গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন

সম্পাদনায় : ডঃ সুকোমল চৌধুরী

গ্রন্থ সম্বন্ধে

'বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম' সিরিজের' দ্বিতীয় নিবেদন "গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন।" বাংলা ভাষায় এজাতীয় গ্রন্থ সর্বপ্রথম প্রকাশিত হইল। বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন লইয়া কিছু কিছু ছোট গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু উক্ত বিষয়ে সর্বসাধারণের পাঠোপযোগী স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি গ্রন্থের অভাব ছিল। আলোচ্য গ্রন্থের গ্রন্থকার ও সম্পাদক ছাত্র-ছাত্রী, গবেষক, অধ্যাপক, সাধারণ পাঠক সকলের কথা চিন্তা করিয়া একটি তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে সাধারণ এবং বিশেষ সকল প্রকার জিজ্ঞাসার সদুত্তর এখানে পাওয়া যাইবে—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। 'বৌদ্ধ ন্যায়' (Buddhist Logic) সম্বন্ধে আলোচনাকে এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। উক্ত বিষয়ে স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থ রচনার প্রয়াস চলিতেছে। বৌদ্ধ বজ্রযান, কালচক্রযান, সহজযান ইত্যাদির আলোচনাও পুনরুক্তি হইবে মনে করিয়া এই গ্রন্থ হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। কারণ আমাদের সিরিজের তৃতীয় খণ্ড 'বৌদ্ধ সাহিত্যে' অধ্যাপক ডঃ বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী ঐ সকল বিষয়ে যথেষ্ট আলোকপাত করিয়াছেন। সামগ্রিকভাবে বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে জিজ্ঞাসু সকল শ্রেণীর পাঠক এই গ্রন্থপাঠে উপকৃত হইবেন বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

মূল্য : একশত পঞ্চাশ টাকা ৩৫০

ISBN 81-87032-13-8

গ্রন্থকার সম্বন্ধে

গ্রন্থকার ও সম্পাদক ডক্টর সুকোমল চৌধুরী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সংস্কৃত, পালি ও তিব্বতী ভাষায় ব্যুৎপন্ন এবং ত্রিপিটক বিশারদ। তাঁহার বহু রচনা পণ্ডিত সমাজে সমাদৃত। দেশ-বিদেশের বহু পত্র-পত্রিকায় বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে তাঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার সম্পাদনায় "ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী" ও "অতীশ মেমোরিয়াল পাবলিশিং সোসাইটী" হইতে ইতিমধ্যে বাংলায় ও ইংরাজীতে বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

বর্তমানে তিনি কলিকাতা রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত কলেজের পালি বিভাগের প্রধান ও বিগত কয়েক বৎসর যাবত উক্ত কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ। তিনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের 'সিনেট' এবং ইউ. জি. কাউন্সিলের সদস্য। বিগত একুশ বৎসর ধরিয়া তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি ও সংস্কৃত বিভাগে অধ্যাপনা করিয়া আসিতেছেন। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটী বিপস্সনা রিসার্চ ইনষ্টিটিউট (ইগতপুরী, নাসিক) বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, বানারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি, মগধ বিশ্ববিদ্যালয়, যাদব-পুর বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত। তিনি বহু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানেরও সক্রিয় সদস্য।

বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সিরিজ—গ্রন্থমালা ২

গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন

সম্পাদনায়

ডঃ সুকোমল চৌধুরী

মহাবোধি বুক এজেন্সী
৪এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০৭৩

GAUTAM BUDDHER DHARMA O DARSHAN

প্রথম প্রকাশ ঃ রাখী পূর্ণিমা, ১৪০৪ (1997)।

প্রকাশক ঃ শ্রী ডি. এল. এস. জয়বর্ধন।
মহাবোধি বুক এজেন্সী।
৪এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট।
কলকাতা-৭৩।

মুদ্রাকর ঃ শ্রীপঞ্চানন জানা, জানা প্রিন্টিং কনসার্ন,
৪০/১বি, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদশিল্পী ঃ প্রবাল প্রামাণিক

মূল্য ঃ ~~একশত পঞ্চাশ টাকা~~।

ISBN 81—87032-13-8

শ্রদ্ধার্ঘ্য

যাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টা ব্যতীত ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে আমার কলিকাতায়
আসা সম্ভব হইত না এবং যাঁহার আশ্রয় সাহায্য ও সহানুভূতি
না পাইলে আমার উচ্চশিক্ষার দ্বার চিরতরে রুদ্ধ হইয়া
যাইত, যাঁহার নিকট আমার পালিভাষায় হাতেখড়ি,
আমার সেই পরমকল্যাণমিত্র পরমশ্রদ্ধাস্পদ
শ্রীমৎ ধর্মপাল মহাস্থবিরের (বর্তমানে
যিনি কলিকাতা বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর
সভার প্রাণপুরুষ ও সাধারণ
সম্পাদক) শ্রীহস্তে এই
ভক্তি শ্রদ্ধার্ঘ্য
সাদরে অর্পিত
হইল।

সুকোমল চৌধুরী

নিবেদন

বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সিরিজের দ্বিতীয় গ্রন্থ "গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন" প্রকাশিত হইল। ইতিপূর্বে এই সিরিজের প্রথম, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিতীয় গ্রন্থের প্রকাশনায় যথেষ্ট বিলম্ব হওয়াতে আমরা দুঃখিত। বিগত আড়াই হাজার বৎসরে বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন কালে বৌদ্ধধর্মের বহু বিবর্তন হইয়াছে। ফলে বুদ্ধের মূল ধর্ম ও দর্শনের মধ্যেও বহু সংযোজন-বিযোজন হইয়াছে, বৌদ্ধধর্মের নূতন নূতন নামকরণ হইয়াছে—হীনযান (=থেরবাদী), মহাযান, তন্ত্রযান (বজ্রযান, কালচক্রযান, সহজযান), দেশ হিসাবেও নামকরণ হইয়াছে তিব্বতী বৌদ্ধধর্ম, চীনা বৌদ্ধধর্ম, জাপানী বৌদ্ধধর্ম, কোরিয়ান বৌদ্ধধর্ম, আরও কত কি! অতএব সমগ্র বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনকে ক্ষুদ্র পরিসরে গ্রথিত করা সম্ভব নহে। তাই আমাদের মূলতঃ লক্ষ্য ছিল 'গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন' লইয়া আলোচনা করা অর্থাৎ বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি-সময়কার ধর্ম ও দর্শন লইয়া আলোচনা করা। আলোচ্য গ্রন্থে অবশ্য তাহাই করা হইয়াছে, তবে পাঠকদের সংশয় নিবারণার্থে শেষে একটি অধ্যায় সংযোজিত হইয়াছে যাহাতে গৌতম বুদ্ধের পরবর্তীকালীন বৌদ্ধ দর্শনের উপর যৎকিঞ্চিৎ আলোকপাত করা হইয়াছে।

এই গ্রন্থ দ্বাদশ অধ্যায়ে সমাপ্ত করা হইয়াছে। প্রথম একাদশ অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শনের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বিষয়। যেমনঃ চারি আর্যসত্য, শীল-মাহাত্ম্য, অনিত্য দর্শন, অনাত্মবাদ, প্রতীত্যসমুৎপাদনীতি, কর্মতত্ত্ব, জন্মান্তরবাদ, নির্বাণ এবং নির্বাণ লাভের মার্গ। দ্বাদশ অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে গৌতম বুদ্ধের পরবর্তীকালীন বৌদ্ধ দর্শন। বৌদ্ধ ধর্মের মূলে চারিটি সম্প্রদায় (শূন্যবাদ, বিজ্ঞানবাদ, সর্বাস্তিবাদ বা বৈভাষিক এবং সৌত্রান্তিক), বৌদ্ধধর্মে ত্রিযান, বৌদ্ধধর্মে ত্রিকায়বাদ, বোধিসত্ত্বচর্যা বা পারমিতা ইত্যাদি এই অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে।

যাঁহাদের রচনার সাহায্য ব্যতিরেকে এই গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব হইত না তাঁহারা হইলেনঃ জার্মাণ বৌদ্ধ পণ্ডিত Nyanatiloka, Narada Thera, অগ্‌গমহাপণ্ডিত শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির, শ্রী দ্বারিকামোহন মুচ্ছুদ্দী, ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া, দার্শনিকপ্রবর শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির, পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন, পণ্ডিত শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির, ভিক্ষু শীলাচার শাস্ত্রী,

শান্তি ভিক্ষু শাস্ত্রী, আচার্য নরেন্দ্রদেব, শ্রীমৎ ভিক্ষু আর্য্যমিত্র (রেঙ্গুন) প্রমুখ দার্শনিকগণ। একমাত্র পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির ব্যতীত তাঁহাদের কেহ আর জীবিত নাই। উপরিউক্ত দার্শনিকগণের নিকট আমি আমার অপরিশোধ্য ঋণ স্বীকার করিতেছি।

ভগবান বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন লইয়া আলোচনা করার মত জ্ঞান আমার কোথায়! পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘনের স্বপ্নের ন্যায় আমিও দুঃসাধ্য ব্রতে ব্রতী হইয়াছি। এই গ্রন্থে যাহা কিছু ভাল তাহার কৃতিত্ব উপরিউক্ত মনীষিগণের, আর যাহা কিছু মন্দ তাহার জন্য মাদৃশ অভাজন এবং অনধিকারীই দায়ী। কাজেই এই গ্রন্থের গ্রন্থকার হিসাবে আমার নাম দেওয়া ধৃষ্টতামাত্র। এই গ্রন্থের সম্পাদনা করা ব্যতীত আমার অন্য কোন কৃতিত্ব নাই। অতএব সম্পাদক হিসাবেই আমি আমার নাম দিয়াছি। আমার 'মহামানব গৌতম বুদ্ধ' পাঠ করিয়াও অনেকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন গ্রন্থকার হিসাবে নাম না দিয়া সম্পাদক হিসাবে কেন নাম দিয়াছি! ইহার উত্তরও একই। গৌতম বুদ্ধের জীবনচরিত রচনা করার মত পাণ্ডিত্য আমার কোথায়! বহু মনীষিগণের রচনা হইতে তথ্য সংগৃহীত করিয়া আমি উক্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছি মাত্র। অতএব সেখানে আমার কোন কৃতিত্ব নাই। কৃতিত্ব তাঁহাদের যাঁহাদের রচনা হইতে আমি সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। আলোচ্য গ্রন্থখানির ক্ষেত্রেও তাহাই সত্য। সংকলন করার সময় আমার লক্ষ্য ছিল বহুজনের হিত ও বহুজনের সংশয় নিরসন। বুদ্ধের দর্শন লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে বাক্‌বিতণ্ডার অন্ত নাই। আমার চেষ্টা ছিল যাহা প্রকৃতপক্ষে সত্য তাহাই সর্বসমক্ষে তুলিয়া ধরা। বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শনে তর্ক-বিতর্কের কোন স্থান নাই। ইহা হইতেছে অন্তর্মুখী সাধনার দ্বারা স্বয়ং উপলব্ধব্য এবং 'এহিপস্সিকো'।

এই গ্রন্থপাঠের দ্বারা কাহারও যদি বিন্দুমাত্রও লাভ হয় তাহা হইলে এই গ্রন্থ সম্পাদনা সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করিব। অলমতিবিস্তরেণ।

সুকোমল চৌধুরী

সংস্কৃত কলেজ
কলিকাতা
রাখী পূর্ণিমা, ১৪০৪

বিষয় নির্দেশ

যদত্র সৌষ্ঠবং কিঞ্চিৎ তৎ বিদামেব মে নহি ।
যদত্রাসৌষ্ঠবং কিঞ্চিৎ তন্মমৈব বিদাং নহি ।।

গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন

নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স

অবতরণিকা

অধ্যায়—এক

মহামানব গৌতম বুদ্ধের ধর্মকে জানিতে হইলে ইহার উৎপত্তির সমকালীন ভারতবর্ষের ধর্মীয় ইতিহাস যেমন জানা প্রয়োজন, তদ্রূপ প্রাক্-বুদ্ধযুগীয় ভারতবর্ষের ধর্মীয় অবস্থা বিষয়েও ধারণা থাকা আবশ্যক। সাধারণতঃ বৌদ্ধধর্মবিষয়ে পঠনপাঠন বুদ্ধের জীবনচরিত দিয়াই সুরু হয়। কিন্তু এইস্থলে আমাদের বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতে হইবে। ইহার দ্বারা সামগ্রিকভাবে ভারতীয় চিন্তাধারার পটভূমিতে বুদ্ধের ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ জানা যাইতে পারে।

উত্তর ভারতে দুইটি বড় নদী আছে—গঙ্গা এবং যমুনা। হিমালয়ের বিভিন্ন উৎস হইতে এই দুইটি নদীর উৎপত্তি এবং উৎপত্তিস্থল হইতে বহুদূর পর্য্যন্ত ইহারা পৃথগ্‌ভাবে প্রবাহিত হইয়াছে এবং উত্তর-পূর্ব ভারতে আসিয়া উভয়ে মিলিত হইয়াছে। গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থল হইতেছে বর্তমান এলাহাবাদ। এই সঙ্গমস্থল হইতে ইহাদের সম্মিলিত ধারা বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। এই দুইটি নদীর ভূগোল হইতেছে ভারতীয় ধর্ম দর্শন ও চিন্তার উৎপত্তি ও বিবর্তনের প্রতীক স্বরূপ কারণ ভারতীয় ধর্মেও আমরা দুইটি স্রোতস্বিনীকে দেখিতে পাই যেগুলি প্রথমাবস্থায় ছিল স্বতন্ত্র, ইহাদের উৎসও স্বতন্ত্র এবং সুদীর্ঘকাল যাবত নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু অবশেষে একটি স্থানে আসিয়া ইহারা সম্মিলিত হইয়াছে এবং একত্রিত অবস্থায় বর্তমান অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে। অতএব প্রাক্-বুদ্ধযুগীয় ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনাকালে আমাদের স্মরণ করিতে হইবে যে, এই দুইটি ধারা উৎসস্থলে ছিল স্বতন্ত্র, পরে বিশেষ এক স্থানে উভয়ে মিলিত হইয়াছে এবং অবশেষে সাগরে গিয়া পড়িয়াছে।

ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও আমরা দেখি যে, তিন হাজার বৎসর পূর্বে ভারত উপমহাদেশে একটি উন্নতমানের সভ্যতা বর্তমান ছিল। এই সভ্যতা মানব-সংস্কৃতির শৈশবাবস্থার ন্যায় এবং মিশর ও বেবীলনের সভ্যতার মত প্রাচীন। এই সভ্যতা খৃঃ পূঃ ২৮০০ হইতে ১৮০০-এর মধ্যবর্তী সময়ের সভ্যতা। ইহাকে বলা হইত সিন্ধুসভ্যতা, ইহাকে হরপ্পা সভ্যতাও বলা হইত। ইহা বর্তমান পাকিস্তান হইতে দক্ষিণে বোম্বাই এবং পূর্বদিকে হিমালয়ের পাদদেশে সিমলা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সভ্যতা শুধু যে সহস্রাধিক বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল তাহা নহে। ইহা ছিল আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক উভয় দিকে অত্যন্ত উন্নতমানের একটি সভ্যতা। আধিভৌতিক দিয়া বিচার করিলে এই সভ্যতা ছিল কৃষিভিত্তিক। এই যুগের মানুষেরা চাষাবাদে যেমন দক্ষ ছিলেন তেমনই দক্ষ ছিলেন নগর পত্তনে। অধিকন্তু তাঁহাদের ছিল একটি উন্নতমানের আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি। মহেঞ্জোদরো এবং হরপ্পা হইতে যে সকল প্রত্নতাত্ত্বিক দ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাই ইহার প্রমাণ। আরও প্রমাণ পাওয়া যায় যে তাঁহারা ছিলেন শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত। উন্নতমানের লিপি তাঁহারা ব্যবহার করিতেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অদ্যাপি আমরা সেই লিপির সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করিতে সক্ষম হই নাই।

খ্রীঃ পূঃ ১৮০০ অথবা ১৫০০ তে উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে একটি সামরিক অভিযান আসিয়া এই সভ্যতার শান্তিপূর্ণ জীবনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করিয়াছে। আক্রমণকারীরা নিজেদের আর্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। বস্তুতপক্ষে এই আর্যনামটি পূর্ব ইউরোপের জনগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পোল্যাণ্ড হইতে পশ্চিম রাশিয়া পর্যন্ত সুবিস্তৃত তৃণভূমি অঞ্চলেই এই আর্যদের উৎসস্থল। সিন্ধু সভ্যতার জনগণ অপেক্ষা আর্যরা স্বতন্ত্র, তাহার কারণ আর্যরা ছিলেন প্রধানতঃ যাযাবর এবং মেষপালক। তাঁহাদের কোনও উচ্চমানের নাগরিক সভ্যতা ছিল না। তাঁহাদের সভ্যতাকে সামরিক সভ্যতা বলা যাইতে পারে কারণ তাঁহারা উন্নতমানের যুদ্ধবিদ্যা দ্বারা পূর্বমুখী অভিযান চালাইয়া পরাজিত অধিবাসীদের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠনের আসক্তিই ছিল তাঁহাদের সেই সভ্যতার ভিত্তিস্বরূপ। আর্যরা ভারতে আসিয়াই অতি দ্রুত গতিতে সিন্ধু সভ্যতার বিনাশ ঘটাইয়াছে। আর্যদের উন্নত সামরিক শক্তির নিকট সিন্ধুসভ্যতা লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। ফলতঃ পরবর্তীকালে

অর্থাৎ আর্যদের ভারত অভিযানের পরে ভারতে আর্যসভ্যতাই একমাত্র এবং আদি সভ্যতা রূপে পরিগণিত হইয়াছে।

সিন্ধুসভ্যতার প্রকৃতি সম্বন্ধে দুইটি উৎসই আমাদের প্রামাণ্য—

(১) মহেঞ্জোদরো এবং হরপ্পায় আবিষ্কৃত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন।

(২) বিজিত জনগণের ধর্মীয় আচার ও বিশ্বাস সম্বন্ধে আর্যদের দ্বারা সংরক্ষিত তথ্যাদি।

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে কতকগুলি প্রতীকচিহ্ন পাওয়া গিয়াছে যেগুলির ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য আছে। বিশেষতঃ এই প্রতীকগুলি বৌদ্ধধর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট। যেমন বোধিবৃক্ষের প্রতীক, হস্তী, মৃগ ইত্যাদির প্রতীক। সেখানে কতকগুলি মূর্তি পাওয়া গিয়াছিল যেগুলি পদ্মাসনে উপবিষ্ট এবং যাহাদের হস্তদ্বয় জানুর উপর রক্ষিত, চক্ষুদ্বয় নিমীলিত—মনে হয় যেন ধ্যানমগ্ন। প্রসিদ্ধ ভারততত্ত্ববিদ্‌গণ এইসকল প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ গবেষণা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিল যে সিন্ধুসভ্যতার যুগে ধ্যানের প্রচলন ছিল। আর্যদের রচিত বৈদিক সাহিত্য হইতে সিন্ধু সভ্যতার যুগের কিছুটা ধর্মীয় বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন পরিব্রাজকের কথা পুনঃ পুনঃ বর্ণিত হইয়াছে যাহারা ধ্যানাভ্যাস করিতেন, ব্রহ্মচর্য পালন করিতেন, কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করিতেন। কখনও বা তাঁহারা দিগম্বর, কখনও বা সামান্য বস্ত্র পরিহিত, তাঁহারা অনাগারিক হইয়া যত্র-তত্র বিচরণ করিতেন, এবং জনগণকে জন্ম-মৃত্যুর অমোঘ বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার পথের সন্ধান দিতেন। বৈদিক সাহিত্য এবং প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনকে সমন্বয় করিলে সিন্ধুসভ্যতা যুগের জনগণের ধর্মীয় ভাবধারার অনেক উপাদান পাওয়া যায়। প্রথমতঃ ধ্যান, দ্বিতীয়তঃ অভিনিষ্ক্রমণ বা সংসার ত্যাগ, পরিব্রাজকের জীবন যাপন করা, তৃতীয়তঃ অনেক পূর্বজন্মের ধারণা, চতুর্থতঃ এই জীবনের পরে পুনর্জন্ম সম্বন্ধে ধারণা, কর্মবাদ এবং সর্বশেষে আছে ধর্মীয় জীবন এবং মোক্ষের লক্ষ্য। প্রাচীনতম ভারতীয় সভ্যতায় এইগুলি হইতেছে ধর্মের মূলতত্ত্ব।

আর্য ও সিন্ধু সভ্যতার ধর্মের পরিচয়

আর্যদের ধর্ম বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ বৈদিক সাহিত্য পাওয়া যায়। প্রাথমিক পর্যায়ে আর্যরা কতকগুলি প্রাকৃতিক শক্তির উপর দেবত্ব আরোপ করিয়াছেন।

ইন্দ্র হইতেছেন বজ্র-বিদ্যুতের দেবতা, অগ্নি অগ্নির দেবতা এবং বরুণ জলের দেবতা। এখানে দেখা যায় পুরোহিত হইতেছে সর্বেসর্বা কারণ তিনি দেবতা ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থের কাজ করেন। কিন্তু সিন্ধু সভ্যতায় ঋষি বা তপস্বীই হইতেছেন প্রধান ব্যক্তিত্ব। সিন্ধু সভ্যতায় ধর্মীয় জীবনের আদর্শ হইতেছে অভিনিষ্ক্রমণ (ত্যাগ), কিন্তু আর্যধর্মের আদর্শ হইতেছে গার্হস্থ্য ধর্ম (ভোগ)। সিন্ধুসভ্যতায় সন্তান-সন্ততির প্রতি ব্যক্তির আকর্ষণ কম কিন্তু আর্যসভ্যতায় পুত্র হইতেছে বিশেষ মূলধন-স্বরূপ। সিন্ধু সভ্যতায় ধ্যানচর্চার বা তপস্যার কথাই প্রাধান্য পাইয়াছে, আর্যসভ্যতায় যাগ-যজ্ঞের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়—যুদ্ধজয়, পুত্রলাভ, স্বর্গগমন ইত্যাদির জন্য যাগ-যজ্ঞাদির মাধ্যমে দেবতাদের তুষ্ট করাই ছিল লক্ষ্য। সিন্ধুসভ্যতায় কর্মনীতি এবং পুনর্জন্মে বিশ্বাস একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিল, কিন্তু আর্যসভ্যতায় পুনর্জন্মের ধারণা নাই। সিন্ধুসভ্যতায় দেখা যায়, ভবিষ্যতে অনেক জন্ম অবধি কর্মবিপাক চলিতে থাকে, কিন্তু আর্যসভ্যতায় তদ্রূপ দৃষ্ট হয় না। বাস্তবিকপক্ষে আর্যসভ্যতায় সর্বোচ্চ আদর্শ ছিল 'আনুগত্য' এবং স্ব স্ব গোষ্ঠীর শক্তি বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থার বিধান। সিন্ধুসভ্যতায় ধর্মীয় জীবনের লক্ষ্য ছিল 'মুক্তি'বা মোক্ষলাভ, কিন্তু আর্যসভ্যতায় ধর্মীয় জীবনের লক্ষ্য ছিল স্বর্গলাভ। অবশ্য তাঁহাদের স্বর্গ সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল, তাহাও বিচিত্র। স্বর্গ বলিতে তাঁহারা বুঝিতেন এই জীবনেরই চরম উৎকর্ষের অবস্থা, পরিপূর্ণতা। সুতরাং সিন্ধুসভ্যতা এবং আর্যসভ্যতায় ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে যে তারতম্য আছে সেই বিষয়ে বলিতে হইলে বলা যায় যে, সিন্ধুসভ্যতায় গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে আত্মোৎসর্গ, আত্মত্যাগ, ধ্যান-ধারণা (তপস্যা), পুনর্জন্ম, কর্ম, ইত্যাদিকে। অপরদিকে আর্যসভ্যতায় প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে বর্তমান জীবন বৈষয়িক উন্নতি, ধন, ক্ষমতা, যশ এবং এইগুলি প্রাপ্তির জন্য যাগযজ্ঞের বিধানকে। অতএব দেখা যাইতেছে একটি অপরটি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। আর্যসভ্যতার আরও দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অনুধাবনযোগ্য—১। জাতিভেদ প্রথা—কর্মানুসারে চতুর্বর্ণের সৃষ্টি। ২। বেদ সাহিত্যের অপৌরুষেয়ত্ব। সিন্ধুসভ্যতায় ইহার কোনটিই দৃষ্ট হয় না।

খৃঃ পূঃ ১৫০০ হইতে খৃঃ পূঃ ৬০০ এই এক হাজার বৎসরের ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস হইতেছে সিন্ধু সভ্যতা ও আর্য সভ্যতা—এই দুই বিপরীত-

মুখী সভ্যতার মধ্যে ক্রম-সংঘাতের ইতিহাস। আর্যরা যতই ক্রমশঃ ভারতের পূর্বদিকে বিস্তার লাভ এবং ভারতীয় উপমহাদেশের বিশাল ভূখণ্ডে স্থায়ী-ভাবে বসতি স্থাপন করিতে সুরু করে (অর্থাৎ যখন আর্যরা রাজ্যজয় ও লুণ্ঠনের নেশা কমাইয়া স্থায়ীভাবে এইদেশে বসতি স্থাপনের সঙ্কল্প করে), তখন এই দুই বিপরীতমুখী ধর্মীয় আদর্শ একে অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সুরু করে এবং ক্রমশঃ উভয়ে মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া যায়। এই মিলনকেই আমরা বলিয়াছি দুই মহানদীর মিলন। গঙ্গা যমুনার সঙ্গম। ইহারই ফলশ্রুতিরূপে আমরা বুদ্ধের সময় দেখিতে পাই বিভিন্ন ধর্মমতের প্রাবল্য। বুদ্ধের জীবনকে পুংখানুপুংখরূপে পর্যালোচনা করিলে এই সত্য প্রকট হইবে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে—যখন বুদ্ধের জন্ম হয় তাঁহার ভবিষ্যত সম্বন্ধে দুই জ্যোতিষীগোষ্ঠী দুইরকম ভবিষ্যদ্বাণী করেন। প্রথমটি করিয়াছিলেন ঋষি অসিত (পালি সাহিত্যে যাঁহার নাম কালদেবল)। অসিত ব্রাহ্মণ এবং পুরোহিত সম্প্রদায়ের অন্যতম ছিলেন। তিনি হিমালয়ে বাস করিতেন। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, বুদ্ধযুগে ব্রাহ্মণরাও গৃহত্যাগ করিয়া তপস্বী হইতেন। কিন্তু বুদ্ধজন্মের এক হাজার বৎসর পূর্বে এইরূপ ঘটনা শোনা যায় না। ইহার পর আমরা জানিতে পারি যে, রাজা শুদ্ধোদন ১০৮ জন ব্রাহ্মণকে পুত্রের নামকরণের দিন নিমন্ত্রণ করেন। ইহা প্রমাণ করে যে, পুরোহিতরা সংসারত্যাগী ছিলেন না—তাঁহারা আর্য-সভ্যতারই ধারা বহন করিতেছিলেন।

এখন প্রশ্ন হইতেছে কি করিয়া দুই ভিন্নমুখী সভ্যতা—সিন্ধুসভ্যতা ও আর্যসভ্যতা একসূত্রে মিলিত হইতে সক্ষম হইয়াছিল। ইহার উত্তর পাওয়া যাইবে খৃষ্টপূর্ব দুই হাজার বছর হইতে সুরু করিয়া বুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত ভারতীয় জনজীবনের মধ্যে যে পরিবর্তন আসিয়াছিল তাহাতে। আর্যরা যখন ভারতের সমতল ভূমি দখল করেন তখন তাঁহাদের রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্খা স্তিমিত হয়। ইহাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বহু পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছিল। প্রথমতঃ উপজাতীয় রাজনৈতিক সমাজ এক একটি সংগঠিত রাষ্ট্রে পরিণত হয়—একান্ত আনুগত্য সম্পন্ন উপজাতীয় ভাবধারা ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইল। একাধিক জনগণ এক একটি রাষ্ট্রে মিলিত হইয়াছে। রাজা বিম্বিসারের দ্বারা শাসিত

বুদ্ধের সময়কার মগধরাজ্য হইতেছে—তাহার একটি প্রমাণ। দ্বিতীয়তঃ পশুপালনের যাযাবর জীবনযাত্রা ক্রমশঃ একটি উন্নত নগরমুখী কৃষিজীবনে পরিণত হইয়াছে, ফলে জনগণ নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত হইল—যে সকল প্রাকৃতিক শক্তির উপর দেবত্ব আরোপ করা হইয়াছিল তাহা হইতে তাহারা অনেক দূরে চলিয়া গেল। অর্থনীতির ক্ষেত্রে ব্যবসা-বাণিজ্য বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিল। সুতরাং আর্যসভ্যতার গোড়ার দিকে যেখানে শুধুমাত্র পুরোহিত এবং যোদ্ধূ সম্প্রদায়ের প্রাধান্য ছিল—পুরোহিত যেহেতু তিনি দেবতাদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করিতেন আর যোদ্ধৃবর্গ শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া লুণ্ঠিত দ্রব্য নিজেদের সংস্থার অন্তর্ভুক্ত করিতেন—এখন সেখানে বণিক্‌দের প্রাধান্য হইল। বুদ্ধের সময় আমরা দেখিতে পাই অনাথ-পিণ্ডিকের (অনাথপিণ্ডদ) মত বহু ধনাঢ্য শ্রেষ্ঠী বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সকল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন স্বাভাবিকভাবে সিন্ধুসভ্যতার ধর্মীয় আদর্শ ও ভাবধারাকে সহজভাবে গ্রহণ করিতে আর্যদের বাধ্য করিয়াছে। আর্যরা সিন্ধু উপত্যকার জনগণকে শস্ত্রের দ্বারা জয় করিলেও পরবর্তী এক হাজার হইতে দুই হাজার বৎসর তাঁহাদিগকে সিন্ধুসভ্যতার প্রভাবে প্রভাবিত হইতে দেখা যায়। ইহার ফলে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া আর্য সংস্কৃতি ও সিন্ধু-উপত্যকায় সংস্কৃতির মধ্যে ব্যবধান ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের বিরোধী অথবা বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মেরই একটি শাখা—ইহা একটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণাপ্রসূত। বৌদ্ধধর্মের অনেক কিছু সিন্ধু-উপত্যকার ধর্মের মধ্যে বর্তমান ছিল—যেমন, সংসার ত্যাগের ধারণা, ধ্যান-সমাধি, কর্ম, পুনর্জন্ম মোক্ষলাভ ইত্যাদি। বুদ্ধ নিজেও স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি যে দুঃখমুক্তির মার্গের সন্ধান দিয়াছেন তাহা প্রাচীন ভারতবর্ষেরই পন্থা, এবং যে লক্ষ্যের নির্দেশ দিয়াছেন তাহাও প্রাচীন। এই কল্পেই গৌতম বুদ্ধের পূর্বে ছয়জন বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছিল। এই সকল ঘটনা প্রমাণ করে যে, গৌতম বুদ্ধের শিক্ষার সহিত সিন্ধুসভ্যতা যুগের ধর্মীয় ভাবধারার অনেক সাদৃশ্য আছে। হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে উভয়েই সিন্ধুসভ্যতা ও আর্যসভ্যতা হইতে অনেক কিছু গ্রহণ করিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যদি বৌদ্ধধর্মকে বিচার করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, বৌদ্ধধর্মের অনেক কিছু সিন্ধুসভ্যতা হইতে

গৃহীত এবং সামান্য কিছু আর্যসভ্যতা হইতে গৃহীত। সেইজন্য বৌদ্ধশাস্ত্রে আর্য দেবতাদের উল্লেখ থাকিলেও ঐ সকল দেবতাদের ভূমিকা অত্যন্ত সীমিত। অন্যদিকে হিন্দুধর্মের বহু শাখাকে পর্যালোচনা করিলে—দেখা যাইবে যে, ইহাদের বহু উপাদান আর্য সভ্যতা হইতে গৃহীত এবং খুব সামান্যই সিন্ধু সভ্যতা হইতে গৃহীত। ইহাতে জাতিভেদ প্রথার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। বেদকে অপৌরুষেয় রূপে স্বীকার করা হইয়াছে। যাগ-যজ্ঞকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বৈরাগ্য, ধ্যান, কর্ম এবং পুনর্জন্মের ধারণাকেও অল্প বিস্তর স্থান করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বুদ্ধ যুগ

গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবকালে দেখা যায় যে, সিন্ধুসভ্যতা ও আর্য-সভ্যতা পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সুরু করে এবং পরবর্তী এক হাজার বৎসর ধরিয়া এই ধারা চলিতে থাকে। এক হাজার বৎসর পরে এই দুই সভ্যতা মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া যায় এবং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষের 'মধ্যদেশ' অঞ্চলেই (বর্তমান বিহার ও উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চল লইয়া গঠিত অঞ্চল) এই দুই সভ্যতার মধ্যে পরস্পর সক্রিয়ভাবে মিলন দেখা যায়। এই মধ্যদেশকে ব্রাহ্মণগণ আর্যসভ্যতার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে গ্রহণ করেন। ইহা লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, যেখানে যেখানে উক্ত এই সভ্যতার ধারা মিলিত হইয়াছে, সেখানে সেখানে নূতন নূতন ধর্মীয় আদর্শের জাগরণ হইয়াছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ভগবান বুদ্ধের জীবনী আলোচনা করিতে পারি। একদিকে দুই ধর্মীয় ভাবধারার সমন্বয়, অন্যদিকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন—এইগুলি মানুষের ধর্মীয় চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রগতির সময়েই মানুষ অন্তর্মুখী হয়, ধর্মমুখী হয়। যখন তাঁহারা দেখেন যে তাঁহাদের পিতৃপুরুষদের সুপ্রতিষ্ঠিত ও অপরিবর্তিত ধর্মবোধের ভিত্ আন্দোলিত হইতেছে, তখনই নতুন ধর্মচিন্তার জন্য তাঁহাদের স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা গিয়াছে এবং ইহাই উন্নতমানের ধর্মীয় চেতনা ও কার্যকলাপের জন্ম দিয়াছে। খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ইহাই দেখা গিয়াছে।

বুদ্ধের জীবনের তিনটি মূল্যবোধের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে—

বৈরাগ্য ও সংসার ত্যাগ, মৈত্রী ও করুণা এবং প্রজ্ঞা। বুদ্ধের জীবন হইতে এইগুলি সুস্পষ্ট রূপে ধারণা করা যায়। বস্তুতপক্ষে ঐ তিনটি গুণই নির্বাণ প্রাপ্তির হেতু স্বরূপ। কারণ তিন প্রকার ক্লেশ (চিত্ত-কলুষতা) বারবার মানুষকে দুঃখের পথে আকর্ষণ করে—তৃষ্ণা, দ্বেষ এবং অবিদ্যা। বৈরাগ্য হইতেছে তৃষ্ণায় প্রতিষেধক, মৈত্রী ও করুণা হইতেছে দ্বেষের প্রতিষেধক, এবং প্রজ্ঞা হইতেছে অবিদ্যার প্রতিষেধক। এই তিনটি গুণের অনুশীলনের দ্বারা ক্লেশসমূহ দূরীভূত হয় এবং নির্বাণ লাভ হয়। সুতরাং এই তিনটি গুণ বুদ্ধের জীবনে বিশেষভাবে যে প্রকটিত হইবে—ইহা অপ্রত্যাশিত নহে।

এখন ঐ তিনটি গুণের প্রত্যেকটিকে একে একে আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ বৈরাগ্য বিষয়ে আলোচনা করা যায়। অতি শৈশবেই সিদ্ধার্থ গোতমের মধ্যে বৈরাগ্যের লক্ষণ দেখা যায়। "সমস্ত কিছুই দুঃখময়"—এই সিদ্ধান্ত হইতেই বৈরাগ্যের উৎপত্তি। কারণ যখন কাহারও এই জ্ঞান হয় যে, জীবন দুঃখময় তখনই জীবনের প্রতি তাঁহার বৈরাগ্য আসে। এইজন্য দুঃখকে প্রথম আর্যসত্য বলা হইয়াছে। নগর ভ্রমণে বাহির হইয়া সিদ্ধার্থ চারিটি দৃশ্য দেখিতে পান—১। জরাগ্রস্ত ব্যক্তি ২। ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি ৩। মৃতদেহ এবং ৪। সন্ন্যাসী। এইসব দেখিয়া ভোগতৃষ্ণার প্রতি তাঁহার বৈরাগ্য জন্মে এবং সংসার ত্যাগ করিয়া সত্যের সন্ধানে বাহির হন। ইহা লক্ষ্য করার বিষয় যে, সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ কোন হতাশার কারণে নহে। তিনি সমস্ত প্রকার দিব্যসুখ ভোগ করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার মধ্যে এই উপলব্ধি হয় যে, ইন্দ্রিয়সুখ ও বিষয়াসক্তির চরমে পৌঁছিলেও প্রত্যেককে এই সত্যের সম্মুখীন একদিন হইতেই হইবে যে, দুঃখই চরম সত্য, ইহা স্বয়ং উপলব্ধি করিয়া সিদ্ধার্থ সমস্ত প্রাণিগণের হিতৈষী হইয়া সংসার ত্যাগ করতঃ বোধির সন্ধানে বহির্গত হন।

দ্বিতীয়তঃ মৈত্রী এবং করুণাও বুদ্ধের জীবনে বিশেষ স্থান অধিকার করে। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার মধ্যে এই গুণ লক্ষ্য করা যায়। দেবদত্ত যে হংসটিকে তীরবিদ্ধ করিয়া ভূপাতিত করিয়াছিল, সিদ্ধার্থ তাহারই প্রাণ রক্ষা করার চেষ্টা করেন। তিনি সযত্নে হংসটিকে কোলে লইয়া শুশ্রূষা করিতে আরম্ভ করেন। দেবদত্ত আসিয়া হংসটিকে দাবী করিল, কারণ সে-ই ঐ হংসটিকে তীরবিদ্ধ করিয়াছে। উভয়ে এই বিষয় লইয়া বিবাদাপন্ন হইলে জনৈক বয়স্ক ব্যক্তি বিচার করিয়া বলেন যে, যে হংসটির জীবন দান করিয়াছে

হংসটি তাহারই প্রাপ্য। যে হত্যা করার চেষ্টা করিয়াছে, তাহার নহে। এই ঘটনা হইতেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সিদ্ধার্থ বাল্যকাল হইতেই ছিলেন মৈত্রীপরায়ণ ও করুণাদ্রচিত্ত। পরবর্তী জীবনেও দেখা যায় যে তিনি জনৈক তিষ্য নামক ভিক্ষুকে স্বয়ং সেবা-শুশ্রূষা করিয়া জীবন দান করিয়াছিলেন। তিষ্য ভিক্ষুর এমন রোগ হইয়াছিল যে, ঘৃণায় অন্যান্য ভিক্ষুগণ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন।

বুদ্ধের জীবনে তৃতীয় প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে প্রজ্ঞা। তাঁহার জীবনে তিনটি বিশেষ গুণের মধ্যে প্রজ্ঞাই শ্রেষ্ঠ, কারণ এই প্রজ্ঞাই অমৃতের দ্বার মুক্তির দ্বার উন্মোচিত করে। এই প্রজ্ঞাই অবিদ্যাকে উন্মূলিত করে যে অবিদ্যা হইতেছে দুঃখের অন্তর্নিহিত কারণ। একটি বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা যতই ছিন্ন করা হউক না কেন, যতক্ষণ না ইহার মূল উৎপাটিত করা হইতেছে, ততক্ষণ পুনরায় শাখা-প্রশাখার উৎপত্তি হইতে পারে। তদ্রূপ ইচ্ছা করিলে ত্যাগের দ্বারা (অভিনিষ্ক্রমণের দ্বারা) তৃষ্ণাকে জয় করা যাইতে পারে। মৈত্রী করুণার দ্বারা বিদ্বেষ এবং হিংসাকে জয় করা যাইতে পারে, কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত না অবিদ্যা সমূলে উৎপাটিত হইতেছে ততক্ষণ তৃষ্ণা এবং বিদ্বেষ বারবার উৎপন্ন হইতে পারে। এই অবিদ্যাকে ছিন্নমূল করিতে হইলে প্রজ্ঞারই প্রয়োজন।

প্রাথমিকভাবে ধ্যানের দ্বারাই প্রজ্ঞা লাভ করা যায়। বুদ্ধের জীবনে আমরা দেখিয়াছি যে, শৈশবকাল হইতেই তিনি ধ্যানী। রাজা শুদ্ধোদনের হলকর্ষণ উৎসবের দিন শিশুপুত্র সিদ্ধার্থকে ধ্যানাসনে আসীন দেখিয়া রাজা তাঁহাকে প্রণাম করিয়াছিলেন। জীবের দুঃখে কাতর হইয়া সমস্ত রাজসুখ বিসর্জন দিয়া তিনি সংসারত্যাগ করিয়াছিলেন এবং যোগসাধনাকেই পাথেয় করিয়া তৎকালীন ভারতবর্ষের বিখ্যাত দুইজন মহাযোগীর শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহারা হইলেন অরাড় কালাম এবং রুদ্রক রামপুত্র। তাঁহাদের নিকটও তিনি সেই যোগাভ্যাসই করিয়াছিলেন। যোগসাধনা ভারতবর্ষের অন্তরাত্মার সহিত জড়িত, যোগসাধনা ভারতবর্ষের মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত। তাই আমরা দেখি যে, মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পায় আবিষ্কৃত মূর্তি ও চিত্রকলায় ধ্যানাসীন মূর্তি দেখা যায়। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, ভারতীয় যোগসাধনার ধারা খৃঃ পূঃ অন্যূন তিন হাজার বছর হইতে চলিয়া আসিতেছে। মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পা যুগের ভারতীয় সভ্যতার উত্তরসূরী

হইতেছেন এই ঋষি অরাড় কালাম এবং রুদ্রক রামপুত্র। কিন্তু কুমার সিদ্ধার্থ ঋষি অরাড় কালাম এবং রুদ্রক রামপুত্রের নিকট যোগাভ্যাস করিয়া তাঁহাদেরও ত্যাগ করিয়াছিলেন কারণ তাঁহার মতে শুধুমাত্র যোগসাধনার দ্বারা স্থায়ীভাবে দুঃখমুক্তি সম্ভব নয়। ইহাতে দেখা যায় যে, সিন্ধুযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাক্‌বুদ্ধযুগ পর্যন্ত ভারতবর্ষে যে যোগসাধনার ধারা চলিয়া আসিয়াছে তাহার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে দুঃখমুক্তি ও অজর-অমর অবস্থা লাভ করা সম্ভব নহে। তাই বুদ্ধ অরাড় কালাম ও রুদ্রক রামপুত্রের নিকট হইতে বিদায় লইয়া একাকী কঠোর তপস্যা করিয়া সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন যাহাতে আর পুনর্জন্ম নাই, জরা-ব্যাধি-মৃত্যু নাই, আছে শুধু পরমা শান্তি যা নিত্য ও শাশ্বত এবং যা অনির্বচনীয়। এই অবস্থার নাম দেওয়া হইয়াছে নির্বাণ।

এখন প্রশ্ন হইতেছে—বুদ্ধের নির্বাণ আর বুদ্ধপূর্বযুগের ঋষিগণের দ্বারা আয়ত্ত মোক্ষের মধ্যে পার্থক্য কোথায় ?

বুদ্ধপূর্বযুগের ঋষিরা পাতঞ্জল দর্শনের চতুর্থ অরূপধ্যান বা অষ্ট সমাপত্তির ঊর্ধ্বে যাইতে পারেন নাই। চতুর্থ অরূপধ্যান বা নৈবসংজ্ঞানা-সংজ্ঞায়তনে সমারূঢ় হইয়া তাঁহারা যে মোক্ষ বা মুক্তির আস্বাদ পাইয়াছিলেন তাহার নাম ব্রহ্মনির্বাণ। গৌতম বুদ্ধ তাহারও ঊর্ধ্বে এক ধ্যানস্তরে আরোহণ করিয়া "সংজ্ঞাবেদয়িতনিরোধ" নামক নবম সমাপত্তি হইতে যে মোক্ষ বা মুক্তির আস্বাদ পাইয়াছিলেন তাহা পূর্বায়ত্ত মোক্ষের তুলনায় বিমোক্ষ বা বিমুক্তি। তাঁহার মতে নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন পর্য্যন্ত প্রত্যেক সমাধি ও সমাপত্তিতে সাময়িক চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হয় এবং তখন মুক্তির আস্বাদ সম্ভব হইলেও ঐ চিত্তের অবলম্বন কেবলমাত্র ভব, নির্বাণ নহে। কারণ তখনও ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞান ও ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ বিষয়ের প্রতি মনস্কার থাকিয়া যায়। বুদ্ধের মতে আপাতদৃষ্টিতে অরূপ ব্রহ্মনির্বাণ দীর্ঘস্থায়ী উপশান্তি হইলেও অনন্তকালের তুলনায় ইহার স্থায়িত্ব কয়েক মুহূর্তমাত্র। অতএব এই মুক্তি সাধকের চরম লক্ষ্য হইতে পারে না। কিন্তু বুদ্ধের সংজ্ঞাবেদয়িতনিরোধ নামক সমাপত্তিতে ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষবিষয়ের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই থাকে না।

বর্তমান বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষমূলে সেই বৈশাখী পূর্ণিমা রাত্রির প্রথম প্রহরে যখন গৌতম সংজ্ঞাবেদয়িতনিরোধ ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন তখন তিনি লাভ করিলেন জাতিস্মর জ্ঞান। জ্ঞানালোকে পরিপূর্ণ হইল তাঁহার দেহ

মন। তিনি জানিতে পারিলেন তাঁহার পূর্ব পূর্ব জন্মের ঘটনা—এক জন্ম, দুই জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, শতসহস্র জন্ম, সংবর্তকল্প, বিবর্তকল্প—এমন কি সংবর্ত-বিবর্তকল্পে তিনি কি ছিলেন, কি নাম, কি গোত্র, কি জাতি, কত ছিল পরমায়ু সকলই তাঁহার মনশ্চক্ষে প্রতিভাত হইল।

সেই রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে তিনি লাভ করিলেন দিব্যচক্ষু। জীবের গতি-পরম্পরা জ্ঞান তাঁহার আয়ত্ত হইল। স্বচ্ছ দর্পণে প্রতিফলিত ছবির মত তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তির দৃশ্য। তিনি দেখিতে পাইলেন সত্ত্বগণ নিজ নিজ কর্মবশে হীন ও উচ্চ অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করিতেছে। আবার চ্যুত হইতেছে, আবার জন্ম গ্রহণ করিতেছে। কেউ হইতেছে রূপবান রূপবতী, কেউ বা কুৎসিত। কর্মবশে কেহ যাইতেছে স্বর্গে, কেহ বা ভোগ করিতেছে নরকের যন্ত্রণা।

সেই রাত্রির শেষ প্রহরে তিনি প্রতীত্যসমুৎপাদ বা কার্যকারণ তত্ত্ব অনুলোম-প্রতিলোমভাবে, উৎপত্তি ও বিনাশ বশে নিজ মনে আনুপূর্বিক পর্য্যালোচনা করিয়া অরুণোদয়ের সময় সম্যক্ সম্বোধি বা সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ করিলেন। তিনি হইলেন সর্বজ্ঞ বুদ্ধ। এই বুদ্ধজ্ঞানের ফলে তিনি যখন যাহা জানিতে ইচ্ছুক, তখনই তাহা তাঁহার সম্মুখে প্রতিভাত হইতে লাগিল। জগতের সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্য তাঁহার নিকট উদ্ঘাটিত হইল—কারণ ভিন্ন কার্য্য হয় না। কারণ সম্ভূত সকলই মুহূর্তে মুহূর্তে পরিবর্তিত হয় এবং একদিন বিনাশপ্রাপ্ত হয়। কারণ যাহা কিছু হেতুসম্ভব তাহা অনিত্য। সৃষ্টির কারণ তিনি জানিয়াছেন বলিয়া সেই বজ্রাসনে উপবিষ্ট অবস্থাতেই তিনি আবেগপূর্ণ কণ্ঠে উচ্চারণ করিলেন—

> "সমুদিত যবে ধর্ম, জ্ঞানের বিষয়,
> বীর্যবান ধ্যানরত ব্রাহ্মণের হয়।
> দূরে যায় সর্ব শংকা,—সকল সংশয়,
> জানে যাহে হেতুবশে ধর্মসমুদয়॥"

তিনি জানিলেন দুঃখের স্বরূপ, আবিষ্কার করিলেন দুঃখের কারণ, বুঝিতে পারিলেন যে দুঃখের বিনাশ আছে এবং দুঃখ বিনাশের উপায়ও তাঁহার বুদ্ধচক্ষুর সম্মুখে প্রকটিত হইল। তিনি তাই বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন—

"জন্ম-জন্মান্তর পথে ফিরিয়াছি পাইনি সন্ধান
সে কোথা গোপনে আছে এ গৃহ যে করেছে নির্মাণ।
পুনঃ পুনঃ দুঃখ পেয়ে দেখা তব পেয়েছি এবার
হে গৃহকারক! গৃহ না পারিবি রচিবারে আর।
ভেঙেছে তোমার স্তম্ভ, চুরমার গৃহ-ভিত্তিচয়,
সংস্কার-বিগতচিত্ত, তৃষ্ণা আজি পাইয়াছে ক্ষয়।"

বুদ্ধজ্ঞানে তিনি জানিতে পারিলেন যে সত্যকে জানিবার ও দেখিবার ফলে তাঁহার সকল আস্রব বা চিত্তের কলুষতা দূর হইয়াছে চিরতরে। তাঁহার আর পুনর্জন্ম হইবেনা কোনদিন। পুনর্জন্মের সকল বন্ধন তাঁহার ছিন্ন হইয়াছে। এক অচিন্ত্যনীয় আনন্দে তাঁহার মন ভরপুর হইল। তাঁহার দেহের স্বর্গীয় আভায় চতুর্দিক উদ্ভাসিত হইয়া গেল। কারণ সংসার-রহস্য ও দুঃখমুক্তি সম্বন্ধে তাঁহার দিব্যচক্ষু উৎপন্ন হইয়াছে। উৎপন্ন হইয়াছে জ্ঞান ও বিদ্যা। ইহাই বুদ্ধের সর্বজ্ঞতাজ্ঞান।

বুদ্ধের এই সর্বজ্ঞতাজ্ঞান অত্যন্ত গভীর, দুজ্ঞের্য়, দুরনুবোধ্য, শান্ত, প্রণীত (= উৎকৃষ্ট), তর্কাতীত। নিপুণ ও বিজ্ঞজন দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞাতব্য। এই জ্ঞান দুইটি মূল তত্ত্বের উপর ভিত্তি করা—১। হেতুপ্রত্যয়তা প্রতীত্যসমুৎপাদ অর্থাৎ কার্যকারণনীতি এবং ২। নির্বাণ। প্রথমটির দ্বারা সৃষ্টিতত্ত্বের স্বরূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে, নিখিল বিশ্বের রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। দ্বিতীয়টি হইতেছে দুঃখের নিরবশেষ পরিসমাপ্তির অবস্থা এবং শাশ্বত পরমা শান্তির অবস্থা।

প্রতীত্যসমুৎপাদ এবং নির্বাণ বিষয়ে বুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইয়াছে। উভয় সত্যই তাঁহার দ্বারা পরীক্ষিত। আমরা যাহা সজ্ঞানে প্রত্যক্ষ করি, উপলব্ধি করি তদ্বিষয়ে আমাদের কোন সংশয় থাকে কি? বুদ্ধেরও কোন সংশয় ছিল না। তাই তিনি উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন—

"সকলের বিভু আমি, সর্ববিদ্ হয়েছি এখন,
কোন ধর্মে নাহি লিপ্ত, ছিন্ন মম সকল বন্ধন।
সর্বগ্রহ সর্বত্যাগী তৃষ্ণাক্ষয়ে বিমুক্ত মানস,

আচার্য নাহিক মোর, নাহি গুরু, নাহি উপাধ্যায়,
সদৃশ যে কেহ নাই। প্রতিদ্বন্দ্বী মম এ ধরায়।

আব্রহ্ম-ভুবন মাঝে কোথা আছে হেন কোন জন,
প্রতিযোগী প্রতিদ্বন্দ্বী, যুঝিবারে লোকাতীত রণ !
অর্হৎ আমি যে বিশ্বে, আমি হই শাস্তা অনুত্তর,
সম্যক্‌সম্বুদ্ধ আমি, শীতিভূত, নির্বৃত অন্তর।"

বুদ্ধের সেইদিনের সেই ঘোষণায় ছিল না কোন আত্মশ্লাঘা, ছিল সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাস। তাই তিনি বিশ্বের মানব-সমাজকে সম্বোধন করিয়া বলিতে পারিয়াছিলেন—"হে বিশ্বমানব, তোমরা এস। দুঃখ মুক্তির পথের সন্ধান আমি পাইয়াছি, জানিয়াছি, স্বয়ং উপলব্ধি করিয়াছি। তোমরাও আসিয়া স্বয়ং প্রত্যক্ষ কর। বুদ্ধগণ সত্যের উপদেষ্টামাত্র। তোমাদের নিজ নিজ মুক্তি তোমাদের নিজেদেরই হাতে। নিজের মুক্তির জন্য নিজেকেই উদ্যম করিতে হইবে। তোমরা নিজের জ্ঞানদীপ নিজে জ্বালো, সংসার সমুদ্রে নিজের দ্বীপ (= আশ্রয়) নিজে প্রতিষ্ঠা কর, পরের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া থাকা নিরর্থক। দুঃখমুক্তির জন্য আমি অষ্টাঙ্গিক মার্গ নির্দেশ করিতেছি, যে পথে চলিয়া আমি মুক্ত হইয়াছি। তোমরাও সেই পথে চলিলে একদিন মুক্ত হইবে। ইহার জন্য প্রয়োজন শীল বা সদাচার, বৈধ আচরণ ও তপঃ। মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর—অতি ভোগও নহে, অতি কৃচ্ছ্রসাধনও নহে। বাক্ সংযম কর—মিথ্যা বলা, পরনিন্দা পরচর্চা বাদ দাও। সৎকাজ কর—প্রাণীহত্যা, চুরি, পরদারগমনাদি ব্যভিচার, মাদকদ্রব্য সেবন হইতে বিরত হও। তোমার জীবিকা শুদ্ধ কর—প্রাণীহত্যা দ্বারা জীবিকা, চৌর্য দ্বারা জীবিকা, মিথ্যাকথার দ্বারা জীবিকা, জাল জুয়াচুরি ইত্যাদি অন্যায় জীবিকা ত্যাগ কর। ইহাতে তোমার কায়বাক্‌কর্ম শুদ্ধ হইবে, তুমি শীলবান হইবে। ইহার পর প্রয়োজন মনঃসংযমের। তাহার জন্য দরকার সম্যক্ ব্যায়াম (মানসিক), সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধির। মনে যে পাপ আছে তাহা দূর কর এবং নূতন পাপ যাহাতে উৎপন্ন না হয় তজ্জন্য সম্যক্ ব্যায়াম বা সম্যক্ প্রচেষ্টার প্রয়োজন। এই প্রচেষ্টা মানসিক। শুধু তাহাই নহে, যে কুশল বা পুণ্য উৎপন্ন হয়নি তাহার উৎপত্তির জন্য এবং উৎপন্ন ও সঞ্চিত কুশলের রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্যও চিত্তের সম্যক্ প্রচেষ্টা থাকা প্রয়োজন। ইহার সঙ্গে প্রয়োজন সম্যক্ স্মৃতির ও সম্যক্ সমাধির। সম্যক্ স্মৃতির কাজ হইতেছে চিত্তের ভালমন্দ অবস্থা বিচার করিয়া যাহা ভাল তাহা গ্রহণ করা এবং যাহা মন্দ তাহা ত্যাগ করা। সমাধি হইতেছে চিত্তের একাগ্রতা। চঞ্চল চিত্তে কোন ভাল কাজ হয় না। তাই সমাধি বা যোগসাধনার দ্বারা চিত্তকে একাগ্র করিতে হইবে। এইভাবে চিত্ত একাগ্র ও

সংযত হইলেই দৃষ্টি বিশুদ্ধ হইবে। সংসার যে বাস্তবিকই অনিত্য, দুঃখময় ও অনাত্ম তাহা সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধ হইবে। ইহারই নাম সম্যক্ দৃষ্টি। দৃষ্টি বিশুদ্ধ হইলে সঙ্কল্পও বিশুদ্ধ হইবে। চিত্ত তখন স্বাভাবিকভাবে নির্বাণাভিমুখে অগ্রসর হইবে। সমাহিত চিত্ত ও দৃষ্টি-বিশুদ্ধির দ্বারা একই যোগাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া যোগী প্রথম, দ্বিতীয় ধ্যান হইতে আরম্ভ করিয়া 'সংজ্ঞাবেদয়িতনিরোধ' নামক লোকোত্তর সমাপত্তি লাভ করিতে পারিবে। ইহাতে অবস্থান করিলে জ্ঞানদর্শনের দ্বারা চিরতরে আস্রবক্ষয় হইবে। যোগী তখন নিজেই উপলব্ধি করিবে যে, তাহার আর পুনর্জন্ম হইবে না। তাহার চিরতরে দুঃখমুক্তি হইয়াছে।"

বুদ্ধ আরও বলিয়াছেন "দুঃখমুক্তি বা নির্বাণলাভে নারী পুরুষ সকলেরই সমান অধিকার। ইহজন্মেই সকল আস্রব ক্ষয়ের দ্বারা নির্বাণ লাভ করা অসম্ভব নহে। ঈশ্বর আছেন কি নাই, সৃষ্টিকর্তা আছেন কি নাই, আত্মা শাশ্বত না অশাশ্বত, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোথায় আদি, কোথায় অন্ত—কি প্রয়োজন তোমার ঐসব জিজ্ঞাসার পশ্চাতে ছুটিয়া চলা? বরং তথাগত নির্দেশিত ও তথাগত-পরীক্ষিত সত্যের পথে চলিয়া তোমরা দুঃখমুক্তির জন্য উদ্যম কর। জয় তোমাদের অনিবার্য।" ইহাই সর্বজ্ঞ বুদ্ধের মহা শান্তির বাণী। মনুষ্যত্বের প্রতি এত বড় মর্যাদা আর কোন মহাপুরুষ দিয়াছেন কিনা জানা নাই। মানুষের মধ্যে যে অপরিসীম শক্তি আছে তাহা ভগবান বুদ্ধই আমাদের অবগত করাইয়াছেন। তিনি এবং তাঁহার অশীতি মহাশ্রাবক, এবং অনেক মহাশ্রাবিকাগণের জীবনই তাহার প্রমাণ। আমার মুক্তি, আমার নির্বাণ আমারই হাতে এটা কত বড় সাহস, কত বড় আশা ও স্বাধীনতার কথা! তাই মানুষের পরমকল্যাণমিত্র শাস্তা সুগত বুদ্ধকে আমরা আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা জানাই এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় তাঁহাকে পুনর্বার আহ্বান করি এই হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বীতে—

"ওই নামে একদিন ধন্য হ'ল দেশে দেশান্তরে
তব জন্মভূমি।
সেই নাম আর বার এ দেশের নগরে প্রান্তরে
দান করো তুমি।
বোধিদ্রুমতলে তব সেদিনের মহাজাগরণ
আবার সার্থক হোক মুক্ত হোক মোহ আবরণ
বিস্মৃতির রাত্রিশেষে এ ভারতে তোমারে স্মরণ
নব প্রাতে উঠুক কুসুমি।"

চারি আর্যসত্য

অধ্যায়—দুই

চারি আর্যসত্যের মধ্যেই বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শনের মূলকথা নিহিত আছে। সেইজন্য তিনি আকারে প্রকারে সর্বত্র এই চারি আর্যসত্যের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি এককথায় বলিয়াছেন যে চারি আর্যসত্যের জ্ঞান না থাকাতেই সত্ত্বগণ জন্ম-মৃত্যুর চক্রাবর্তনে পুনঃপুনঃ ঘূর্ণিত হইতেছে। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, বুদ্ধের ধর্মকে জানিতে হইলে এবং বুদ্ধের ধর্মের লক্ষ্যকে জানিতে হইলে চারি আর্যসত্য বিষয়ে জ্ঞানলাভ অপরিহার্য। তাই সারনাথে ঋষিপত্তন মৃগদাবে যখন তিনি পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদের নিকট তাঁহার প্রথম ধর্মোপদেশ দিয়াছিলেন, তখন এই চারি আর্যসত্য এবং মধ্যম পন্থা সম্বন্ধেই বলিয়াছিলেন। অতএব চারি আর্যসত্যের দুইটি বিশেষ গুরুত্ব অনুধারন করা যায়—(১) চারি আর্যসত্য হইতেছে বুদ্ধের সমগ্র ধর্ম ও দর্শনের সারকথা—যদি তথ্যের দিকে বিচার করা যায়। (২) আবার যদি দুঃখমুক্তিমার্গের অনুশীলনের দিকে বিচার করা যায়, তাহা হইলেও চারি আর্যসত্য হইতেছে বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শনের শেষ-কথা। অতএব তথ্য এবং অনুশীলন উভয়তঃ চারি আর্যসত্য হইতেছে বুদ্ধের ধর্মের ভিত্তিস্বরূপ।

এই চারি আর্যসত্যকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের চারি নিদানের সঙ্গে তুলনা করা যায়। যেমন রোগ, রোগের কারণ, রোগের উপশম ও রোগ-উপশমের উপায়। মানবজীবনে জন্মজন্মান্তর ধরিয়া দুঃখ হইতেছে রোগতুল্য, দুঃখের কারণ হইতেছে রোগের কারণসদৃশ, দুঃখনিবৃত্তি হইতেছে রোগ-উপশম-তুল্য এবং দুঃখনিবৃত্তির উপায় হইতেছে রোগ-উপশমের উপায়সদৃশ।

বুদ্ধের ধর্ম যে চারি আর্যসত্যের মধ্যেই নিহিত তাহা একটি দৃষ্টান্ত হইতেও জানা যায়। ধর্মসেনাপতি শারিপুত্র বুদ্ধের ধর্মে দীক্ষিত হইবার পূর্বে একদিন ঘটনাক্রমে অস্সজি ভিক্ষুর সাক্ষাৎ পান। অস্সজির পরিচয় জানিয়া শারীপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেনঃ 'আপনি আমাকে বুদ্ধের ধর্ম সম্বন্ধে বলুন।' তখন অস্সজি বলিলেন—"আমি বুদ্ধশাসনে নবাগত। অতএব তাঁহার সম্বন্ধে বিস্তৃত কিছু বলিতে পারিবনা, তবে সংক্ষেপে বলিতে পারি।" শারীপুত্র বলিলেন—আপনি সংক্ষেপেই বলুন। তখন অস্সজি (=অশ্বজিৎ) বলিলেন—

"যে ধর্মা হেতুপ্রভবাঃ তেষাং হেতুং তথাগতোঽবদৎ।
তেষাং চ যো নিরোধঃ এবংবাদী মহাশ্রমণঃ ॥"

অর্থাৎ সমস্ত ধর্মই হেতুপ্রভব হেতুসঞ্জাত। তথাগত বুদ্ধ ইহাদের হেতু বা কারণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন এবং ইহাদের নিরোধ বা নিবৃত্তি সম্বন্ধেও বলিয়াছেন। মহাজ্ঞানী শারীপুত্র উক্ত সংক্ষিপ্ত ভাষণেই বুদ্ধের ধর্মের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অবগত হইলেন এবং বন্ধু মৌদ্গল্যায়নকে ইহায় বিষয় বলিলে মৌদ্গল্যায়নও বুঝিলেন যে তাঁহারা দুই বন্ধু যে সত্যের সন্ধানে বহির্গত হইয়াছেন তথাগত বুদ্ধই সেই ধর্মের জ্ঞাতা। তিনিও ইহাতে অভিভূত হইলেন এবং উভয়ে তথাগত বুদ্ধের নিকট যাইয়া দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। বৌদ্ধ ইতিহাস হইতে জানা যায় যে শারীপুত্র এবং মৌদ্গল্যায়ন বুদ্ধের নিকট দীক্ষা গ্রহণের পরে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। তাঁহারা উভয়ের অসাধারণ প্রতিভা দেখিয়া বুদ্ধ অভিভূত হন এবং তাঁহাদিগকে ধর্মসেনাপতি পদে অভিষিক্ত করেন।—এই দৃষ্টান্ত হইতেই উপলব্ধি করা যাইতে পারে যে, বুদ্ধের ধর্ম এবং চারি আর্যসত্য উভয়ের মূল বা সারকথা হইতেছে কার্য-কারণ নীতি বা শৃঙ্খলা। দুঃখকেই প্রথম এবং প্রধান সত্য বলা হইয়াছে। কারণ দুঃখ অপেক্ষা বড় কোন সত্য নাই জীবজগতে। এই দুঃখের কারণ বা হেতু আছে। হেতু ব্যতীত কোন কিছুর উৎপত্তি সম্ভব নহে। দুঃখের হেতু হইতেছে দ্বিতীয় প্রধান সত্য। দুঃখ যেহেতু হেতুপ্রভব অর্থাৎ হেতু বা কারণজাত, এই দুঃখ অনিত্য অর্থাৎ দুঃখকে ধ্বংস করা যায়, দুঃখের নিবৃত্তি আছে। ইহা তৃতীয় প্রধান সত্য। দুঃখনিবৃত্তির উপায় বুদ্ধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা হইতেছে অষ্টাঙ্গিক মার্গ। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, দুঃখের কারণ দূর করিতে পারিলে দুঃখকেও জয় করা যায়।

চারি আর্যসত্যকে আবার দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। দুঃখ এবং দুঃখের কারণ জন্ম এবং মৃত্যুর অন্তর্গত—ইহারা বর্তুলাকার অর্থাৎ জন্মের পর মৃত্যু, আবার মৃত্যুর পর জন্ম, আবার জন্মের পর মৃত্যু। দুঃখের কারণ হইতে দুঃখ উৎপন্ন হয়, দুঃখ হইতে আবার দুঃখের কারণ উৎপন্ন হয়, দুঃখের কারণ আবার দুঃখের জন্ম দান করে। তাহারা বর্তুলাকার, সেইজন্য ইহাদিগকে সংসার বলা হইয়াছে (সংসার=সং—সৃধাতু

—পুনঃ পুনঃ সংসরণ করা, জন্মের পর মৃত্যু। মৃত্যুর পর জন্ম, আবার জন্মের পর মৃত্যু)। দুঃখের নিবৃত্তি ও দুঃখ-নিবৃত্তির উপায়—এই দুইটি আর্যসত্য হইতেছে মোচাকার (Spiral), বর্ত্তুলাকার (circular) নহে। কারণ প্রগতি বর্ত্তুলাকার হইতে পারে না। ইহা উর্ধ্বমুখী।

১। দুঃখ আর্যসত্য—যেহেতু দুঃখকে প্রথম সত্য বলা হইয়াছে সেইজন্য অনেকে মনে করেন দুঃখবাদই বুদ্ধের ধর্মের মূলকথা। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। দুঃখবাদ তাঁহার ধর্মের গোড়ার কথা মাত্র। ইহার মধ্য দিয়াই তিনি মানবসমাজকে আশাবাদী ও বাস্তববাদী হইতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। এক ব্যক্তি রোগ যন্ত্রণায় কষ্ট পাইয়াও যদি সে বলে যে সে দুঃখী নহে, ইহা মূর্খতা মাত্র। ইহা উটপাখীর বালিতে মাথা গোঁজার তুল্য। যদি কোন সমস্যার উদ্ভব হয়, প্রয়োজন হইতেছে সেই সমস্যার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়া তাহার সমাধানের চেষ্টা করা, সমস্যাকে উপেক্ষা করা মূর্খতা। যদি দুঃখ আর্যসত্যের কথা বলিয়া বুদ্ধ থামিয়া যাইতেন তাহা হইলে বলা যাইতে পারিত যে বুদ্ধের ধর্মে দুঃখবাদ ব্যতীত আর কিছুই নাই। কিন্তু বুদ্ধ দুঃখ আর্যসত্যের পরে দুঃখের কারণ আর্যসত্য প্রচার করিয়াছেন এবং দুঃখ হইতে নিবৃত্তি এবং নিবৃত্তির উপায়রূপ আর্যসত্যদ্বয়ও প্রচার করিয়াছেন। নিজের জীবন এবং তাঁহার শিষ্য-শিষ্যাদের জীবনের মাধ্যমে তিনি একটা কথা পরিস্ফুট করিয়াছেন যে, সংসার-দুঃখের স্বরূপকে জানিয়া মানুষ যদি সেই দুঃখ হইতে ত্রাণ লাভের চেষ্টা করে—তাহা হইলে সে একদিন জয়লাভ করে এবং দুঃখমুক্তিরূপ পরমা শান্তি লাভ করিতে সক্ষম হয়। বুদ্ধের ভাষায় এই পরমা শান্তির নামই নির্বাণ, যাহা অজর অমর, যাহার কোন চ্যুতি নাই, ক্ষয় নাই, ব্যয় নাই, যাহা অক্ষয় অব্যয় এবং শাশ্বত।

প্রত্যেক মানুষ যদি সত্য কথা বলে, তাহা হইলে তাহাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রত্যেক মানুষের জীবনেই একটি মৌল সমস্যা আছে। কি সেই সমস্যা? মানুষ যাহা চায় তাহা পায় না। জীবনে যাহা হওয়া উচিত তাহা কদাচিৎ হয়। কবির ভাষায় বলিতে গেলে বলা যায় ঃ—

"যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই,

যাহা পাই তাহা চাই না।" —ইহাই বাস্তব সত্য। এই সত্যকে উপেক্ষা করিয়া আমরা কোথায় লুকাইব? বরং এই পরম সত্যের মুখোমুখি হওয়াই ভাল। দৈনন্দিন জীবনের প্রতি মুহূর্তে এই সত্যকে যদি

উপলব্ধি করা যায় যে, আমার মনের মত সব ঘটনা ত ঘটিতেছে না, আমি যাহা চাই তাহা ত পাইতেছি না, তাহা হইলেই সমস্যার সমাধানের প্রতি মন ধাবিত হইবে। নোচেৎ নহে। সমস্যায় কাতর হইয়া শোক-ক্রন্দন-হাহুতাশ করিলে সমস্যা যেখানে ছিল সেখানেই থাকিয়া যাইবে। তাই বুদ্ধ বলিয়াছেন :—

"উত্তিট্‌ঠে ন পমজ্জেয্য ধম্মং সুচরিতং চরে,

ধম্মচারী সুখং সেতি অস্মিং লোকে পরম্‌হি চ।"

—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত। প্রমত্ত হইও না। সুচরিত ধর্মের অনুগামী হও। ধর্মচারী ইহলোকে এবং পরলোকে সুখী হয়। অর্থাৎ বুদ্ধ বলিতেছেন—তুমি সমস্যায় পড়িয়া পলায়ন করিও না। সমস্যার মুখোমুখি হও। যাহা ঘটিতেছে তাহার স্বরূপ জানিয়া এই ঘটনার কারণ অনুসন্ধান কর। তোমার সব সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে। ইহার জন্য প্রয়োজন দৃঢ় মনোবল, সৎ সাহস, সৎ প্রচেষ্টা।

যত প্রকার দুঃখ আছে সেগুলিকে সংক্ষিপ্ত করিয়া বুদ্ধ ৮টি পর্যায়ভুক্ত করিয়াছেন, যেমন জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মৃত্যু দুঃখ, অপ্রিয়-সংযোগ দুঃখ, প্রিয়বিচ্ছেদ দুঃখ, ঈপ্সিতের অপ্রাপ্তি দুঃখ এবং পঞ্চো-পাদান স্কন্ধময় এই দেহ ও মন দুঃখপূর্ণই। [ধর্মচক্রপ্রবর্তনসূত্রে বুদ্ধ এই আট প্রকার দুঃখের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু অভিধর্মপিটকে ব্যাধি-দুঃখের কথা উল্লেখ নাই, তৎপরিবর্তে বলা হইয়াছে 'সোক-পরিদেব-দুঃখ-দোমনস্স-উপায়াসা দুক্‌খা] মাতৃগর্ভে উৎপন্ন হওয়ার কাল হইতে সুরু করিয়া কমবেশী দশ মাস মাতৃকুক্ষির অভ্যন্তরে সদা জ্বলমান অগ্নির সন্তাপে সন্তপ্ত হইয়া ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্য্যন্ত শুধু দুঃখ আর দুঃখ। জন্মগ্রহণ করার পর হইতে শুরু হয় অনন্ত দুঃখ, নানা প্রকারের দুঃখ এবং আমৃত্যু এই দুঃখ চলিতেই থাকে। এই দুঃখ হইতে কাহারও নিস্তার নাই। জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া জীবসকল এই দুঃখ ভোগ করিয়া আসিতেছে। এই দুঃখ সর্বজনীন (Universal)। জাতিধর্মনির্বিশেষে, দেশকালনির্বিশেষে, আবালবৃদ্ধ-বনিতা নির্বিশেষে কাহারও দুঃখ হইতে পরিত্রাণ নাই। নিখিল বিশ্বে এমন একজনও কি শপথ করিয়া বলিতে পারিবেন যে তিনি আজীবন কোন প্রকার দুঃখ ভোগ করেন নাই? না, একজনও সেইরকম ব্যক্তি নাই। উপরিউক্ত আট প্রকার দুঃখের মধ্যে কোন না কোন দুঃখের শিকার যে কোন মানুষকে

হইতে হয়। 'কোন না কোন দুঃখ' বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে—বরং বলা উচিত প্রত্যেককে ঐ আটপ্রকার দুঃখের শিকার হইতে হয়, ইহার ব্যতিক্রম কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। উক্ত আট প্রকার দুঃখ অপরিহার্যরূপে মনুষ্য-জীবনের সহিত সংসৃষ্ট।

উক্ত আট প্রকার দুঃখকে আবার দুইভাগে ভাগ করা যায়—শারীরিক ও মানসিক দুঃখ। জন্ম, জরা, ব্যাধি এবং মৃত্যু হইতেছে শারীরিক দুঃখ। প্রিয়বিচ্ছেদ, অপ্রিয় সংযোগ, ঈপ্সিতের অপ্রাপ্তি এবং পঞ্চ উপাদানস্কন্ধের[১] মধ্যে বেদনা-উপাদানস্কন্ধ, সংজ্ঞা-উপাদানস্কন্ধ, সংস্কার-উপাদানস্কন্ধ এবং বিজ্ঞান-উপাদানস্কন্ধ হইতেছে মানসিক দুঃখের অন্তর্গত। এখন আমরা সংক্ষেপে আট প্রকার দুঃখ বর্ণনা করিব।

(ক) জন্ম-দুঃখঃ জন্ম কি? বুদ্ধের ভাষায়—"যা তেসং তেসং সত্তানং তম্হি তম্হি সত্তনিকায়ে জাতি সঞ্জাতি ওক্কন্তি অভিনিব্বত্তি খন্ধানং পাতুভাবো আয়তনানং পটিলাভো—অয়ং বুচ্চতি জাতি।" অর্থাৎ একটি সত্ত্বের মাতৃকুক্ষিতে কললাকারে উৎপন্ন হইয়া, তথায় কমবেশী দশমাস কাল ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়া পূর্ণাকারে মাতৃকুক্ষি হইতে বহির্গত হইয়া ভূমিষ্ঠ হওয়াই জন্ম। আমরা চিন্তাও করিতে পারি না মাতৃকুক্ষিরূপে নিয়ত জ্বলমান উত্তপ্ত বদ্ধ কটাহে (যাহার মধ্যে কোন দরজা বা জানালা নাই, আলো নাই, বাতাস নাই, বায়ু গমনাগমনের কোন পথ নাই) নয়-দশ মাস অবস্থানকালে আমরা কি নিদারুন নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকি। ইহা কি দুঃখ নহে? গর্ভধারিণীর অশেষ মমতা না থাকিলে বাঁচার সম্ভাবনা নাই। মাতৃগর্ভে আমরা অসহায়। সম্পূর্ণরূপে মাতার করুণা ও মমতার উপর নির্ভর করিতে হয়। হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গএবং চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় বর্তমান থাকিলেও বেকার। তদুপরি পূর্বপূর্ব জন্মের সুকৃতি থাকিলে আমরা সুস্থাবস্থায় মাতৃকুক্ষি হইতে বহির্গত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকি। আর যদি সুকৃতি না থাকে মাতৃগর্ভেই আমাদের মৃত্যু হয়, অনেক ক্ষেত্রে বিকৃত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লইয়া জন্মগ্রহণ করি। জন্মগ্রহণ করিয়াই আমাদের রোদন করিতে হয়। এই রোদনও সাঙ্কেতিক (symbolic) অর্থাৎ তোমার জন্ম রোদন দ্বারা শুরু হইয়াছে এবং আমৃত্যু এই রোদন তোমার সঙ্গী। শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া রোদন না করিলে তাহা নাকি শিশুর পক্ষে অশুভ, অর্থাৎ জীবনসংশয়ের সম্ভাবনা। তাই ডাক্তার বা নার্স কৃত্রিম উপায়ে শিশুকে রোদন করায়। ভাবটা যেন

এই প্রকার—"তুমি দুঃখভোগের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছ। সারাজীবন ধরিয়া তোমাকে কত না রোদন, ক্রন্দন, শোক, বিলাপ করিতে হইবে। কত না অশ্রু বিসর্জন করিতে হইবে—একথা ধ্রুব সত্য। অতএব, ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তোমাকে ক্রন্দন করিতেই হইবে।" ভূমিষ্ঠ হইবার পরেও জাতশিশু কত অসহায়। তাহার আহার-বিহারাদির জন্য সম্পূর্ণরূপে অন্যের উপর নির্ভর করিতে হয়। কেহ না দিলে সে খেতে পারে না, কেহ না শোওয়াইলে সে শুইতে পারে না। ক্ষুধা হইলে সে কাঁদে এবং কাঁদিয়া অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঘুম পাইলেও সে কাঁদে। শারীরিক কোন অসুস্থতাবোধ করিলে সে কাঁদিয়া অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাহার নিজের কিছুই করিবার ক্ষমতা নাই। সে অবোধ বলিয়া আগুনে হাত দেয়, হাত পোড়ে। ধারাল ছুরি কাঁচি এবং বটীতে হাত দিয়া নিজের রক্তপাত ঘটায়। সে অবোধ বলিয়া জলের দিকে আগাইয়া যায়, অনেক সময় জলে ডুবিয়া তাহার অকালমৃত্যু হয়। সে অবোধ বলিয়া নিজের মলমূত্র নিজে খেতে যায়, নিজের মলমূত্র দ্বারা ম্রক্ষিত হয়। শিশুর সকল অবস্থাতেই শুধু দুঃখ আর দুঃখ। যে দুঃখ জাতকের ভ্রূণাবস্থা হইতে শুরু হয় তাহা এইভাবে চলিতেই থাকে। তাই বলা হইয়ছে 'জাতিপি দুক্‌খা' অর্থাৎ জন্মও দুঃখ, জন্মগ্রহণ করাও দুঃখের, সুখের নহে।

(খ) ব্যাধি দুঃখ ঃ শরীরং ব্যাধিমন্দিরং। শরীর উৎপন্ন হইলেই ব্যাধির শিকার হইতে হয়। ব্যাধি যে কত প্রকারের তাহার কোন সীমা পরিসীমা নাই। শৈশব হইতে আরম্ভ করিয়া আমরা কত প্রকারেরই না ব্যাধি ভোগ করিয়া থাকি। অবশ্য সকলের ব্যাধি একই প্রকারের না-ও হইতে পারে। কিন্তু ব্যাধি হইতে মুক্ত মনুষ্য নাই। কেহ শৈশবে, কেহ বা যৌবনে, কেহ বা বার্ধক্যে নানা প্রকারের ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। কোন কোন ব্যাধি এমনই মারাত্মক হয় যে তাহার দ্বারা ব্যক্তির প্রাণসংশয়ও হইয়া থাকে। সাধারণ মানুষ ত দূরের কথা, যাঁহারা মহামানব মহাপুরুষ তাঁহারাও ব্যাধিমুক্ত ছিলেন না। স্বয়ং মহামানব বুদ্ধ জীবনে বহুবার নানারকম ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, অবশেষে রক্তামাশাতে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। কুমার সিদ্ধার্থ নগর ভ্রমণে বাহির হইয়া ব্যাধিপীড়িত জনৈক ব্যক্তিকে দেখিয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'সৌম্য ছন্দক, এ ব্যক্তি কে? কেন সে যন্ত্রণায় কাতর হইয়াছে?' সারথি বলিলেন—'প্রভু, ইনি ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত।

ব্যাধির যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। দেহ থাকিলে ব্যাধি থাকিবেই। কেহই ব্যাধিমুক্ত নহে, কাহারও বেশী, কাহারও বা কম।' শুনিয়া সিদ্ধার্থ ভাবিলেন—'অহো! আমি যে এতকাল ধরিয়া দিব্যসুখে কাটাইয়াছি সেই সুখ ত মিথ্যা। আমি যদি ব্যাধিমুক্ত না হই, তাহা হইলে সুখ কোথায়? ইন্দ্রিয় সুখের পশ্চাতে অনন্ত দুঃখ নিহিত রহিয়াছে, যেমন ব্যাধি দুঃখ। অজ্ঞানের অন্ধকারে থাকিয়া জন্মজন্মান্তরে আমি অনন্ত ব্যাধিদুঃখের শিকার হইয়াছি। এই জন্মেও ইহা হইতে আমার পরিত্রাণ নাই। দেহ থাকিলেই যদি ব্যাধি উৎপন্ন হয় তাহা হইলে কিসের দ্বারা দেহোৎপত্তি হইতে পরিত্রাণ পাইব! আমি ত ব্যাধিদুঃখ চাহিনা।' তাই উত্তরজীবনে বুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বলিতে হইয়াছে—ব্যাধি পি দুক্‌খা।

(গ) জরা দুঃখঃ জরা দুঃখ কি? বুদ্ধের ভাষায়—'যা তেসং তেসং সত্তানং তম্হি তম্হি সত্তনিকায়ে জরা জীরণতা খণ্ডিচ্চং পালিচ্চং বলিত্তচতা আয়ুনো সংহানি ইন্দ্রিয়ানং পরিপাকো'—অর্থাৎ জরা হইতেছে জীর্ণতা, বয়সের ভারে শরীরের মধ্যে ভাঙন ধরা, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিথিল হইয়া যাওয়া। জরাগ্রস্ত হইলে ব্যক্তির শরীরের উপর শিরা-উপশিরা ভাসিয়া উঠে, গাত্রচর্ম শিথিল ও শুষ্ক হইয়া যায়। আয়ু শেষ হইয়া আসে, ইন্দ্রিয়-সমূহ পরিপক্ক হয় (যেমন চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি কমিয়া যায়, কর্ণের শ্রবণশক্তি কমিয়া যায়, নাসিকা কুঞ্চিত হয়, জিহ্বায় রসাস্বাদন কমিয়া যায়, দেহ অনেক ক্ষেত্রে নষ্ট হইয়া পড়ে)। জাতব্যক্তির মৃত্যু যেমন ধ্রুব, জরাও ধ্রুব। কেহই জরা হইতে পরিত্রাণ পাইবে না। অবশ্য কর্মবশতঃ যাহারা স্বল্পায়ু তাহাদের জরাগ্রস্ত হইতে হয় না। জরা আসিবার পূর্বেই তাহাদের মৃত্যু হয়। জরাকে ভয়ঙ্কর এবং দুঃখদায়ক বলা হইয়াছে। জরা মানুষের রমণীয় কোমল কান্তি ধ্বংস করে, জরা মানুষের রূপযৌবন ধ্বংস করে, জরা মানুষকে ক্রমশঃ মৃত্যুর পথে লইয়া যায়। জরাগ্রস্ত ব্যক্তি কত অসহায়! জরাগ্রস্ত হইলে নিজের হাত পা নিজের বশে থাকে না। শরীর নিস্তেজ হইয়া পড়ে। কর্মশক্তি হারাইয়া ফেলে। তথাকথিত ইন্দ্রিয়সুখ সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলে জরাগ্রস্ত ব্যক্তি তাহা ভোগ করিতে পারে না, কারণ ভোগের শক্তি সে হারাইয়া ফেলিয়াছে। তাই বলা হইয়াছে—

"জরা-জজ্জরিতা হোন্তি হত্থপাদা অনস্সবা
যস্‌স সো বিহতথামো কথং ধম্মং চরিস্‌সতি?"

—জরায় জর্জরিত হইলে নিজের হাত-পাও নিজের বশে থাকে না। যাহার এইরূপ ভগ্নদশা, সে কিভাবে ধর্মাচরণ করিবে ?

বাস্তবিক জরায় জর্জরিত হইলে মানুষের নিজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিজের বশে থাকে না—সে তখন কত অসহায়। কেহ কেহ বা চলৎশক্তি রহিত হইয়া যায়, আহার-বিহারাদি সমস্ত কাজেকর্মে অন্যের উপর নির্ভর করিতে হয়—সে তখন সকলের করুণার পাত্র। তাহার সেবা করিতে করিতে সকলে ক্লান্ত হইয়া তাহার মৃত্যু কামনা করে। কেহ কেহ বা পঙ্গু হইয়া যায় রোগে বা জরায়। নিজের আহার নিজের হাতে গ্রহণ করিতে পারে না। নিজের মলমূত্র নিজে ত্যাগ করিতে পারে না। নিজের বস্ত্রাদি নিজে পরিধান করিতে পারে না, নিজে স্নানাদি নিত্যকর্ম সম্পাদন করিতে পারে না—প্রতিটি কাজে অন্যের উপর নির্ভর করিতে হয়। তখন সে নিজেই নিজের মৃত্যু কামনা করে—অনেক ক্ষেত্রে কেহ কেহ আত্মহত্যাও করে। অতএব জরা দুঃখদায়ক নহে কি ? তাই ত ভগবান বলিয়াছেন—জরা পি দুক্খা।

(ঘ) মৃত্যু দুঃখ ঃ মৃত্যু দুঃখ কি ? বুদ্ধের ভাষায় ঃ 'যা তেসং তেসং সত্তানং তম্হা তম্হা সত্তনিকায়া চুতি চবনতা ভেদো অন্তরধানং মচ্চু মরণং কালকিরিয়া খন্ধানং ভেদো কলেবরস্স নিক্খেপো জীবিতিন্দ্রিয়স্স উপচ্ছেদো—ইদং বুচ্চাতি মরণং।' অর্থাৎ মৃত্যু হইতেছে পঞ্চস্কন্ধের ভেদ (মৃত্যু সংগঠিত পঞ্চস্কন্ধময় দেহকে ভাঙ্গিয়া ফেলে), কলেবরের নিক্ষেপ, জীবিতেন্দ্রিয়ের উপচ্ছেদ অর্থাৎ প্রাণবায়ু বহির্গত হওয়া—যাহাকে সাধারণের ভাষায় বলা হয় মৃত্যু, কালক্রিয়া, দেহত্যাগ। এই মৃত্যু সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ। জন্মগ্রহণ করিলে মৃত্যুবরণ করিতেই হইবে। মৃত্যু হইতে কাহারও পরিত্রাণ নাই। এই মৃত্যুকে দুঃখজনক কেন বলা হইয়াছে ? মৃত্যু সকলের নিকটই দুঃখজনক বিশেষত যাহারা সংসারের ভোগবিলাসে মত্ত। জরায় জর্জরিত ব্যক্তি, চিকিৎসার অতীত রোগে কাতর ব্যক্তি ও সংসারের নানা প্রকার দুঃখ শোকে ম্রিয়মাণ ব্যক্তি ব্যতীত ইহজগতে মৃত্যুকে কেহই চাহে না, কারণ মৃত্যু হইলে সমস্ত শেষ হইয়া গেল। স্ত্রী-পুত্র-কন্যার স্নেহমমতার বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। ঘরবাড়ী ধনদৌলত সকলই ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হয়। কিছুই সঙ্গে যায় না। দিগম্বর হইয়া জন্মগ্রহণ করে, আবার দিগম্বর হইয়া এই দেহ ত্যাগ করিতে হয়—অর্থাৎ জন্মগ্রহণের সময় শুধুমাত্র পঞ্চস্কন্ধের কলেবর লইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং সারা-

জীবন ধরিয়া অনেক কিছু সঞ্চয় করিলেও মৃত্যুকালে সমস্তই ত্যাগ করিতে হয়। এমন কি নিজের কলেবরও ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হয়। তাই মৃত্যু দুঃখজনক। তাহা ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে মৃত্যু যন্ত্রণাদায়ক বলিয়া দুঃখময়। সত্ত্বগণ কর্মনিবন্ধন অর্থাৎ সুকৃতি থাকিলে মৃত্যুর সময় কোন শারীরিক বা মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করে না, কিন্তু দুষ্কৃতি থাকিলে শারীরিক যন্ত্রণাও হয়, মানসিক যন্ত্রণাও হয়। মুমূর্ষু ব্যক্তির মৃত্যুযন্ত্রণা দেখিয়া আত্মীয়স্বজন কষ্ট পায়, তাহার সুখমৃত্যু কামনা করে। কর্মবশে কোন কোন ব্যক্তি মৃত্যুকালে এত কষ্ট পাইয়া থাকে যে, আত্মীয়স্বজনের নিকট তাহা নিতান্তই অসহনীয় হইয়া থাকে, ঐ যন্ত্রণা চোখে দেখা যায় না। অনেকে তাহার মৃত্যু কামনায় প্রার্থনা করে—"ভগবান, লোকটাকে সুখে মরতে দাও।" অতএব মৃত্যু দুঃখজনক নহে কি? তাই ত বুদ্ধ বলিয়াছেন —মরণং পি দুক্খং।

তাই ত বৌদ্ধ কবি গাহিয়াছেন—

"কামং পতন্তি মহিয়া খলু বসুধারা,
বিজ্জুল্লতা বিততমেঘমুখা পমুত্তা।
এবং নরা মরণভীম-পপাতমজ্ঝে,
কামং পতন্তি নহি কোচি ভবেসু নিচ্চো।"

—বজ্রাঘাতের পর মেঘমণ্ডল হইতে বর্ষিত বারিধারার মহীস্পর্শ যেমন সুনিশ্চিত, জাত ব্যক্তির মৃত্যুরূপী প্রপাতগমনও ঠিক তদ্রূপ সুনিশ্চিত। ত্রিলোকে নিত্য (অমর) কেহ নহে।

"বেলাতটে পটুতরো'রু তরঙ্গমালা,
নাসং বজন্তি সততং সলিলা'লয়স্‌স।
নাসং তথা সমুপয়ন্তি নরামরানং,
পাণানি দারুণতরে মরণো' দধিম্হি॥"

—সমুদ্রের বেগবতী চঞ্চলা তরঙ্গমালা যেরূপ চিরকাল সমুদ্রতট প্রাপ্ত হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ দেবমনুষ্যগণের প্রাণও মরণরূপী অতি ভয়ংকর সমুদ্রতটে বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

"রাম'জ্জুনপ্পভূতি-ভূপতিপুঙ্গবা চ,
সূরা পুরে রণমুখে বিজিতারিসংঘা।

তেপীহ চণ্ডমরণোঘ-নিমুগ্‌গদেহা,

নাসং গতা জগতি কে মরণা পমুত্তা ?"

...অতীতে রাম, অর্জুন প্রভৃতি যে শত্রু-সংহারক, রণজয়ী শূর, নৃপতি ও পুরুষোত্তমগণ ছিলেন, তাঁহারাও এখানে মৃত্যুরূপী ভয়াবহ বন্যাপ্রবাহে নিমজ্জিত হইয়া অস্তিত্বহীন হইয়াছেন। এই সংসারে কে (আছে) মৃত্যুহীন ?

"বুদ্ধাপি বুদ্ধকমলামল-চারুনেত্তা,

বত্তিংসলক্‌খণবিরাজিত-রূপসোভা।

সব্বাসবক্‌খয়করাপি চ লোকনাথা,

সম্মদ্দিতা মরণমত্ত-মহাগজেন।"

—প্রস্ফুটিত অমল-কমল সদৃশ চারুনেত্রসম্পন্ন ও বত্রিশ প্রকার মহাপুরুষ লক্ষণযুক্ত, অঙ্গে অনুপমদীপ্তিশালী সর্বাস্রববিধ্বংসক লোকনাথ বুদ্ধও মৃত্যু-রূপী মহানাগ কর্ত্তৃক পরিমর্দ্দিত হইয়াছেন।

(ঙ) অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ : যাহা কিছু অপ্রিয়, বস্তু বা ব্যক্তি, তাহার সহিত সংযোগ হইলেই মানসিক দুঃখ উৎপন্ন হয়। এই অপ্রিয়সংযোগ দুঃখ সম্বন্ধে বুদ্ধ বলিয়াছেন—"ইধ যস্‌স তে হোন্তি অনিট্‌ঠা অকন্তা অমনাপা রূপা সদ্দা গন্ধা রসা ফোট্‌ঠব্বা, যে বা পনস্‌স তে হোন্তি অনত্থ-কামা অহিতকামা অফাসুকামা অযোগক্‌খেমকামা, যা তেহি সঙ্গতি সমাগমো সমোধানং মিস্‌সীভাবো—অয়ং বুচ্চতি 'অপ্পিয়েহি সম্পযোগো দুক্‌খো।' অপ্রিয় বস্তু বা ব্যক্তি কি তাহা বর্ণনা করিতে যাইয়া বুদ্ধ বলিয়াছেন—যে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ অপ্রিয় (যাহা ইষ্ট নহে, যাহা কান্ত বা সুন্দর নহে, যাহা মনোজ্ঞ নহে) এবং যাহা কিছু অনর্থকামী, অহিতকামী, অসুখ-কামী এবং অযোগক্ষেমকামী, তাহার সহিত যে সংযোগ, যে মিলন তাহা দুঃখদায়ক, মানসিক পীড়াদায়ক। এই অভিজ্ঞতা প্রত্যেকের জীবনেই হইয়া থাকে। সারাজীবন ধরিয়া কতই না অপ্রিয়সংযোগ হইয়া থাকে এবং তাহার জন্য দুঃখ পাইতে হয় ইহার সীমা-পরিসীমা নাই।

(চ) প্রিয়বিয়োগ দুঃখ : যাহা কিছু প্রিয়, বস্তু বা ব্যক্তি, তাহা হইতে বিয়োগ বা বিচ্ছেদ হইলেই মানসিক দুঃখ উৎপন্ন হয়। এই প্রিয়-বিয়োগ দুঃখ সম্বন্ধে বুদ্ধ বলিয়াছেন—"ইধ যস্‌স তে হোন্তি ইট্‌ঠা কন্তা মনাপা রূপা সদ্দা গন্ধা রসা ফোট্‌ঠব্বা, যে বা পনস্‌স তে হোন্তি অত্থকামা

হিতকামা ফাসুকামা যোগক্খেমকামা মাতা বা পিতা বা ভাতা বা ভগিনী বা মিত্তা বা অমচ্চা বা ঞাতী বা সালোহিতা বা—যা তেহি অসঙ্গতি অসমাগমো অসমোধানং অমিস্সীভাবো—অয়ং বুচ্চতি 'পিয়েহি বিপপয়োগো দুক্খো।' প্রিয় বস্তু বা ব্যক্তি কি তাহা বর্ণনা করিতে যাইয়া বুদ্ধ বলিয়াছেন—যে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ প্রিয়জনক (অর্থাৎ যাহা ইষ্ট, যাহা কান্ত বা সুন্দর, যাহা মনোজ্ঞ) এবং যাহারা অর্থকামী (=মঙ্গলকামী) হিতকামী, সুখকামী এবং যোগক্ষেমকামী, যেমন মাতা বা পিতা বা ভ্রাতা বা ভগ্নী বা মিত্র, বা সহকর্মী বা জ্ঞাতি বা রক্তের সম্পর্কযুক্ত অন্য আত্মীয়-স্বজন তাহা হইতে যে বিয়োগ, যে বিচ্ছেদ তাহা দুঃখদায়ক, মানসিক পীড়াদায়ক। এই অভিজ্ঞতাও প্রত্যেকের জীবনে হইয়া থাকে। সারাজীবন ধরিয়া কতই না মানুষের প্রিয়বিচ্ছেদ হইয়া থাকে এবং তাহার জন্য মানসিক দুঃখ পাইতে হয় তাহার সীমা পরিসীমা নাই।

(ছ) ঈপ্সিতের অপ্রাপ্তি দুঃখ ঃ মানুষ যাহা চায় তাহা সব সময় পায় না, যাহা কামনা করে, যাহা পাইতে ইচ্ছা করে—তাহা পায় না—অতএব তজ্জন্য মানসিক দুঃখ হইয়া থাকে। সারাজীবন ধরিয়া এই অপ্রাপ্তিজনিত দুঃখ ভোগ করিতে হয় কমবেশী সকলকেই। ইহা হইতেছে সাধারণ ভাষায় ঈপ্সিতের অপ্রাপ্তি দুঃখ। কিন্তু, বুদ্ধ এই দুঃখের আরও গভীরে চিন্তা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"জন্মাধীন সত্ত্বগণ এইরূপ চিন্তা করেন—'অহো। আমরা জন্মাধীন হইব না ; আমাদের যেন আর জন্ম না হয়।' কিন্তু তাঁহাদের সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয় না। ইহাই ঈপ্সিতের অপ্রাপ্তি দুঃখ। তদ্রূপ তাঁহারা চিন্তা করেন—'অহো, আমরা জরাধীন হইব না……ব্যাধির অধীন হইব না……মৃত্যুর অধীন হইব না……শোক-পরিদেব-দুঃখ-দৌর্মনস্য হতাশার অধীন হইব না……।" কিন্তু তাঁহাদের সেই সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয় না। ইহাই ঈপ্সিতের অপ্রাপ্তি দুঃখ। মরণশীল সত্ত্বগণ প্রত্যেকেই এইরূপ ঈপ্সিতের অপ্রাপ্তিজনিত দুঃখে দুঃখী হইয়া থাকে। কারণ জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, শোক-পরিদেব-দুঃখ-দৌর্মনস্য-হতাশাজনিত দুঃখ হইতে মরণশীল কাহারও পরিত্রাণ নাই।

(জ) পঞ্চোপাদানস্কন্ধ দুঃখ ঃ পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ কি কি ? রূপোপাদান স্কন্ধ, বেদনোপাদানস্কন্ধ, সংজ্ঞোপাদানস্কন্ধ, সংস্কারোপাদান-স্কন্ধ এবং বিজ্ঞানোপাদানস্কন্ধ।

পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ লইয়াই এই জৈবশরীর গঠিত (Constituted) এবং কার্যকারণসম্ভূত বলিয়া এই জৈবশরীর বিপরিণামধর্মী অর্থাৎ প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তনশীল অতএব অনিত্য। রূপাদি পঞ্চ স্কন্ধকে উপাদানস্কন্ধ কেন বলা হইয়াছে? রূপাদি পঞ্চ স্কন্ধ যখন তৃষ্ণার বিষয় হইয়া ব্যক্তির সান্নিধ্যে আগমন করে, তখন তাহাদিগকে উপাদানস্কন্ধ বলা হয়। পঞ্চস্কন্ধ বা জড়চেতনের সমন্বয়কেই জীবনপ্রবাহ বলা হয়। ইহাই সত্ত্ব, জীব ইত্যাদি বিভিন্ন নামে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা হইয়াছেঃ ঈশা, চক্র, নেমি প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমন্বয়হেতু যেমন 'রথ' শব্দের উৎপত্তি হয়, 'শকট' শব্দের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টিকে 'সত্ত্ব' নামে অভিহিত করা হয়। 'রথ' বা 'শকট' যেমন পরমার্থ সত্য নহে, 'সত্ত্ব'ও পরমার্থ সত্য নহে।

১। রূপোপাদানস্কন্ধঃ পৃথিবী, অপ্, তেজ ও বায়ু এই ৪ মৌলিক ধাতু (যাহাদিগকে মহাভূত বলা হয়) ও ইহাদের বিকারজনিত ২৪ প্রকার রূপের সমষ্টিকেই রূপস্কন্ধ বলা হয়।

(ক) ভূতরূপঃ পৃথিবী, অপ্, তেজ, বায়ু = ৪
(খ) প্রসাদরূপঃ চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ (নাসিকা), জিহ্বা এবং কায় = ৫
(গ) গোচররূপঃ রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস এবং [স্পৃশ্য] = ৪
(ঘ) ভাবরূপঃ স্ত্রীভাব, পুংভাব = ২
(ঙ) হৃদয়রূপঃ হৃদয় বস্তু = ১
(চ) জীবিতরূপঃ জীবিতেন্দ্রিয় (= প্রাণ) = ১
(ছ) আহারূপঃ কবলীকৃত আহার = ১
(জ) পরিচ্ছেদরূপঃ আকাশ ধাতু = ১
(ঝ) বিজ্ঞপ্তিরূপঃ কায়বিজ্ঞপ্তি ও বাক্‌বিজ্ঞপ্তি = ২
(ঞ) বিকাররূপঃ লঘুতা, মৃদুতা, কর্মণ্যতা = ৩
(ট) লক্ষণরূপঃ উপচয় (রূপের উৎপত্তি), সন্ততি (প্রবর্তন), জরতা, অনিত্যতা = ৪

(৪ + ২৪) = ২৮

(ক) ভূতরূপঃ যাহা উৎপন্ন হইয়া বর্তমান তাহাই ভূত। যথা পৃথিবী, অপ, তেজ এবং বায়ু। এই চারি ভূত মহান্ এবং নিজ নিজ গুণে শ্রেষ্ঠতম বলিয়া এইগুলিকে মহাভূত বলা হইয়াছে। এই ভূতচতুষ্টয়

হইতে বস্তুজগতের সমস্ত রূপ উৎপন্ন হয় বলিয়াও এইগুলিকে মহাভূত বলা হয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এই চারি মহাভূতের দ্বারাই সৃষ্ট। ইহারা দৃশ্যমান বলিয়াই রূপ, ইহাদের বর্ণ এবং সংস্থান আছে বলিয়াই রূপ এবং ইহারা নিয়ত পরিবর্তনশীল বলিয়া রূপ। উক্ত চারি মহাভূতকে ধাতুও বলা হয়। যেহেতু ইহারা স্বস্বলক্ষণকে ধারণ করে এবং ইহাদিগ হইতে উৎপন্ন সমস্ত রূপকেও ধারণ করে। অন্যভাবে বলিতে হইলে বলা যায় যে, ইহারা নিজে-দের এবং সকল রূপধর্মের উৎপত্তি-স্থান বলিয়া ইহাদিগকে ধাতু বলা হয়। আবার ইহারা প্রত্যেকে নিজ নিজ গুণ ও লক্ষণের জন্য অন্য তিন হইতে ভিন্ন এবং শ্রেষ্ঠ। যেমন পৃথিবীধাতুতে (ক্ষিতি) স্বীয় গুণের (অর্থাৎ ধৃতি-কর্মের—ইহা ব্যতীত রূপ বা বিষয় স্থান অধিকার করিতে পারেনা) আধিক্যহেতু ইহা মহাভূত। অপ্‌ধাতুতে স্বীয় গুণের (অর্থাৎ সংগ্রহ কর্মের —ইহা বিভিন্ন জড়কণাকে একত্রে সন্নিহিত করে এবং বিভক্ত হওয়াকে বাধা প্রদান করে) আধিক্যহেতু ইহা মহাভূত। তেজোধাতুতে স্বীয়গুণের (অর্থাৎ পক্তি বা পরিপক্ককর্মের—ইহা উত্তপ্ত করে পরিপক্ক করে এবং সঞ্জীবিত করে) আধিক্যহেতু ইহা মহাভূত। বায়ুধাতুতে স্বীয়গুণের (ব্যূহনকর্মের —ইহা চালিত করে, স্পন্দিত করে, বৃদ্ধি করে, প্রসর্পিত করে) আধিক্যহেতু ইহা মহাভূত। পৃথিবীধাতুর স্বভাব খরত্ব (solidity—hardness and softness), অব্‌ধাতুর স্বভাব স্নেহত্ব (cohesion), তেজোধাতুর স্বভাব উষ্ণত্ব (Heat) এবং শীতলতা (শীতলতা এবং উষ্ণতা উভয়েই তেজোধাতুর ধর্ম। তীব্র তেজই উষ্ণতা এবং মৃদু তেজই শীতলতা—বরফ সৃষ্টির মূলেও তেজো-ধাতু) এবং বায়ুধাতুর স্বভাব ঈরণ (movement) (ঈর্‌ গমনে। অর্থাৎ গতি স্পন্দন, দোলন, ঊর্ধ্বঃ অধঃ এবং পার্শ্বাদি চাপ-প্রদান এই ধাতুর লক্ষণ)। অব্‌ধাতুর মধ্যে আবার অপর তিনটি মহাভূতের লক্ষণ বিদ্যমান। যেমন জলে হাত দিলে যে কোমলত্ব অনুভূত হয় তাহা অব্‌ধাতু নহে, তাহা পৃথিবী ধাতু। যে শৈত্য বা উষ্ণত্ব অনুভূত হয় তাহা অব্‌ধাতু নহে, তেজোধাতু। জলে যে চাপ অনুভূত হয় তাহা অব্‌ধাতু নহে, বায়ুধাতু।

উপরিউক্ত চারি মহাভূতই রূপধাতুর ভিত্তিস্বরূপ এবং ইহারা পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণু-পরামাণু হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের বৃহত্তম পদার্থ উক্ত চারি মহাভূতের দ্বারা গঠিত।

(খ) প্রসাদরূপ ঃ প্রসন্নতা (transparentness), স্বচ্ছতা গুণবিশিষ্ট

পদার্থই প্রসাদরূপ। চক্ষু প্রভৃতি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সংবেদনশীল অংশই প্রসাদরূপ। ইহারা একত্রে সন্নিহিত (co-existing) রূপধর্মকে প্রকাশিত করে। যেমন, স্পর্শযোগ্য কায়িক চক্ষুই যৌগিক চক্ষু (composite eye) যাহার মধ্যে চারি মহাভূত, বর্ণ গন্ধ, রস, ওজঃ এবং জীবিতেন্দ্রিয় বর্তমান। যে সংবেদনশীল অংশ কায়িক চক্ষুর মধ্যভাগে অবস্থিত এবং যাহার সাহায্যে ব্যক্তি বস্তু দর্শন করে তাহাই চক্ষুপ্রসাদ। অন্যান্য চারি প্রসাদরূপকেও (অর্থাৎ শ্রোত্রপ্রসাদ, ঘ্রাণপ্রসাদ বা নাসিকাপ্রসাদ, জিহ্বাপ্রসাদ এবং কায়প্রসাদ) অনুরূপভাবে জানিতে হইবে। প্রসাদরূপ না থাকিলে পঞ্চেন্দ্রিয় বেকার ও নিরর্থক। সেইজন্য প্রসাদরূপকে পঞ্চেন্দ্রিয়ও বলা হয়।

(গ) গোচররূপ ঃ ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয়কে (যথা রূপ, শব্দ, গন্ধ এবং রস) গোচররূপ বলা হইয়া থাকে। স্পর্শ বা স্প্রষ্টব্যকে ইহার অন্তর্গত করা হয় নাই। কারণ ইহা পৃথিব্যাদি মহাভূতের অন্তর্গত।

(ঘ) ভাবরূপ ঃ স্ত্রীভাব এবং পুংভাব। স্ত্রীন্দ্রিয় এবং পুরুষেন্দ্রিয় অর্থাৎ যেসকল অবস্থা থাকিলে (যেমন অঙ্গসৌষ্ঠর, লিঙ্গ, কণ্ঠস্বর এবং ভঙ্গিমা) স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব নির্ণয় করা যায় তাহাই ভাবরূপ।

(ঙ) হৃদয়রূপ ঃ হৃদয়গুহা (heart) যাহা মস্তিষ্ক এবং শিরা-উপশিরায় রক্ত সঞ্চারিত করিয়া প্রাণীকে জীবিত রাখে। ইহাকে চিত্ত বা বিজ্ঞানের উৎপত্তিস্থলও বলা হইয়া থাকে। এককথায় বলা যায় হৃদয়রূপ হইতেছে চিত্ত-চৈতসিকের উৎপত্তিস্থান।

(চ) জীবিতরূপ ঃ ইহার অপর নাম জীবিতেন্দ্রিয় (vital force) যাহা রূপের জীবনীশক্তি বা রূপ-সন্ততির অনুপালক। ইহা সত্ত্বগণকে জীবিত রাখিতে সাহায্য করে।

(ছ) আহাররূপ ঃ স্থূল আহার বা ওজঃ যাহা জীবদেহকে সঞ্জীবিত রাখে।

(জ) পরিচ্ছেদ রূপ ঃ আকাশ (Space) যাহার সীমাবদ্ধতা আছে। প্রত্যেক রূপেরই আকাশধাতু (Limited Space) আছে। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র রূপ হইতে বৃহত্তম রূপ প্রত্যেকের মধ্যে আকাশধাতু আছে। বালুকারাশির মধ্যে যেমন আকাশধাতু আছে, প্রত্যেকটি বালুকার মধ্যেও আকাশধাতু আছে। বৃক্ষসারির মধ্যে এক একটি বৃক্ষ যে স্বতন্ত্ররূপে দৃষ্ট হয় তাহার কারণ

আকাশধাতু। তাহা না হইলে সমস্ত বৃক্ষ এক হইয়া অনুভূত হইত। প্রত্যেক রূপের মধ্যে আকাশধাতু না থাকিলে সমস্ত রূপ একাকার হইয়া কিম্ভূত-কিমাকার দৃষ্ট হইত। প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে আকাশধাতু আছে বলিয়াই বস্তুসমূহ ভঙ্গুর।

(ঝ) বিজ্ঞপ্তিরূপ ঃ যদ্দ্বারা মনোভাব প্রকাশিত হয় তাহাই বিজ্ঞপ্তি। ইহা দুই প্রকার—কায়বিজ্ঞপ্তি ও বাক্‌বিজ্ঞপ্তি। ইঙ্গিতে, ইশারায়, হস্তপদ-বিকারের দ্বারা এবং মৌনভাবে যে মনোভাব প্রকাশিত হয় তাহা কায়বিজ্ঞপ্তি। যে মনোভাব বাক্যদ্বারা প্রকাশিত হয় তাহা বাক্‌বিজ্ঞপ্তি। মনোভাব কায়-দ্বারে এবং বাক্‌দ্বারে প্রকাশিত হয় বলিয়া ইহার নাম বিজ্ঞপ্তিরূপ।

(ঞ) বিকাররূপ ঃ রূপের বিকার বা পরিবর্তনশীলতা। ইহা তিন প্রকার ঃ রূপের লঘুতা, রূপের মৃদুতা এবং রূপের কর্মণ্যতা। প্রথমটি হইতেছে রূপের হাল্কা অবস্থা, দ্বিতীয়টি হইতেছে রূপের কোমল অবস্থা এবং তৃতীয়টি হইতেছে রূপের কার্যসাধনের উপযোগী অবস্থা। রূপের লঘুতা দৈহিক ক্রিয়ার পক্ষে অনুকূল। রূপের মৃদুতা দেহ এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়ক। অনুরূপভাবে রূপের কর্মণ্যতা হইতেছে দৈহিক কর্মক্ষমতা, যে কোন কার্যসাধনের পক্ষে সক্ষমতা।

রূপ ভারসাম্য হারাইলে দেহ ভারী বলিয়া মনে হয়। ফলতঃ ইহাতে রূপের লঘুতাই যে বিপন্ন হয় তাহা নহে, রূপের মৃদুতা ও কর্ম-ক্ষমতাও বিপন্ন হয়। নীরোগ এবং স্বাস্থ্যবান দেহে রূপের এই তিন প্রকার বিকার স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয়।

(ট) লক্ষণরূপ ঃ রূপ কখনও একপ্রকার থাকে না। প্রতি মুহূর্তেই রূপের পরিবর্তন হইতেছে। রূপের বিপরিণামধর্মিতা সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। রূপের উৎপত্তি ও বিনাশের দ্বারাই এই পরিবর্তন সাধিত হয়। যে চারিটি অবস্থা বা লক্ষণের দ্বারা রূপের পরিবর্তন সাধিত হয় সেইগুলি হইতেছে ১। উপচয় বা রূপের উৎপত্তি, ২। সন্ততি বা বৃদ্ধি, ৩। জরতা বা রূপের জীর্ণাবস্থা এবং ৪। অনিত্যতা বা মৃত্যু। মাতৃগর্ভে প্রথম উৎপত্তি হইতেছে উপচয়। মাতৃগর্ভে বৃদ্ধি, মাতৃগর্ভ হইতে বহিরা-গমন এবং ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া (অর্থাৎ জরাগ্রস্ত হইবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত অবস্থা) সন্ততি। বার্ধক্যে জরাগ্রস্ত হওয়া জরতা। মৃত্যু হইতেছে অনিত্যতা।

২। বেদনোপাদানস্কন্ধ ঃ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় ও উহাদের সম্পর্কে আসিয়া যে সুখ, দুঃখ কিংবা মধ্যস্থ অনুভূতি (feeling) জন্মে উহাই বেদনোপাদানস্কন্ধ। সুখবেদনা, দুঃখবেদনা এবং অদুঃখঅসুখবেদনা—এই তিন প্রকার বেদনা লইয়াই বেদনাস্কন্ধ।

৩। সংজ্ঞোপাদানস্কন্ধ ঃ বিষয়ানুভূতি ও তদ্বিষয়ে জন্মান্ধের হস্তি-দর্শনের ন্যায় আমাদের মনে যে প্রাথমিক ধারণা জন্মে তাহাই সংজ্ঞাস্কন্ধ। এইভাবে ষাড়িন্দ্রিয়গ্রাহ্য ছয় প্রকার সংজ্ঞা (যেমন রূপসংজ্ঞা, শব্দসংজ্ঞা, গন্ধসংজ্ঞা, রসসংজ্ঞা, কায়িকস্পর্শসংজ্ঞা এবং মানসিক স্পর্শসংজ্ঞা) লইয়াই সংজ্ঞাস্কন্ধ।

৪। সংস্কারোপাদানস্কন্ধ ঃ লোভ, দ্বেষ, মোহ প্রভৃতি অকুশল মনোবৃত্তি এবং শ্রদ্ধা, স্মৃতি, অলোভ, অদ্বেষ প্রভৃতি কুশল মনোবৃত্তিকে সংস্কার-স্কন্ধ বলা হয়। এই সকল মানসিক বৃত্তির সঞ্চিত অভিজ্ঞতা আমাদের মস্তিষ্কের উপর রেখাপাত করে এবং ইহাই আমাদের ভবিষ্যৎ জন্ম নিয়ন্ত্রিত করে।

অকুশল এবং কুশল মনোবৃত্তির সংখ্যা ৫২, তন্মধ্যে বেদনা ও সংজ্ঞা বাদ দিলে সংখ্যা দাঁড়ায় ৫০। এই ৫০ প্রকার চিত্তসংস্কার বা মনোবৃত্তিকে লইয়াই সংস্কারস্কন্ধ[১]।

৫। বিজ্ঞানোপাদানস্কন্ধ—মানসিক বৃত্তিনিচয়ের আধার বিজ্ঞানকেই বিজ্ঞানস্কন্ধ বলা হয়। ছয় প্রকার বিজ্ঞান লইয়াই বিজ্ঞানস্কন্ধ, যেমন, চক্ষুবিজ্ঞান, শ্রোত্রবিজ্ঞান, ঘ্রাণবিজ্ঞান, জিহ্বাবিজ্ঞান, কায়বিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞান।

উপরিউক্ত রূপস্কন্ধকে সংক্ষেপে বলা হয় 'রূপ' এবং বেদনাদি চতুষ্টয়কে সংক্ষেপে বলা হয় 'নাম'। এইজন্য দার্শনিক ভাষায় পঞ্চস্কন্ধকে নামরূপ বলা হয়। এই নামরূপ অন্যোন্যাশ্রিত এবং অন্যোন্যসাপেক্ষ। অন্ধ-পঙ্গুর মিলনের ন্যায় এই নামরূপের মিলনেই বিশ্বচরাচরের সমস্ত জীব সজীব এবং সক্রিয় থাকে।

নামরূপএককভাবে নিস্তেজ ও অকর্মণ্য। নাম স্বীয় শক্তি বলে প্রবর্তিত হইতে পারে না। গমনাগমনে, আলোকনবিলোকনে, পান-ভোজনে নাম সম্পূর্ণ অসমর্থ। রূপেরও সেই একই অবস্থা। রূপের গমনাগমনের, আলোকন-বিলোকনের, পান ভোজনের ইচ্ছা নাই। পরস্পরকে আশ্রয়

করিয়াই উভয়ের প্রবর্তন ঘটে। এই নামরূপ পরস্পরাশ্রিত হইলেই মানুষ উহাকে 'সত্ত্ব' 'জীব' বলিয়া চেতনালাভ করে। বস্তুতঃ সত্ত্ব বা জীব বলিয়া তৃতীয় কোন বস্তুর কল্পনা নিরর্থক। বলা হইয়াছে ঃ

"কম্মস্‌স কারকো নত্থি বিপাকস্‌স চ বেদকো,
সুদ্ধধম্মা পবত্তন্তি এবমেত্থ সম্মাদস্‌সনং।"

কর্মের কারক নাই, কর্মফলের ভোক্তাও নাই। ক্ষণবিধ্বংসী জড়চেতনময় ধর্মপ্রবাহই কর্ম এবং কর্মফলরূপে চলিতেছে। ইহা উপলব্ধি করাই সম্যক্‌ দর্শন। আমি কর্ম করি এবং আমিই ফলভোগ করি—ইহা ব্যবহারিক সত্যমাত্র, পরমার্থ সত্য নহে। বস্তুতঃ গমনাগমনের ইচ্ছাই 'নাম' এবং গমনাগমন হইতেছে 'রূপ'। আলোকন-বিলোকনের ইচ্ছাই 'নাম'। আলোকন-বিলোকন হইতেছে 'রূপ'। পান ভোজনের ইচ্ছাই 'নাম' এবং পানভোজন হইতেছে 'রূপ'। যেমন সমুদ্রপোতকে আশ্রয় করিয়া লোক সমুদ্রযাত্রা করে, তদ্রূপ 'রূপকে' আশ্রয় করিয়াই 'নাম' প্রবর্তিত হয়। এইভাবে নামরূপ পরস্পরাশ্রিত নলকলাপের ন্যায়, একটির পতন ঘটিলে অন্যটির পতন অনিবার্য্য। কিন্তু তৎসত্ত্বেও নাম ও রূপ উভয়ে পরস্পর স্বতন্ত্র এবং বিচ্ছিন্ন। প্রত্যয়-সাহায্য বিরহিত হইলে কাহারও প্রবর্তির ক্ষমতা থাকে না।

বুদ্ধ এই জড়চেতনময় অস্তিত্ব বা নামরূপকে (= পঞ্চস্কন্ধ) দুঃখময় বলিয়াছেন ঃ

"দুক্‌খমেব হি সম্ভোতি, দুক্‌খং বেতি তিট্‌ঠতি।
নাঞ্‌ঞত্র দুক্‌খা সম্ভোতি, নাঞ্‌ঞত্র দুক্‌খা নিরুজ্ঝতি ॥"

—জগতে কেবল দুঃখেরই উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলয় হইতেছে, দুঃখ ব্যতীত অন্য কিছু উৎপন্ন হইতেছে না, দুঃখ ব্যতীত অপর কিছু নিরুদ্ধ হয় না।

নামরূপ-বিধৃত সংসার (repeated existences) নিরবচ্ছিন্নভাবে দুঃখময়। বুদ্ধ ইহাকে এক বাস্তব ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কাহারও মতে সংসারে সুখও ক্ষণস্থায়ী, অতএব ইহার বিরহ দুঃখজনক। অবিদ্যাচ্ছন্ন ব্যক্তির নিকট দুঃখও সুখরূপে প্রতিভাত হয়। বলা হইয়াছে—

"অমধুরং মধুররূপেণ পিয়রূপেণ অপ্পিয়ং
দুক্‌খং সুখস্স রূপেণ পমত্তং অতিবত্ততি।"

—অমধুর মধুররূপে, অপ্রিয় প্রিয়রূপে এবং দুঃখ সুখরূপে প্রমত্তজনকে

দলিত করিতেছে। সুতরাং বুঝিতে হইবে আপাতসুখের পরিণামও দুঃখকর।

দুঃখসত্যকে প্রথম আর্যসত্য (Noble Truth) বা সর্বশ্রেষ্ঠ সত্যরূপে প্রকাশিত করায় কাহারও কাহারও বা মনঃপূত হয় নাই এবং তাঁহাদের প্রশ্ন ঃ বুদ্ধের ধর্ম কি নৈরাশ্যবাদী, হতাশাবাদী? মানুষ যে সকল সুখ ভোগ করে ধন-দৌলত, সুস্বাস্থ্য, প্রিয় স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, স্নেহশীল মাতা-পিতা, সুযশঃ সুখ্যাতি ইত্যাদির দ্বারা—সেইগুলি কি সুখ নহে?' ক্ষণস্থায়ী হইতে পারে। কিন্তু সুখ ত সুখই, দুঃখ ত নয়! অন্যদিকে দরিদ্র জনসাধারণ অভাব-অনটনজনিত দুঃখ সর্বদাই ভোগ করে। রোগী রোগযন্ত্রণায় কাতর হইয়া দুঃখভোগ করে। বার্ধক্যে জরাগ্রস্ত হইয়া সকলেই কমবেশী দুঃখভোগ করে। মৃত্যু কাহারও কাম্য নহে অতএব দুঃখ। অপ্রিয়সংযোগ হইলে মানসিক দুঃখ হয়, প্রিয়বিচ্ছেদ হইলে মানসিক দুঃখ হয়, ঈপ্সিত বস্তুর অপ্রাপ্তিতে মানসিক দুঃখ হয়। এতদ্ব্যতীত সারাজীবন ধরিয়া নানাকারণে শোক, পরিদেবনা, হতাশা, শারীরিক দুঃখ ও মানসিক দুঃখের শিকার হইতে হয়। —অতএব দেখা যাইতেছে সুখ এবং দুঃখ উভয়ই মানুষের জীবনে আসে, কম বা বেশী। সুখের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না। তাহা হইলে বুদ্ধ কেন সুখের কথা উল্লেখ না করিয়া কেবল দুঃখের কথাই বলিয়াছেন? তিনি যে স্বয়ং জন্মকাল হইতে আরম্ভ করিয়া গৃহত্যাগের পূর্বমুহূর্তে পর্যন্ত রাজকীয় সুখভোগ করিয়াছেন তাহা কি সুখ নহে?

উত্তরে বলা যায় যে, গৃহত্যাগের পূর্ব মুহূর্তে পর্যন্ত সিদ্ধার্থ গৌতম দিব্য রাজসুখ ভোগ করিয়াছেন। তাহা তিনি স্বীকারও করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার দৃষ্টিতে সেই সুখ সুখ নহে। দুঃখেরই নামান্তর। তিনি বলিয়াছেন ঃ যে সুখ অনন্তকাল স্থায়ী হইবে না, সেই সুখ সুখ নহে। যে যৌবন অনন্তকাল স্থায়ী হইবে না, সেই যৌবনসুখ সুখই নহে। তিনিও অবিদ্যার অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিয়া ঐ সকল ক্ষণস্থায়ী সুখকে সুখ মনে করিয়া জীবনের দীর্ঘ ২৯ বৎসর মোহাচ্ছন্ন হইয়া অতিবাহিত করিয়াছেন। কিন্তু পরে যখন তাঁহার মোহের ঘোর কাটিল, যখন তিনি বাস্তবের সম্মুখীন হইলেন তখন জানিলেন যে, তিনি যাহাকে এতদিন সুখ মনে করিয়াছেন তাহা সুখ নহে। একদিন এই সুকোমল সুন্দর দেহেও জরা আসিয়া

ইহাকে ক্ষতবিক্ষত করিবে। এই দেহ নানা রোগের দ্বারা আক্রান্ত হইবে। একদিন মৃত্যু আসিয়া এই দেহকে ভূপাতিত করিবে। অতএব সুখ কোথায় ? জীবনের রূঢ় বাস্তবতা সম্বন্ধে সম্যক্‌জ্ঞান লাভ করিয়া তিনি কিন্তু আর একদিনও সময় নষ্ট করেন নাই। রাজপ্রাসাদের সমস্ত সুখকে বিসর্জন দিয়া তিনি চরম দুঃখের পথ বাছিয়া লইয়াছেন দুঃখমুক্তির সন্ধানে—যে মুক্তিতে জরা নাই, ব্যাধি নাই, মৃত্যু নাই—আছে শাশ্বত সুখ এবং পরমা শান্তি। যে দুঃখের পথ তিনি বাছিয়া লইয়াছেন তাহাকে ঋষিরা বলিয়াছেন ঃ

"ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।"

তাহা হইলেও তিনি অসাধ্যকে সাধন করিয়াছেন। দুঃখমুক্তির পথ আবিষ্কার করিয়া প্রচার করিলেন সমস্ত মানবজাতির কল্যাণের জন্য। তিনি বলিলেন—নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্। কামনা-বাসনার পরিতৃপ্তিতে ও পরিপূর্ণতায় যে সুখ তাহা ক্ষণিকের অতএব সেই সুখ মিথ্যা, কারণ সেই ক্ষণিক সুখের পশ্চাতে অপেক্ষা করিতেছে—চরম দুঃখের বজ্রাঘাত। সুখ ক্ষণস্থায়ী বলিয়াই ইহা সত্য নহে। অন্যদিকে দুঃখ দীর্ঘস্থায়ী (অর্থাৎ যাহা জন্মজন্মান্তর ধরিয়া মানুষের অনুগামী) বলিয়াই সত্য এবং চরমসত্য, মহান সত্য। মহান সত্য কেন ? কারণ পৃথিবীতে যত মনুষ্য আছে—সকলের ক্ষেত্রেই ইহা সত্য (Universal truth)। কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি নৈরাশ্য ও হতাশায় ভুগিতে নিষেধ করিয়াছেন। কারণ তিনি নিজের জীবনে প্রমাণ করিয়াছেন যে মানুষ ইচ্ছা করিলে সংসারদুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া শাশ্বত সুখ ও শান্তির অধিকারী হইতে পারে। তিনি বলিয়াছেন যে মানুষ জানে না সে কত অসাধারণ শক্তির অধিকারী। সদিচ্ছা ও সৎ প্রচেষ্টা থাকিলে মানুষ অসাধ্য সাধন করিতে পারে। বুদ্ধের শিষ্যগণ অসাধ্য সাধন করিয়া দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে বুদ্ধের ধর্ম দুঃখবাদী নহে, চরম সুখবাদী। ক্ষণিক সুখকে তিনি সুখ বলেন নাই। বাস্তবতার সম্মুখীন হইয়া সুখ-দুঃখের প্রকৃত রূপকে জানিয়া শাশ্বত সুখের জন্য প্রয়াস করিতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। অতএব যাঁহারা বুদ্ধকে Pessimist বলেন তাঁহারা তাঁহার সম্বন্ধে সত্য কথা বলেন না। তাঁহার মত পরম সুখবাদী ও শান্তিবাদী দ্বিতীয় কোন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি ?

২। দুঃখ-সমুদয় বা দুঃখের কারণ আর্যসত্য :

দুঃখের কারণ সম্বন্ধে বুদ্ধ বলিয়াছেন : তৃষ্ণাই (Selfish Desire) দুঃখের কারণ, যে তৃষ্ণা সত্ত্বগণকে জন্ম হইতে জন্মান্তরে পরিভ্রমণ করায়, যে তৃষ্ণা ভোগ ও ভোগাসক্তি-সহগত এবং যে তৃষ্ণা মুহূর্তে মুহূর্তে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে সুখের অন্বেষণ করায়। মোহমুগ্ধ বা মোহান্ধ মানুষের সকল প্রকার কর্মসম্পাদনের মূলে হইতেছে এই তৃষ্ণা। ইহাই মানুষকে প্রতিনিয়ত বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে পরিভ্রমণ করায়।

দুঃখের কারণ তৃষ্ণা কেন ? কারণ মানুষের তৃষ্ণার শেষ নাই। একটি তৃষ্ণা পূর্ণ হইতে না হইতে সঙ্গে সঙ্গে অন্য তৃষ্ণার জন্ম হয়। যেমন জলপিপাসা নিবারণ করিতে যাইয়া কেহ যদি লবণাক্ত জল পান করে তাহার জলপিপাসা আরও বর্ধিত হয়। তাই তৃষ্ণাকে বর্ণনা করা হইয়াছে কোন কিছু প্রাপ্তির জন্য প্রবল ও তীব্র আকাঙ্ক্ষারূপে। এই উদগ্র আকাঙ্ক্ষা ভয়ানক। কারণ ইহা জাগতিক সমস্ত প্রকার অকুশল কর্মের মূল। বর্তমান বিশ্বে যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহার মূলীভূত কারণ এই তৃষ্ণা। জগতের সমস্ত দেশের যে রাজনৈতিক উত্থান-পতন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্ভব— সমস্ত কিছুর মূল এই তৃষ্ণা। স্বার্থপরতা, স্বার্থের চরিতার্থতার জন্য প্রচেষ্টা সমস্তই তৃষ্ণাপ্রসূত। ইহারই প্রভাবে একে অন্যকে হত্যা করিতেও দ্বিধা করে না, ইহারই কারণে একে অন্যের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়, পরশ্রীকাতর হয়, ক্রোধের বশবর্তী হইয়া অনর্থ ঘটায়, মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে, নানা প্রকার ছলনা, প্রতারণা করিয়া থাকে।

স্বার্থজনিত তৃষ্ণার বহিঃপ্রকাশ স্থূলও হইতে পারে, সূক্ষ্মও হইতে পারে। পতি পত্নীকে ভালবাসে, পত্নীও পতিকে ভালবাসে—কিন্তু এই ভালবাসার মধ্যে স্বার্থবুদ্ধিজনিত তৃষ্ণা বর্তমান। একজন প্রেমিক তাহার প্রেমিকাকে ভালবাসে—ইহাও সূক্ষ্মভাবে স্বার্থপরতার বহিঃপ্রকাশের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। একজন প্রেমিকের ভালবাসা কদাচিৎ নিঃস্বার্থ হইয়া থাকে। ইহা পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদানের উপর নির্ভর করে। সাধারণতঃ দেখা যায়, কোন ব্যক্তি অন্যকে যে ভালবাসে, ইহার কারণ সে নিজেকে বেশী ভালবাসে এবং তাহার তৃষ্ণা জাগে অন্যকে ভালবাসিতে এবং অন্য হইতে ভালবাসা পাইতে। অতএব, মূলতঃ সে নিজেকেই ভালবাসে এবং অন্যের প্রতি তাহার ভালবাসা হইতেছে প্রচ্ছন্নরূপে তাহার নিজেকেই ভালবাসা।

তাহা না হইলে তাহার ভালবাসা কোন কারণে প্রত্যাখ্যাত হইলে এত সহজে হঠাৎ তাহা ঘৃণায় পরিণত হইত না। আমরা ত অনেক ঘটনা জানি যেখানে প্রেমিক তাহার প্রেমিকাকে খুন করিয়াছে। ঈদৃশ ঘটনা কখন ঘটে? যখন প্রেম-ভালবাসার মূলে থাকে স্বার্থপরতা। কোশলের রাজা প্রসেনজিত এবং রাণী মল্লিকাদেবী ভগবান বুদ্ধের ভক্ত ছিলেন। দুইজনেই পরস্পরকে খুবই ভালবাসেন। দুইজনেই ধ্যানাভ্যাস করিয়া মানসিক দিকে অনেক উন্নত হইয়াছিলেন। একদিন রাজা রাণীকে বলিলেন—চল আমরা ধ্যানে বসি এবং ধ্যানের শেষে নিজেদের মনকে জিজ্ঞাসা করি—কে আমাদের সর্বাপেক্ষা প্রিয়? রাণীও রাজী হইলেন। উভয়ে ধ্যানস্থ হইলেন এবং ধ্যানের শেষে নিজেদের মনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আমি কাহাকে বেশী ভালবাসি? রাণী উত্তর পাইলেন—আমি নিজেকেই সর্বাপেক্ষা বেশী ভালবাসি। রাজাও উত্তর পাইলেন—আমি নিজেকেই সর্বাপেক্ষা বেশী ভালবাসি। ধ্যানের পরে উভয়ে পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিলেন নির্বাক্। রাণী ভাবিলেন—মহারাজ বোধ হয় তাঁহার উত্তর শুনিয়া অসন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু মহারাজও ত বুদ্ধশিষ্য এবং ধ্যানীপুরুষ। তিনি রাণীকে সাধুবাদ দিয়া বলিলেন—প্রিয়ে, তুমি যথার্থই বলিয়াছ। পরে উভয়ে বুদ্ধের নিকট যাইয়া সমস্ত ঘটনা বলিলে বুদ্ধ একেবারেই অবাক্ না হইয়া বলিলেন—"সাধু সাধু! তোমরা উভয়ে যথার্থ উত্তরই পাইয়াছ। তোমরা সারা বিশ্বের সর্বদিকে বিচরণ করিয়াও এমন কোন ব্যক্তিকে খুঁজিয়া পাইবেনা যে তোমাদের নিজ অপেক্ষা প্রিয়। তোমরা যথার্থই উপলব্ধি করিয়াছ যে মানুষ নিজেকে যতটা ভালবাসে, অন্য কাহাকেও ততটা নয়।" সুতরাং যেভাবেই দেখা হউক না কেন, যে কোন আকারেই দেখা হউক না কেন, মানুষের তৃষ্ণা হইতেছে তাহার নিজ কামনা-বাসনাকে চরিতার্থ করিবার প্রয়াস।

যতক্ষণ পর্যন্ত একে অন্যের মনের মত 'সমস্ত' কাজ করে ততক্ষণ বিরোধ নাই; কিন্তু সামান্যতম ব্যতিক্রম হইলেও সংঘাত লাগে; ক্রোধ, দ্বেষ, মনোমালিন্য, কলহ-বিবাদের সৃষ্টি করে। সন্তানসন্ততির প্রতি স্নেহ-ভালবাসা এবং পিতামাতার প্রতি সন্তানসন্ততির ভক্তি-শ্রদ্ধা ইত্যাদির মূলেও তাহাই। ব্যক্তিগত স্বার্থ সামান্য ক্ষুণ্ণ হইলেই সংঘাত। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই স্বার্থপ্রণোদিত তৃষ্ণার বহিঃপ্রকাশ স্থূলভাবেই হইয়া থাকে। কিন্তু সূক্ষ্মভাবেও হইয়া থাকে—অনেক সময়

আমরা বুঝিতে পারিনা। পিতৃদেব কেন ক্রুদ্ধ হইয়া চেঁচামেচি করিতেছেন, মাতৃদেবী কেন গুম হইয়া বসিয়া আছেন বা দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়া আছেন—আমরা সহজে বুঝিতে পারিনা। কারণ অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, কোন কিছু মনের মত হয় নাই—অর্থাৎ তৃষ্ণানুকুল কিছুর প্রাপ্তি ঘটে নাই অথবা তৃষ্ণার বিপরীত কিছু ঘটিয়াছে। জগতে যাহা কিছু অঘটন ঘটিতেছে—পরিবারে, সমাজে, দেশে, রাষ্ট্রে (কেবলমাত্র প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে বাদ দিয়া) সমস্ত কিছুর মূলে এই দুই—১। তৃষ্ণামূলক কিছুর অপ্রাপ্তি এবং ২। তৃষ্ণার বিপরীত কিছুর ঘটনা।

যত প্রকার তৃষ্ণা আছে, সেইগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা হইয়াছে। ১। কামতৃষ্ণা ২। ভবতৃষ্ণা এবং ৩। বিভবতৃষ্ণা।

১। কামতৃষ্ণা—বিষয়-বাসনাই কামতৃষ্ণা। মানুষ মনোমুগ্ধকর, সুখপ্রদ এবং আনন্দজনক অবস্থা প্রাপ্তির জন্য লালায়িত হয়। ইহাই কামতৃষ্ণা। মানুষ মনের মত বস্তু বা বিষয় লাভ করিতে আগ্রহী হয়, লালায়িত হয়, ইহাই কামতৃষ্ণা। এই কামতৃষ্ণার কখনও তৃপ্তি হয় না। একটি সুন্দর খেলনা দেখিলে শিশু তাহা পাইতে ইচ্ছা করে। সে তাহা পাইল, নাড়াচাড়া করিল, খেলিল। কিন্তু পরক্ষণে অন্য একটি সুন্দর খেলনা দেখিলে সে তখন পূর্বেরটি ভুলিয়া গিয়া নতুনটি পাইতে ইচ্ছা করে। না পাইলেই ক্রন্দন অর্থাৎ দুঃখ। বড়দের ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। নূতন একটি গৃহ বা মোটরগাড়ী লাভ করিলেও আমাদের তৃষ্ণা জাগে "গৃহখানি বা মোটরগাড়ীটি আরও ভাল হইলে ভাল হইত।" এইভাবে 'আরও ভাল'র ত কোন শেষ নাই। কোটি কোটি টাকা খরচ করিয়াও বাসগৃহ তৈয়ার করা যায়; ৫০-৬০ লক্ষ টাকা দিয়াও গাড়ী ক্রয় করা যায়। তথাপি বাসনার নাহিক শেষ। আরও ভাল চাই, আরও ভাল চাই। এইভাবে সারাজীবন ধরিয়া 'চাই চাই' করিয়া ক্রন্দনের শেষ নাই। শুধু দুঃখই দুঃখ।

২। ভবতৃষ্ণা—পুনর্জন্মের তৃষ্ণা। পুনঃপুনঃ উন্নত জীবনধারণের তৃষ্ণা। সারাজীবন ধরিরা নানাবিধ দুঃখে কাতর হইয়াও মানুষ মৃত্যুকালে আবার পুনর্জন্ম কামনা করে। আমি যেন জন্মে জন্মে তোমার পত্নী হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে পারি। আমি যেন তোমার ঘরে জন্ম লইতে পারি। আমি যেন অমুক দেশে জন্ম লইতে পারি। আমি যেন এইরকম মাতাপিতার নিকট জন্মগ্রহণ করিতে পারি। ইহাই ভবতৃষ্ণা।

৩। বিভবতৃষ্ণা—উচ্ছেদবাদীর ভোগতৃষ্ণাকে বিভবতৃষ্ণা বলে। যেমন চার্বাক বলিয়াছেন—

"ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ।"

—ঋণ করিয়াও ঘৃত আহার করিবে। কারণ যে দেহ ভস্মীভূত হইবে তাহার পুনরাগমন হইবে না অর্থাৎ উচ্ছেদবাদী। পুনর্জন্ম নাই অতএব এই জন্মেই যাহা কিছু পার ভোগ কর। উচ্ছেদবাদীরা পুনর্জন্ম বিশ্বাস করেনা বলিয়া পুনর্জন্ম কামনাও করেনা।

এখন প্রশ্ন হইতেছে—তৃষ্ণাই কি দুঃখের একমাত্র কারণ? আর তৃষ্ণারই বা কারণ কি? অর্থাৎ তৃষ্ণোৎপত্তি কেন হয়?

তৃষ্ণাই দুঃখের একমাত্র কারণ নহে। যেজন্য তৃষ্ণা উৎপন্ন হয় সেই অবিদ্যাও দুঃখের মূলীভূত কারণ।

অবিদ্যা কি? অবিদ্যা হইতেছে অজ্ঞতা (ignorance)। দর্শনের ভাষায় অবিদ্যা হইতেছে দুঃখকে না জানা, দুঃখের কারণকে না জানা, দুঃখের নিবৃত্তিকে না জানা এবং দুঃখ-নিবৃত্তির উপায়কে না জানা। কিন্তু সাধারণ ভাষায় অবিদ্যা কি তাহা জানিতে হইবে। অবিদ্যা হইতেছে যথাভূত, যথাসত্য সম্বন্ধে অজ্ঞান। চেয়ারকে টেবিল বলিলে অবিদ্যা হইবে। অশ্বকে হস্তী বলিলে অবিদ্যা হইবে। জন্মান্ধদের হস্তীদর্শনের গল্প আছে। কিছু জন্মান্ধ লোকের নিকট একটি হস্তীকে আনা হইল। পরে তাহাদের বলা হইল—তোমাদের সম্মুখে একটি হস্তী বিদ্যমান। বলত হস্তী কিরূপ? তখন জন্মান্ধদের প্রত্যেকে হস্তীর এক একটি অঙ্গ স্পর্শ করিয়া হস্তীর রূপ বর্ণনা করিল। যাহারা হস্তীটির পদস্পর্শ করিয়াছে তাহারা বলিল—হস্তী হইতেছে স্তম্ভের (Pillar) ন্যায়। যাহারা হস্তীটির কর্ণ স্পর্শ করিল তাহারা বলিল—হস্তী হইতেছে কুলার ন্যায়। যাহারা হস্তীটির পুচ্ছ স্পর্শ করিল তাহারা বলিল—হস্তী হইতেছে সম্মার্জনীর (ঝাঁটা Sweeping brush) ন্যায়। ইহা অবিদ্যার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ, কারণ জন্মান্ধরা অজ্ঞতাবশতঃ এবং আংশিক জ্ঞানবশতঃ কেহই হস্তী সম্বন্ধে সঠিক বলিতে পারে নাই। তাহাদের উক্তিতে যথাভূতজ্ঞানদর্শনের পরিচয় নাই। অর্থাৎ হস্তী কি তাহা যথার্থতঃ বলা হয় নাই। জীবনের ক্ষেত্রেও তদ্রূপ। অবিদ্যার প্রভাবে কেহই কোন বস্তু সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান দিতে পারে না।

যাহা বাস্তব, জীবনের সত্য তৎসম্বন্ধে সম্যক্ ওয়াকিবহাল নহে। অবিদ্যার প্রভাবে মানুষ অসারবস্তুকে সারবস্তু বলিয়া মনে করে এবং সারবস্তুকে অসারবস্তু বলিয়া মনে করে। বুদ্ধ বলিয়াছেন—

"অসারে সারমতিনো, সারে চ অসারদস্সিনো।
তে সারং নাধিগচ্ছন্তি মিচ্ছাসংকপ্পগোচরা ॥"

[—ধম্মপদ, শ্লোক ১১]

অর্থাৎ অবিদ্যান্ধকারে আচ্ছন্ন মিথ্যাপথপ্রতিপন্ন ব্যক্তিগণ অসারকে সার এবং সারকে অসার বলিয়া মনে করে এবং সত্যকার সারবস্তু তাহারা কখনও লাভ করিতে পারে না।

প্রত্যেকের মধ্যেই সম্যক্প্রজ্ঞা প্রসুপ্ত থাকে। সেই প্রজ্ঞা জাগ্রত হইলেই আমরা বস্তুর যথার্থ স্বরূপ জানিতে পারি। যতদিন তাহা না হয় ততদিন আমরা অসত্যকে সত্য এবং অসারকে সার বলিয়া মনে করি। আমরা ভোগবাসনাকে চরিতার্থ করিবার জন্য ধাবিত হই, বুঝিনা যে দীর্ঘদিন কিছুই ভোগ করা যায় না। সমস্ত কিছুই অনিত্য, মায়া এবং মরীচিকা তুল্য। আমাদের চক্ষু মনোরম বস্তুর দিকে ধাবিত হয়। আমাদের শ্রোত্রেন্দ্রিয় মনোজ্ঞ শব্দের পশ্চাতে ধাবিত হয়। আমাদের জিহ্বেন্দ্রিয় আস্বাদনীয় বস্তুর প্রতি লালায়িত হয়। আমাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় সুগন্ধের দিকে ধাবিত হয়। আমাদের কায়েন্দ্রিয় সুখস্পর্শের জন্য কাতর হয়। আমাদের মনেন্দ্রিয় সুখকর চিন্তায় মগ্ন থাকিতে চায়। কিন্তু এই সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় নিয়ত পরিবর্তনশীল। প্রতিমুহূর্তে ইহাদের বিকার হইতেছে, ইহারা অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু এই ক্ষণস্থায়ী বিপরিণামধর্মী বস্তুকে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাওয়ার মত মূর্খতা আর আছে কি? কিন্তু অবিদ্যাপ্রসূত তৃষ্ণা আমাদের তদ্রূপ করিতে বাধ্য করে। তৃষ্ণাই কারণ। তৃষ্ণাই আমাদের বিভ্রান্ত করে। তৃষ্ণা আমাদের বিপথে চালিত করে এবং তৃষ্ণাগ্নি প্রতিনিয়ত আমাদের দগ্ধ করিতেছে। বুদ্ধ বলিয়াছেন—"নত্থি রাগসমো অগ্গি।"—রাগ বা আসক্তির মত অগ্নি নাই। ইহা প্রতিমুহূর্তে আমাদের দগ্ধ করিতেছে। তাই বলা হইয়াছে—

"পজ্জলিতো অয়ং লোকো।"

তৃষ্ণার অনলে ব্যক্তি স্বয়ং যে দগ্ধ হয় তাহা নহে, অন্যদেরও দগ্ধ করে। মজ্‌ঝিমনিকায় গ্রন্থে বুদ্ধ সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—"হে ভিক্ষুগণ,

কামতৃষ্ণার বশে বশীভূত হইয়া রাজা রাজার সহিত, রাজকুমার রাজকুমারের সহিত, পুরোহিত পুরোহিতের সহিত, নাগরিক নাগরিকের সহিত যুদ্ধ করে, কলহ-বিবাদে রত হয়। মাতা পুত্রের সহিত কলহ করে, পুত্র মাতার সহিত কলহ করে, পিতা পুত্রের সহিত, পুত্র পিতার সহিত, ভ্রাতা ভ্রাতার সহিত, ভ্রাতা ভগ্নীর সহিত, ভগ্নী ভ্রাতার সহিত, বন্ধু বন্ধুর সহিত কলহ করে।"

এইভাবে তৃষ্ণা মানুষের মনে দৃঢ়মূল। ইহা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া মানুষের মনকে ধ্বংস করিতে থাকে। তাই বুদ্ধ সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়া বলিয়াছেন—"তণ্হায় মূলং খনথ"—সমূল তৃষ্ণাকে উৎপাটিত কর। নতুবা প্রতি পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা। তৃষ্ণাই সর্বদুঃখের মূল।

পৃথিবীতে বুদ্ধই একমাত্র মহাপুরুষ যিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে, মানুষের সমস্ত প্রকার দুঃখের কারণ হইতেছে তাহার নিজের কর্ম এবং সমস্ত কর্মের মূলে তাহার তৃষ্ণা। মানুষের দুঃখের মূলে কোন অতিপ্রাকৃত শক্তি বা ঈশ্বরের ভূমিকা আছে একথা বুদ্ধ স্বীকার করেন নাই।

তৃষ্ণোৎপত্তির কারণরূপে অবিদ্যার কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু অবিদ্যা হইতে কিভাবে তৃষ্ণা উৎপন্ন হয় সেইজন্য বুদ্ধ প্রতীত্যসমুৎপাদনীতি বা কার্য্যকারণশৃঙ্খলার কথা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ["প্রতীত্যসমুৎপাদনীতি" (=পালি পটিচ্চসমুপ্পাদনয়) শীর্ষক অধ্যায়ে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে।]

৩। দুঃখ-নিবৃত্তি আর্যসত্য ঃ

দুঃখের কারণ থাকিলে দুঃখের নিবৃত্তিও সম্ভব। বুদ্ধ বলিয়াছেন—ইমস্মিং সতি ইদং হোতি। ইমস্স উপ্পাদা ইদং উপ্পজ্জতি। অর্থাৎ একটা থাকিলে আর একটা হয়। একটার উৎপত্তিতে আর একটা উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় আর্যসত্যে আমরা দেখিয়াছি। তৃষ্ণা থাকিলে দুঃখ হয়। তৃষ্ণার উৎপত্তিতে দুঃখের উৎপত্তি। আবার যাহা কিছু উৎপন্ন হয় তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। দুঃখ যদি উৎপন্ন হইয়া থাকে ইহার বিনাশও সম্ভব। কিভাবে? বুদ্ধ বলিয়াছেন ঃ ইমস্মিং অসতি ইদং ন হোতি। ইমস্স নিরোধা অয়ং নিরুজ্ঝতি। অর্থাৎ একটা না থাকিলে আর একটা হয় না। একটার নিবৃত্তিতে অন্যটারও নিবৃত্তি। এই স্থলে তৃষ্ণা না থাকিলে দুঃখ হয় না। তৃষ্ণার নিবৃত্তিতে দুঃখের নিবৃত্তি। রোগের জীবাণু নষ্ট করিতে

পারিলে রোগেরও উপশম হইবে। কারণকে দূর করিলে কার্য্যের উৎপত্তি হইবে না। ইহাই তৃতীয় আর্যসত্যের মূল কথা। যদি দুঃখের নিবৃত্তিসূচক তৃতীয় আর্যসত্য না থাকিত তাহা হইলে বুদ্ধের ধর্ম দুঃখবাদী, নৈরাশ্যবাদী বা হতাশাব্যঞ্জক হইত। কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ আর্য্যসত্যের দ্বারা বুদ্ধ প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, তাঁহার ধর্ম আশাব্যঞ্জক, পরম সুখময় এবং শাশ্বত শান্তিদায়ক।

তৃতীয় আর্যসত্য প্রসঙ্গে বুদ্ধ বলিয়াছেন ঃ হে ভিক্ষুগণ! দুঃখনিবৃত্তি-সূচক তৃতীয় আর্যসত্য কি? সেই তৃষ্ণার অশেষ নিরবশেষ বিরাগ নিবৃত্তি ত্যাগ ও বিচ্ছেদ। ইহাই দুঃখনিবৃত্তিমূলক তৃতীয় আর্যসত্য। এইস্থলে 'অশেষ' 'নিরবশেষ' কথা দুইটি তাৎপর্য্যপূর্ণ অর্থাৎ বিন্দুমাত্রও যদি তৃষ্ণা বর্তমান থাকে তাহা হইলে দুঃখনিবৃত্তি হইবে না। বলা হইয়াছে—

যথাপি মূলে অনুপদ্দবে দল্হে
ছিন্নো'পি রুক্খো পুনদেব রূহতি।
এবং তণ্হানুসয়ে অনূহতে
উপ্পজ্জতি দুক্খমিদং পুনপ্পুনং॥

—যেমন দৃঢ়মূল শিকর উৎপাটিত না হইলে ছিন্ন বৃক্ষ পুনরায় উজ্জীবিত হইয়া উঠে, সেইরূপ চিত্ত-সন্ততিতে অনুশায়িত তৃষ্ণার সমুচ্ছেদ না হইলে এই দুঃখময় জীবন পুনঃপুনঃ উৎপন্ন হয়।

কিন্তু চিত্ত-সন্ততিতে অনুশায়িত (অর্থাৎ জন্মজন্মান্তর ধরিয়া কৃতকর্মের ফলস্বরূপ যে অনন্ত তৃষ্ণা চিত্তস্তরে সুষুপ্ত আছে) তৃষ্ণার সমুচ্ছেদ কি করিয়া সম্ভব? বুদ্ধ বলিয়াছেন ঃ চিত্ত-সন্ততিতে উৎপদ্যমান সুখদুঃখাদি বেদনা বা অনুভূতিসমূহের নিবৃত্তি ঘটাইতে পারিলেই তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইবে। চিত্তস্তরে জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত কর্মবীজ বেদনা বা অনুভূতির আকারে দেহস্তরে প্রকটিত হয়—কখনও সুখকর অনুভূতি, কখনও বা দুঃখজনক অনুভূতি। এই অনুভূতিকে ভোগ করিলে পুরাতন তৃষ্ণা ত ক্ষয় হইবেনা, বরং নূতন নূতন তৃষ্ণা পূর্বপূর্ব তৃষ্ণার সহিত যুক্ত হইয়া তৃষ্ণার বোঝাকে আরও ভারী করিয়া তুলিবে। অতএব মুক্তি নাই। উৎপদ্যমান বেদনা বা অনুভূতিকে ভোগ না করিয়া উপেক্ষা করিতে পারিলেই নূতন তৃষ্ণাও উৎপন্ন হইবে না, পুরাতন তৃষ্ণাও এইভাবে একে একে ক্ষয় হইবে। অতএব বেদনার বা অনুভূতির নিবৃত্তিতে তৃষ্ণা-নিবৃত্তি। তৃষ্ণার নিবৃত্তিতে

উপাদান-নিবৃত্তি। উপাদানের নিবৃত্তিতে ভব-নিবৃত্তি। ভবের নিবৃত্তিতে পুনর্জন্মের নিবৃত্তি। পুনর্জন্মের নিবৃত্তিতে জরামরণাদি উপশান্ত হইয়া সমূলে দুঃখের নিবৃত্তি হইবে। এই দুঃখের নিরবশেষ নিবৃত্তিকে বৌদ্ধশাস্ত্রে নির্বাণ বলা হইয়াছে। নির্বাণ নামক কোন স্বর্গ নাই, কোন স্থান নাই। ইহা চিত্তের একটি উন্নততম অবস্থা। 'উদান' গ্রন্থে বুদ্ধ বলিয়াছেন: "হে ভিক্ষুগণ, এমন অবস্থা আছে, যাহাতে মাটি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ ও বিজ্ঞানাদি নাই। উহা ইহলোক কিংবা পরলোক নহে, সেখানে চন্দ্র-সূর্য উদ্ভাসিত হয় না, এবং সেখানে নিবৃতের গমন, আগমন, স্থিতি ও উৎপত্তি নাই। ইহাই দুঃখের অন্ত।" এই নির্বাণকেই দুঃখনিবৃত্তি বা তৃতীয় আর্যসত্য বলা হইয়াছে। [পরে 'নির্বাণ' শীর্ষক অধ্যায়ে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে]

৪। দুঃখনিবৃত্তির উপায় চতুর্থ আর্যসত্য :

দুঃখনিবৃত্তি বা নির্বাণ-উপলব্ধির উপায় আছে যাহা বুদ্ধ আবিষ্কার করিয়াছেন। এই উপায় হইতেছে অষ্টাঙ্গিক মার্গ, যথা সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্ম, সম্যক্ জীবিকা, সম্যক্ প্রচেষ্টা, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি। এই মার্গাঙ্গসমূহকে শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা এই তিন-ভাগে ভাগ করা যায়। সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্ম ও সম্যক্ জীবিকা শীলের অন্তর্গত। সম্যক্ প্রচেষ্টা, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি সমাধির অন্তর্গত, কারণ এই তিনটিই হইতেছে মানসিক অনুশীলন। সম্যক্ দৃষ্টি ও সম্যক্ সংকল্প প্রজ্ঞার অন্তর্গত। এই প্রজ্ঞা হইতেছে বিদ্যা বা তত্ত্বজ্ঞান যাহার আলোকে অবিদ্যা দূরীভূত হয়, চরিত্র নির্মল হয় এবং দুঃখমুক্তির সাধনার পথ প্রশস্ত হয়, সমুজ্জ্বল হয়। [পরের অধ্যায়ে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে]

চারি আর্যসত্য সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। এখন প্রশ্ন হইতেছে কোথায় এই আর্যসত্যের সন্ধান করিতে হইবে? আয়ুষ্মান্ রোহিত বুদ্ধকে এই প্রশ্ন করিলে তিনি বলিয়াছিলেন: "এই ব্যাম পরিমাণ (উচ্চতায় নিজ নিজ হাতের মাপে সাড়ে তিন হাত) কলেবরেই দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখের নিবৃত্তি ও দুঃখনিবৃত্তির উপায় অনুসন্ধান করিতে হইবে। নিজ নিজ জীবনপ্রবাহের মধ্যেই ইহাদের সন্ধান পাওয়া যাইবে। কিন্তু একটা কথা মনে রাখিতে হইবে—

"দুক্‌খমেব হি ন কোচি দুক্‌খিতো, কারকো ন কিরিয়া বিজ্জতি।
অত্থি নিব্বুতি, ন নিব্বুতো পুমা, মগ্গমত্থি, গমকো ন বিজ্জতি॥"

অর্থাৎ জগতে দুঃখই আছে, দুঃখের ভোক্তা নাই। কর্ম আছে, কিন্তু কর্মের কর্তা নাই। নির্বাণ চিরকাল রহিয়াছে, কিন্তু নির্বাণপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি নাই। অষ্টাঙ্গিক মার্গ আছে, কিন্তু পথিক নাই। জড় এবং চেতনের (অর্থাৎ নামরূপের) সমন্বয়ে কার্য-কারণ প্রবাহের প্রবর্তন ও নিবর্তন হইতেছে মাত্র।

স্বীয় অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বুদ্ধ বলিয়াছেন—

"চতুন্নং অরিয়সচ্চানং যথাভূতং অদস্সনা,
সংসিতং দীঘমদ্ধানং তেসু তেস্বেব জাতীসু:
তানি এতানি দিট্‌ঠানি ভবনেত্তি সমূহতা,
উচ্ছিন্নমূলং দুক্‌খস্স নত্থি দানি পুনব্ভবো।"

—চারি আর্যসত্যকে যথাভূতভাবে প্রত্যক্ষ করিতে না পারায় দীর্ঘকালব্যাপী বিভিন্ন জন্মের মাধ্যমে সংসার ভ্রমণ করিয়াছি। এখন সেইগুলিকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি; পুনর্জন্মদায়িনী তৃষ্ণা সমুচ্ছিন্ন হইয়াছে। দুঃখের মূল উৎপাটিত হইয়াছে, অতঃপর আর পুনর্জন্ম হইবে না।

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইয়াছে বলিয়াই বুদ্ধ বলিতে পারিয়াছেন—

"সব্বে সংখারা দুক্‌খাতি যদা পঞ্‌ঞায় পস্সতি।
অথ নিব্বিন্দতি দুক্‌খে এস মগ্গো বিসুদ্ধিয়া।"

জগতের সকল সংস্কার দুঃখময়—ইহা যখন প্রজ্ঞার দ্বারা জানা যায়, তখন সাধক দুঃখের প্রতি বিরাগসম্পন্ন হয়। ইহাই বিশুদ্ধির মার্গ।

দুঃখমুক্তির উপায় আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ

আট অঙ্গ সমন্বিত দুঃখনিবৃত্তির উপায় সম্বন্ধে আলোচিত হইতেছে। আট অঙ্গ নিম্নরূপ ঃ

সম্যক্ দৃষ্টি (=পালি সম্মা দিট্‌ঠি), সম্যক্ সংকল্প (=পালি সম্মা সংকপ্পো), সম্যক্ বাক্য (=পালি সম্মা বাচা), সম্যক্ কর্ম (=পালি সম্মা কম্মন্তো), সম্যক্ জীবিকা (=পালি সম্মা আজীবো), সম্যক্ প্রচেষ্টা (=পালি সম্মা বায়ামো), সম্যক্ স্মৃতি (=পালি সম্মা সতি) এবং সম্যক্ সমাধি (=পালি সম্মা সমাধি)।

১। সম্যক্ দৃষ্টি—অভ্রান্ত যথার্থ সত্য দর্শন বা জ্ঞান। ইহা মিথ্যাদৃষ্টির বিপরীত। অবিদ্যাচ্ছন্ন মানুষ জীব ও জগত সম্বন্ধে ৬২ প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি বা ভ্রান্তধারণা পোষণ করিয়া তাহাতে আবদ্ধ থাকে। পালি দীর্ঘনিকায়ের ব্রহ্মজাল সূত্রে উক্ত ৬২ প্রকার মিথ্যাদৃষ্টির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।[১] সম্যক্ দৃষ্টির দ্বারা ঐ সকল মিথ্যাদৃষ্টি বা অজ্ঞানতার নিরসন হয়। দৃষ্টি বিশুদ্ধ না হইলে দুঃখনিবৃত্তির মার্গে অগ্রসর হওয়া যায় না। রঙীন চশমা পড়িলে যেমন বস্তুর প্রকৃত রূপ দেখা যায় না, যে রং-এর চশমা বস্তুও সেই রং-এর বলিয়া প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ অজ্ঞান-তিমিরান্ধের দৃষ্টিতে যথাভূত দর্শন হয় না, জগত এবং জীবন সম্বন্ধে সত্যদর্শন হয় না। মরুভূমির মরীচিকার ন্যায় অনিত্যকে নিত্য বলিয়া মনে করে, দুঃখকে সুখ বলিয়া মনে করে, অবাস্তবকে বাস্তব বলিয়া মনে করে। ঈদৃশ মিথ্যাদর্শনই মানুষকে বিপথে পরিচালিত করে। সেইজন্যই দৃষ্টিবিশুদ্ধির প্রয়োজন। ইহাই সম্যক্ দৃষ্টি।

সম্যক্ দৃষ্টি লৌকিক ও লোকোত্তরভেদে দ্বিবিধ—আমি জন্মজন্মান্তরে কর্মফলভোগী সত্ত্ব ভিন্ন অন্য কিছু নহি এই জ্ঞান এবং সত্যানুলোমিক জ্ঞান (যে বস্তু যাহা তাহাকে ঠিক তদ্রূপভাবে জানা, যেমন চেয়ারকে চেয়ার, টেবিলকে টেবিল ইত্যাদি) হইতেছে লৌকিক সম্যক্ দৃষ্টি। লোকোত্তর মার্গ ও ফলযুক্ত (যেমন স্রোতাপত্তি মার্গ, স্রোতাপত্তি ফল, সকৃদাগামী মার্গ, সকৃদাগামী ফল ইত্যাদি) যে জ্ঞান তাহাই লোকোত্তর সম্যক্ দৃষ্টি।

সম্যক্ দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি ত্রিবিধ—পৃথগ্‌জন বা সাধারণ মানুষ, শৈক্ষ্য

এবং অশৈক্ষ্য ব্যক্তি। পৃথগ্‌জন আবার দ্বিবিধ। কোন কোন পৃথগ্‌জন নিজেকে স্বীয় কর্মফলভোগী সত্ত্ব জানিয়া এবং কর্মফলে বিশ্বাসী হইয়াও আত্মবাদ (অর্থাৎ আত্মা আছে এই মতবাদ) গ্রহণ করিয়া থাকে। আবার কোন কোন পৃথগ্‌জন নিজেকে স্বীয় কর্মফলভোগী সত্ত্ব জানিয়া এবং কর্মফলে বিশ্বাসী হইয়া অনাত্মবাদ (অর্থাৎ শাশ্বত আত্মা নাই) গ্রহণ করিয়া থাকে।

শৈক্ষ্য (=পালি সেখ) ব্যক্তি সপ্তবিধ ঃ

১। স্রোতাপত্তি মার্গস্থ ব্যক্তি

২। ফলস্থ ব্যক্তি

৩। সকৃদাগামী মার্গস্থ ব্যক্তি

৪। ফলস্থ ব্যক্তি

৫। অনাগামী মার্গস্থ ব্যক্তি

৬। ফলস্থ ব্যক্তি

৭। অর্হত্ত্ব মার্গস্থ ব্যক্তি

অশৈক্ষ্য (=পালি অসেখ)—অর্হত্ত্ব ফলস্থ ব্যক্তিকে বলা হয় অশৈক্ষ্য। এই দৃষ্টিতে বুদ্ধ স্বয়ং অশৈক্ষ্য ব্যক্তি, বুদ্ধের অশীতি মহাশ্রাবক এবং অন্যান্য ভিক্ষু-ভিক্ষুণী যাঁহারা অর্হৎ হইয়াছেন সকলেই অশৈক্ষ্য ব্যক্তি।

দর্শনের ভাষাতে দুঃখে জ্ঞান, দুঃখের কারণ সম্বন্ধে জ্ঞান, দুঃখনিবৃত্তিতে জ্ঞান এবং দুঃখনিবৃত্তির উপায় সম্বন্ধে জ্ঞানকে সম্যক্‌ দৃষ্টি বা সম্যক্‌ দর্শন বলা হয়।

দুঃখমুক্তিকামী ব্যক্তি যখন অকুশল[২] কি, অকুশলের মূল[৩] কি, কুশল[৪] কি এবং কুশলের মূল[৫] কি তাহা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করেন। যখন তিনি আহার[৬], দুঃখ, জরা, মরণ, জন্ম, ভব, উপাদান, তৃষ্ণা, বেদনা, স্পর্শ, ষড়ায়তন, নামরূপ, বিজ্ঞান, সংস্কার, অবিদ্যা এবং আস্রব ইত্যাদির যে কোনটি বিশেষভাবে জানেন, ইহার উৎপত্তি, নিবৃত্তি এবং নিবৃত্তির উপায় সুবিদিত হন তখনই তিনি ধ্যানের প্রভাবে কামানুশয় (জন্মজন্মান্তরে কামভোগের দ্বারা সঞ্চিত এবং বর্তমান জন্মে কামভোগের দ্বারা সঞ্চিত কামবীজ), প্রতিঘানুশয় (জন্মজন্মান্তরে ক্রোধভোগের দ্বারা সঞ্চিত এবং বর্তমান জন্মে ক্রোধভোগের দ্বারা সঞ্চিত ক্রোধবীজ) এবং অস্মিতা ও মানানুশয় (জন্মজন্মান্তরে 'আমি', 'আমার', 'আমি', 'আমার' বলিয়া মান

[=অহংকার] ভোগের দ্বারা সঞ্চিত এবং বর্তমান জন্মে তদ্রূপ মানভোগের দ্বারা সঞ্চিত মানবীজ) উচ্ছেদ সাধন করতঃ অবিদ্যা পরিহার করিয়া বিদ্যা উৎপাদনপূর্বক ইহজন্মেই দুঃখান্তকারী হইয়া থাকেন। এইভাবে ব্যক্তি সম্যক্‌দৃষ্টি-সম্পন্ন হইয়া থাকেন ; তাঁহার দৃষ্টি ঋজুগত (স্বচ্ছ) হয়, তিনি অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মপ্রাপ্ত হন।

২। সম্যক্ সংকল্প—উত্তম সংকল্প। চিত্ত সততই ক্রিয়াশীল এবং চিন্তাপ্রবণ, কেবলমাত্র সুষুপ্তিকালে চিত্তের ক্রিয়া সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে। মানুষের চিন্তার বিষয় হইতেছে জাগতিক বিষয় লইয়া চিন্তা—জাগতিক সুখ, দুঃখ, কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মাৎসর্য, বিদ্বেষ ইত্যাদি এবং আরও কত কি। এই সকল বিষয়ে চিন্তা যত গভীর হয় মানুষের নানা প্রকার মানসিক দুঃখও তত বর্ধিত হয়। ঈর্ষা, হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, লোলুপতা, পরের অনিষ্ট চিন্তা ইত্যাদি মানুষকে পশুতে পরিণত করে। এই সকল অশুভ এবং অকুশল চিন্তা বা সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া চিত্তে মৈত্রী, করুণা, পরোপকার চিন্তা, সৎচিন্তা, সদ্‌ভাবনা ইত্যাদি জাগ্রত করার নামই সম্যক্ সংকল্প। এই সম্যক্ সংকল্পের দ্বারাই ব্যক্তির আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভব। সংসার-দুঃখ হইতে মুক্তিকামী মানুষকে এতাদৃশ সম্যক্ সংকল্পের অধিষ্ঠান করিতে হইবে।[৭]

দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য ত্রি-অঙ্গ সমন্বিত সংকল্প শক্তিশালী করিয়া জাগ্রত করিতে হইবে। যেমন, আমি কাহাকেও কদাপি বিন্দুমাত্র দুঃখও প্রদান করিব না, হিংসা করিব না এবং কোন প্রকার কাম-কামনায় চিত্তকে কলুষিত করিব না। দর্শনের ভাষায় এইগুলিকে নৈষ্ক্রম্য সংকল্প, অব্যাপাদ সংকল্প এবং অবিহিংসা সংকল্প বলা হইয়াছে। এবম্বিধ সংকল্প সম্যক্ দৃষ্টির পরম সহায়, যেন অন্ধের যষ্টি। ঈদৃশ সংকল্প না থাকিলে প্রজ্ঞা পঙ্গু। আবার সম্যক্ দৃষ্টি না থাকিলে প্রজ্ঞা অন্ধ। অন্ধ এবং পঙ্গু যেমন পরস্পরের সহায়তায় তাহাদের সর্বকার্য সমাধা করিতে পারে, তদ্রূপ সম্যক্ দৃষ্টি ও সম্যক্ সংকল্প একত্রিত হইলে প্রজ্ঞা জাগ্রত হয়। প্রজ্ঞা জাগ্রত হইলে অবিদ্যার অন্ধকার দূরীভূত হয়। অবিদ্যার অন্ধকার দূরীভূত হইলে জগতে সমস্ত কিছুই যে অনিত্য দুঃখময় এবং অনাত্ম এই বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান লাভ হয়। একে একে কাম, ক্রোধ, লোভ, বিদ্বেষ, হিংসা, মোহ ইত্যাদি চিত্তের অকুশল বৃত্তি দূরীভূত হয়। গয়ার

বোধিবৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া বোধিসত্ত্ব গৌতম যে সংকল্পবদ্ধ হইয়া ধ্যানস্থ হইয়াছিলেন তাহাই সম্যক্ সংকল্প। তিনি কি সংকল্প করিয়াছিলেন ?

"ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু,
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতঃ চলিষ্যতে ॥"

—এ আসনে দেহ মম যাক শুকাইয়া
চর্ম অস্থি মাংস যাক প্রলয়ে ডুবিয়া।
না লভিয়া বোধিজ্ঞান দুর্লভ জগতে
টলিবেনা দেহ মোর এ আসন হতে ॥

—ইহাই সম্যক্ সংকল্পের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

৩। সম্যক্ বাক্য—সত্য এবং যথাভূত বাক্য। ইহার দ্বারা চারি প্রকার বাচনিক সংযমের সীমা লঙ্ঘন না করা বোঝায়। যেমন, (ক) মৃষাবাদ হইতে বিরত হওয়া অর্থাৎ কদাপি কুত্রাপি আত্মহেতু বা পরহেতু সজ্ঞানে মিথ্যা না বলা। সত্যবাদী ও অন্যের বিশ্বাসভাজন হওয়া।

(খ) পিশুন বা ভেদবাক্য হইতে বিরতি অর্থাৎ হিংসাবশতঃ অন্যদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি হইতে পারে এইরকম কথা না বলা বরং এমন কথা বলা যদ্দ্বারা অমিত্রগণের মধ্যেও মিত্রতা স্থাপিত হয়।

(গ) পরুষ বা কর্কশ বাক্য না বলা। শ্রুতিমধুর, নির্দোষ, প্রেমনীয়, কল্যাণজনক, বহুজনপ্রিয় বাক্য ব্যবহার করা।

(ঘ) প্রলাপ বা বৃথা বাক্য না বলা—শূন্যগর্ভ বাক্য, অন্যায় প্রস্তাব, ঠাট্টা বিদ্রূপ বা প্রলাপ বাক্য হইতে বিরত হইয়া আত্মপরহিতকর পরিমিত বাক্য প্রয়োগ করা।

৪। সম্যক্ কর্মান্ত—সৎ বা পবিত্র এবং বিশুদ্ধ কর্ম। ইহার দ্বারা চারি প্রকার কায়িক সংযমের সীমা লঙ্ঘন না করা বোঝায়। যেমন, (ক) প্রাণীহত্যা হইতে বিরত হইয়া নিহিত দণ্ড, নিহিত শস্ত্র, লজ্জী, দয়ালু, সকল প্রাণীর প্রতি হিতানুকম্পী হইয়া বাস করা।

(খ) অদত্ত দ্রব্য গ্রহণ বা চৌর্য্য হইতে বিরত হওয়া অর্থাৎ গ্রামে বা অরণ্যে বা অন্যত্র পরদ্রব্য চৌর্য্যচিত্তে গ্রহণ না করা এবং দাতা ও করুণাপন্ন হওয়া।

(গ) কামসমূহে মিথ্যাচার পরিত্যাগ করিয়া পরদারে মাতা ও ভগ্নীর ন্যায় সম্মান প্রদর্শন করা ও যথাসময়ে নিজ স্ত্রীতে রমিত হওয়া।

(ঘ সুরা, মদ, গাঁজা, ভাঙ্, আফিম্ প্রভৃতি নেশাজনক দ্রব্য সেবন হইতে বিরত থাকা।

৫। সম্যক্ জীবিকা—অনবদ্য, নির্দোষ নিষ্পাপ জীবিকা। যে জীবিকার দ্বারা অন্য কোন প্রাণীর অনিষ্ট হয় না। অস্ত্রবাণিজ্য, প্রাণি-বাণিজ্য, বিষবাণিজ্য, নেশাদ্রব্যবাণিজ্য, মৎস্যবাণিজ্য, মাংসবাণিজ্য, মনুষ্য-বাণিজ্য অন্য প্রাণীর অনিষ্টকারী জীবিকা। কায়িক, বাচনিক পাপে লিপ্ত না হওয়া অর্থাৎ প্রাণীহত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা, ভেদবাক্য (=পিশুন), কর্কশবাক্য (=পরুষ), প্রলাপ দ্বারা এবং কাপট্য, স্তাবকতা, নৈমিত্তিকতা, নিষ্পীড়নতা, কুশীদজীবিকা (usury) ইত্যাদি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ না করিয়া ধর্মতঃ অহিংস, অচৌর, অবঞ্চন, অমায়ারী হইয়া জীবিকা নির্বাহ করা।

৬। সম্যক্ প্রচেষ্টা (=পালি সম্মা বায়ামো)—একান্ত অনবদ্য সৎ মানসিক ইচ্ছা বা প্রচেষ্টা। গয়ার বোধিদ্রুমমূলে বসিয়া যে মানসিক প্রচেষ্টার দ্বারা, যে বলবতী ইচ্ছার দ্বারা বোধিসত্ত্ব বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন তাহাই সম্যক্ প্রচেষ্টা। এই সম্যক্ প্রচেষ্টা চারি প্রকার ঃ

(ক) অনুৎপন্ন অকুশলের অনুৎপত্তির জন্য হৃদয়ে বলবতী ইচ্ছা, প্রবল চেষ্টা, মহা উদ্যোগ পোষণ ও স্থিরপ্রতিজ্ঞা হওয়া।

(খ) উৎপন্ন অকুশলের বিনাশের জন্য হৃদয়ে বলবতী ইচ্ছা, প্রবল চেষ্টা, মহা উদ্যোগ পোষণ ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ হওয়া।

(গ) অনুৎপন্ন কুশলের উৎপত্তির জন্য হৃদয়ে বলবতী ইচ্ছা, প্রবল চেষ্টা, মহা উদ্যোগ পোষণ ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ হওয়া।

(ঘ) উৎপন্ন কুশলের স্থিতি ও বৃদ্ধির জন্য হৃদয়ে বলবতী ইচ্ছা, প্রবল চেষ্টা, মহা উদ্যোগ পোষণ ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ হওয়া।

এবম্বিধ অধ্যবসায় বা সৎ প্রচেষ্টার গুণে সাধক নিজেই নিজের মুক্তি অর্জন করিতে পারেন। স্বাবলম্বন ও পুরুষাকার ইহার আদর্শ। ইহা সর্ববিধ মানসিক দুর্বলতাকে অপসারিত করে।

৭। সম্যক্ স্মৃতি (Right Mindfulness) (পালি সম্মা সতি)—প্রতি মুহূর্তে কায় ও মনে যে সকল অবস্থা উৎপন্ন হয়, অতি সজাগ দৃষ্টিতে

সন্তর্পণে সেগুলিকে মনে মনে পর্যবেক্ষণ করাই সম্যক্ স্মৃতি। এই পর্যবেক্ষণের দ্বারাই যোগী জানিতে পারেন উৎপন্ন ধর্মসমূহের (mental concomitants) মধ্যে ইহা কুশল, ইহা অকুশল, ইহা দোষযুক্ত, ইহা নির্দোষ, ইহা ভাল, ইহা মন্দ, ইহা হিতকর, ইহা অহিতকর। ইহা সম্যক্‌ভাবে জানিয়া যোগী সেবনীয় ধর্ম সেবন করেন, গ্রহণীয় ধর্ম গ্রহণ করেন, অসেবনীয় ধর্ম পরিহার করেন, অগ্রহণীয় ধর্ম গ্রহণ করেন না। স্মৃতি জাগ্রত থাকিলেই ইহা সম্ভব হয়। স্মৃতিহীন চিত্ত যোগীকে বিভ্রান্ত করে, পথভ্রষ্ট করে। তাই বলা হইয়াছে যে স্মৃতিহীন চিত্ত কর্ণধারহীন তরণীর ন্যায় বিপন্ন।

সম্যক্ স্মৃতি কুশলকে নিয়ত জাগ্রত রাখে, অকুশল উৎপত্তির অবকাশে বাধা প্রদান করে। এই সতর্কতাই স্মৃতির কার্য। ইহা কায়ে কায়ানুদর্শন, বেদনাসমূহে বেদনানুদর্শন, চিত্তে চিত্তানুদর্শন ও ধর্মসমূহে ধর্মানুদর্শন-ভেদে প্রথমে চতুর্বিধ হইয়া কার্যসাধন করতঃ মার্গাঙ্গ পূর্ণ করে।

(ক) স্মৃতির দ্বারা কিভাবে কায়ে কায়ানুদর্শন হয়? যোগী বীর্যবান, সম্প্রজানকারী (fully conscious) ও স্মৃতিশীল হইয়া কায়ে কায়ানুদর্শী হয়। অর্থাৎ অশুচি কুৎসিৎ কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক্, অস্থি, মাংস প্রভৃতি বত্রিশ আকার বা ইহাদের উৎপত্তিস্থানভূত ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু এই চতুর্মহাভূতের সংমিশ্রণে সুগঠিত, আহার্য দ্বারা পরিবর্ধিত দেহের প্রত্যেকটি অংশ (ভিতরের ও বাহিরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ), বীর্যসহকারে স্মৃতির দ্বারা অবলম্বন করতঃ প্রজ্ঞায় তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শন করে, দেহের শ্বাস-প্রশ্বাসের গমনাগমন-স্থিতি প্রভৃতি বিশেষভাবে জানে, হস্তপদাদির সঙ্কোচন, প্রসারণ, পান-ভোজন প্রভৃতি দেহের প্রত্যেক অবস্থায় সম্প্রজানকারী হয়। শয়ন-উপবেশন-গমন-দণ্ডায়মান দেহের এই চারি অবস্থায় সম্প্রজানকারী হয়। তৎপর মৃতদেহ শ্মশানে নিক্ষিপ্ত হইলে পঁচিয়া গলিয়া যে দশবিধ (ঊর্ধস্ফীত মৃতদেহ, বিনীলক মৃতদেহ, পূযপূর্ণ, ছিদ্রীকৃত, বিখাদিত, বিক্ষিপ্ত, কর্তিত-বিক্ষিপ্ত, রক্তাপ্লুত, কীটপূর্ণ, অস্থিপঞ্জর) অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় তাহাও প্রজ্ঞাচক্ষুতে দর্শন করিয়া থাকে। এইভাবে দেহ প্রত্যবেক্ষণ করতঃ অর্থাৎ অশুভরূপে দেখিয়া শুভসংজ্ঞা, অনিত্যরূপে দেখিয়া নিত্যসংজ্ঞা, দুঃখরূপে দেখিয়া সুখসংজ্ঞা, অনাত্মারূপে দেখিয়া আত্মসংজ্ঞা ত্যাগ করে এবং দেহের প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়, নন্দিত হয় না, বিরক্ত হয়, অনুরক্ত হয় না, অনুরাগ নিরুদ্ধ করে, উৎপাদন করেনা। দেহ-উৎপাদক সমস্ত কলুষ ত্যাগ

করে, গ্রহণ করেনা (কলুষে লিপ্ত হয় না)—এইরূপে দেহের প্রতি লোভ (আসক্তি) ও দৌর্মনস্য (displeasure) ত্যাগ করিয়া অবস্থান করে। ইহাকেই বলা হয় কায়ে কায়ানুদর্শন।

(খ) স্মৃতির দ্বারা কিভাবে বেদনায় বেদনানুদর্শন হয়? যোগী বীর্যবান স্মৃতিমান্ ও সম্প্রজানকারী হইয়া বেদনাসমূহে (সুখ-দুঃখাদি অনুভূতি-সমূহে) বেদনানুদর্শী হয়। অর্থাৎ সুখ, দুঃখ, উপেক্ষাদি বেদনার উদয়ে তাহা বিশেষভাবে জানে, তাহা কি আসক্তির হেতু হইল, কি অনাসক্তির হেতু হইল তাহা বীর্যসহকারে স্মৃতির দ্বারা অবলম্বন করতঃ প্রজ্ঞায় পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে দর্শন করে এবং জ্ঞাত হয় যে, সুখ-বেদনার উপস্থিতি সুখময় বটে, কিন্তু ইহার পরিণাম দুঃখদায়ক। দুঃখ-বেদনা শল্যতুল্য। উপেক্ষা বেদনা শান্ত বটে, কিন্তু তাহাও উদয়-ব্যয়শীল। অতএব বেদনামাত্রই (অনুভূতি-মাত্রই) পরিবর্তনশীল বা অনিত্য বলিয়া দুঃখ। এইভাবে বেদনাসমূহকে অনিত্যরূপে দেখিয়া নিত্যসংজ্ঞা, দুঃখরূপে দেখিয়া সুখসংজ্ঞা, অনাত্মরূপে দেখিয়া আত্মসংজ্ঞা ত্যাগ করে এবং বেদনাসমূহের প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়, নন্দিত হয় না, বিরক্ত হয়, অনুরক্ত হয় না। অনুরাগ নিরুদ্ধ করে, উৎপাদন করে না। বেদনা-উৎপাদক কলুষ ত্যাগ করে, গ্রহণ করেনা—এইরূপে বেদনাসমূহের প্রতি লোভ ও দৌর্মনস্য ত্যাগ করে।

(গ) স্মৃতির দ্বারা কিভাবে চিত্তে চিত্তানুদর্শন হয়? যোগী বীর্যবান্ স্মৃতিমান ও সম্প্রজানকারী হইয়া চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়। অর্থাৎ কোন্ সময়ে কোন্ চিত্ত উৎপন্ন হইতেছে, যে চিত্ত উৎপন্ন হইল তাহা কি সরাগচিত্ত, না সদ্বেষচিত্ত, না সমোহচিত্ত অথবা রাগ-দ্বেষ-মোহাতিক্রান্ত চিত্ত, তাহা বীর্য-সহকারে স্মৃতির দ্বারা অবলম্বন করতঃ প্রজ্ঞাচক্ষুতে দর্শন করে এবং চিত্তের মহদ্গততা (loftiness),অমহদ্গততা, লৌকিক অবস্থা, অনুত্তর অবস্থা ও চিত্তের বিমুক্ত অবিমুক্ত অবস্থাদি ষোড়শবিধ চিত্তের অবস্থা সম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া তাহা অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মরূপে দর্শন করতঃ নিত্য-সুখ-আত্মসংজ্ঞা পরিত্যাগ করে, এবং চিত্তের প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়, নন্দিত হয় না, বিরক্ত হয়, অনুরক্ত হয় না। অনুরাগ ত্যাগ করে, উৎপাদন করে না। চিত্ত-উৎপাদক কলুষ ত্যাগ করে, গ্রহণ করে না। এইরূপে চিত্তের প্রতি লোভ ও দৌর্মনস্য ত্যাগ করিয়া অবস্থান করে।

(ঘ) স্মৃতির দ্বারা কিভাবে ধর্মসমূহে ধর্মানুদর্শন হয়? যোগী

বীর্যবান্, স্মৃতিমান ও সম্প্রজানকারী হইয়া ধর্মসমূহে ধর্মানুদর্শী হয়। অর্থাৎ স্বীয় মানসে কামচ্ছন্দাদি পঞ্চ নীবরণ থাকিলে, আছে বলিয়া জানে। কিরূপে তাহা প্রত্যাখ্যান করা যাইতে পারে এবং ভবিষ্যতে উহা কিরূপে উৎপন্ন না হইতে পারে, তদ্বিষয় যথাযথভাবে জানে। কামচ্ছন্দাদি নীবরণ না থাকিলে, নাই বলিয়া জানে। পঞ্চস্কন্ধের উৎপত্তি-বিলয় যথাযথভাবে জানে। চক্ষুকর্ণাদির সহিত রূপশব্দাদির সমাগমে যে বন্ধন বা সংযোজনের সৃষ্টি হইয়া থাকে, উহার ছেদন বিষয়ক জ্ঞান যথাযথভাবে আয়ত্ত করে। প্রহীন সংযোজন যাহাতে ভবিষ্যতে উৎপন্ন না হয় তাহাও জানে। সপ্ত বোধ্যঙ্গ, চতুরার্যসত্য ও আর্যমার্গ ভাবনায় অভিজ্ঞতা লাভ করে। উক্ত চৈতসিক ধর্মসমূহ বীর্যসহকারে স্মৃতির দ্বারা অবলম্বন করতঃ প্রজ্ঞায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শন করে। ধর্মসমূহের স্পর্শাদি স্বলক্ষণ, অনিত্যতাদি সাধারণ লক্ষণ ও অনাত্মাদি শূন্যতালক্ষণ সন্দর্শন করে। অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মরূপে দেখিয়া নিত্য, সুখ ও আত্মসংজ্ঞা পরিত্যাগ করে। চৈতসিক ধর্মসমূহের প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়, নন্দিত হয় না, বিরক্ত হয়, অনুরক্ত হয় না। অনুরাগ নিরুদ্ধ করে, উৎপাদন করে না। পঞ্চস্কন্ধ উৎপত্তিজনক কলুষ পরিত্যাগ করে, গ্রহণ করে না (কলুষে লিপ্ত হয় না)। এইরূপে ধর্মসমূহের প্রতি লোভ ও দৌর্মনস্য ত্যাগ করিয়া অবস্থান করে।

ইহাকেই বলা হয় সম্যক্ স্মৃতি।

৮। সম্যক্ সমাধি (Right Concentration) সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্মান্ত, সম্যক্ প্রচেষ্টা, সম্যক্ জীবিকা ও সম্যক্ স্মৃতি—এই সপ্ত অঙ্গ সমন্বিত চিত্তের একাগ্রতাই সমাধি। একটিমাত্র বিষয়ে চিত্তের নিশ্চল অবস্থাই একাগ্রতা বা সমাধি। এই সমাধি প্রথমাদি ধ্যানভেদে চারি প্রকার ঃ

(ক) কাম ও অকুশল ধর্মসমূহ হইতে বিবিক্ত (aloof from) হইয়া অত্যুগ্র কামলালসা (পালি কামচ্ছন্দ), বিদ্বেষ (পালি ব্যাপাদ), তন্দ্রালস্য (পালি থীনমিদ্ধ), ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য=চিত্তের অশান্ত ও দ্বিধাগ্রস্তভাব (পালি উদ্ধচ্চ-কুক্কুচ্চ) এবং সংশয় (পালি বিচিকিচ্ছা)—এই পঞ্চ নীবরণ (obstacles to the progress of mind) ত্যাগ করতঃ সবিতর্ক, সবিচার, বিবেকজ প্রীতি, সুখ, একাগ্রতা সম্প্রযুক্ত প্রথম ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া বিহার করা।

(খ) বিতর্ক বিচার বর্জিত, আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদ চিত্তের একাগ্রভাব সহিত

অবিতর্ক, অবিচার, সমাধিজাত প্রীতি, সুখ, একাগ্রতা সমন্বিত দ্বিতীয় ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া বিহার করা।

(গ) প্রীতি-বিরাগবর্জিত উপেক্ষা একাগ্রতা সহিত স্মৃতিশীল সম্প্রজ্ঞানকারী হইয়া কায়িক সুখ অনুভব করা, আর্যগণ যাঁহাকে উপেক্ষা স্মৃতিশীল সুখবিহারী বলিয়া নির্দেশ করেন—সেইরূপ তৃতীয় ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করা।

(ঘ) পূর্ব হইতেই কায়িক সুখদুঃখ ত্যাগ করিয়া, মানসিক সুখদুঃখও পরিহার করতঃ অদুঃখ-অসুখ উপেক্ষা একাগ্রতায় স্মৃতি-পারিশুদ্ধি চতুর্থ ধ্যানপ্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করা। এই ধ্যানসমূহ পূর্বভাগে সমাপত্তিবশে নানাবিধ এবং মার্গক্ষণে ও স্রোতাপত্তি-আদি মার্গবশে নানাবিধ। ধ্যানসমূহ পূর্বভাগে লৌকিক, অপরভাগে লোকোত্তর। এই পূর্বভাগে লৌকিক, অপরভাগে লোকোত্তর চিত্তের একাগ্রতাই সম্যক্ সমাধি বলিয়া কথিত হইয়াছে।

এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গকে শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা এই তিনভাগে ভাগ করা যায়। সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্মান্ত ও সম্যক্ জীবিকা শীলের অন্তর্গত। সম্যক্ প্রচেষ্টা, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি সমাধির অন্তর্গত। সম্যক্ দৃষ্টি ও সম্যক্ সংকল্প প্রজ্ঞার অন্তর্গত। কিন্তু শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা পরস্পর সাপেক্ষ। উপস্তম্ভিত ত্রিনল-কলাপের ন্যায় একটির অভাব ঘটিলে অন্য দুইটি পরস্পর সংস্থিত হইতে পারে না। দুঃশীল ব্যক্তির সমাধি ও প্রজ্ঞা কিভাবে সম্ভব ? অসমাহিত ব্যক্তির (অর্থাৎ সমাধিহীন ব্যক্তির) শীল ও প্রজ্ঞা কিরূপে সম্ভব ? মূর্খ ব্যক্তির (অর্থাৎ প্রজ্ঞাহীন ব্যক্তির) শীল, সমাধি কিছুই হয় না।

অন্যভাবে বলিতে হইলে বলা যায় যে, শীল সমাধির সোপান। সচ্চরিত্র গঠন ব্যতীত সাধনা সম্ভব নহে। সাধনা দ্বারাই প্রজ্ঞা বা তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। আবার জ্ঞানের আলোকে চরিত্র নির্মল হয়, সাধনা সমুজ্জ্বল হয়।

চিত্তের কলুষবৃত্তকে সমুচ্ছেদ করাই মুক্তিকামীর পরম পুরুষার্থ। বুদ্ধ তাঁহার শিষ্যগণকে বলিয়াছেন—"বন্ধুগণ, তোমরা ঋণগ্রস্ত হইয়া, ভয়বিহ্বল হইয়া কিংবা সুখে জীবিকা নির্বাহার্থে আমার নিকট আইস নাই। দুঃখ হইতে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে এই ধর্মে প্রব্রজিত হইয়াছ। সুতরাং শয়ন, উপবেশন, গমন ও দণ্ডায়মান যখন যেই অবস্থাতেই তোমাদের অন্তরে

কলুষভাবের সঞ্চার হইবে, তাহাকে সেই অবস্থাতেই শান্ত কর, নিগ্রহ কর, সমুচ্ছেদ কর। অবস্থান্তরে যাইতে দিও না।" অতএব আমাদের সমস্ত আয়োজন সমগ্র অধ্যবসায় চিত্ত কলুষ ধ্বংসের নিমিত্ত নিয়োগ করিতে হইবে। ইহারই উদ্দেশ্যে অষ্টাঙ্গিক মার্গের অনুশীলন প্রয়োজন। চিত্ত কলুষের তিন অবস্থা—অনুশয়, সমুত্থান ও ব্যতিক্রম। ইহা এই মনোবৃত্তিতে চিত্তসন্ততিতে সুপ্ত থাকে (জন্মজন্মান্তর ধরিয়া ইহা চিত্তসন্ততিতে সুষুপ্ত রহিয়াছে), অনুরূপ বিষয়প্রাপ্ত হইলে জাগ্রত হয় আর সুযোগ অনুসারে সংযমের সীমা লঙ্ঘন করে। যেমন প্রজ্বলিত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে অগ্নি আরও তীব্রভাবে প্রজ্বলিত হয়; কলুষের ক্ষেত্রেও তদ্রূপ। অনুরূপ বিষয় প্রাপ্ত হইলে ইহা বর্ধিত হয়। অষ্টাঙ্গিক মার্গের শীল-সংযম কলুষের শীললঙ্ঘন ব্যাহত করে। সমাধি দ্বারা উহাদের জাগরণ সাময়িকভাবে উপশান্ত হয়। প্রজ্ঞাস্ত্র দ্বারা কলুষরাশি সমূলে সমুচ্ছিন্ন হয়। তখন চিত্ত কলুষমুক্ত হইয়া পরম বিশুদ্ধি লাভ করে। ইহাই সাধকের সউপাদিশেষ নির্বাণ অবস্থা। ঈদৃশ জীবন্মুক্ত ব্যক্তিরাই আয়ুক্ষয়ে এই অন্তিম দেহ ত্যাগ করিয়া অনুপাদিশেষ নির্বাণে নির্বাপিত হন। তাই বলা হইয়াছে ঃ

সীলে পতিট্ঠায় নরো সপঞ্ঞো
চিত্তং পঞ্ঞং চ ভাবয়ং
আতাপী নিপকো ভিক্খু
সো ইমং বিজটয়ে জটং তি।

আরব্ধবীর্য সম্প্রজানকারী প্রাজ্ঞ ভিক্ষু (বা প্রাজ্ঞ ব্যক্তি) শীলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমাধি (=চিত্ত) ও প্রজ্ঞাভাবনা অনুশীলনের দ্বারা এই তৃষ্ণাজালকে ছিন্ন করিয়া (অথবা তৃষ্ণাজটাকে বিজটিত করিয়া) দুঃখমুক্তিরূপ নির্বাণ লাভ করিতে পারেন।

শীল-মাহাত্ম্য

পূর্ব অধ্যায়ে অষ্টাঙ্গিক মার্গের আলোচনাকালে আমরা দেখিয়াছি যে, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্মান্ত ও সম্যক্ জীবিকা—এই তিনটি মার্গ শীলের অন্তর্গত এবং মোটামুটিভাবে ঐ তিনটি মার্গের পরিচয় সংক্ষেপে দেওয়া হইয়াছে। আরও বলা হইয়াছে যে দুঃখমুক্তি মার্গ-প্রতিপন্ন ব্যক্তিকে উক্ত তিনটি মার্গ বা শীলকে সর্বাগ্রে বিশুদ্ধ করিতে হইবে। তাহা না হইলে দুঃখ-মুক্তির মার্গে বিন্দুমাত্রও অগ্রসর হওয়া যাইবেনা। কিন্তু কেন শীলকে মহাকারুণিক বুদ্ধ এত প্রাধান্য দিয়াছেন, শীলের মাহাত্ম্যই বা কোথায় এই বিষয়ে আরও বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজনীয়তা আছে। তাই বর্তমান অধ্যায়ের অবতারণা।

শীল (=পালি সীল) শব্দের অর্থ সদাচার বা কায়িক ও বাচনিক কর্মের পরিশুদ্ধি। সংস্কৃতে 'শীল' শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে 'সদাচার' (morality) অর্থই এইস্থলে গ্রহণযোগ্য। মহাভারতে এবং মনুসংহিতায় 'শীলবান' শব্দ ঠিক এই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। বৌদ্ধ-শাস্ত্রে 'শীল' শব্দ কেবল 'সদাচার' অর্থেই বিশেষতঃ ব্যবহৃত হইয়াছে। 'নীতি' শব্দও এই অর্থই বহন করে। যেমন 'পঞ্চশীল' বলিতে পাঁচ প্রকার নীতিকে বুঝায়, 'দশশীল' বলিতে দশ প্রকার নীতিকে বুঝায়। ভগবান বুদ্ধ গৃহীদের জন্য (অর্থাৎ যাঁহারা গৃহী অবস্থায় সংসারধর্ম পালন করেন) পঞ্চশীল এবং অষ্টশীলের বিধান দিয়াছেন। প্রব্রজিত ভিক্ষু ও শ্রামণেরদের জন্য 'দশশীল' হইতে আরম্ভ করিয়া ২২৭ শীলের বিধান দিয়াছেন। যখন তিনি 'সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠা করেন তখন মাত্র দশশীলের বিধানই দিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমশঃ সঙ্ঘ আয়তনে দিনদিন বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে নানাবিধ ঘটনা ঘটিতে থাকে, বিশেষতঃ ভিক্ষুণীসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার পর হইতে এবং জনমতকে (Public opinion) প্রাধান্য দিতে যাইয়া যখন সঙ্ঘের আবাসিকদের আহার্য, পরিধেয় বস্ত্র, বাসস্থান ও ভৈষজ্য (রোগীর পথ্য) এই চতুর্প্রত্যয় দাতাদের নিকট হইতে দানস্বরূপ গ্রহণের অনুমতি প্রদান করিলেন এবং এই অনুমতির অপব্যবহার সুরু হইল তাহার পর হইতে। এক একটি ঘটনা ঘটিল। বুদ্ধ বিচার করিলেন যে ঘটনাটি অন্যায়, নীতিবিরুদ্ধ

এবং জনমতবিরোধী, তখন তিনি বিধান দিলেন যে ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী এইরূপ ঘটনা ঘটাইবে তাহার এই পাপ হইবে এবং তাহাকে এইভাবে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। এইভাবে একটি একটি 'শীল' বা নীতি (moral Code) সঙ্ঘের নিয়মানুবর্তিতার জন্য বিহিত হইল। এইভাবে ঘটনা ঘটিতে থাকিলে ক্রমশঃ শীলের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ২২৭ সংখ্যায় শেষ হইল। অর্থাৎ ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী যে কোন অপরাধ করুক না কেন এই ২২৭ সংখ্যার বাহিরে তাহা যাইবেনা। পালি বিনয়পিটকের অধিকাংশ এই ২২৭টি শীলের উৎপত্তি লইয়াই গঠিত হইয়াছে। ২২৭টি শীলই কায়িক ও বাক্‌কর্মের অন্তর্গত। অতএব শীল বলিতে আমরা বুঝিব শুধুমাত্র কায়িক ও বাচনিক কর্মের সংযম বা পরিশুদ্ধি।

এই শীল বা সদাচার হইতেছে যাবতীয় কুশল ধর্মের এমন কি দুঃখমুক্তি-রূপ নির্বাণলাভেরও আধার বা প্রতিষ্ঠা। শীলে স্থিত হইলেই যাবতীয় কুশল প্রতিষ্ঠিত হয়। পৃথিবী যেমন সমস্ত জড় ও চেতন বস্তুর আশ্রয়, শীলও তদ্রূপ যাবতীয় কুশলের আশ্রয় বা আধার। আমরা চারিদিকে দৃকপাত করিলে দেখি যে যাবতীয় গৃহ-অট্টালিকা, বৃক্ষ-লতাপাতা, বনজঙ্গল, পাহাড়-পর্বত, পশুপক্ষী, মনুষ্য ও মনুষ্যেতর জীবজন্তু পৃথিবীকে আশ্রয় করিয়া বর্তমান, পৃথিবীই ইহাদের প্রতিষ্ঠা বা ভিত্তিস্থল। একটি গৃহ নির্মাণ করিতে হইলে প্রথমে প্রয়োজন উত্তম ভিত্তির। ভিত্তি যদি দুর্বল হয় গৃহ নির্মিত হইবেনা, নির্মাণের পূর্বেই ধরাশায়ী হইবে। আর ভিত্তি যদি সুদৃঢ় হয় গৃহ সুনির্মিত হইবে এবং ইহা দীর্ঘস্থায়ী হইবে। ঠিক তদ্রূপ শীল হইতেছে সমস্ত কুশলধর্ম, লৌকিক ও লোকোত্তর সমস্ত জ্ঞানের উপলব্ধি হইতে সুরু করিয়া ধ্যান ও প্রজ্ঞায় পুষ্ট হইয়া অবশেষে বোধিজ্ঞান লাভ পর্যন্ত সমস্ত কিছুর আশ্রয়স্বরূপ। তাই শীলকে এত প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। শীল প্রতিপালন দ্বারা কায়-বাক্ বিশুদ্ধ করতঃ সমাধিপরায়ণ হইলে যোগীর মহাফল লাভ হইয়া থাকে। দুঃশীল ব্যক্তির সম্যক্ সমাধি লাভ হইতে পারে না।

শীল শব্দের দ্বারা কায়-বাক্ কর্মের পরিশুদ্ধি বুঝাইলেও চেতনা ইহার অন্তর্ভুক্ত। কারণ চেতনাকেই কর্ম বলা হয়। কায়িক যে কোন কর্মের পশ্চাতে চেতনা আছে। চেতনা ব্যতীত কর্ম হইতে পারেনা। তদ্রূপ বাচনিক যে কোন কর্মের পশ্চাতেও চেতনা আছে। বুদ্ধ বলিয়াছেন—চেতনা'হং ভিক্খবে

কম্মং বদামি। চেতয়িত্বা কম্মং করোতি হীনং বা পণীতং বা। অর্থাৎ হে ভিক্ষু-গণ, আমি চেতনাকেই কর্ম বলি। চিন্তা করিয়াই ব্যক্তি ভাল-মন্দ কর্ম সম্পাদন করে। তাই বলিতে পারা যায় যে, প্রাণীহত্যা, অদত্তদ্রব্য গ্রহণ (=চৌর্য), কামে ব্যভিচার, মৃষাবাদ, পিশুনবাদ, পরুষবাদ, সম্প্রলাপাদি ত্যাগের জন্য উৎসাহী ব্যক্তির যে চেতনা তাহাই শীল। পুনঃ বলিতে পারা যায়—যে চৈতসিক দ্বারা লোভ, দ্বেষ, মোহ, মিথ্যাদৃষ্টি ত্যাগ করিয়া বীত-লোভ, বীতদ্বেষ, বীতমোহ ও সম্যগ্‌দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া বিহার করা হইয়া থাকে সেই চৈতসিকই শীল। অতএব 'শীল' বলিতে 'প্রাণীহত্যা হইতে বিরতি', 'অদত্তদ্রব্যগ্রহণ হইতে বিরতি' প্রভৃতি কতগুলি পদসমন্বিত বাক্যকে মাত্র বুঝায় না। তম্ভাবে ভাবিত হইবার যে চেতনা বা তম্ভাবে ভাবিত হইয়া বিহরণের যে মানসিকতা বা মনোবৃত্তি উহাই শীল।

চরিত্র ও বারিত্রবশে শীল দ্বিবিধ। যাহা করা কর্তব্য বলিয়া ভগবান নির্দেশ করিয়াছেন তাহা চারিত্র (কর্তব্যে বিচরণকারীকে ত্রাণ করে এইজন্য চারিত্র)। ঐ চারিত্রের যে চেতনা বা চৈতসিক উহা চারিত্রশীল। আর যাহা অকর্তব্য বলিয়া ভগবান বারণ করিয়াছেন তাহা বারিত্র (অকর্তব্যে বারিত্রকে ত্রাণ করে এইজন্য বারিত্র বলা হইয়াছে)। এতদ্বিষয়ে যে চেতনা বা চৈতসিক তাহা বারিত্রশীল। 'প্রাণীহত্যা হইতে বিরতি' এই শীলের দ্বারা তিনি বুঝাইয়াছেন যে, ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র প্রাণী হইতে বৃহত্তম প্রাণী সকলেরই পৃথিবীতে বাঁচিবার অধিকার আছে। যেমন আমার প্রাণ তেমন তাহার, যেমন তাহার প্রাণ তেমন আমার। আমি যেমন বাঁচিতে চাহি, ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল প্রাণীই বাঁচিতে চাহে। এই দৃষ্টিতে সজ্ঞানে একটি পিপীলিকাকে মারিলেও পাপ বলিয়াছেন। কারণ পিপীলিকা ক্ষুদ্র হইলেও তাহারও প্রাণ আছে। বাঁচিবার অধিকার আছে। তবে ক্ষুদ্র প্রাণী হত্যা করিলে অল্পপাপ, বড় প্রাণী হত্যা করিলে মহাপাপ। সজ্ঞানে মনুষ্যহত্যাকে জঘন্যতম মহাপাপ বলা হইয়াছে। ইহার দ্বারা ভগবান্ তাঁহার হৃদয়ের মহাকরুণার কথাই ব্যক্ত করিয়াছেন। 'সকল প্রাণীই সুখী হউক' এইভাবে সর্বভূতহিতানুকম্পী হইতে হইবে—ইহাই বুদ্ধবাণী। সমস্ত প্রাণীর প্রতি অপরিসীম প্রেম, মৈত্রী, করুণা হৃদয়ে পোষণ করিতে হইবে—ইহাই বুদ্ধবাণী। বুদ্ধ বলিয়াছেন—

"মাতা যথা নিযং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তং অনুরক্খে।
এবং পি সব্বভূতেসু মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং"—

অর্থাৎ মাতা যেমন তাঁহার নিজের জীবনের বিনিময়েও একমাত্র পুত্রের জীবন রক্ষার্থে আগ্রহী হইয়া থাকেন, তদ্রূপ সমস্ত প্রাণীর প্রতি অপরিসীম মৈত্রী পোষণ করিতে হইবে। অতএব 'প্রাণীহত্যা হইতে বিরতি' এই শীলের Negative (নঞর্থক) এবং Positive (সদর্থক) দুইটি দিকই আছে। 'প্রাণীহত্যা করিবনা' ইহা শীলের নঞর্থক দিক এবং 'জগতের সকল প্রাণীর প্রতি অপরিসীম মৈত্রীভাব পোষণ করিব' ইহা শীলের সদর্থক দিক। 'সকল প্রাণী' বলিতে বুদ্ধ যাহা বুঝাইতে চাহিয়াছেন তাহা অভিনব। তাঁহার ভাষায়—

'যে কেচি পাণভূতত্থি তসা বা থাবরা বা অনবসেসা,
দীঘা বা যে মহন্তা বা মজ্ঝিমা রুস্‌সকা অণুকথূলা।
দিট্‌ঠা বা যেব অদিট্‌ঠা যে চ দূরে বসন্তি অবিদূরে,
ভূতা বা সম্ভবেসী বা সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা ॥'

—যে সকল প্রাণী আছে, ভীত, নির্ভীক, দীর্ঘ, বৃহৎ, মধ্যম, হ্রস্ব, ক্ষুদ্র বা স্থূল, দৃষ্ট প্রাণী, অদৃষ্ট প্রাণী, যাহারা দূরে বাস করে বা নিকটে বাস করে, যাহারা জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, এমনকি যাহারা জন্মগ্রহণ করিবে—সকলেই সুখী হউক। এইভাবে সমস্ত প্রাণীর প্রতি অপরিসীম মৈত্রী পোষণ করিতে হইবে। এইভাবে প্রত্যেকটি শীলের নঞর্থক এবং সদর্থক দিক আছে। যেমন দ্বিতীয় শীল হইতেছে 'আমি অদত্তদ্রব্য গ্রহণ করিবনা' অর্থাৎ চুরি করিবনা —ইহা শীলের নঞর্থক দিক। উক্ত শীলের সদর্থক দিক হইতেছে 'আমি দান করিব'। যাহা কিছু শ্রদ্ধাচিত্তে দেওয়া হয় তাহাই দান। অশ্রদ্ধাচিত্তে কোটি কোটি টাকা দান করিলেও তাহা 'দান' হইবে না। শ্রদ্ধাচিত্তে প্রার্থীকে এক পয়সা দিলেও তাহা দান, কিন্তু অশ্রদ্ধাচিত্তে এক কোটি টাকা দিলেও দান ত হইবেই না, বরং চিত্তে অশ্রদ্ধা আনয়ন করার ফলে পাপের বোঝাই ভারী হইবে। দুঃখী ব্যক্তিকে দান করিবার সময় চিত্তে 'অনন্ত করুণা' আনয়ন করিতে হইবে। আহা! লোকটি কত দুঃখী। আমার দানে সে কিছুটা সুখী হউক। গ্রহীতার প্রতি এইরূপ করুণা আনয়ন করিলে দান সার্থক হয়। এতদ্ব্যতীত সৎপাত্রে দান করিতে হইবে। সৎপাত্র দ্বিবিধ—১। সদাচারী সজ্জন সাধুসন্ত পুণ্যবান্ ব্যক্তি এবং ২। প্রকৃত দুঃখী এবং অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি। 'কামে ব্যভিচার করিবনা' ইহা শীলের নঞর্থক দিক্। ইহার সদর্থক দিক হইতেছে পরদার বা পরনারীকে স্বীয় মাতৃবৎ, পত্নীবৎ, ভগ্নীবৎ,

এবং কন্যাবৎ দর্শন করিয়া তাহার প্রতি শ্রদ্ধা, স্নেহ, প্রীতি উৎপাদন করিতে হইবে এবং প্রয়োজনে তাহাদের মর্যাদা রক্ষা করিতে হইবে।

'মৃষাবাদ হইতে বিরতি' ইহা শীলের নঞর্থক দিক্। সদর্থক দিক হইতেছে সত্যকথা বলা, প্রিয়বাক্য বলা, মধুরবাক্য বলা। অন্যের কল্যাণ হয় এইরূপ বাক্য বলা, পরোপকারচিত্তে কথা বলা, হিতকর এবং মনোহারী বাক্য বলা।

এইভাবে প্রত্যেকটি শীলকে জানিতে হইবে এবং শীল রক্ষা করিতে হইবে। শীল রক্ষিত না হইলে সংসারজীবনে যেমন সুখী হওয়া যায়না, আধ্যাত্মিক সাধনমার্গেও অগ্রসর হওয়া যায় না। তাই বুদ্ধ শীলের উপর এতটা গুরুত্ব প্রদান করিয়াছেন।

অনিত্যদর্শন

অনিত্যদর্শন বুদ্ধের দর্শনের গোড়ার কথা। বুদ্ধ বলিয়াছেন ঃ

সব্বে সংখারা অনিচ্চা'তি যদা পঞ্ঞায় পস্সতি
অথ নিব্বিন্দতি দুক্খে এস মগ্গো বিসুদ্ধিয়া।"[১]

—সমস্ত সংস্কার (যাহা কিছু কার্য-কারণ-সম্ভূত) অনিত্য—এইকথা যদি প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে দেখা যায় তাহা হইলে দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। এই অনিত্যদর্শনই বিশুদ্ধির মার্গ।

সকল দ্রব্যই অনিত্য, সতত পরিবর্তনশীল। মানুষ, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষ-গুল্ম, লতাপাতা, তৃণ, স্থাবর, জঙ্গম, জড়চেতন সমস্ত পদার্থই প্রতিক্ষণে পরিবর্তিত হইয়া একদিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। প্রতিক্ষণের পরিবর্তন আমরা বুঝিতে পারিনা। কিন্তু পরিবর্তন হইয়াই চলিয়াছে। কাণ্ট বলিয়াছেন—প্রতিদিনই নূতন সূর্য উদিত হইতেছে। গ্রীক দার্শনিক হেরা-ক্লিটাস (Heraclitus) বলিয়াছেন—'তুমি এই নদীর জলে দুইবার অবগাহন করিতে পারনা।' আমরা গঙ্গাস্নান করি। কিন্তু একই গঙ্গায় নিত্য স্নান করি এই কথা বলা ভুল। প্রতিমুহূর্তে গঙ্গার জল পরিবর্তিত হইয়া চলিয়াছে। অতএব প্রতিমুহূর্তে আমরা নূতন নূতন গঙ্গায় স্নান করি এই কথা বলাই যুক্তিসঙ্গত! শাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে ত্রিলোক অর্থাৎ কামলোক, রূপলোক ও অরূপলোক শরৎকালের মেঘের ন্যায় অনিত্য ‚জন্ম এবং মৃত্যু নৃত্যের তালের ন্যায় একটার পর একটা সংঘটিত হইয়াই চলিয়াছে।

আমরা যদি আমাদের জীবনধারাকে লক্ষ্য করি আমরা অনিত্যতার স্বরূপ জানিতে পারি। আমারের দেহে প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তন সাধিত হইতেছে। আমাদের অলক্ষ্যে দেহে বাল্য, যৌবন, বার্ধক্য ক্রমানুসারে সংঘটিত হইতেছে। দাঁত পক্ব হয়, স্খলিতও হয়। কেশ পক্ব হয়, কেশ স্খলিত হয়। গাত্রচর্ম ক্রমশঃ কুঞ্চিত হয়। দেহ জরাজর্জরিত হইয়া ক্রমশঃ অকর্মণ্য হইয়া যায়। এই বাস্তবতা কোন প্রমাণের অপেক্ষা রাখেনা। প্রতি বৎসরে যদি কেহ নিজের একটি করিয়া ফটো তুলিয়া রাখে তাহা হইলে দেখা যাইবে পাঁচ বৎসর পূর্বেকার 'আমি'র সঙ্গে বর্তমান 'আমি'র কত তফাত। ইহা হইতেই উপলব্ধি হইবে যে, আগামী পাঁচ বৎসর পরে এই

'আমি' আরও কত পরিবর্তিত হইবে। এই পরিবর্তন প্রাকৃতিক নিয়মেই সংঘটিত হইতেছে, কোন দৈববশে নহে। এই পরিবর্তনের অবসান হইবে ভঙ্গুর এই দেহ যখন নিষ্প্রাণ অবস্থায় ভূমিতে শায়িত হইবে। রূপের যেমন ঈদৃশ পরিবর্তন স্বাভাবিকভাবেই হইয়া থাকে, নামেরও (অর্থাৎ চিত্ত-চৈতসিকেরও) তাদৃশ পরিবর্তন প্রতিক্ষণে হইয়া থাকে। চিত্ত এই মুহূর্তে এখানে থাকিলে অন্য মুহূর্তে অন্যস্থানে। মুহূর্তে মুহূর্তে চিত্তের পরিবর্তন হইয়া থাকে। কোন মুহূর্তের চিত্তই নিত্য নহে। তদ্রূপ চৈতসিক। এক এক ক্ষণে এক এক চৈতসিক উৎপন্ন হয়। এই মুহূর্তে যদি আমরা সুখী হই, অন্য মুহূর্তে দুঃখী। শৈশবে আমরা কদাচিৎ কিছু বুঝিতে পারি, কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমরা অনেক কিছু বুঝিতে শিখি। অনেক কিছু জানি, বুঝি ও শিখি। আবার বার্ধক্যে আমাদের বোধশক্তি কমিতে থাকে এবং ক্রমশঃ আবার সেই শিশুদের মত অবস্থা আসে, বৃদ্ধ আর শিশুতে তখন আর কোন তফাত থাকে না। শিশু চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করে, কিন্তু ঠিক বুঝিতে পারে না। কর্ণ দ্বারা শব্দ শ্রবণ করে, ঠিক বুঝিতে পারে না। বৃদ্ধ চক্ষু থাকিলেও ঠিক দেখিতে পায় না, কর্ণ থাকিলেও ঠিক শুনিতে পায় না। ঠিক ঠিক না দেখিলে কি করিয়া বুঝিবে? ঠিক ঠিক না শুনিলে কি করিয়া বুঝিবে? অতএব, বোধশক্তির দিক বিচার করিলে বৃদ্ধ ও শিশু সমপর্যায়ের। অতএব সমস্তই অনিত্য। মানুষের ক্ষেত্রে ইহা যেমন সত্য, আমাদের চতুর্দিকে দৃশ্যমান যাহা কিছু আছে, প্রত্যেকটি বস্তুর ক্ষেত্রে তাহা তেমনই সত্য। অর্থাৎ সর্বম্ অনিত্যম্। কোন কিছু দীর্ঘস্থায়ী হয় না—কোন দ্রব্য, ঘর-বাড়ী, মঠ-মন্দির, প্রাসাদ-অট্টালিকা, পাহাড়-পর্বত, নদী-সমুদ্র কিছুই চিরস্থায়ী নহে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পাহাড় সমুদ্রে পরিণত হইয়াছে, সমুদ্র পাহাড়ে পরিণত হইয়াছে—এই ঘটনা বিরল নহে, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য বহন করে। প্রাকৃতিক যাহা কিছু আমরা দেখিনা কেন একদিন সমস্ত কিছু বিলীন হইয়া যাইবে। আমরা সৌরশক্তিকে চিরস্থায়ী মনে করি, কিন্তু ইহাও একদিন ধ্বংস হইয়া যাইবে।

প্রকৃতির এই যে নিয়ম অর্থাৎ নিয়ত পরিবর্তনশীলতা ও অনিত্যতা ইহার ব্যতিক্রম কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না—কি ব্যক্তিতে, কি সমষ্টিতে, কি ভিতরে, কি বাহিরে, আমাদের অগোচরে নিয়ত পরিবর্তন সাধিত হইতেছে এবং

দৈনন্দিন জীবনে ইহার প্রভাব হইতেও কেহ মুক্ত নহে। আত্মীয় পরিজন বন্ধু-বান্ধব প্রতিবেশী সকলের ক্ষেত্রেই এই অনিত্যতার নিয়ম প্রয়োজ্য। দৈনন্দিন জীবনে দেখা যায় যে, মিত্র শত্রু হইতেছে, শত্রু মিত্র হইতেছে। শত্রু পরমাত্মীয় হইতেছে, আবার পরমাত্মীয় শত্রুতে পরিণত হইতেছে। প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা, স্নেহ-মমতা কিছুই একই রকম থাকিতেছেনা। দীর্ঘকাল পরম সুখে সহাবস্থান করিয়াও দেখা যায় স্বামী স্ত্রী একে অন্যের শত্রুতে পরিণত হইতেছে। একদিন যে সন্তান মাতাপিতার অপার স্নেহ-মমতা পাইয়াছে, সে হঠাৎ তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে পারে। দেব-দেবীতুল্য মাতাপিতা একদিন পরম শত্রুতে পরিণত হইতে পারে। সর্বম্ অনিত্যম্। ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন বস্তুর ক্ষেত্রেও তদ্রূপ। আমার প্রিয় বাড়ী গাড়ী, জামা-কাপড় সমস্ত কিছু হইতে আমার বিচ্ছেদ হইতে পারে। কারণ ঐ সকল বস্তু নিয়ত পরিবর্তনশীল। একদিন সেইগুলি ধ্বংস হইয়া যাইবে। অতএব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, জীবনের সর্বস্তরে, যাহা কিছুর সংস্পর্শে আমরা আসি, জড় এবং চেতন, সমস্ত কিছুই অনিত্য।

অনিত্যবোধের অভাবেই ব্যক্তিগত জীবনে, সমষ্টিগত জীবনে সমাজে, রাষ্ট্রে এত অসন্তোষ, কলহ-বিবাদ, বিচ্ছেদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হইতেছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে মধুর সম্পর্ক তাহা একদিন তিক্ততায় পরিণত হইতে পারে যদি অনিত্যতা সম্বন্ধে বোধ না জাগে। অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়মে স্বামী বা স্ত্রীর স্বভাবে, চরিত্রে, রুচিতে, ব্যবহারে পরিবর্তন আসিতে পারে, আসাটাই স্বাভাবিক। বিশ বৎসর পূর্বে স্বামী বা স্ত্রীর যে স্বভাব, যে চরিত্র, যে রুচি, যে ব্যবহার ছিল এখন তাহার মধ্যে পরিবর্তন আসিতে পারে। এই পরিবর্তনের জন্য পরস্পরের মধ্যে সংঘাত এবং ভুল বুঝাবুঝি হওয়া স্বাভাবিক। যাঁহারা অনিত্যতার নিয়ম স্বীকার করিবেন তাঁহারা পরিবর্তনকে সহজেই মানিয়া লইবেন—তাহা হইলে আর সংঘাত বা বিচ্ছেদের সম্ভাবনা থাকিবেনা। কিন্তু যাঁহারা অনিত্যতার নিয়ম স্বীকার করিবে না তাঁহারা ক্রম-পরিবর্তনকে মানিয়া লইতে পারিবেন না—অতএব, সংঘাত, কলহ-বিবাদ, অসন্তোষ, বিচ্ছেদ অনিবার্যরূপে সংঘটিত হইবে। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের ক্ষেত্রে এই অনিত্যতার নিয়ম প্রযোজ্য। ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, কেরাণী সাহিত্যিক, চিত্রশিল্পী, কারুশিল্পী,

তন্তুবায়, স্বর্ণকায় ইত্যাদি সর্বস্তরের মানুষ যদি নিয়ত পরিবর্তনশীলতার সহিত তাল রক্ষা করিয়া নিজ নিজ পেশার মধ্যে সময়োপযোগী পরিবর্তন আনয়ন করিতে পারেন, তাহা হইলে নিজেরও কল্যাণ, পরোক্ষভাবে সমাজের ও দেশের কল্যাণ সাধিত হয়।

যাঁহারা দুঃখমুক্তির জন্য সাধনা করেন, ধ্যানাভ্যাস করেন তাঁহাদের ক্ষেত্রে এই অনিত্যদর্শন খুবই ফলপ্রসূ। অনিত্যতাবোধ রাগ-দ্বেষের সংযমের পক্ষে সহায়ক। ইহার দ্বারা সাধনায় উৎসাহ পাওয়া যায়। জড় চেতন বস্তুর বাস্তব সত্তাকে জানিবার ক্ষেত্রে ইহা অত্যন্ত সহায়ক।

যিনি ধর্মানুশীলনকারী অর্থাৎ সাধনমার্গের পথিক মরণানুস্মৃতি তাঁহার নিকট বন্ধু এবং শিক্ষকের মত সহায়ক। এই মরণানুস্মৃতি ভাবনা রাগদ্বেষেরও পরিপন্থী অর্থাৎ 'মৃত্যু ধ্রুব' জানিলে লোভ, দ্বেষ, মোহ কমিয়া আসা স্বাভাবিক। 'কো জানে মরণং সুবে' অর্থাৎ আগামী কল্যই আমার মৃত্যু হইবেনা এইকথা কে বলিতে পারে?—ঈদৃশ মৃত্যু চিন্তা মানুষকে পাপকর্ম হইতে সংযত করে। কলহ-বিবাদ, সামান্য কারণে অসন্তোষ, শত্রুতা, আকাঙ্ক্ষা, তৃষ্ণা ইত্যাদি মৃত্যু-ভাবনার দ্বারা প্রশমিত হহতে পারে। বৌদ্ধধর্মের সুরু হইতেই ইহার প্রচারকগণ প্রকৃত ধর্মানুশীলনকারীদের মৃত্যু-ভাবনার উপদেশ দিয়াছেন। কবির ভাষায়—

"জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে?
চির স্থির কবে নীর হায় রে জীবন নদে?"

বাস্তবিক যদি মানুষ চিন্তা করিতে পারে যে সে প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হইতেছে তাহা হইলে তাহার মনে হইবে দারা-পুত্র-পরিবার, ধন, যৌবন, ঐশ্বর্য প্রতিপত্তি সমস্তই অনিত্য, মিথ্যা, মায়া—অতএব ইহাদের প্রতি আসক্তি করিয়া লাভ কি? তাই কবি দার্শনিকগণ বলিয়াছেন—

"মা কুরু ধন-জন-যৌবনগর্বম্
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্বম্।"

—অর্থাৎ ধন, জন, যৌবনের গর্ব করিও না। কাল (মৃত্যু) একসময় সমস্তই হরণ করিবে।

জগতে মৃত্যু হইতে কেহ অব্যাহতি লাভ করে নাই, করিবেও না। এমন কি কোন মহাপুরুষও ইহা হইতে মুক্তি লাভ করেন নাই। রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ,

যীশু মহম্মদ—কেহই মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন নাই। অতএব, মৃত্যুই অনিত্য দর্শনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

অঙ্গুত্তরনিকায়ে (৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১০০—) বুদ্ধ বলিয়াছেন—

"হে ভিক্ষুগণ, এখন হইতে লক্ষাধিক বৎসর পরে এমন সময় আসিতে পারে যখন বৃষ্টিপাত হইবে না, ফলতঃ সমস্ত গাছপালা লতাপাতা তৃণশস্য শুষ্ক হইয়া ধ্বংস হইয়া যাইবে। দ্বিতীয় সূর্যের প্রখর উত্তাপে ছোট ছোট স্রোতস্বিনী নদী জলপ্রপাত, শুষ্ক হইয়া যাইবে। তৃতীয় সূর্যের উদয়ে গঙ্গা-যমুনাদি বড় বড় নদী শুষ্ক হইয়া যাইবে। বড় বড় হ্রদ, সমুদ্র, মহাসমুদ্র শুষ্ক হইয়া যাইবে। সুমেরু পর্বত হইতে আরম্ভ করিয়া বিশাল পৃথিবী জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরিতে পরিণত হইয়া দগ্ধীভূত হইবে।...অতএব, হে ভিক্ষুগণ. কিছুই চিরস্থায়ী নহে। সংস্কারসমূহ অনিত্য, অধ্রুব, অসুখ জানিয়া ইহাতে বিরাগ উৎপাদনই উচিত, উহা হইতে বিবিক্ত ও বিমুক্ত হওয়াই উচিত।" অতএব, যাহা কিছু উৎপন্ন হয় তাহার বিনাশ অনিবার্য। আপাতদৃষ্টিতে কোন কিছুকে স্থায়ী মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহাও উদয়-বিলয়শীল। সমস্ত কিছুই প্রতীত্যসমুৎপন্ন অর্থাৎ কার্যকারণ শৃঙ্খলার দ্বারা যুক্ত। কারণ ব্যাতিরেকে কার্য হয় না। কিন্তু কোন কারণই (=হেতুই) নিত্য নহে, শাশ্বত নহে, বীজবৃক্ষাদির ন্যায় অনন্ত ভবসন্ততির নিয়মে আবদ্ধ। বীজ আগে না বৃক্ষ আগে ইহা যেমন নির্ণয় করা দুষ্কর, তদ্রূপ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরও আদি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, ভবচক্রেরও আদি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তবে ইহা জানা যায় যে, অনিত্যতার সূত্র স্বীকার করিলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্ত আছে ভবচক্রেরও অন্ত আছে। কারণ হেতুপ্রভব সমস্ত কিছুই অনিত্য। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হেতুপ্রভব, অতএব ইহা অনিত্য, বিপরিণামধর্মী। সংযুক্তনিকায়ে (২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৯) বলা হইয়াছে—'যং ভূতং তং নিরোধধম্মং'—যাহা উৎপন্ন হইয়াছে তাহা নিরোধধর্মী। এই নীতি মহাব্রহ্মার ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র প্রাণীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এই নীতিকে ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া অধ্যাপক Rhys Davids বলিয়াছেন: দেবলোক এবং মনুষ্যলোকে যাহা কিছু আছে, কোন ব্যক্তি বা বস্তু, সমস্তই অধ্রুব ক্ষণস্থায়ী এবং ভঙ্গুর অর্থাৎ বিনাশশীল। প্রাণিভেদে স্থায়িত্বের তারতম্য। দেবলোকে মহাব্রহ্মার আয়ুষ্কাল এক লক্ষ বৎসর হইতে পারে। কিন্তু একটি কীটের আয়ুষ্কাল হইতে পারে মাত্র

কয়েক ঘণ্টা। কোন দ্রব্য বিশেষতঃ রাসায়নিক দ্রব্যের স্থায়িত্ব হইতে পারে মাত্র কয়েক সেকেণ্ড কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে দেখা যায় যে উৎপন্ন হইলে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী (উপ্পজ্জিত্বা নিরুজ্ঝন্তি)। দীঘনিকায়ের মহাসুদস্সন সুত্রে অনিত্যপ্রসঙ্গে বলিতে যাইয়া ভগবান আনন্দকে বহু অতীতকালের কুশাবতী (বর্তমান কুশীনগর) নগরের উদাহরণ দিয়াছেন। ভগবান গৌতম বুদ্ধ কুশীনগরে মল্লদিগের শালবনে যুগ্মশালতরুর মধ্যবর্তী পাদদেশে মহাপরিনির্বাণশয্যায় অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার নিত্যসহচর ভিক্ষু আনন্দ আসিয়া ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক বলিলেন—"ভন্তে ভগবন্ এই ক্ষুদ্র জঙ্গলাকীর্ণ শাখানগরে পরিনির্বাপিত হইবেন না। ভন্তে, অন্য বহু নগর আছে, যথা—চম্পা, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, সাকেত (=অযোধ্যা) কৌশাম্বী, বারাণসী—ইহাদের মধ্যে যে কোন স্থানে ভগবান্ পরিনির্বাপিত হউন। এই সকল স্থানে বহু মহাক্ষত্রিয় (যাঁহাদের প্রত্যেকে কোটি শতসহস্র ধনের মালিক), মহাব্রাহ্মণ (যাঁহাদের প্রত্যেকে অশীতি কোটি ধনের মালিক) এবং মহাগৃহপতি (যাঁহাদের প্রত্যেকে চল্লিশ কোটি ধনের মালিক) আছেন যাঁহারা তথাগতের প্রতি অতি প্রসন্ন, যাঁহারা তথাগতের শরীর পূজা করিবেন।" ইহা শুনিয়া ভগবান বলিলেন—

"হে আনন্দ, এরূপ বলিও না। হে আনন্দ, এরূপ বলিও না যে এই নগর ক্ষুদ্র, জঙ্গলাকীর্ণ ও শাখানগর মাত্র"—এই বলিয়া তিনি প্রাচীন কুশাবতী নগরের বর্ণনা দিলেন যেখানে মহাসুদর্শন নামক প্রতিপত্তিশালী চক্রবর্তী রাজা রাজত্ব করিতেন। সমৃদ্ধিশালী নগরী কুশাবতী ছিল তাঁহার রাজধানী। তাঁহার ছিল অনন্ত ধনধান্য, অনন্ত বৈভব। চতুরঙ্গিনী সেনা, সপ্তরত্ন যদ্দ্বারা তিনি সসাগরা পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন।...কিন্তু এখন কুশাবতী নগর বর্তমান অবস্থায় পর্যবসিত হইয়াছে। অতীতের কুশাবতীর সকল বস্তু অতীত, নিরুদ্ধ, বিপরিণত। অতএব সর্বসংস্কার অনিত্য, অধ্রুব, অবিশ্বাস্য। সর্বসংস্কারে বিরাগ উৎপাদনই বিধেয়, উহা হইতে বিবিক্ত ও বিমুক্ত হওয়াই উচিত।

রাজা মহাসুদর্শনের কাহিনী শেষে ভগবান বলিলেন—"হে আনন্দ, আমি স্মরণ করিতেছি যে, এইস্থানে আমি ছয়বার দেহত্যাগ করিয়াছিলাম। যখন এইস্থানে আমি ধর্মপরায়ণ রাজচক্রবর্তী, ধর্মরাজ, চতুরন্তবিজেতা, সপ্তরত্নসমন্বিত হইয়া বাস করিয়াছিলাম, সেই সময়েই আমার সপ্তমবার

দেহত্যাগ হইয়াছিল। আনন্দ, দেবলোক সহ পৃথিবীতে, মারলোকে, ব্রহ্মলোকে, শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেব ও মনুষ্যমধ্যে এমন কোন স্থানই দেখিতেছি না যেখানে আমি অষ্টমবার দেহত্যাগ করিব।"—এই বলিয়া তিনি গাথায় কহিলেন—

"অনিচ্চা বত সংখারা, উপ্পাদবয়ধম্মিনো।
উপ্পজ্জিত্বা নিরুজ্ঝন্তি তেসং বূপসমো সুখো" তি।

—সংস্কারসমূহ অনিত্য, উৎপত্তি ও বিনাশশীল। উৎপন্ন হইয়া তাহারা নিরুদ্ধ হয়। তাহাদের উপশমই সুখ।

হেতুপ্রভব সমস্ত সংস্কৃত ধর্ম (ব্যক্তি এবং বস্তু, জড় এবং চেতন) অনিত্য, অধ্রুব, বিনাশশীল ইহা আবিষ্কার করিতে যাইয়া বুদ্ধ মানবজীবনের রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। তাহার মতে মানবজীবন পঞ্চস্কন্ধ লইয়া গঠিত, যথা, রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান। দীর্ঘ ৪৫ বৎসর ধরিয়া বুদ্ধ যে ধর্মোপদেশ দিয়াছেন তাহার মূলকথা হইল এই যে, যে পঞ্চস্কন্ধ লইয়া মানবজীবন গঠিত তাহা অনিত্য, অধ্রুব। দীর্ঘনিকায়ের মহাসতি-পট্‌ঠান সূত্রে তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, এই পঞ্চস্কন্ধ সমুদয়ধর্মী এবং ব্যয়ধর্মী অর্থাৎ উৎপন্ন হইয়া বিনষ্ট হয়। রূপ অনিত্য, উৎপন্ন হইয়া বিনষ্ট হয়। বেদনা অনিত্য, উৎপন্ন হইয়া বিনষ্ট হয়। সংজ্ঞা অনিত্য, উৎপন্ন হইয়া বিনষ্ট হয়। সংস্কার অনিত্য, উৎপন্ন হইয়া বিনষ্ট হয়। বিজ্ঞান অনিত্য, উৎপন্ন হইয়া বিনষ্ট হয়। তথাগত বুদ্ধের অন্তিম বচনও হইতেছে অনিত্যবিষয়ক। কুশীনগরে মহাপরিনির্বাণ শয্যায় শয়ন করিয়া মহাপরিনির্বাণের পূর্বক্ষণে তিনি তাঁহার যে অন্তিম উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা হইল এই—

"হন্দ দানি ভিক্‌খবে, আমন্তয়ামি বো, বয়ধম্মা সংখারা, অপ্পমাদেন সম্পাদেথ"—ভিক্ষুগণ, তোমাদিগকে এখন সম্বোধন করিয়া বলিতেছি যে, সংস্কারসমূহ ক্ষয়শীল (অনিত্য); অপ্রমাদের (জ্ঞানযুক্ত সম্যক্ স্মৃতির) সহিত সর্বকর্ম সম্পাদন করিবে।

অধ্যায় ছয়

অনাত্মবাদ

মানব সভ্যতার সুরু হইতেই মানুষ চিন্তা করিতে সুরু করিয়াছে মৃত্যুর পর কিছু থাকে কি? মানুষ উত্তর পাইয়াছে যে, মৃত্যুতেই সব শেষ নহে, মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম আছে। তখন জিজ্ঞাসা সুরু হইল—কে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে? উত্তর হইল—আত্মা। এই অনিত্য পঞ্চস্কন্ধময় দেহের মধ্যে এমন কি আছে যাহাকে বলা হয় জ্ঞাতা, ভোক্তা, দ্রষ্টা, শ্রোতা ইত্যাদি? উত্তর হইল—আত্মা। যাহাকে আমরা মন বলি তাহার পরিচালক কে? উত্তর হইল—আত্মা। দেহ ও মনের একমাত্র কর্তা হইতেছে এই আত্মা। গীতায় বলা হইয়াছে এই আত্মা অবিনশ্বর, ইহা অক্ষয়, অব্যয় এবং নিত্য। দেহী মৃত্যুর পরে জীর্ণবস্ত্র ত্যাগের ন্যায় জীর্ণ দেহকে পরিত্যাগ করিয়া নূতন কলেবর ধারণ করে। এই দেহীকেই বলা হইয়াছে আত্মা যাহা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য এবং সনাতন।[১] গীতার ন্যায় অনেক ধর্মমতেও আত্মার অস্তিত্ব এবং নিত্যত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। ভগবান গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবকালেও এই মতবাদ ভারতবর্ষে দৃঢ়মূল।

প্রাচীন বৈদিক ঋষিরাও আত্মা সম্বন্ধে ধারণা করিয়াছেন যাহা পরবর্তীকালে উপনিষদের যুগে বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। আত্মা শব্দের মূল সংস্কৃত প্রতিশব্দ হইতেছে 'আত্মন্' যাহাকে পালিতে বলা হইয়াছে 'অত্তা'। অবশ্য 'আত্মা' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নির্ণয় করা কঠিন। আত্মাকে কখনও বা বলা হইয়াছে প্রাণবায়ু বা প্রাণ, কখনও বা বলা হইয়াছে সত্তা, জীব, ব্যক্তি, পুদ্গল ইত্যাদি। তাই বলা হইয়াছে যে, স্থাবর এবং জঙ্গম সমস্ত কিছুর আত্মা হইতেছে সূর্য এবং যজ্ঞের আত্মা হইতেছে সোমরস। আত্মা দেহে প্রবেশ করে এবং দেহ হইতে নির্গত হয়। মনকে ইহার প্রতিশব্দ বলা হইয়াছে।[২]

প্রাচীন ভারতীয় ধর্মে ব্রহ্মন্‌কে সর্বেশ্বর বলা হইয়াছে এবং তিনিই সৃষ্টির প্রথম কারণ অর্থাৎ একমাত্র সৃষ্টিকর্তারূপে পরিগণিত হইয়াছেন। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে এই ব্রহ্মের অংশ রহিয়াছে। ইহাকেই বলা হইয়াছে আত্মা। ব্রহ্মন্ এবং আত্মন্ একই এবং একই উপাদানে গঠিত। মুক্তির অপর নাম হইতেছে এই ব্রহ্মের সহিত আত্মার মিলন অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত

একাত্ম হইয়া যাওয়া। এই আত্মা শাশ্বত এবং অপরিবর্তনীয়। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আত্মা সম্বন্ধে অনেক মতবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে। পালি দীঘনিকায়ের ব্রহ্মজালসুত্তে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়।[৩] কোন কোন মতবাদে বলা হইয়াছে—আত্মা এবং বিশ্ব শাশ্বত (=শাশ্বতবাদ)। অপর কেহ বলিয়াছেন ইহারা আংশিক শাশ্বত এবং আংশিক অশাশ্বত। কেহ কেহ ছিলেন অমরাবিক্ষেপিক (অর্থাৎ পাঁকাল মাছের মত)—আত্মা এবং সৃষ্টি সম্বন্ধে সঠিক উত্তর দিতেন না। অন্য কেহ বিশ্বাস করিতেন যে আত্মা এবং সৃষ্টি অকারণসম্ভূত (=অধীত্যসমুৎপন্ন)। কেহ কেহ বলিতেন—মৃত্যুর পর আত্মা থাকে এবং সচেতন থাকে। অপর কেহ বলিতেন—আত্মা থাকে, তবে অচেতন অবস্থায় থাকে। কেহ বা বিশ্বাস করিতেন যে, মৃত্যুর পর আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না (=উচ্ছেদবাদ)। এই উচ্ছেদ কখনও বা মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই হইয়া থাকে, কখনও বা কামলোকে, কখনও বা রূপলোকে, কখনও বা অরূপলোকে এই দিব্য আত্মার উচ্ছেদ হইয়া থাকে। এইভাবে আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বহু মতবাদ ভারতবর্ষে প্রাক্‌বৌদ্ধযুগে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল।

ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারা পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে উপনিষদের যুগেই আত্মবাদ বিশেষ একটি রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। উপনিষদসমূহে আত্মার বহু বর্ণনা পরিলক্ষিত হয়। ইহাতে বলা হইয়াছে যে প্রত্যেকের মধ্যে আত্মা বিদ্যমান। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে এই আত্মা কোথায় অবস্থিত থাকে। ছান্দোগ্য উপনিষদে[৪] আত্মাকে অমর (=বিমৃত্যু), শোকহীন (=বিশোক) এবং সত্যসংকল্পযুক্ত বলা হইয়াছে। কখনও বা রূপকায় (যাহা জলপূর্ণ পাত্রে প্রতিবিম্বিত হয়) এবং আত্মাকে অভিন্ন কল্পনা করা হইয়াছে। কখনও বা আত্মাকে স্বপ্নাবস্থায় এবং সুষুপ্তিতে দৃষ্ট আত্মার সহিত তুলনা করা হইয়াছে।[৫] মৃত্যুর পর আত্মা রূপ গ্রহণ করে, কারণ ইহা নিজের রূপেই প্রতিভাত হয় এবং ইহা সর্বদাই নিষ্কলঙ্ক, শুদ্ধ এবং নীরোগ। এই আত্মা আকারে অঙ্গুষ্ঠবৎ এবং ইহা হৃদয়রূপ গুহায় অবস্থান করে। "অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ।" নিদ্রাকালে এই আত্মা হৃদয় হইতে সঞ্চারিত ১০১টি ধমনীর যে কোন একটির মধ্য দিয়া দেহ হইতে বহির্গত হইতে পারে। মস্তকের যে কোন একটি রন্ধ্র দিয়া ইহা অমরত্ব লাভ করিতে পারে।[৬] কোন কোন উপনিষদের মতে[৭] দেহ হইতে

আত্মাকে পৃথক করা যায়, যেমন কোশ হইতে তরবারিকে নিষ্কাসিত করা যায়। এইভাবে আত্মা যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতে পারে, বিশেষতঃ নিদ্রাকালে। অন্য কোন মতবাদ অনুসারে আত্মাকে দৈহিক বা আধ্যাত্মিক কোন ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। কাহারও বা মতে আত্মার অস্তিত্ব আছে, কিন্তু ইহা অদৃশ্য। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার "নেতি নেতি" মতবাদের দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, পরমাত্মন্ (পরমব্রহ্মন্) হইতেছেন অজ্ঞেয়, কারণ তিনি সর্বব্যাপক একটি শক্তি, অদ্বৈত শক্তি। কিন্তু জ্ঞান সীমিত, যেহেতু ইহা subject এবং object-এর দ্বৈততা স্বীকার করে। ব্যক্তিগত আত্মাও অজ্ঞেয়, কারণ সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে এই আত্মা হইতেছে স্বয়ং জ্ঞান, সুতরাং ইহা জ্ঞেয় হইতে পারে না। কিন্তু উপনিষদের যুগে অপর কেহ কেহ চিন্তা করিয়াছেন যে, জ্ঞানের সর্বপ্রকার উপায়ের দ্বারা আত্মাকে জানা যায়।[৮] বহু শতাব্দী পরে শংকরাচার্যও বলিয়াছেন যে, আত্মাকে যুক্তি ও তর্কের দ্বারা জানা যায়। তবে মধ্যযুগীয় এবং পরবর্তীকালের উপনিষদসমূহ যাজ্ঞবল্ক্যকেই সমর্থন করিয়াছে। আত্মা প্রত্যক্ষভাবে দ্রষ্টব্য, তবে মাংসচক্ষুর দ্বারা নহে। শাস্ত্রীয় অনুশাসনের দ্বারাও ইহা প্রাপ্তব্য নহে।[৯] আবার মৈত্রী উপনিষদের মতে আত্মা যুক্তিগ্রাহ্য নহে, কারণ ইহা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বলিয়া অচিন্ত্যনীয় এবং বুদ্ধিগ্রাহ্য নহে।[১০] সর্ববস্তুতে নিহিত এই আত্মার কোন প্রকাশ নাই। ইহা সূক্ষ্ম, জাগ্রত এবং বিশুদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা দ্রষ্টব্য, কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দ্রষ্টব্য নহে, কারণ ইহা ইন্দ্রিয়াতীত।[১১]

ছান্দোগ্য উপনিষদের মতে আত্মাকে কোন ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। শুধু বলা যাইতে পারে যে, ইহা "সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম, বৃহৎ হইতে বৃহত্তম।" যাহা সূক্ষ্মতম তাহাই এই নিখিল বিশ্বের আত্মা। ইহাই সত্য। ইহাই আত্মা। সে-ই তুমি (তৎ ত্বম্ অসি)।[১২]

বেদ, ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদ ব্যতিরেকেও বুদ্ধের সমকালীন ভারতবর্ষে অনেক দার্শনিকের অভ্যুদয় হইয়াছিল যাঁহারা আত্মা সম্বন্ধে নিজ নিজ মতবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে, প্রধান হইতেছেন জৈন এবং আজীবিকগণ। জৈনদের মতে জীব (যাহাকে জীবন বলা হইয়াছে) হইতেছে সসীম এবং আকার ও ওজন হিসাবে ইহা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে স্বতন্ত্র হইয়া থাকে। তাঁহাদের মতে শুধু মানুষের নয়, বিশ্বের সর্বভূতের মধ্যেই আত্মা

বর্তমান। জৈনধর্মের জনৈক প্রবর্তক মহাবীরকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল দেহ এবং আত্মা এক না পৃথক্। উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন[১৩] যে, দেহ এবং আত্মা একও বটে, আবার পৃথক্‌ও বটে। অর্থাৎ একদিকে বিচার করিলে ইহারা এক, অন্যদিকে বিচার করিলে ইহারা পৃথক্। জৈনদের মতে আত্মা সর্বজ্ঞ, কিন্তু ইহা কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ। অতীত কর্মের নিরবশেষ ক্ষয়ের দ্বারা কর্মপ্রবাহ নিঃশেষিত হয়, আত্মা তখন স্বমহিমায় দীপ্যমান হয়। কোন কোন আজীবিক সন্ন্যাসী মনে করিতেন যে, আত্মা হইতেছে অষ্ট কোণ সম্পন্ন বা গোলাকার এবং ইহার বিস্তৃতি পঞ্চশত যোজন। ইহা নীলাভ।[১৪] সাংখ্যরা একদিকে আত্মার নানাত্ম স্বীকার করিয়াছেন, অন্যদিকে বলিয়াছেন, আত্মা এক, অবিনশ্বর এবং সর্বব্যাপক।

গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবকালে উপরিউক্ত মতবাদগুলির মধ্যে কতগুলি বর্তমান ছিল তাহা নিশ্চয়ই করিয়া বলা কঠিন। বুদ্ধ নিজেকে সর্বজ্ঞ বলিয়া জাহির করেন নাই। তবে তিনি বলিতেন যে যথাভূতজ্ঞানের দর্শন অর্থাৎ সত্য দর্শন তাঁহার হইয়াছে। তিনি কোথাও ব্রহ্মন্‌কে একমাত্র সত্য বা আত্মন্ ও ব্রহ্মন্ এক—এই কথা বলিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ নাই। পালি সুত্তপিটকে যে ব্রহ্মার কথা জানা যায়, তিনি হইতেছেন একটি দেবলোকের অধিপতি এবং অন্যান্য সত্ত্বের ন্যায় তাঁহারও জন্ম এবং পুনর্জন্ম আছে। এই ব্রহ্মার সহিত উপনিষদীয় আত্মার কোন সম্পর্ক নাই। তবে একথা সত্য যে শাশ্বত আত্মা সম্বন্ধে যত মতবাদ ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, বুদ্ধ তাহার সকলকেই খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি স্বীকার করেন নাই যে, মানুষের মধ্যে আত্মা বলিয়া এমন পদার্থ আছে যাহা শাশ্বত এবং অপরিবর্তনীয়। আবার তিনি ইহাও স্বীকার করেন নাই যে, মৃত্যুতেই মানুষের সব শেষ। বুদ্ধের মতে মানুষ জন্মের দ্বারা দেবতা বা অতিমানব হইতে পারে না, তবে সৎকর্ম, সদ্বাক্য ও সৎচিন্তার অনুশীলনের দ্বারা মানুষ অতিমানবত্ব অর্জন করিতে পারে।

আত্মবাদের বিরুদ্ধে বুদ্ধ দুই প্রকার যুক্তি উপস্থাপিত করিয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি যে সকল উপাদানের দ্বারা মানবদেহ গঠিত তাহার প্রত্যেকটিকে (অর্থাৎ পঞ্চস্কন্ধকে) পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছেন যে তাহার কোনটির মধ্যে আত্মা নামক বস্তুর অস্তিত্ব নাই এবং কোনটির সঙ্গে তথাকথিত আত্মার তুলনা চলেনা, কারণ ইহাদের মধ্যে আত্মার

লক্ষণ নাই। তাই প্রশ্ন হইয়াছে—এই দেহ অর্থাৎ রূপ নিত্য না অনিত্য? ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে ইহা অনিত্য। যাহা অনিত্য তাহা দুঃখদ না সুখদ? উত্তরে বলা হইয়াছে দুঃখদ। যাহা অনিত্য, দুঃখদ এবং পরিবর্তনশীল তাহাকে কি বলা যায় "ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার আত্মা?"—না, তাহা বলা যায় না।[১৫] বেদনা (= অনুভূতি), সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তদ্রূপ জানিতে হইবে।

ছান্দোগ্য উপনিষদে অনুরূপ একটি পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছে, তবে এই ক্ষেত্রে প্রশ্নকর্তার মনোভাব আলাদা। প্রজাপতি আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী কিন্তু রূপাদি পঞ্চস্কন্ধের কোনটার মধ্যে তিনি আত্মার সাদৃশ্য খুঁজিয়া না পাইয়া বলিয়াছেন যে আত্মা দেহের কোথাও আছে। কিন্তু বুদ্ধ আত্মার অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া আত্মার সংজ্ঞাকে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অন্বেষণ করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, আত্মার অস্তিত্ব নাই। কারণ ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই।

বুদ্ধের দ্বিতীয় যুক্তি হইতেছে এই যে, শাশ্বত আত্মা স্বীকার করিলে নৈতিক জীবনের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করিতে হয়। বুদ্ধত্বলাভের তিনমাস পরে সারনাথে বুদ্ধ পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদের নিকট ধর্মচক্র প্রবর্তনকালে দেশনা করিয়াছেন যে চারি আর্যসত্যের (দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখের নিবৃত্তি এবং দুঃখ-নিবৃত্তির উপায়) উপরই তাঁহার ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি ঐ পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদের নিকটই "অনাত্মলক্ষণসূত্র" দেশনা করিয়া বলিয়াছেন যে, শাশ্বত আত্মা বলিয়া কিছুই নাই। তিনি বলেনঃ পঞ্চস্কন্ধ লইয়াই জীবদেহ গঠিত। এই পঞ্চস্কন্ধ হইতেছে—রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। রূপ আত্মা নহে। রূপ যদি আত্মা হইত তাহা হইলে ইহা দুঃখের অধীন হইত না। দেহী বলিতে পারিতেন—'আমার দেহ এইরূপ হউক, আমার দেহ এইরূপ না হউক।' কিন্তু এইরূপ ত হয় না। দেহ প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তিত হইতেছে, এবং দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন হইতেছে। অতএব দেহ বা রূপ আত্মা হইতে পারে না। ঠিক তদ্রূপ বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান নিয়ত পরিবর্তনশীল, অতএব দুঃখময়। অতএব সিদ্ধান্ত হইতেছে এই যে, অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের পঞ্চস্কন্ধ, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, উৎকৃষ্ট বা

নিকৃষ্ট, দূরস্থ বা নিকটস্থ সমস্ত পঞ্চস্কন্ধ সম্বন্ধে ইহাই জ্ঞাতব্য—"ইহা আমার নহে, ইহা আমি নহে এবং ইহা আমার আত্মা নহে।" ব্যক্তি ইহা উপলব্ধি করিতে পারিলে তিনি ঐগুলির প্রতি বীতরাগ হইতেন এবং তৃষ্ণামুক্ত হইয়া মুক্তিলাভ করিতেন। আত্মা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা হইতেই দুঃখের উৎপত্তি হয় এবং ব্যক্তি নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অপরের অনিষ্ট সাধন করে। মানুষ যদি বুঝিত যে শাশ্বত আত্মা বলিয়া কিছুই নাই, তাহা হইলে সে নিজের বাসনাকে চরিতার্থ করিবার জন্য ব্যাকুল হইত না।

রূপ-বেদনাদি পঞ্চস্কন্ধ চির অনিত্য। ইহা বর্তমানে যেমন কার্য-কারণ-নীতিজাত আমরা দেখিতে পাই, এ স্বভাব ইহার অতীতেও ছিল, ভবিষ্যতেও থাকিবে। যাহা অনিত্য তাহা দুঃখদায়ক, যাহা দুঃখদায়ক তাহা পরস্বভাব সুতরাং অনাত্মন্। যদি কেহ বলে—বেদনা আমার আত্মা, তাহা হইলে সে উদয়-ব্যয়-স্বভাবযুক্ত আত্মাকেই স্বীকার করিল। বেদনা সুখ, দুঃখ, অদুঃখ-অসুখভেদে ত্রিবিধ। যখন আমরা সুখবেদনা অনুভব করি, তখন অন্য দুই প্রকার বেদনার অনুভূতি হয় না। তদ্রূপ যখন দুঃখবেদনা অনুভব করি, তখন অপর দুই বেদনার অনুভূতি হয় না। আবার যখন অদুঃখ-অসুখ বেদনা অনুভব করি, তখন অন্য দুই প্রকার বেদনার অনুভূতি হয় না। প্রত্যেক বেদনা নিজকে সম্পূর্ণ পৃথগ্‌ভাবেই প্রকাশিত করে। যখন যে বেদনার উৎপত্তি হয় তাহাকে আমরা স্পষ্টতঃ জানি যে, এইরূপ বেদনা আমার উৎপন্ন হইয়াছে। আবার সেই বেদনা যখন নিরুদ্ধ হয়, তখনও আমরা স্পষ্টতঃ জানি যে এই বেদনা নিরুদ্ধ হইল। যদি বেদনা আত্মা হয়, তবে বলিতে হইবে যে আত্মা উদয়ব্যয়শীল। অতএব বেদনা অনাত্ম। সংজ্ঞা, সংস্কারাদিকে অনুরূপভাবে জানিতে হইবে, অর্থাৎ ইহারাও অনাত্ম।

ভগবান বুদ্ধ বুদ্ধত্বলাভের পরে সারনাথে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুর নিকট 'ধর্মচক্রপ্রবর্তনসূত্র' দেশনা করিয়া এক সপ্তাহের অভ্যন্তরেই আবার তাঁহাদের নিকট 'অনাত্মলক্ষণসূত্র' দেশনা করিয়াছিলেন। তাহার কারণ অনাত্ম সম্বন্ধে জ্ঞান উৎপন্ন না হইলে 'আমিত্ব' 'মমত্ব' 'নিত্যতা'দি ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হয়না এবং ঐ সকল ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত না হইলে চিত্ত আস্রবমুক্ত হইতে পারেনা। চিত্ত আস্রবমুক্ত না হইলে দুঃখমুক্তি বা নির্বাণ কি করিয়া সম্ভব? বুদ্ধোপদিষ্ট 'অনাত্মলক্ষণসূত্র' নিম্নরূপ :—

"অতঃপর ভগবান পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

'হে ভিক্ষুগণ! রূপ অনাত্মা, আত্মা নহে। যদি রূপ আত্মা হইত তবে তাহা পীড়ার কারণ হইত না এবং রূপে এইরূপ অধিকার লাভ করা যাইত— "আমার রূপ এইরূপ হউক" "আমার রূপ এইরূপ না হউক।" যেহেতু রূপ আত্মা নহে তদ্ধেতু রূপ পীড়ার কারণ হইয়া থাকে এবং "আমার রূপ এইরূপ হউক", "এইরূপ না হউক" এই অধিকার লাভ হয় না।

বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এইরূপ। 'হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর—রূপ নিত্য কিংবা অনিত্য?'

"অনিত্য।"

'যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ কিংবা সুখ?'

'দুঃখ।'

'যাহা অনিত্য ও বিপরিণামী (পরিবর্তনশীল) তাহা কি তোমরা এই-রূপ দেখিতে পার—"ইহা আমার", "ইহা আমি", "ইহাই আমার আত্মা?" 'না প্রভু। আমরা সেইরূপ দেখিতে পারি না।' বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এইরূপ। 'হে ভিক্ষুগণ! তদ্ধেতু যাহা কিছু রূপ (রূপনামধেয়) অতীত, অনাগত, প্রত্যুৎপন্ন বা বর্তমান, অধ্যাত্ম অথবা বাহ্য, স্থূল অথবা সূক্ষ্ম, হীন কিংবা উৎকৃষ্ট, যাহা দূরে অথবা নিকটে, এই যে সর্বরূপ তাহা আমার নহে, তাহা আমি নহি, তাহা আমার আত্মা নহে— বিষয়টি এইরূপে যথাযথভাবে সম্যক্ প্রজ্ঞা দ্বারা দেখিতে হইবে।"

বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এইরূপ। এইরূপে বিষয়টি দেখিলে শ্রুতবান্ আর্যশ্রাবক রূপে নির্বেদ প্রাপ্ত হয়, সংজ্ঞায় নির্বেদ প্রাপ্ত হয়, সংস্কারে নির্বেদ প্রাপ্ত হয় এবং বিজ্ঞানে নির্বেদ প্রাপ্ত হয়— নির্বেদহেতু বীতরাগ হয়, বীতরাগহেতু বিমুক্ত হয়, বিমুক্ত হইলে 'বিমুক্ত হইয়াছে' বলিয়া জ্ঞান হয়, 'জন্মবীজ ক্ষীণ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হইয়াছে, করণীয় কার্য কৃত হইয়াছে। অতঃপর অত্র আর পুনরাগমন হইবে না বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারে।"

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ তাহা প্রসন্নমনে শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইলেন। এই বিবৃতি উচ্চারিত হইলে অনাসক্তি-হেতু পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণের চিত্ত আস্রব হইতে বিমুক্ত হইল।[১৩]

[অনাত্মলক্ষণসূত্র সমাপ্ত]

এই প্রসঙ্গে ডঃ মললশেখর বলিতেছেন[১৭]—ইহা উপেক্ষণীয় নহে যে, পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ জ্ঞানের দিকে বুদ্ধের প্রায় সমকক্ষ হইলেও 'ধর্মচক্রপ্রবর্তন-সূত্রের' পরে 'অনাত্মলক্ষণসূত্র' বুদ্ধ কর্তৃক উপদিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তাঁহাদের কেহই—অর্হত্ত্ব বা বিমুক্তি লাভ করিতে সক্ষম হন নাই। কারণ 'আত্মা শাশ্বত অবিপরিণামধর্মী' এই ভ্রান্ত ধারণা আমাদের চিত্তে এতই দৃঢ়মূল যে, সমস্ত কিছুর নিত্য পরিবর্তনশীলতা এবং বিপরিণামধর্মিতা সম্বন্ধে জ্ঞান সহজে প্রতিষ্ঠিত হয় না। তাই ভগবান চারি আর্যসত্য সম্বন্ধে দেশনা করিয়া অনাত্মদর্শন সম্বন্ধে ধর্মদেশনা করাকে অপরিহার্য বলিয়া মনে করিয়াছেন। অতএব, দুঃখমুক্তি বা জন্মমৃত্যুর অতীত 'নির্বাণ' অবস্থাকে উপলব্ধি করিতে হইলে চারি আর্যসত্যের জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে 'জাগতিক ধর্ম-সমূহ অনাত্ম' এই বিষয়ে জ্ঞানলাভের আবশ্যকতা অপরিহার্য। তাই চারি আর্যসত্যের দেশনা এবং অনাত্ম-দেশনাকে বুদ্ধগণের সর্বোৎকৃষ্ট ধর্ম-দেশনা (বুদ্ধানং সমুক্কংসিকা ধম্মদেসনা) বলা হইয়াছে।

বৌদ্ধপণ্ডিত জ্ঞানতিলক যথার্থই বলিয়াছেন—"The Anattā doctrine teaches that neither within the bodily and mental phenomena of existence, nor outside of them, can be found anything that in the ultimate sense could be regarded as a self-existing real Ego-entity, soul or any other abiding substance. This is the central doctrine of Buddhism without understanding of which a real knowledge of Buddhism is altogether impossible. It is the only really specific Buddhist doctrine, with which the entire structure of the Buddhist teachings stands or falls. All the remaining Buddhist doctrines may, more or less, be found in other philosophic systems and religions, but the Anattā-Doctrine has been clearly and unreservedly taught only by the Buddha, wherefore the Buddha is known as the Anattā-Vādī, or teacher of Impersonality. Whosoever has not penetrated this impersonality of all existence, and does not comprehend that in reality there exists only this continually self-consuming process of arising

and passing bodily and mental phenomena and that there is no separate Ego-entity within or without this process, he will not be able to understand Buddhism, i.e.. the teaching of the 4 Noble truths in the right light. He will think that it is his Ego, his personality, that experiences the suffering, his personality that performs good and evil actions and will be reborn according to these actions, his personality that will enter into Nirvāṇa, his personality that walks on the Eightfold path."[১৮]

—অনাত্মদর্শনের মতে শরীর বা চিত্তস্তরে বা ইহাদের বাহিরে এমন কোন কিছুর অস্তিত্ব নাই যাহাকে পারমার্থিক দৃষ্টিতে স্বয়ং উৎপন্ন আত্মা বা, ঐজাতীয় কিছু বলা যাইতে পারে। ইহাই বৌদ্ধধর্মের মূল উপদেশ যাহা না বুঝিলে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা যায় না। ইহার উপরই বৌদ্ধ শিক্ষার প্রতিষ্ঠা বা অপ্রতিষ্ঠা নির্ভর করে। কারণ বৌদ্ধধর্মের অন্যান্য শিক্ষাগুলি অপরাপর দর্শন এবং ধর্মে পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু অনাত্ম-দর্শন স্পষ্টভাবে কেবল বুদ্ধের দ্বারাই প্রকাশিত হইয়াছে, যেইজন্য বুদ্ধকে বলা হয় অনাত্মবাদী। 'সর্বধর্ম অনাত্মা' এই বিষয় যাহার জ্ঞাত হয়নি তিনি জানিতে পারেন না যে, বস্তুতপক্ষে কায় ও চিত্তধারার অবিরাম উৎপত্তি ও বিলয় ব্যতীত অন্য কিছুর অস্তিত্ব কল্পনা করা বৃথা। এই সন্ততির অভ্যন্তরে বা বাহিরে স্বতন্ত্র কোন নিত্য-সত্তা নাই ইহা না বুঝিলে বৌদ্ধধর্মকে জানা যাইবে না অর্থাৎ যথার্থভাবে চারি আর্যসত্যকে জানা যাইবে না। আত্মাই সুখ-দুঃখ অনুভব করে, আত্মাই কুশলাকুশল কর্ম সম্পাদন করে, আত্মাই কর্মানুসারে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিবে, এবং আত্মাই অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করিয়া নির্বাণে প্রবেশ করিবে—ইত্যাদি ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইবে। তাই বিশুদ্ধিমার্গে আচার্য্য বুদ্ধঘোষ বলিয়াছেন ঃ

"দুক্খমেব হি, ন কোচি দুক্খিতো,
কারকো ন কিরিয়া ব বিজ্জতি।
অত্থি নিব্বুতি, ন নিব্বুতো পুমা,
মগ্গমত্থি, গমকো ন বিজ্জতি ॥"

অর্থাৎ —দুঃখই আছে, দুঃখিত কেহ নাই।
কারক বা কর্তা নাই, ক্রিয়াই আছে।
নির্ব্বাণ আছে, নিবৃত ব্যক্তি নাই।
মার্গ আছে, মার্গগামী কেহ নাই।

মহাপন্ডিত গ্রীকরাজ মিলিন্দের প্রশ্নে ও বিচিত্রবাদী মহাভিজ্ঞ স্থবির নাগসেনের উত্তরে ভগবান বুদ্ধের অনাত্মবাদ সম্বন্ধে স্পষ্ট একটা ধারণা করা যাইতে পারে :

মিলিন্দ—ভন্তে! আপনি কিরূপে জ্ঞাত হইয়া থাকেন? আপনার নাম কি?

নাগসেন—মহারাজ! আমাকে নাগসেন বলিয়া সম্বোধন করে। এই নাগসেন কিন্তু সংজ্ঞাপ্রকাশ ব্যবহার ও নামমাত্র, এখানে কোন ব্যক্তি বা অবয়বী উপলব্ধি হয় না।

মিলিন্দ—ভন্তে, যদি ব্যক্তি না থাকে, তবে কে আপনাকে চীবরাদি চতুর্প্রত্যয় দান করে, কে উপভোগ করে, কে ভাবনা অভ্যাস করে, কে মার্গ-ফল প্রত্যক্ষ করে, কে প্রাণীহত্যাদি পাপকর্ম সম্পাদন করে? তাহা হইলে কুশল নাই, অকুশল নাই, কুশলাকুশলের কর্তা নাই, কারয়িতা নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মের ফলও নাই। আপনাকে যদি কেহ হত্যা করে, তাহা হইলেও হত্যাকারীর কোন পাপ হইবে না। আপনার আচার্য নাই, উপাধ্যায় নাই, উপসম্পদাও নাই। আপনি যে বলিলেন লোকে আপনাকে 'নাগসেন' বলিয়া সম্বোধন করে, এখানে 'নাগসেন' কে? আপনার কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক্, মাংস নাগসেন কি?

নাগসেন—না, মহারাজ।

মিলিন্দ—আপনার, রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান কি নাগসেন?

নাগসেন—না, মহারাজ।

মিলিন্দ—তবে কি ভন্তে, রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান—এই পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টিরূপে নাগসেন?

নাগসেন—না, মহারাজ।

মিলিন্দ—ভন্তে, আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া নাগসেনকে পাইলাম

না। নাগসেন কি তবে শুধু শব্দই? বিদ্যমান নাগসেন কে তবে? আপনি মিথ্যা বলিয়াছেন। নাগসেন নাই।

নাগসেন—মহারাজ, আপনি ক্ষত্রিয়-কুমার, সুকোমল শরীর আপনার, মধ্যাহ্ন সময় এখন, ভূমি তপ্ত, উষ্ণ বালুকার উপর তীক্ষ্ম কংকর। পদব্রজে আসায় সম্ভবতঃ আপনার চরণ উপহত হইয়াছে, শরীরও বোধ হয় ক্লান্ত হইয়াছে?

মিলিন্দ—ভন্তে, আমি রথে করিয়া আসিয়াছি, আমার কিছুমাত্র ক্লান্তি হয় নাই।

নাগসেন—মহারাজ, যদি আপনি রথে করিয়া আসিয়া থাকেন, তবে রথ কি তাহা আমাকে বলুন। ঈশা কি রথ? অক্ষ, চক্র, পঞ্জর, দণ্ড, যুগ, রজ্জু, প্রতোদদণ্ড (=চাবুক) কি রথ?

মিলিন্দ—না ভন্তে।

নাগসেন—মহারাজ, আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া ক্লান্ত হইলাম, কিন্তু আপনি রথ কি বলিতে পারিলেন না। তবে রথ কি কেবল শব্দমাত্র? মহারাজ, আপনি মিথ্যা বলিয়াছেন। রথ নাই।

মিলিন্দ—ভন্তে, আমি মিথ্যা বলি নাই। ঈশা, অক্ষ, চক্র ইত্যাদির সমবায়ে সুসংবদ্ধতা হেতু রথ। ইহা সংজ্ঞামাত্র, ব্যবহারিক নাম মাত্র।

নাগসেন—সাধু, সাধু মহারাজ, রথ কি তাহা আপনি ভাল জানেন। ঠিক এইরূপই মহারাজ কেশ-লোমাদি রূপ এবং বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার-বিজ্ঞান এই পঞ্চস্কন্ধের সুসংবদ্ধতা হেতুই নাগসেন। এইগুলিকে আশ্রয় করিয়াই নাগসেন সংজ্ঞা, ব্যবহার, প্রকাশ ও নাম মাত্র প্রবর্তিত হইতেছে। পরমার্থতঃ এখানে পৃথক্ কোন ব্যক্তি বা অবয়বীস্বরূপ ব্যক্তি বা আত্মার উপলব্ধি হয় না।

মিলিন্দ—সাধু সাধু, ভন্তে, নাগসেন, অতি সুন্দর ও বিচিত্ররূপে আপনি উত্তর প্রদান করিয়াছেন।

রাজা মিলিন্দ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—

—ভন্তে নাগসেন, বেত্তার (=আত্মার) উপলব্ধি হয় কি?

নাগসেন—এই বেত্তা আবার কে?

মিলিন্দ—ভন্তে, এই অভ্যন্তরের জীব—যে চক্ষুর দ্বারা দর্শন করে, শ্রোত্র দ্বারা শ্রবণ করে ইত্যাদি। যেমন, আমরা এই প্রাসাদে উপবেশন করিয়া

পূর্ব-দক্ষিণাদির যে যে বাতায়ন-পথে ইচ্ছা করি, সেই সেই বাতায়ন দ্বারাই দর্শন করিতে পারি। এইরূপেই অভ্যন্তরস্থ জীব যে যে ইন্দ্রিয় দ্বারা দর্শন করিতে ইচ্ছা করে, শুনিতে ইচ্ছা করে, তাহা দ্বারাই দর্শন, শ্রবণ ইত্যাদি কৃত্য সম্পাদন করে।

নাগসেন—যদি অভ্যন্তরস্থ জীব চক্ষু দ্বারা দর্শন করে, তবে শ্রোত্র-ঘ্রাণ-জিহ্বা-ত্বক্ দ্বারাও কি শুধু রূপই দর্শন করে? যেমন প্রাসাদে বসিয়া সকল বাতায়ন দিয়া কেবল রূপই আমরা দর্শন করিয়া থাকি।

মিলিন্দ—না ভন্তে।

নাগসেন—মহারাজ, অভ্যন্তরে যে জীব আছে তাহার জিহ্বায় কোন রস নিক্ষিপ্ত হইলে সে অম্লত্বাদি রস সম্বন্ধে জ্ঞাত হইবে কি?

মিলিন্দ—হাঁ ভন্তে, জ্ঞাত হইবে।

নাগসেন—ঐ রস যদি ভিতরে প্রবেশ করে, তবে কি সেই জীব (আত্মা) তাহার অম্লত্বাদি রসের বিষয় জানিতে পারিবে?

মিলিন্দ—না ভন্তে।

নাগসেন—মহারাজ, আপনার পূর্বাপর কথার সঙ্গতি হইতেছে না। মধু-দ্রোণীতে মধুপূর্ণ করিয়া, যদি কোন ব্যক্তির মুখ বন্ধন পূর্বক উহাতে নিক্ষেপ করে, তবে কি সেই অভ্যন্তরস্থ জীব জানিতে পারিবে যে মধু মিষ্ট কি তিক্ত?

মিলিন্দ—না ভন্তে।

নাগসেন—ইহার কারণ কি?

মিলিন্দ—যেহেতু ঐ ব্যক্তির মুখে মধু স্পর্শিত হয় নাই।

নাগসেন—মহারাজ, আপনার পূর্বাপর সঙ্গতি হইতেছে না।

মিলিন্দ—আপনি বাদী, আপনার সহিত আলাপে সমর্থ নহি। আপনি আমাকে তত্ত্বকথা বলুন।

নাগসেন—চক্ষু-রূপ-আলোক ও মনস্কার হেতু চক্ষুবিজ্ঞান যেমন উৎপন্ন হয়, তৎ সহজাতস্পর্শ-বেদনা-সংজ্ঞা-চেতনা-একাগ্রতাদি চৈতসিকও তেমন উৎপন্ন হয়। ইহারা এক সঙ্গে উদিত হয়, একই সঙ্গে নিরুদ্ধ হয়। এই চিত্ত-চৈতসিক আবার একই আলম্বনকে আশ্রয় করে। তথা শ্রোত্র-শব্দ-ঈথর-মনস্কার হেতু শ্রোত্রবিজ্ঞান এবং সহজাত স্পর্শ

বেদনাদি চৈতসিকগুলিও উৎপন্ন হয়, এবং শব্দালম্বনকে আশ্রয় করিয়া প্রবর্তিত হয় ও একসঙ্গে নিরুদ্ধ হয়। তথা ঘ্রাণ জিহ্বাদি সম্বন্ধেও একই তত্ত্ব। এখানে শাশ্বত বেত্তার কোন উপলব্ধি হয় না। চৈতসিক বেদনাই বেত্তা; সংজ্ঞা জ্ঞাতা; চেতনা চেতেতা; জীবিতেন্দ্রিয় জীবেতা; বিজ্ঞান বিজ্ঞাতা; মনস্কার নিবেশেতা; একাগ্রতা ধারেতা। যখন যে ইন্দ্রিয়দ্বারে যে বিষয় আলম্বিত হয়, সেই দ্বারেই সেই বিজ্ঞান ও ঐ সপ্ত চৈতসিক উৎপন্ন হয় ও আপন আপন কৃত্য সম্পাদন করিয়া নিরুদ্ধ হয়। এই সপ্ত চৈতসিক সর্বচিত্ত সাধারণ চৈতসিক। ইহা ছাড়াও অন্যান্য চৈতসিকও অধিকার হিসাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই পর পর উৎপন্ন বিজ্ঞানসমূহকে চৈতসিক জীবিতেন্দ্রিয়ই সঞ্জীবিত রাখে এবং পূর্ব পূর্ব বিজ্ঞানের সংস্কারের একটা ছাপ পর-বিজ্ঞানে সমুদিত হয়। এইজন্য বিজ্ঞান বহু হইয়াও এক বলিয়া আমরা ভ্রম করি এবং বিজ্ঞান-সন্ততিকে আত্মা বলিয়া ভ্রম করি।

বুদ্ধ আত্মাকে অস্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু পুনর্জন্মকে স্বীকার করিয়াছেন। এখন প্রশ্ন হইতেছে—যদি আত্মা না থাকে কিসের পুনর্জন্ম হয় অর্থাৎ কে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে? যদি আত্মা না থাকে, কে চিরস্থায়ী স্বর্গে অনন্ত সুখ ভোগ করে, আবার কে চিরস্থায়ী নরকে অসীম যন্ত্রণা ভোগ করে?

এই সকল প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধ বলিয়াছেন—

"কম্মস্স কারকো নত্থি বিপাকস্স চ বেদকো।
সুদ্ধধম্মা পবত্তন্তি এবমেত্থ সম্মাদস্সনং॥"

অর্থাৎ পরমার্থতঃ শুভাশুভ কর্মের কর্তা ও বিপাকের ভোক্তা নাই। ক্ষণবিধ্বংসী জড়চেতনময় ধর্মপ্রবাহই কর্ম ও কর্মফলরূপে চলিতেছে। আমি কর্ম করি এবং আমি ফলভোগ করি—এই সকল উক্তি ব্যবহারিক সত্য মাত্র। বস্তুতঃ যে চিত্তসন্ততিতে কর্মবাসনা সঞ্চিত হইবে, উত্তরকালে উহাতেই ফল বদ্ধ হয়। এই চিত্তসন্ততি ক্ষণিক। ইহার তিনটি অবস্থা—উৎপত্তি, স্থিতি ও ভঙ্গ (ধ্বংস)। নিমেষের মধ্যে এক একটি চিত্তক্ষণ উক্ত তিনটি অবস্থার মধ্য দিয়া বহুবার পরিবর্তিত হইতেছে। সতত পরিবর্তনশীল জীবনধারার প্রত্যেক ক্ষণিক চিত্ত অতীত হইবার কালে তাহার সর্বশক্তি,

সর্ব অনপনেয় রক্ষিত ছাপ তাঁহার পরবর্তী চিত্তকে প্রদান করে। তাই প্রতিটি নূতন চিত্তে তাঁহার পূর্ব চিত্তের শক্তি নিহিত থাকে। সুতরাং বাধাহীন স্রোতের মত সতত গতিশীল ও পরিবর্তনশীল একটি চিত্তসন্ততি প্রবাহিত হইতেছে। কর্মশক্তির একই প্রবাহ বলে পরবর্তী চিত্ত পূর্বচিত্তের সহিত একান্ত একও নহে, এবং সম্পূর্ণ ভিন্নও নহে।

প্রতি মুহূর্তেই জীবের জন্মমৃত্যু ঘটিতেছে। একটি চিত্তের উৎপত্তিস্থিতি-ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই আর একটি চিত্ত উৎপন্ন হইতেছে। এই এক একটি চিত্তের উৎপত্তিক্ষণে জীবের জন্ম হইতেছে। আবার এক একটি চিত্তের ভঙ্গ ক্ষণে জীবের মৃত্যু হইতেছে। অতএব 'আত্মা' ব্যতীতই একই জীবনে অসংখ্যবার ক্ষণিক পুনর্জন্ম হইতেছে। অবশ্য ইহা মনে করা উচিত নহে যে, একটি খণ্ডিত-বিখণ্ডিত হইতেছে এবং ট্রেন বা শিকলের মত একটির সহিত অন্যটিকে জোড়া দেওয়া হইতেছে। বরং মনে করা সঙ্গত যে, উপনদীর স্রোত-সহায়ে পূর্ণ নদীর প্রবাহের মত চিত্ত ইন্দ্রিয়-প্রদত্ত ধারায় শক্তিমান হইয়া নিরন্তর প্রবাহিত হয় এবং যাত্রাপথে সংগৃহীত চিন্তারাশি বাহিরের পৃথিবীকে অবিরাম প্রদান করিতে থাকে। ইহার জন্মের জন্য উৎস এবং মৃত্যুর জন্য মোহনা আছে। ইহার গতি এত তীব্র যে, কোন কিছুর দ্বারাই ইহার সঠিক পরিমাপ করা যায় না। তথাপি ভাষ্যকারগণ এই বলিয়া আনন্দ পাইয়া থাকেন যে, এক একটি চিত্তক্ষণ অক্ষি-নিমীলন-ক্ষণের (=নিমেষের) এক লক্ষ কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র। আমরা সংসারী জীব মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া চির-পরিবর্তনশীল এই চিত্তের (চিত্তসন্ততির) স্বরূপ জানিতে না পারিয়া ইহাকে কর্মকর্তা ও ফলভোক্তা অবিনশ্বর 'আত্মা' বলিয়া ভুল করি।

মিলিন্দপ্রশ্নে ভদন্ত নাগসেন এই চিত্তসন্ততিকে প্রদীপশিখার সহিত তুলনা করিয়াছেন। একই প্রদীপ সারারাত্র জ্বলিতেছে। কিন্তু রাত্রির প্রথম-ভাগের যে প্রদীপশিখা এবং রাত্রির মধ্যভাগের প্রদীপশিখা এক নহে। আবার রাত্রির মধ্যভাগের প্রদীপ শিখা ও রাত্রির শেষভাগের প্রদীপ শিখা এক নহে। আবার ইহারা ভিন্নও নহে। ঠিক তদ্রূপ, একই ব্যক্তির শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্য একও নহে, আবার ভিন্নও নহে। একই ধর্মসন্ততি বা চিত্তসন্ততি ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হইয়া শৈশব কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্যের রূপ পরিগ্রহ করে। আবার ইহাই ঐ একই নিয়মে জীবনের অবসানে অন্য

রূপ পরিগ্রহ করে। জনৈক ব্যক্তি একটি মোমবাতি জ্বালাইয়া তাহার শিখার সাহায্যে একশতটি মোমবাতি জ্বালাইল। তাহা বলিয়া কেহ এই কথা স্বীকার করিবে না যে, ঐ একশতটি মোমবাতির শিখা একই শিখা, আবার ভিন্নও নহে। জন্মান্তরও সেইভাবে সংঘটিত হইয়া থাকে। আরও প্রকৃষ্ট উদাহরণ হইতেছে প্রজাপতির সৃষ্টি। প্রজাপতির প্রথম অবস্থা হইতেছে ডিম্বাবস্থা। দ্বিতীয় অবস্থা হইতেছে শুঁয়োপোকা (caterpillar); না জানিলে কেহই স্বীকার করিবে না যে, ঐ শুঁয়োপোকা হইতেই প্রজাপতির সৃষ্টি হয়। অথচ ইহাই সত্য ঘটনা। ঠিক তদ্রূপ ব্যবহারিক ভাষায় বলিলে বলা যায় শরীরের মৃত্যু বা ধ্বংস হয় এবং কর্মশক্তি (যাহা ইহজীবনে বা পূর্ব পূর্ব জীবনে সঞ্চিত হইয়াছে) (Kammic Force) নিজের বলে বলীয়ান হইয়া রূপান্তর গ্রহণ করে, সেই রূপ ধ্বংস হইলে আবার একটি রূপ গ্রহণ করে··· এইভাবে কর্মবীজ চিরতরে নিঃশেষিত না হওয়া পর্যন্ত 'সন্ততি' চলিতেই থাকে। একটি আম্রবীজ হইতে আম্রবৃক্ষ সৃষ্টি হইতে সহস্র সহস্র আম্রফলে রূপান্তরিত হয়। আবার ঐ সহস্র সহস্র বীজ হইতে আরও লক্ষ লক্ষ আম্রফল উৎপন্ন হয়। অথচ এই কথা বলা যুক্তিযুক্ত হইবে না যে, প্রথমোক্ত আম্রবীজ এবং পরবর্তী পরবর্তী লক্ষ লক্ষ আম্রবীজ এক-ই, আবার ইহাও বলা যাইবে না যে, ইহারা ভিন্ন। অথচ প্রথমোক্ত আম্রবীজের গুণ-স্বভাব-ধর্ম পরবর্তী পরবর্তী আম্রসমূহে সংক্রামিত হইয়াছে। তবে প্রাকৃতিক প্রভাব, জল, মাটি ও সারের তারতম্য হইলে আম্রের গঠন উন্নতমানের বা অবনত মানের হইতে পারে, কিন্তু গুণ-স্বভাব-ধর্মের পরিবর্তন হইতে পারেনা। ল্যাংরা আমের বীজ বপন করিলে ল্যাংরা আমই হইবে, চোসা বা বোম্বাই আম হইবে না। বিচিত্র প্রকৃতির চরিত্র। কেহ যদি উক্ত ল্যাংরা আমের বীজ চর্বণ করিতে থাকে কোন মিষ্ট পাইবেনা, পাইবে তিক্ত স্বাদ। অথচ ল্যাংরা আমের মিষ্টত্ব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে ঐ বীজের মধ্যেই নিহিত আছে, তাহা না হইলে ঐ বীজ হইতে গাছ হইয়া যখন ফল প্রদান করে, তখন প্রত্যেকটি পাকা ফল সুমিষ্ট হয় কেন? প্রত্যেকটি ল্যাংরা আমের মধ্যে প্রথমোক্ত ল্যাংরা আমের গুণ-ধর্ম-স্বভাব অপরিবর্তিত থাকে। মানুষের জীবনপ্রবাহও ঠিক তদ্রূপ। এই জীবনের গুণ-স্বভাব-ধর্মযুক্ত কর্মবীজই পরজন্মে সংক্রামিত হয়। কেহ পুনর্জন্ম গ্রহণ করে না। যখন একটি জীবনের অবসান ঘটে, তখন কর্মবীজ (=কর্মশক্তি) অনুকূল অবস্থার সম্মুখীন হইয়া

তাহার স্বরূপ প্রকাশিত করে। ইহার একপ্রকার প্রকাশ থামিয়া যাইলে যখন অনুকূল অবস্থার প্রাপ্তি ঘটে তখন নবরূপে ইহা আত্মপ্রকাশ করে।

জন্ম হইতেছে নামরূপের (রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান) প্রাদুর্ভাব, আর তথাকথিত মৃত্যু হইতেছে ক্ষণভঙ্গুর নামরূপের ক্ষণভঙ্গুর অবসান।

নামরূপের আবির্ভাব পূর্বজন্মের কারণ সঞ্জাত। জীবনপ্রবাহ যেমন ক্ষণভঙ্গুর অস্তিত্ব ব্যতিরেকেও এক চিত্তক্ষণ হইতে অন্য চিত্তক্ষণে চলিতে পারে, সেইরূপ বহু জীবনপ্রবাহও অমর আত্মার সংক্রমণ ব্যতীত এক অস্তিত্ব হইতে অন্য অস্তিত্বে সংক্রামিত হইতে পারে। 'গঙ্গা' বলিয়া পারমার্থিক দৃষ্টিতে কিছুই নাই, আছে 'গঙ্গাপ্রবাহ' যাহা প্রতিক্ষণে পরিবর্তিত হইয়া চলিয়াছে। অনাদি অতীত হইতে এই গঙ্গাপ্রবাহ চলিয়া আসিতেছে এবং ভবিষ্যতেও চলিতে থাকিবে। তথাপি আমরা ব্যবহারিক ভাষায় বলিতে থাকি "আমি প্রত্যহ গঙ্গা-স্নান করি।" ঠিক তদ্রূপ আমরা ভ্রমবশতঃ বলিয়া থাকি 'আত্মা'ই জীর্ণদেহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন দেহ ধারণ করে। 'শাশ্বত গঙ্গা' বলিয়া যেমন কিছুই নাই শাশ্বত 'আত্মা' বলিয়াও কিছুই নাই। আছে শুধু 'প্রবাহ', 'সন্ততি'। স্নেহপদার্থ (তৈল, ঘৃতাদি) নিঃশেষিত হইলে যেমন প্রদীপ নির্বাপিত হয়, হিমালয়ের বারিধারা রুদ্ধ হইলে গঙ্গাও শুষ্ক হইয়া যাইবে, ক্লেশক্ষয় (কর্মবীজ কর্মসন্ততি) হইলে জীবনপ্রবাহেরও নির্বাণ হইবে।

পুনর্জন্ম বা জন্মান্তরবাদ ঃ

আমরা কিভাবে পুনর্জন্ম বিশ্বাস করিতে পারি। বুদ্ধ নিজেই ইহার প্রমাণ। বুদ্ধত্বলাভের রাত্রির প্রথম যামে তিনি **জাতিস্মর-জ্ঞানাভিমুখে** চিত্তকে নমিত করিয়া নানাপ্রকারে বহু পূর্বজন্ম অনুসরণ করেন—এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চারি জন্ম, পাঁচ জন্ম, দশ জন্ম, বিশ জন্ম,…শত জন্ম, সহস্র জন্ম, শতসহস্র জন্ম, বহু সংবর্তবিবর্তকল্প। রাত্রির দ্বিতীয় যামে তিনি **জীবের গতি-পরম্পরা-জ্ঞান** লাভ করেন। তিনি অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিতে দেখিতে পাইলেন—জীবগণ একযোনি হইতে চ্যুত হইয়া অপরযোনিতে উৎপন্ন হইতেছে। তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারেন ঃ হীনোৎকৃষ্টজাতীয়, উত্তম-অধমবার্ণের জীবগণ স্ব স্ব কর্মানুসারে সুগতি-দুর্গতি প্রাপ্ত হইতেছে।

পুনর্জন্ম সম্বন্ধে বুদ্ধের ইহাই ছিল নিজস্ব উক্তি।[১৯] ইহা হইতে জানা যায় যে, পুনর্জন্ম বিষয়ক জ্ঞান বুদ্ধ নিজেই আয়ত্ত করিয়াছিলেন। এই জ্ঞান লোকোত্তর, স্ব-আয়ত্ত, স্বোপলব্ধ এবং সম্যক প্রচেষ্টা থাকিলে অন্যরাও এই জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। ধর্মচক্রপ্রবর্তন সূত্রে[২০] দ্বিতীয় আর্যসত্য বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদানকালে বুদ্ধ বলিয়াছেনঃ "তৃষ্ণাই পুনর্জন্মের কারণ"। ঐ সূত্রেরই শেষে তিনি বলিয়াছেনঃ "ইহাই আমার অন্তিম জন্ম। আমার আর পুনর্জন্ম হইবে না।" তাঁহার উপদিষ্ট বহু সূত্র হইতে জানা যায় যে, পাপী সত্ত্বগণ মৃত্যুর পরে নরকে উৎপন্ন হয় এবং পুণ্যবান সত্ত্বগণ মৃত্যুর পরে স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। তিনি বহুপ্রকার নরকের বর্ণনা করিয়াছেন যেখানে সত্ত্বগণ উৎপন্ন হইয়া নরকযন্ত্রণা ভোগ করে এবং বহু স্বর্গের বর্ণনা করিয়াছেন যেখানে সত্ত্বগণ উৎপন্ন হইয়া স্বর্গসুখ ভোগ করেন। জাতকের গল্পসমূহের মাধ্যমে তিনি তাঁহার বহু পূর্ব পূর্ব জন্মের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছেন। পালি মজ্ঝিমনিকায় এবং অঙ্গুত্তরনিকায়ের বহুস্থানে বুদ্ধের পূর্ব পূর্ব জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। ঘটিকার সুত্তে[২১] উক্ত হইয়াছে যে, তিনি কাশ্যপ বুদ্ধের সময়ে জ্যোতিপাল হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠী মৃত্যুর পরে দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং দেব অবস্থায় একদিন রাত্রিতে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন।[২২] অঙ্গুত্তরনিকায়ের একস্থানে[২৩] বলা হইয়াছে যে তিনি এক-জন্মে পচেতন নামক শকট-নির্মাতা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাপরি-নিব্বানসুত্তে তিনি বর্ণনা করিয়াছেন—একটি গ্রামের বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া কে কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কেবল বুদ্ধ নহেন তাঁহার শিষ্যদের মধ্যেও অনেকে বহু পূর্ব পূর্ব জন্মকথা বর্ণনা করিয়াছেন। স্থবির মহামোদ্‌গল্যায়ন ঋদ্ধিপ্রভাবে যথেচ্ছভাবে বিভিন্ন নরকে ও স্বর্গে ভ্রমণ করিয়া আসিয়া সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিতেন। বুদ্ধের পূর্বে কয়েকজন ঋষিদের কথা জানা যায় যাঁহারা দিব্যচক্ষু, দিব্যশ্রোত্র লাভ করিয়া কিছু কিছু পূর্বজন্মকথা স্মরণ করিতে পারিতেন। বিজ্ঞান অবশ্য ঋদ্ধিপ্রভাব স্বীকার করিতে চায়না। কিন্তু বুদ্ধের মতে যোগপ্রভাবে মানসিক উৎকর্ষতা সাধন করিতে পারিলে ঋদ্ধিশক্তি লাভ করা অসাধ্য নহে।

বর্তমানকালেও অনেক ঘটনা শোনা যায় যে, কোন কোন শিশু তাহাদের পূর্বজন্মকথা স্মরণ করিতে পারে। পূর্বজন্মে তাহারা কোথায় ছিল তাহা

জানিতে পারে এবং সেখানে যাইতে ইচ্ছা হয়। পীথাগোরাস স্মরণ করিতে পারিতেন যে, পূর্বজন্মে ট্রয়-অবরোধকালে তিনি একটি শীল্ড গ্রীক মন্দিরে বহন করিয়া আনিয়াছিলেন।[২৪] আধুনিককালের অনেক ভূতবিদ্যা, পিশাচ-বিদ্যা ও প্লানছেট (Planchette) হইতেও পুনর্জন্ম স্বীকৃত হয়। ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত বঙ্গীশ মৃতের খুলি স্পর্শ করিয়া বলিতে পারিতেন মৃত ব্যক্তি কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে।[২৫]

আমেরিকার Edgar Cayce অন্যদের পূর্বজন্মকথা বলিতে পারিতেন। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনেও ইহার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা এমন কোন কোন ব্যক্তির সান্নিধ্যে আসি প্রথমবার দেখিয়াও মনে হয় যেন পূর্ব পরিচিত। নতুন কোন জায়গায় যাইয়াও মনে হয় যেন স্থানটি খুব পরিচিত। 'ধম্মপদ' গ্রন্থের অট্ঠকথায় (commentary) এক পিতামাতার গল্প আছে যাঁহারা একদিন বুদ্ধকে দেখিয়া তাঁহার পদতলে লুটাইয়া বলিলেন—"হে পুত্র, পিতামাতা বৃদ্ধ হইলে তাঁহাদের প্রতি কি পুত্রদের কোন কর্তব্য থাকে না? তুমি এতকাল আমাদের দর্শন দাও নাই কেন? এই প্রথম তোমার দর্শন পাইলাম।" বুদ্ধ তাঁহাদের চিনিতে পারিয়া বলিলেন—অতীতে বহু জন্মে তাঁহারা তাঁহার পিতামাতা ছিলেন। এই বলিয়া একটি গাথা আবৃত্তি করিলেন ঃ

"পুব্বে'ব সন্নিবাসেন পচ্চুপ্পন্নহিতেন বা।
পেমং তথ জায়েথ উপ্পলং ব যথোদকে॥"

অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব জন্মে একত্রে সংবাসহেতু অথবা বর্তমান জন্মের হিতের কারণে উদকে জাত উৎপলের ন্যায় (পরস্পরকে দেখিয়া) পূর্বের প্রেমভাব আবার জাগ্রত হয়।

জগতে বুদ্ধ এবং অন্যান্য অনেক মহর্ষি ও মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু কেবলমাত্র একজন্মের সাধনার দ্বারা কেহ বুদ্ধ, মহর্ষি বা মহাপুরুষ হইতে পারেন না, বহু জন্মের সাধনার প্রয়োজন। কনফুসিয়াস, পাণিনি, বুদ্ধঘোষ, নাগার্জুন, হোমার এবং প্লেটোর মত অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, কালিদাস, সেক্সপীয়ার এবং রবীন্দ্রনাথের মত অসাধারণ প্রতিভা, রামানুজ পাসকেল, মোজার্ট, বীঠোবনের মত অসাধারণ বালক কি একজন্মের সাধনার ফল?

শৈশবেই যে সমস্ত বালক বা বালিকা অসাধারণ প্রতিভা ও স্মৃতির পরিচয়

দিয়া থাকে তাহা যে তাহাদের পূর্ব পূর্ব জন্মে সঞ্চিত প্রতিভার প্রকাশ তাহা বৈজ্ঞানিকগণ স্বীকার করিতে নারাজ। কিন্তু খৃষ্টান হাইনেকেন (Heineken)-এর অলৌকিক শক্তিকে কি যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করিবেন! হাইনেকেন তাঁহার জন্মের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কথা বলিয়াছিলেন (সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধ জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই কথা বলিয়াছিলেন বলিয়া ত্রিপিটকে বর্ণনা আছে), এক বৎসর বয়সে বাইবেল হইতে মুখস্ত বলিয়াছিলেন, দুই বৎসর বয়সে ভূগোলের যে কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম ছিলেন, তিন বৎসর বয়সে ফরাসী ও লেটিন ভাষায় কথা বলিতে পারিতেন, চারি বৎসর বয়সে দর্শনের ছাত্র হইয়া দার্শনিক তত্ত্বের সমাধান করিয়াছিলেন।

আরও প্রমাণ আছে, যেমন জন ষ্টুয়ার্ট মিল মাত্র তিন বৎসর বয়সে গ্রীক পড়িতে পারিতেন, মেকলে মাত্র ছয় বৎসর বয়সে বিশ্ব-ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন, আমেরিকার উইলিয়াম জেমস্ সিদিস মাত্র দুই বৎসর বয়সে বড়দের ন্যায় লিখিতে ও পড়িতে পারিতেন, আট বৎসর বয়সে ফরাসী, রাশিয়ান, ইংলিশ, জার্মাণ, লেটিন ও গ্রীক ভাষায় কথা বলিতে পারিতেন। মাত্র তিন বৎসর বয়সে ম্যাঞ্চেষ্টারের চার্লস বেনেট বহু ভাষায় কথা বলিতে পারিতেন।[২৬] বৈজ্ঞানিকেরা ইহার কি প্রমাণ দিবেন? অতএব পুনর্জন্ম স্বীকার করিতেই হইবে। বর্তমানের 'আমি' অতীতের ফল এবং ভবিষ্যতের 'আমি' বর্তমানের ফল। টি. এইচ্. হাক্সলে যথার্থই বলিয়াছেন:

"আমরা বর্তমানকে দেখিতে আসিয়াছি অতীতের শিশুরূপে এবং ভবিষ্যতের জনকরূপে।" এ্যাডিসন বলিয়াছেন: "যদি অতীত এবং ভবিষ্যত না থাকে তাহা হইলে ইহজগতে ধার্মিকেরা কেন কষ্ট পায় এবং পাপীরা সুখে থাকে?" বাস্তবিকপক্ষে মানুষ তাহার পূর্ব পূর্ব জন্মে কৃতকর্মের ফল ইহজন্মে ভোগ করে, বর্তমান জন্মের কৃতকর্মের ফলও কিছু কিছু ইহজন্মে ভোগ করে। সদাচারী ধার্মিক ব্যক্তি যদি কষ্ট পায় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তাহার পূর্বজন্মের কোন দুষ্কৃতি ছিল। পাপী অনাচারী ব্যক্তি যদি সুখী হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তাহার পূর্বজন্মের সুকৃতি ছিল। বর্তমানের ভালমন্দ কর্মের ফল ভবিষ্যতে ভোগ করিতে হইবে। যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে যমজ সন্তান এক একজন এক এক স্বভাবের ও প্রতিভার হয় কেন? একই পিতামাতার সন্তান কেহ হয় মূর্খ, কেহ হয় পণ্ডিত—ইহাই বা কেন?

পাদটীকা

১। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, ২। ২২—২৪
২। ঋগ্বেদ, ৫। ৫৮
৩। দীঘনিকায়, ১ম, পৃঃ ৪৪— ।
৪। ৮, ৭, ১ ।
৫। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্‌, ৪, ৩, ৯ ; ১১, ১, ১৬ ।
৬। ঐ, ৪, ৩, ১৩ ।
৭। কঠোপনিষদ্‌, ২, ৩, ১ ।
৮। ছান্দোগ্য, ৮, ৮, ১ ; ৬, ১, ৩ ; ৬, ১৬, ৩ ।
৯। কঠ, ২, ৩, ১২ ; ১, ২, ২৩ ।
১০। মৈত্রী উপনিষদ্‌, ৬, ১৭ ; কঠ, ১, ২, ২৩ ; মুণ্ডক, ৩,·২, ২ ।
১১। কঠ, ১, ৩, ১২ ; মুণ্ডক, ৩, ১, ৮ ।
১২। ছান্দোগ্য, ৬, ৩, ১৪৩ ; ৬, ৮, ৬ ।
১৩। ভগবতীসূত্র, ১৩, ৭, ৪৯৫ ।
১৪। A. L. Basham, History and Doctrine of the Ājīvikas, 1951, p. 270.
১৫। মজ্‌ঝিমনিকায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩২— ।
১৬। বিনয়, মহাবর্গ (বঙ্গানুবাদ), পৃঃ ১৫-১৬ ।
১৭। G. P. Malalasekera, The Truth of Anattā, p. 27
১৮। Buddhist Dictionary, pp. 12-13.
১৯। মহাসচ্চক-সুত্ত, দীঘনিকায় ।
২০। মহাবর্গ, বিনয়পিটক, অবতরণিকা ।
২১। মজ্‌ঝিমনিকায় (সুত্ত নং ২৬)
২২। ঐ (সুত্ত নং ৮১)
২৩। ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১১
২৪। Atkinson & Walter *Reincarnation and the Law of Karma.*
২৫। বঙ্গীস সুত্ত, থেরগাথা ।
২৬। Ceylon Observer, নবেম্বর ১৯৪৮ ।

প্রতীত্য-সমুৎপাদ-নীতি[১]

(বৌদ্ধ কার্য-কারণ নীতি)

বৌদ্ধধর্ম্ম-মতের মধ্যে প্রতীত্য-সমুৎপাদই অত্যন্ত কঠিন বিষয়। প্রতীত্য-সমুৎপাদের ইংরাজী অনুবাদ "Dependent Origination" অর্থাৎ সমস্তই মানসিক ও ভৌতিক অনুভূত-ঘটনা বা উত্তেজনার (mental and Physical phenomena) আপেক্ষিক সমুৎপত্তি (Conditional arising)। প্রচলিত বা ব্যবহারিক কথায় (বোহারবসেন) ব্যক্তিগত অনুভূত-উত্তেজনার বা ঘটনাবলীর এই আপেক্ষিক-সমুৎপত্তির সমষ্টিকে আমরা "জীবজন্তুপ্রাণী" বা "ব্যক্তি" বা "মানুষ" বলিয়া থাকি।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে এই পর্য্যন্ত অনেকেই বহুবার প্রতীত্য-সমুৎপাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন এবং অনেকে এই সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থাদিও প্রণয়ন করিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়—তাঁহাদের মধ্যে কেহই এই প্রতীত্য-সমুৎপাদের প্রকৃত সার-মর্ম্ম বুঝিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। পাশ্চাত্য গ্রন্থকার ও বক্তাগণের নানা প্রকার কাল্পনিক ও নিতান্ত ছেলেমানুষি ব্যাখ্যা দেখিলে মনে হয়—তাঁহারা কোনদিন নিজেকে এই প্রশ্নটি করেন নাই যে, ভগবান বুদ্ধ কোন্ পার্থিব কারণে প্রতীত্য-সমুৎপাদ দেশনা করা দরকার মনে করিয়াছিলেন। ভগবান সম্যকসম্বুদ্ধ রুচিবিজ্ঞান ও তর্কজাল বুননের খাতিরে নিশ্চয়ই ইহা করেন নাই। প্রতীত্য-সমুৎপাদের দ্বারা সংসারের নানাবিধ দুঃখ-দুর্দ্দশার মূলীভূত হেতুগুলি দেখান হইয়াছে; এবং ইহাও দেখান হইয়াছে যে, দুঃখের এই মূলীভূত কারণগুলি নিঃশেষে অপসৃত হইলে ভবিষ্যতে আর দুঃখের উৎপত্তি হইবে না। প্রতীত্য-সমুৎপাদের দ্বারা আমরা অতি সহজেই বুঝিতে পারি যে, আমাদের এই দুঃখ-দুর্দ্দশাপূর্ণ বর্ত্তমান জন্ম বা অস্তিত্ব—আমাদের পূর্ব্ব জন্মেরই কৃত-কর্ম্মের ফল; এবং আবার ভবিষ্যৎ জন্মও আমাদের বর্ত্তমান জন্মের কর্ম্মফলের উপরেই নির্ভর করিয়া থাকে, এই পুনর্জন্ম নিয়ন্ত্রণকারী চেতনা বা সংস্কার বা কর্ম্ম না থাকিলে ভবিষ্যতে আর পুনর্জন্ম হইবে না; তখনই এই সংসার-চক্রের জন্ম-মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা বা মুক্তি। ইহারই নাম নির্ব্বাণ লাভ;

ইহাই বৌদ্ধধর্ম্মের চরম লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। জন্ম, জরা ও মৃত্যুর কঠোর হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করতঃ পরম শান্তি নির্ব্বাণ লাভই—ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধের অমৃতময় বাণী।

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ধারণা করিয়া থাকেন যে—প্রতীত্য-সমুৎপাদের দ্বারা ভগবান বুদ্ধ সমগ্র পৃথিবী ও পার্থিব যাবতীয় পদার্থের আদি-প্রারম্ভই (primary beginning) ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এবং অবিদ্যা (অবিজ্জা) বা অজ্ঞানতা হইতেই সময়ে সমস্ত ভৌতিক পদার্থ ও প্রাণিগণ সমুদ্ভূত হইয়াছে অথবা ক্রমবিকাশ লাভ করিয়াছে; ইহাই সমগ্র বিশ্বের হেতুহীন আদি কারণ বা নিয়ম (causeless first principle)। এই ধারণা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক[২]। প্রতীত্যসমুৎপাদ ব্যক্তিগত বাহ্যিক (through five sense-organs) ও আভ্যন্তরিক (through pure consciousness) অনুভূতির আপেক্ষিকতা বা একে অন্যের নির্ভরশীলতাই শিক্ষা দেয় মাত্র। মানসিক ও ভৌতিক আপেক্ষিক ঘটনা বা উত্তেজনার সমষ্টি—যাহাকে আমরা ব্যবহারিক কথায় "মানুষ" বা "ব্যক্তি" বলি—তাহা যে আকস্মিক ঘটনা নহে অথচ প্রত্যেক অনুভূত-ঘটনাই নিরবচ্ছিন্ন প্রবহমান ভাবে একে অন্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল,—ইহাই প্রতীত্য-সমুৎপাদের দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অন্য কথায় ইহার দ্বারা চতুরার্য্যসত্যের সমুদয়সত্য ও নিরোধ-সত্যের নির্দ্দিষ্ট দার্শনিক রূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

অবিজ্জা-পচ্চয়া সঙ্খারা—"অবিদ্যাই সংস্কারের কারণ।" সংস্কার অর্থ —পুনর্জন্ম প্রদানকারী চেতনা বা কর্ম্ম।

সঙ্খারা-পচ্চয়া বিঞ্ঞাণং—"সংস্কার বা পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মই বিজ্ঞানের[৩] বা বর্ত্তমান অস্তিত্বের (Conscious existence) কারণ।"

বিঞ্ঞাণ-পচ্চয়া নাম-রূপং—"বিজ্ঞানই নাম-রূপের কারণ।" নামরূপের সমষ্টিই আমাদের তথাকথিত ব্যক্তিগত অস্তিত্ব।

নাম-রূপ-পচ্চয়া সলায়তনং—"নামরূপই ষড়ায়তনের কারণ। চক্ষুরায়তন, শ্রোত্রায়তন, ঘ্রাণায়তন, জিহ্বায়তন, কায়ায়তন ও মনায়তন,—এই ষড়ায়তনই নাম-জীবিতেন্দ্রিয়ের বা মানসিক-জীবনের (mental life) ভিত্তি।

সলায়তন-পচ্চয়া ফস্সো—"ষড়ায়তনই স্পর্শের (Sensory and mental impression) কারণ।"

ফস্সো পচ্চয়া বেদনা—"স্পর্শই বেদনার[৪] (Feeling) কারণ।"

বেদনা-পচ্চয়া তণ্‌হা—"বেদনাই তৃষ্ণার (Craving) কারণ।"

তণ্‌হা-পচ্চয়া উপাদানং—"তৃষ্ণাই উপাদানের[৫] (Clinging) কারণ।"

উপাদান-পচ্চয়া ভবো—"উপাদানই ভব বা উৎপত্তি-প্রক্রিয়ার কারণ।" এখানে ভব অর্থ—কর্ম্ম-ভব ও উৎপত্তি-ভব দুইই বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ পুনর্জন্ম প্রদানকারী কর্ম্ম-প্রক্রিয়া the (rebirth-producing Karmic process) ইহারও ফল—পুনর্জন্ম-প্রক্রিয়া[৬] (Rebirth-process)।

ভব-পচ্চয়া জাতি—"ভব" অর্থাৎ পুনর্জন্ম উৎপাদনকারী কর্ম্ম-প্রক্রিয়াই পুনর্জন্মের কারণ।"

অবশেষে জাতি-পচ্চয়া জরা-মরণং ইত্যাদি—"পুনরুৎপত্তিই জরা, মৃত্যু, শোক, পরিদেবনা, দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য ও হতাশা ইত্যাদির কারণ।" এইভাবেই আবার ভবিষ্যতে সমস্ত দুঃখেরই উৎপত্তি হয়।

সংক্ষেপে ইহাই হইল "প্রতীত্য-সমুৎপাদ" (Dependent origination)।

১। এখন আমাদের প্রথম কথা হইল—"অবিজ্জা-পচ্চয়া সঙ্খারা" অবিদ্যা বা অজ্ঞানতাই আমাদের পুনর্জন্ম-উৎপাদনকারী চেতনা বা সংস্কারের (Karma formation) হেতু।

অবিদ্যার (অবিজ্জা)[৮] অন্য অর্থ—মোহ। অনিত্য অন্তঃসার-শূন্য নিরবচ্ছিন্ন প্রবহমান অনুভূতি (ধর্ম্ম) সমূহকে নিত্য শাশ্বত, দুঃখকে সুখ, এবং অসারকে সার মনে করার নামই অবিদ্যা। মানুষ অবিদ্যাবরণে আচ্ছন্ন হইয়া বুঝিতে পারে না যে, তাহাদের অস্তিত্ব নিত্য-পরিবর্ত্তনশীল মানসিক ও ভৌতিক আপেক্ষিক ঘটনা-সমুদয়ের প্রক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই নহে; এই অবিচ্ছিন্ন মুহুর্মুহুঃ আপেক্ষিক-সমুদ্ভবনের দ্বারা পরমার্থতঃ কোন শাশ্বত-নিত্য বস্তু বা পুরুষ (পুগ্‌গলো) অথবা আত্মার সৃষ্টি হয় না; এই পঞ্চস্কন্ধের বাহিরে বা ভিতরে অথবা এই নিত্য-জঙ্গম-প্রক্রিয়ার পিছনে এমন কোন অজর অমর অক্ষয় পদার্থ নাই যাহাকে শাশ্বত-সত্তা পুরুষ জীব বা আত্মা বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে সুতরাং আমরা যাহাকে বলি—"আমি" বা "তুমি" বা "তিনি" বা কোন "ব্যক্তি" অথবা "বুদ্ধ" ইত্যাদি—এইগুলি কেবলমাত্র প্রচলিত (সম্মুতি-সচ্চ) শব্দ ছাড়া আর কিছুই নহে; মুহুর্মুহু অনুভূত ঘটনাবলীর (Physical and mental phenomena) অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া ছাড়া ইহার পিছনে পরমার্থতঃ কোন সত্তা

নাই। অবিদ্যা ও অজ্ঞানতার ভিতরেই সমস্ত কুশল অকুশল কর্ম্মের মূল-হেতু নিহিত রহিয়াছে; অবিদ্যাই সাংসারিক নানাবিধ দুঃখ যন্ত্রণা এবং লোভ, দ্বেষ, হিংসা, মান ও অভিমান ইত্যাদির কারণ। অবিদ্যার মোহ-পাশ ছিন্ন করতঃ ইহাকে নিঃশেষে ধ্বংস করিতে পারিলে তখনই জ্ঞানের উদয় হয়, ক্রমশঃ সাংসারিক সমস্ত শুভ, অশুভ ও দুঃখ যন্ত্রণার হাত হইতে নিস্তার লাভ সম্ভব হয়। এই সমস্ত কারণেই প্রতীত্য-সমুৎপাদে অবিদ্যাকে প্রথম উল্লেখ করা হইয়াছে।

সংখারা বা সংস্কারের শব্দগত অর্থ—"সংগঠন" (formations)। কিন্তু প্রতীত্য-সমুৎপাদে সংস্কারের অর্থ—পুনর্জন্ম-দাতা কুশল বা অকুশল কর্ম্ম বা চেতনাই (Rebirth-producing karma-formations or volitional activities) বুঝিতে হইবে। সুতরাং সংস্কার অর্থ—শুধু "কর্ম্ম" বলিলেও অন্যথা হয় না।[১]

কায়িক, বাচনিক ও মানসিক সমস্ত অকুশল বা মন্দ-চেতনাই অকুশল কর্ম্ম। কারণ, ইহারা ইহজন্মে ও পরজন্মে দুঃখপূর্ণ ফলই প্রসব করিয়া থাকে। কায়িক, বাচনিক ও মানসিক কুশল চেতনা বা কর্ম্ম ইহজন্মে ও পরজন্মে মনোরম ও সুখপূর্ণ ফল আনয়ন করে বটে, কিন্তু এই কুশল-কর্ম্মও অবিদ্যা-প্রসূত, অন্যথা ইহারা ভবিষ্যৎ জন্মের কারণ হইত না। একমাত্র অর্হৎগণ কোন প্রকার কুশল অকুশল এবং পুনর্জন্ম-নিয়ামক কর্ম্ম বা কর্ম্ম-ফল উৎপাদন করেন না। কেননা তাঁহাদের অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা চিরতরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহারা সংসারের অসারতার প্রকৃতরূপ বুঝিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাই তাঁহারা পার্থিব কোন পদার্থেই আসক্ত নহেন; জন্ম-মৃত্যুর কঠোর হস্ত হইতে চিরতরে মুক্ত হইয়াছেন।

বর্ত্তমান (অত্থি-পচ্চয়ো) ও সমকালীন উৎপত্তি (সহজাত-পচ্চয়ো) রূপে অবিদ্যা সমস্ত অকুশল কর্ম্ম বা অকুশল চেতনার অপরিহার্য্য হেতু। সকল প্রকার অশুভ (evil) কর্ম্মেই অবিদ্যা বর্ত্তমান থাকে এবং সকল প্রকার অশুভ কর্ম্ম-চেতনার উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই অবিদ্যাও উৎপন্ন হইয়া থাকে। কোন অশুভ কর্ম্মই অবিদ্যা ব্যতিরেকে সম্পন্ন হয় না। দৃষ্টান্তস্থলে বলা যায়—যদি কোন মোহান্ধ পুরুষ লোভ ও ক্রোধের বশীভূত হইয়া নানাবিধ কায়িক, বাচনিক ও মানসিক অশুভ কর্ম করিয়া থাকে, বুঝিতে হইবে—এই সমস্ত কর্ম্মেই অবিদ্যা সহজাত ও বর্ত্তমান ছিল। সুতরাং অবিদ্যা অকুশল

কর্ম্মের বর্ত্তমান (অত্থি) ও সহজাত-প্রত্যয় বা কারণ (Condition by way of present and simultaneous arising)। আবার দেখুন—অবিদ্যার অবর্ত্তমানে যেমন কোন অকুশল কর্ম্ম সম্ভব হয় না তেমন অকুশল কর্ম্মের অবর্ত্তমানেও বুঝিতে হইবে—অবিদ্যার অস্তিত্ব নাই। সুতরাং উভয়েই যে কোন সময়েই যে কোন অবস্থাতেই এক অন্যের উপর নির্ভরশীল (অঞ্ঞমঞ্ঞ-পচ্চয়ো); কাজে কাজেই অবিদ্যা ও অকুশল কর্ম্ম পরস্পর অবিয়োজ্য।

আবার অবিদ্যা সমস্ত অকুশল কর্ম্মেরই মূল-হেতু (হেতু-পচ্চয়ো) রূপে অবিভাজ্য (কারণ সম্পযুত্ত-পচ্চয়ো)।

এ ছাড়া আরও অন্যান্য উপায়েও অবিদ্যা অকুশল কর্ম্মের কারণ হইতে পারে। "উপনিস্সয়-পচ্চয়ো" রূপেও অবিদ্যা মন্দকর্ম্মের কারণ হয়। উপনিস্সয় অর্থ—উপনিশ্রয় বা আশ্রয়, অবলম্বন অর্থাৎ উৎসাহদানকারী কারণ (incentive condition)। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যদি কোন ব্যক্তি লোভ, ক্রোধ ও মোহের বশীভূত হইয়া হত্যা, ডাকাতি, চুরি ও কাম-মিথ্যাচার ইত্যাদি দুঃসাহসিক অপকর্ম্ম করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে—অবিদ্যা তাহাকে এই সমস্ত অপকর্ম্মে সাহস জোগাইয়াছে। সুতরাং অবিদ্যাই এই সমস্ত অকুশল কর্ম্ম-চেতনা-আত্মপ্রকাশের আশ্রয় বা উপনিশ্রয়-প্রত্যয় বা কারণ।

চিন্তার আলম্বন বা বিষয় হইয়াও অবিদ্যা ও অজ্ঞানতা নানা প্রকার অকুশল বা মন্দ-কর্ম্ম-চেতনার প্রেরণা দিয়া থাকে। যেমন মনে করুন,—কোন ব্যক্তি অতীতে কোন দুষ্কর্ম্ম করিয়া অত্যন্ত আনন্দ উপভোগ করিয়াছিল। এখন অনেক দিন পরেও সে ঐ আনন্দ ও আনন্দ উপভোগের অবস্থা চিন্তা করিয়া অধিকতর আমোদ পাইতেছে এবং পুনর্ব্বারও ইহা উপভোগ করিবার মোহে মুগ্ধ হইয়া নানা প্রকার লোভ-চেতনার প্রশ্রয় দিতেছে অথবা এখন আর ঐ আনন্দ উপভোগ করিবার অবস্থা বা উপায় নাই দেখিয়া উন্মত্ত-প্রায় হইয়া উঠিয়াছে। এই উদাহরণ হইতে দেখা যায় যে, অবিদ্যা-জনিত একান্ত নিরর্থক বিষয় চিন্তার আলম্বন-রূপে মানসপটে উদিত হইয়া নানা প্রকার দুশ্চিন্তার ও অকুশল কর্ম্ম-চেতনার প্রশ্রয় বা প্রেরণা দিয়া থাকে। এইরূপে বুঝা যায়,—অবিদ্যা প্রেরণার বিষয়রূপে অকুশল কর্ম্ম বা সংস্কারের কারণ হইয়া থাকে।

প্রতীত্য-সমুৎপাদের গূঢ়তত্ত্ব বুঝিতে হইলে সর্বপ্রথমে ২৪ প্রকার প্রত্যয়-গুলি[১০] সম্বন্ধে আলোচনা করা দরকার। অভিধর্ম্ম পিটকের শেষ গ্রন্থ "পট্ঠান পকরণে"[১১] এই প্রত্যয়গুলির বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে,—মাত্র এই ২৪টি প্রত্যয়ের ব্যাখ্যা করিতে "পট্ঠান পকরণে" বৃহৎ বৃহৎ ছয়টি গ্রন্থের প্রয়োজন হইয়াছে। এইখানে কিন্তু আমরা প্রথমে উল্লিখিত অবিদ্যার সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট মুখ্য প্রত্যয় বা কারণগুলি অর্থাৎ হেতু-পচ্চয় বা মূল কারণ; সহজাত পচ্চয় বা এক সঙ্গেই উৎপন্ন হয় এমন কারণ; অঞ্ঞমঞ্ঞ-পচ্চয় বা পরস্পর অনুবর্ত্তনশীল কারণ; উপনিস্সয়-পচ্চয় বা প্রেরণা বা প্রবর্ত্তনাদায়ী কারণগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

পট্ঠান-পকরণের ভাষ্যকার বৃক্ষের শিখরের সহিত হেতু-পচ্চয় বা মূল-কারণের তুলনা করিয়াছেন। বৃক্ষ ইহার শিখরগুলিকে আশ্রয় করিয়াই দাঁড়াইয়া থাকে; এবং ততদিনই ইহা জীবিত থাকে, যতদিন না ইহার শিখর-গুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যায়। এই প্রকারে সর্ব্বদা বর্ত্তমান এবং সমকালীন-উৎপত্তিরূপে কুশল ও অকুশল কর্ম্মের মূল-হেতুগুলি যথাক্রমে তাহাদের স্ব স্ব সমস্ত কুশল ও অকুশল কর্ম্মের বা সংস্কারের কারণ হইয়া থাকে। লোভ, দ্বেষ ও মোহ বা অবিদ্যা অথবা অজ্ঞানতা, এই তিনটিই সমস্ত অকুশলের মূল-হেতু। সেইরূপ অলোভ, অদ্বেষ ও অমোহ অর্থাৎ লোভ-হীনতা, দ্বেষ-হীনতা ও মোহ-হীনতা এই তিনটিই সমস্ত কুশলেরই মূল-হেতু।

এখন "সহজাত-পচ্চয়" সম্বন্ধে আলোচনা করা যায়। সহজাত শব্দের শব্দগত অর্থ হইল,—সমকালীন উৎপত্তি বা সঙ্গে সঙ্গেই উৎপত্তি। সহজাত-প্রত্যয় প্রধানতঃ চিত্ত এবং বেদনা, সঞ্ঞা, ফস্সো, চেতনা, মনসিকার ইত্যাদি চৈতসিক-ধর্ম্ম[১২] গুলির উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কারণ চিত্ত (Consciousness) ও এই সমস্ত চৈতসিক-ধর্ম্মগুলি (Concomitant mental Phenomena) এক অন্যের অনুবর্ত্তনশীল; সুতরাং সমকালীন উৎপত্তি হিসাবে একে অন্যের কারণ হইয়া থাকে। এক অন্য ব্যতিরেকে সম্ভব হয় না বা অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারে না। সুতরাং চিত্ত ও চৈতসিক-ধর্ম্মগুলি পরস্পর অবিয়োজ্য। এখন আমরা যদি বলি,—সমকালীন উৎপত্তি হিসাবে বেদনা (Feeling) চিত্তের কারণ, তাহা হইলে ইহার অর্থ হয় যে,—চিত্ত ও ইহার চৈতসিক ধর্ম্ম "বেদনা" উভয়েই এক সঙ্গেই উৎপন্ন হয়; এক ছাড়া

অন্যের উৎপত্তি সম্পূর্ণ অসম্ভব। একদিন জনৈক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ গ্রন্থকার আলোচনা প্রসঙ্গে আমাকে বলিয়া বসিলেন যে, চিত্ত (বা বিঞ্ঞাণ) ব্যতিরেকে দুঃখ বেদনা (Painful feeling) সম্পূর্ণ সম্ভব। আমি তাঁহার এই বিস্ময়কর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিলে তিনি তাঁহার অদ্ভুত যুক্তি ও সিদ্ধান্তকে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার মানসে একটি দৃষ্টান্ত দিতেও ত্রুটি করিলেন না। দৃষ্টান্তটি এইরূপ,—কোন লোককে ক্লোরোফরম করিয়া অস্ত্রোপচার করিবার কালীন সে অত্যন্ত দুঃখ বেদনা অনুভব করিয়া থাকে, যদিও সে সচেতন নহে। বাস্তবিকই ইহা মস্ত বড় ভুল ধারণা। বেদনা সম্বন্ধে সচেতন না হইলে কি করিয়া বেদনানুভব সম্ভব হইতে পারে? দুঃখ-বেদনা চৈতসিক ধর্ম্ম বিশেষ; সুতরাং ইহাকে চিত্ত (বিঞ্ঞাণ) ও অন্যান্য চৈতসিক-ধর্ম্মগুলি হইতে কোন মতেই পৃথক করিবার বা ভাবিবার উপায় নাই। বেদনা সম্বন্ধে যদি আমাদের সংজ্ঞা (Perception) না থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, বেদনা সম্বন্ধে আমরা সচেতন নহি; সংজ্ঞাহীন অবস্থায় দুঃখ বা সুখ বেদনা কি প্রকারে অনুভব করা সম্ভব হয়? সুতরাং ইহাতেই বুঝা যায়—চিত্ত এবং বেদনা, সংজ্ঞা ইত্যাদি ৫২ প্রকার চৈতসিক ধর্ম্মগুলি পরস্পর অনুবর্ত্তনশীল ও সমকালীন উৎপত্তিরূপে একে অন্যের কারণ হইয়া থাকে।

"উপনিস্সয়-পচ্চয়" অর্থ—অবলম্বন অথবা উৎসাহদানকারী অথবা প্রেরণা বা প্রবর্ত্তনাদায়ী প্রত্যয় বা কারণ। উপনিশ্রয় প্রত্যয়কে অনেক শ্রেণীতে[১৩] ভাগ করা যায়; এবং ইহার সহিত অন্য কতকগুলি প্রত্যয়ের হুবহু মিল আছে। ইহার প্রয়োগ অত্যন্ত ব্যাপক; আমরা এইখানে ইহার কোন তারতম্য না করিয়া খুব সাধারণ ভাবে আলোচনা করিব। অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ, ভৌতিক অথবা মানসিক, বাস্তবিক অথবা কাল্পনিক সব কিছুই প্রেরণারূপে পশ্চাদ্বর্ত্তী চিত্ত চৈতসিক-ধর্ম্মোৎপত্তির অথবা কর্ম্মের অথবা ঘটনার কারণ হইতে পারে।

উদাহরণ স্বরূপ বলিতে পারি, বুদ্ধ ও তাঁহার ধর্ম্ম আমার পাশ্চাত্য দেশ ত্যাগ করতঃ প্রাচ্যদেশে আসার কারণ। জার্ম্মানীতে যে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে আমি প্রথম বক্তৃতাটি শুনিয়াছিলাম, ইহাও আমার এই দেশে আসার কারণ বলা চলে। তথায় আমি যেই পালি-পণ্ডিতগণের পালির অনুবাদ পড়িয়াছিলাম তাঁহারা (পণ্ডিতগণ)ও আমার এই প্রাচ্যদেশে আসার অন্যতম

কারণ বটে। অথবা নির্ব্বাণই আমাদের চিন্তার বা ভাবনার অবলম্বন (Object) স্বরূপ হইয়া আমাদিগকে সঙ্ঘে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতঃ নিষ্কলুষ ও পবিত্র জীবন যাপনের প্রেরণা (Inducement) দিয়াছে বলিতে পারি। অতীতের সমস্ত চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ, বৈজ্ঞানিকগণ ও শিল্পীগণ তাঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও কর্ম্মদক্ষতায় পরবর্ত্তী বংশধরগণের পূর্ণাঙ্গ কৃষ্টির আশ্রয় বা অবলম্বনরূপে (উপনিস্সয়-পচ্চয়) কারণ বলা যায়। "অর্থোপার্জ্জন" আমাদের চিন্তার বিষয় হইয়া, অর্থ লাভের উপায় উদ্ভাবনের প্রবর্ত্তনারূপে কারণ হইয়া থাকে। অথবা এই অর্থোপার্জ্জনের উপায় উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা যদি সৎপথে চালিত না হয়, ইহা চুরি বা দস্যুবৃত্তিরও কারণ হইতে পারে। জ্ঞান, বিশ্বাস ও সৎসঙ্কল্প ইত্যাদি অনেক প্রকার সৎ ও নিঃস্বার্থ কর্ম্মের প্রেরণারূপে কারণ হয়। সৎ অথবা অসৎ বন্ধু যথাক্রমে—সৎ অথবা অসৎ-কর্ম্মের অবলম্বন বা প্রেরণা হিসাবে কারণ হইতে পারে। অনুকূল অথবা প্রতিকূল জল-বায়ু, আহার, বাসস্থান ইত্যাদি শারীরিক সুস্থতা বা অসুস্থতার, শারীরিক সুস্থতা বা অসুস্থতা মানসিক সুস্থতা বা অসুস্থতার উপনিশ্রয় বা আশ্রয় বা অবলম্বনরূপে কারণ হইতে পারে। এইভাবে দেখা যায়—উপনিশ্রয় বা আশ্রয় বা অবলম্বন বা প্রবৃত্তিরূপে এক অবস্থা অন্য অবস্থার, এক ধর্ম্ম (Phenomena) অন্য ধর্ম্মের, এক ঘটনা অন্য ঘটনার কারণ হইয়া থাকে।

এখন আমরা "আরম্মণ-পচ্চয়" বা আলম্বন-প্রত্যয়ের আলোচনা করিব। আলম্বন শব্দের অর্থ—রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ এবং মানসিক চিন্তার বা ভাবনার যে কোন বিষয়কেই বুঝায়। ভৌতিক অথবা মানসিকই হউক, অতীত, বর্ত্তমান অথবা ভবিষ্যৎ, বাস্তব বা কাল্পনিকই হউক, যে কোন কিছুই মনালম্বন হইতে পারে (mental object)। এই দৃশ্যমান বিষয় বা রূপ,—বর্ণ, আলো ও অন্ধকার—এই তিনের বিভিন্নতা মাত্র ; ইহাই চক্ষু-বিজ্ঞান (eye-consciousness) উৎপন্ন হইবার বিষয়ভূত কারণ। এবং এই একই নিয়মে অন্য চারি প্রকার ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। রূপী-আলম্বন ব্যতিরেকে চক্ষু-বিজ্ঞান, শ্রোত্র-বিজ্ঞান, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, জিহ্বা-বিজ্ঞান ও কায়-বিজ্ঞানের কোন বিজ্ঞানই (Sense consciousness) উৎপন্ন হয় না। অধিকন্ত আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি যে—অতীতের যে কোন অপকর্ম্ম-জনিত সুখ বা দুঃখ-বেদনা বর্ত্তমানে আমাদের চিন্তার বিষয়রূপে উদিত হইয়া উপনিশ্রয় বা আলম্বন অথবা প্রবৃত্তিজনক প্রত্যয় হইয়া ঐ ঘটনা পুনঃ ঘটিবার

অথবা ইহার প্রতি ঘৃণার উদ্রেকের বা ইহার জন্য পরিতাপের কারণ হইতে পারে। এইরূপে অতীতের অপকর্ম্মের চিন্তা অসৎপথে চালিত হইলে, ইহা অধিকতর পাপ-জীবন যাপনের কারণ হইতে পারে। আবার একই অপকর্ম্মের চিন্তা সৎপথে চালিত হইলে, ইহা নানা প্রকার পুণ্যকর্ম্মের ও পবিত্র-জীবন যাপনেরও কারণ হইতে পারে। সুতরাং সৎকর্ম্মের সৎচিন্তা অধিকতর সৎকর্ম্মের প্রেরণামূলক কারণ হইয়া থাকে ; সেইরূপ নিজকৃত একই প্রকার সৎকর্ম্মের কুচিন্তা নানা প্রকার মান, অভিমান ও অন্যান্য অকুশল-চিত্ত[১৪] ও চেতনা উৎপত্তির প্রেরণা বা প্রবৃত্তি যোগাইয়া থাকে। এইরূপে এমন কি অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা ও অনেক সময়ে অনেক প্রকার সৎ এবং কুশল কর্ম্মের কারণ হইতে পারে। ইহা আমরা উল্লিখিত "অবিদ্যা সংস্কারের কারণ" সম্বন্ধে আলোচনাতেও দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। যাহা হউক, এখন আবার দেখা যাক্—অবিদ্যার মত এমন মন্দ, অহিতকর জিনিসও কি উপায়ে সাধু এবং কুশলকর্ম্ম বা সংস্কারের কারণ হইতে পারে ; মুখ্য প্রেরণা বা প্রবৃত্তি (উপনিস্সয়-পচ্চয়) অথবা মানসিক চিন্তার বিষয় (মনারম্মণ)—এই দুই উপায়ে অবিদ্যা ও অজ্ঞানতা কুশল কর্ম্মের কারণ হইতে পারে। চৈতসিক ইহা জটিল উদাহরণ দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

ভগবান বুদ্ধের সময়ে অনুপস্থীগণ (অঞ্‌ঞতিত্থিয়া) অভিমান ও অজ্ঞানতার বশবর্ত্তী হইয়া বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া বুদ্ধের কথা দিয়াই বুদ্ধকে তর্কে পরাজিত করিবার প্রয়াস পাইত। কিন্তু অল্পক্ষণ কথা কাটা-কাটির পরেই ভগবান বুদ্ধের তর্ক ও যুক্তি-জালের মধ্যে ধরা পড়িয়া নিজেরাই ভগবান বুদ্ধের চরণেই আশ্রয় ভিক্ষা করিত এবং যাবজ্জীবন ভগবান বুদ্ধের সমর্থনকারী হইয়া থাকিত। এমন কি, এইরূপে দীক্ষিত লোকগণের মধ্যে অনেকে অর্হত্ত্ব ফল লাভ করিয়াছিলেন এমন দৃষ্টান্ত যথেষ্ট পাওয়া যায়। এইখানে ভগবান বুদ্ধের উপদেশানুসারে এই সমস্ত লোকের নানাবিধ পুণ্যা-নুষ্ঠান, এমন কি অর্হত্ত্ব ফল লাভেরও অবিদ্যা বা অজ্ঞানতাই মুখ্য কারণ (Direct Inducement)। যদি ইহাদের মনে অবিদ্যা-জনিত অহঙ্কার ও বুদ্ধকে পরাজিত করিবার মিথ্যা প্রয়াসের চিন্তা না উঠিত, সম্ভবতঃ তাহারা কোনদিনই ভগবান বুদ্ধের দর্শন লাভ করিত না, নানাবিধ পুণ্যানুষ্ঠান ও অর্হত্ত্ব ফল লাভ করা দূরেই থাকুক। সুতরাং অবিদ্যাই ছিল—এই সমস্ত লোকের নানাবিধ সাধু ও কুশল কর্ম্মের "উপনিস্সয়-পচ্চয়" অথৎ মুখ্য

প্রেরণারূপে কারণ। আবার মনে করুন, কোন ব্যক্তি সাংসারিক সমস্তই দুঃখ-দুর্দ্দশার মূল-কারণরূপে চিন্তা করিয়া যদি অবিদ্যাকে ঘৃণা করে এবং সঙ্গে সঙ্গেই নানা প্রকার পুণ্যানুষ্ঠান ও সৎকর্ম্ম সাধন করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে অবিদ্যাই এই সমস্ত কুশলকর্ম্মের "আরম্মণূপনিস্সয়-পচ্চয়" বা আলম্বনোপনিশ্রয় প্রত্যয় বা কারণ (Inducement as object of thought)।

২। এখন আমাদের দ্বিতীয় প্রতিপাদ্য বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমাদিগকে এই বিষয়টি স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অবিদ্যা সংস্কারের এবং সংস্কার বিজ্ঞানের মুখ্য কারণ (Main condition) হইলেও কখনই একমাত্র কারণ নহে। প্রতীত্যসমুৎপাদে আপেক্ষিক কারণ সমুদ্ভূত প্রত্যেক ঘটনা বা সমুৎপত্তিই তথা প্রদর্শিত মুখ্য কারণ ছাড়াও নানা রকম প্রত্যয়ের বা কারণের উপর নানা উপায়ে নির্ভরশীল হইয়া থাকে।

হেতু (Cause) এবং প্রত্যয় (Condition) এক কথা নহে। প্রকৃতপক্ষে হেতু বলিলে ইহাই বুঝায় যে,—এমন কোন জিনিসের ভিতরে হেতুরূপে ভবিষ্যৎ বিপাক (Result) আগেই নিহিত বা লুক্কায়িত রহিয়াছে এবং প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রত্যয় বা কারণগুলি বর্ত্তমান থাকিলে, ইহার আভ্যন্তরিক অবশ্যম্ভাবিতানুযায়ী সময়ে ফল-স্বরূপ একই স্বভাবের অন্য এক জিনিষ উৎপাদন করিয়া থাকে; যেমন আম্রবীজে ভবিষ্যতের আম্রবৃক্ষ লুক্কায়িত থাকে।

আম্রবীজ হইতে যেমন ফল-স্বরূপ (Result) শুধু আম্রবৃক্ষই বাহির হয়, কখনই অন্য কোন প্রকার বৃক্ষ হয় না, তেমন একটিমাত্র হেতুও তাহার স্বভাবানুযায়ী ফল-স্বরূপ একটি মাত্র জিনিষই উৎপাদন করিয়া থাকে, কখনই নানা জিনিষ বা নানা স্বভাবের জিনিষ উৎপাদন করে না। উদাহরণ স্বরূপ মনে করুন, রাম—শ্যামের আচরণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল, এমতাবস্থায় সাধারণতঃ লোকে বলিয়া থাকে, শ্যামের অন্যায় আচরণই রাম ক্রুদ্ধ হইবার হেতু। কিন্তু ইহা নেহাৎ ভুল ধারণা। হেতু অর্থাৎ রামের প্রচণ্ডতা রামের ভিতরেই নিহিত ছিল; ইহা তাহার চরিত্রেই লুক্কায়িত ছিল, শ্যামের ভিতরে নহে। শ্যামের অন্যায় আচরণ রামের সুপ্ত-প্রচণ্ডতা জাগ্রত হইবার বা আত্মপ্রকাশ করিবার উদ্দীপনা বা উপলক্ষ্য মাত্র (Condition) ছাড়া আর

কিছুই নহে। বৌদ্ধ দর্শনে হেতু শব্দের অর্থ শুধু পুনর্জন্ম উৎপাদনকারী সংস্কার বা কর্ম্মই বুঝায় (rebirth-producing volitional activities)।

এখন আমাদের দ্বিতীয় প্রতিপাদ্য বিষয় হইল "সঙ্খারা-পচ্চয়া বিঞ্ঞাণং"[১২]—সংস্কারই বিজ্ঞানের কারণ। অন্য কথায়ঃ—পূর্ব্বজন্মের সংস্কার বা কর্ম্মই (কর্ম্ম চেতনা) বর্ত্তমান চেতনশীল অস্তিত্বের কারণ।

এইখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে,—অতীত ভবের "অবিজ্জা, সঙ্খারা, তণ্হা, উপাদানং ও ভব (কর্ম্ম-ভব)" এই পাঁচটি কর্ম্ম হেতু—বর্ত্তমান ভবে "বিঞ্ঞাণং, নাম-রূপং, সলায়তনং, ফস্সো, বেদনা"—ফল-রূপে প্রসব করিয়া থাকে। পুনর্জন্ম নির্ণয়কারী চেতনা (Life-affirming volition) "অবিজ্জা, সঙ্খারাদি"—উক্ত পাঁচটি কর্ম্ম-হেতুর ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করে; এই পুনর্জন্ম-জনক চেতনাই বর্ত্তমান উৎপত্তির বীজ-স্বরূপ এবং ভবিষ্যৎ উৎপত্তি ও এই একই বীজ হইতে হইয়া থাকে। তাহা হইলে আমাদের দ্বিতীয় পতিপাদ্য বিষয় হইতে আমরা ইহাই দেখিতে পাই যে,—আমাদের বর্ত্তমান চেতনশীল অস্তিত্ব আমাদের অতীত জন্মের সংস্কারেরই (Karma formations) ফল; কর্ম্ম—হেতু (Karmic cause) রূপে অতীতের এই সংস্কার ব্যতিরেকে কখনই মাতৃগর্ভে কোনও চেতনাশীল সত্তার উৎপত্তি হইত না। মহানিদান সূত্রে (দীর্ঘনিকায়) বলা হইয়াছে—"একবার সমুদয় অবিদ্যা ও উপাদান নিঃশেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে কুশল বা অকুশল আর কোনও প্রকার সংস্কার সংস্কৃত হইবে না, সুতরাং পুনর্জন্ম-জনক কোন বিজ্ঞানই মাতৃগর্ভে উৎপন্ন হয় না।"

পূর্ব্ব সংস্কার—মাতৃগর্ভে প্রতিসন্ধি বিজ্ঞান ও প্রতিসন্ধিক্ষণে জাত অন্যান্য সমস্তই "অব্যাকৃত বিপাক" চিত্তগুলি (Morally neutral Karma-resultant consciousness) উৎপত্তির কর্ম্ম বা হেতু-রূপে কারণ হইয়া থাকে। ইষ্ট বা অভিপ্রেত মনোরম আলম্বন (Sense-object) সংস্পর্শ-জনিত চক্ষু, শ্রোত্রবিজ্ঞানাদি পাঁচ প্রকার বিপাক চিত্তগুলি পূর্ব্ব জন্মের কুশল সংস্কারেরই ফল; সেইরূপ অনিষ্ট বা অনভিপ্রেত অপ্রীতিকর আলম্বন সংস্পর্শ-জনিত চক্ষু, শ্রোত্রবিজ্ঞানাদি পাঁচ প্রকার অকুশল বিপাক চিত্তও অকুশল সংস্কারেরই[১৩] ফল।

৩। এখন আমরা আমাদের তৃতীয় প্রতিপাদ্য বিষয় আলোচনা করিব—

"বিঞ্ঞাণ-পচ্চয়া নাম-রূপং," বিজ্ঞানই নাম-রূপোৎপত্তির (Mental and physical phenomena) কারণ। এই সম্বন্ধে সংযুক্ত নিকায়ের নিদান-সংযুক্তে অতি চমৎকার যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে :—"গর্ভসঞ্চারকালে মাতৃগর্ভে বিজ্ঞান (Rebirth consciousness) উপস্থিত না থাকিলে তথায় নাম-রূপের উৎপত্তি হইত কি ?"

বেদনা (feeling), সংজ্ঞা (perception), স্পর্শ (impression), চেতনা (volition), জীবিতেন্দ্রিয় (mental vitality), একাগ্রতা ও মনোনিবেশ (মনসিকারো), এই চৈতসিক ধর্ম্মগুলির নাম "নাম" বা নামস্কন্ধ[১৭]। এই সাতটি চৈতসিক ধর্ম্ম অনিবার্য্যরূপে সমস্তই কুশল ও অকুশল বিপাক চিত্ত-গুলির সহিত জড়িত থাকে।

পৃথিবী ইত্যাদি চারি প্রকার মহাভূত ও চারি মহাভূত উপাদানে প্রবর্ত্তিত ২৪ প্রকার রূপের নাম "রূপ"[১৮] বা রূপস্কন্ধ।

এখন দেখা যাউক কি উপায়ে বিজ্ঞান নামরূপের কারণ হয়।" পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে,—যে কোন চৈতসিক অবস্থা তদনুবর্ত্তনশীল স্পর্শ, বেদনা, সংজ্ঞা ইত্যাদি চৈতসিক ধর্ম্মগুলি উৎপত্তির সহজাত প্রত্যয়রূপে কারণ হইয়া থাকে। অর্থাৎ চিত্ত[১৯] ও চৈতসিক ধর্ম্মগুলি এক সঙ্গেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। বেদনা ইত্যাদি চৈতসিক ধর্ম্ম ব্যতিরেকে বিজ্ঞান বা চিত্ত কখনই উৎপন্ন হইতে পারে না বা উৎপন্ন হইয়া স্থিত থাকিতে পারে না। সেইরূপ বেদনা ইত্যাদিও চিত্ত ব্যতিরেকে উৎপন্ন হইতে পারে না। কুশল বা অকুশল চিত্তের অনুগামী—চৈতসিক ধর্ম্মগুলিও যথাক্রমে সেই সেই চিত্তের সহিত অবিয়োজ্যভাবে জড়িত থাকে ; এক ছাড়া অন্যের উৎপত্তি সম্ভব হইতে পারে না। ইহারা পরস্পর অবিয়োজ্য অথচ একান্ত আপেক্ষিক ; সুতরাং ইহাদের কোন স্বাধীন অস্তিত্ব নাই। অন্য কথায় চৈতসিক ধর্ম্মগুলি চিত্তের বিভিন্ন অবস্থা মাত্র ; বিদ্যুতের মত প্রতি মুহূর্ত্তে প্রয়োজনানুসারে স্ফুরিত হইয়া অনতিবিলম্বেই চিরতরে বিলীন হইয়া যায়।

কিন্তু বিজ্ঞান কি উপায়ে চক্ষুরায়তনাদি নানাবিধ রূপের (physical phenomena) কারণ হইতে পারে ?

জন্ম-প্রক্রিয়ার যে মুহূর্ত্তে চক্ষু প্রথম দর্শন ক্রিয়া আরম্ভ করে, ঠিক সেই প্রথম মুহূর্ত্তেই দর্শন ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চক্ষুবিজ্ঞান (eye consciousness.) উৎপন্ন হওয়া অনিবার্য্য নিয়ম ; সুতরাং বিজ্ঞান চক্ষুরায়তনের সহজাত-প্রত্যয়-

রূপে কারণ হইয়া থাকে। যতক্ষণ চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয় না ততক্ষণ পর্যন্ত চক্ষু দর্শন-ক্রিয়োপযোগী হয় না। এই প্রথম মুহূর্ত্ত ছাড়া অন্য সময়ে অর্থাৎ সারাজীবনব্যাপি বিজ্ঞান অগ্রে-উৎপন্ন-রূপের পশ্চাৎজাত প্রত্যয়রূপে কারণ হইয়া থাকে, আহার (nutriment) প্রত্যয়রূপেও কারণ হইয়া থাকে। কারণ শরীর ধারণের পক্ষে বিজ্ঞান প্রধান আশ্রয় বা অবলম্বন। ক্ষুধার অনুভূতি যেমন খাওয়ারও অগ্রে উৎপন্ন শরীর ধারণের কারণ হয়, সেইরূপ বিজ্ঞানও অগ্রে উৎপন্ন শরীর রক্ষার অবলম্বন ও পশ্চাৎজাত প্রত্যয়রূপে কারণ হইয়া থাকে। শরীরোৎপত্তির পরে যদি আর কোন প্রকার বিজ্ঞান উৎপন্ন না হইত তাহা হইলে চক্ষুরায়তনাদি সমস্ত আয়তনগুলিরই (Physical organs) ক্রিয়া ক্রমশঃ বন্ধ হইয়া যাইত, সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের ক্রিয়াশক্তি (faculties)ও নষ্ট হইয়া যাইত এবং ফলে সমস্ত শরীর অচেতন অসাড় কাষ্ঠবৎ হইয়া মরিয়া যাইত।

৪। "নাম-রূপ-পচ্চয়া সলায়তনং" নাম-রূপের (Mental and physical phenomena) প্রত্যয়ে বা কারণে ষড়ায়তনের উৎপত্তি হয়। ষড়ায়তনই নাম-জীবিতেন্দ্রিয়ের (mental life) ভিত্তি। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক (কায়),—এই পাঁচটি আয়তন ভৌতিক ; ষষ্ঠ আয়তন অর্থাৎ মনায়তন (mind-base),—চক্ষু, শ্রোত্রবিজ্ঞানাদি, পঞ্চবিধ বিজ্ঞানের এবং নানা প্রকার মন-বিজ্ঞানের সমষ্টির অন্যতম নাম মাত্র।

এখন দেখা যাউক, কিরূপে "নাম ও রূপ," প্রথম পঞ্চ-ভৌতিক আয়তনের এবং ষষ্ঠ আয়তনের অর্থাৎ বিজ্ঞানের কারণ হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে এইখানে আমরা চারিটী প্রশ্নের সম্মুখীন হই।

প্রথম প্রশ্ন হইল, কি প্রকারে "নাম" চক্ষুরায়তন, শ্রোত্রায়তনাদি—পঞ্চভৌতিক আয়তনের (physical sense-organs) কারণ হইয়া থাকে? স্পর্শ, বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা, একাগ্রতা, জীবিতেন্দ্রিয় ও মনোনিবেশ (মনসিকার)—এই পরস্পর অবিয়োগ্য সপ্ত-চৈতসিক ধর্ম্মের নাম—"নাম।" এই চৈতসিক ধর্মগুলি, কুশল বা অকুশল, সকল প্রকার চিত্তেই বর্তমান থাকে। এই জন্য ইহাদের অপর নাম,—সর্বচিত্ত সাধারণ (সত্ত চেতসিকা সব্বচিত্ত-সাধারণা)। ইহারা চক্ষুরায়তন, শ্রোত্রায়তন, জিহ্বায়তন ও কায়ায়তন—এই পঞ্চ ভৌতিক আয়তনের পশ্চাৎ-জাত প্রত্যয় (Postnascence) রূপে কারণ হইয়া থাকে ; ইহা ছাড়া অবশ্য আরও অন্যান্য অনেক উপায়েও

কারণ হইয়া থাকে। ব্যক্তিগত সারাজীবনের মানসিক-প্রক্রিয়াই এই ভৌতিক আয়তন সমূহের সজীব থাকিবার প্রয়োজনীয় অবলম্বন। চক্ষুরায়তন, শ্রোত্রায়তন, ইত্যাদি আয়তনগুলির উৎপত্তির পরে যদি চক্ষুবিজ্ঞান, শ্রোত্র-বিজ্ঞানাদি কোন বিজ্ঞানই (Consciousness) উৎপন্ন না হইত, তাহা হইলে এই আয়তন সমূহের কর্ম-শক্তি লোপ পাইত, ইহা আগেই বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হইল,—কিরূপে "নাম" মনায়তনের অর্থাৎ বিজ্ঞানের কারণ হইয়া থাকে? "নাম" অর্থাৎ বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা ইত্যাদি যে কোন সময়ে মনায়তন বা বিজ্ঞানের সহজাত-রূপে কারণ হইয়া থাকে (সহজাত-পচ্চয়)।

ইহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে, বিজ্ঞান বা চিত্ত, ইহার অনুগামী বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনাদি চৈতসিক-ধর্ম্মসমূহ ব্যতিরেকে কখনই উৎপন্ন হয় না। কারণ চিত্ত ও চৈতসিক ধর্ম্মগুলি পরস্পর অবিয়োগ্যভাবে সম্বন্ধ বিশিষ্ট, এবং একে অন্যের উপর অনিবার্য্যরূপে নির্ভরশীল। ইহা ছাড়া "নাম" পঞ্চায়তনের ও মনায়তনের বা বিজ্ঞানের কিরূপে কারণ হইয়া থাকে,—তাহাও দেখান হইয়াছে।

রূপ (Physical phenomena) কি উপায়ে পঞ্চভৌতিক-আয়তনের কারণ হইয়া থাকে?—ইহাই হইল তৃতীয় প্রশ্ন। মাটি. জল, উত্তাপ ও বায়ু,—এই চতুর্মহাভূত,—চক্ষুরায়তন, শ্রোত্রায়তন, ঘ্রাণায়তন, জিহ্বায়তন ও কায়ায়তন ইত্যাদির সর্ব্ব-প্রথম উৎপত্তি মুহূর্তে (জন্মের সময়ে) সহজাত-প্রত্যয়রূপে (সহজাত-পচ্চয়) কারণ হইয়া থাকে: কিন্তু ইহা ছাড়া অন্য সময়ে (জন্মের পর হইতে) চতুর্মহাভূত—"পঞ্চায়তনের ভিত্তি (নিস্সয়) রূপে কারণ হইয়া থাকে। রূপ-জীবিতেন্দ্রিয়,—পঞ্চায়তনের বর্তমান-প্রত্যয় রূপে (অত্থি-পচ্চয়) কারণ হইয়া থাকে। অন্য কথায়,—পঞ্চায়তনের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে রূপ-জীবিতেন্দ্রিয়ের উপরেই নির্ভর করিয়া থাকে; রূপ-জীবিতেন্দ্রিয়ের (Physical life) অবর্ত্তমানে ভৌতিক আয়তনসমূহ কোন মতেই বাঁচিয়া থাকিতে পারে না।

আহার,[২০] পঞ্চ ভৌতিক-আয়তনের বর্তমান-প্রত্যয়রূপে (a condition by way of presence) কারণ হইয়া থাকে; যতক্ষণ পর্যন্ত ইহাদের প্রয়োজনীয় আহার (Nutrition) বিদ্যমান থাকে ততক্ষণই ইহারা

জীবিত থাকে। সুতরাং ইহাতে বুঝা যায়,—"রূপ," কিরূপে পঞ্চরূপী-আয়তনের কারণ হইতে পারে।

চতুর্থ প্রশ্ন হইল,—"রূপ," কি প্রকারে মনায়তনের বা বিজ্ঞানের কারণ হইতে পারে? চক্ষুরায়তন, শ্রোত্রায়তন, ঘ্রাণায়তন, জিহ্বায়তন ও কায়ায়তন,—তৎসম্পর্কিত চক্ষুবিজ্ঞান, শ্রোত্রবিজ্ঞানাদি পঞ্চবিজ্ঞানের বা দর্শন শ্রবণ ইত্যাদি ক্রিয়া-সংগঠনের ভিত্তি-প্রত্যয়রূপে (Foundation), পূর্ব্বে জাতপ্রত্যয়রূপে (already arisen), বর্তমান প্রত্যয়রূপে (Presence), কারণ হইয়া থাকে। যেহেতু চক্ষুবিজ্ঞানাদি পঞ্চবিজ্ঞান,—ভিত্তিরূপে পূর্ব্বেজাত-পঞ্চায়তন ব্যতিরেকে কখনই উৎপন্ন হইতে পারে না, সুতরাং ভিত্তিরূপে পূর্ব্বেজাত হইয়া চক্ষুরায়তনের বর্ত্তমানতা ছাড়া, কখনই দর্শন-ক্রিয়া সংঘটিত হইতে পারে না। সেইরূপ ভিত্তিরূপে পূর্ব্বেজাত হইয়া শ্রোত্রায়তনের, ঘ্রাণায়তনের, জিহ্বায়তনের এবং কায়ায়তনের "বর্তমানতা" ছাড়া কখনই শ্রবণ-ক্রিয়া, ঘ্রাণক্রিয়া, রসাস্বাদন-ক্রিয়া, স্পর্শ-ক্রিয়া সংঘটিত হইতে পারে না। যদি পঞ্চায়তনের ক্রিয়াশক্তি নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে আর তৎসম্পর্কিত বিজ্ঞানাদি উৎপন্ন হইতে পারে না।

মনায়তনও এইরূপে,—বহুবিধ মন-বিজ্ঞানের[২১] কারণ হইয়া থাকে। মূল পালি পিটকে মন-বিজ্ঞানের ভিত্তিস্বরূপ (Physical base) কোন বিশিষ্ট নামে কোন বিশিষ্টরূপী-আয়তনের উল্লেখ না থাকিলেও, কিন্তু পরে অর্থকথা-চার্য্যগণ মন-বিজ্ঞানের ভিত্তিস্বরূপ, হৃদয়বস্তু নামে, এক রূপী আয়তনের কল্পনা করিয়াছেন; এবং এই অভিমত অনেকদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। আমার মনে হয়, আমার ব্রহ্মদেশীয় বন্ধু মিঃ সোয়ে জান অং সর্ব্বপ্রথম এই ঘটনা আবিষ্কার করেন এবং তাঁহার "অভিধর্ম্মার্থ সংগ্রহের"[২২] অনুবাদ গ্রন্থে ইহা প্রকাশ করেন। মনের ভৌতিক-ভিত্তি মস্তিষ্কই হউক,—অথবা হৃদয়-বস্তুই হউক, অথবা এছাড়া অন্য কোন আয়তনই হউক—বৌদ্ধদের পক্ষে ইহা খুবই ভাবিবার বিষয় নহে,[২৩] এবং ইহাতে কিছু আসে ও যায় না।

৫। "সলায়তন-পচ্চয়া ফস্সো" ষড়ায়তনের ভিতর দিয়াই স্পর্শের[২৪] উৎপত্তি হয়। অন্য কথায়,—চক্ষুরায়তনই—চাক্ষুষ-সংস্পর্শের, শ্রোত্রায়তনই শব্দসংস্পর্শের, ঘ্রাণায়তনই গন্ধ-সংস্পর্শের, জিহ্বায়তনই আস্বাদ-সংস্পর্শের, কায়ায়তনই কায়িক সংস্পর্শের, মনায়তনই (Consciousness) মানসিক সংস্পর্শের কারণ হয়।

পঞ্চায়তন, তদনুরূপ পঞ্চস্পর্শের (Sense-impression) ভিত্তি-প্রত্যয় রূপে (নিস্‌সয়), পূর্ব্বজাত-প্রত্যয়রূপে (পুরেজাত), এবং এ ছাড়া আরও নানাবিধ প্রত্যয়রূপে কারণ হইয়া থাকে। পঞ্চায়তন যে শুধু তদনুরূপ পঞ্চবিজ্ঞানের বা চিত্তোৎপত্তির ভিত্তিভূমি, তাহা নহে; পঞ্চবিজ্ঞানানুগামী চৈতসিক ধর্ম্ম সমূহেরও (Mental concomitants) ভিত্তি বটে। স্পর্শ (ফস্‌সো)ও চৈতসিক ধর্ম্ম, সুতরাং পঞ্চায়তন চৈতসিক ধর্ম্মেরও ভিত্তি। পঞ্চায়তন, পূর্ব্বজাত (জন্মের সঙ্গে সঙ্গে) বলিয়া পঞ্চবিধ সংস্পর্শের পূর্ব্বজাত-প্রত্যয় বা কারণ বলা হয়।

মনায়তন বা চিত্ত, যে কোন সময়ে ইহার আনুষঙ্গিক চৈতসিক ধর্ম্ম "স্পর্শের" সহজাত বা সমকালীন উৎপত্তি রূপে কারণ হইয়া থাকে। অন্য কথায়,—মনায়তন চক্ষু-বিজ্ঞান (Mind-Base eye-Consciousness), চাক্ষুষ-সংস্পর্শের সঙ্গে সঙ্গেই (সহজাত) উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেইরূপ শ্রোত্রবিজ্ঞান শব্দ-সংস্পর্শের, ঘ্রাণবিজ্ঞান গন্ধ-সংস্পর্শের, জিহ্বাবিজ্ঞান আস্বাদ-সংস্পর্শের, কায়বিজ্ঞান কায়িক-সংস্পর্শের এবং মনোবিজ্ঞানমানসিক-সংস্পর্শের সঙ্গে সঙ্গেই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বহিরায়তনগুলি অর্থাৎ রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ইত্যাদি আলম্বনগুলিও (Sense-objects) স্পর্শের অত্যাবশ্যক কারণ। যে কোন "রূপ" (visible object) দৃষ্টি-পথে পতিত হইবার আগে কখনই চাক্ষুষ-সংস্পর্শ উৎপন্ন হইতে পারে না, শব্দোৎপত্তির আগে কখনই শব্দ-সংস্পর্শের উৎপত্তি হয় না। এইরূপ অন্যান্য স্পর্শ ও তাহাদের অনুরূপ আলম্বনের সংস্পর্শে আসিবার পূর্ব্বে কখনই উৎপন্ন হইতে পারে না। সুতরাং পঞ্চবিধ স্পর্শোৎপত্তি যতদূর,—রূপ, রস, শব্দ ইত্যাদি পূর্ব্বজাত (Pre-arising) আলম্বনের উপর নির্ভর করিয়া থাকে,—চক্ষুরায়তন, শ্রোত্রায়তন ইত্যাদি পূর্ব্বজাত পঞ্চায়তনের উপরেও ততদূর নির্ভর করিয়া থাকে, ইহা ইতিপূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

রূপ. রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ ইত্যাদি মনালম্বন ও (Mental objects) হইতে পারে। সুতরাং ইহারা মন-বিজ্ঞান এবং তদানুষঙ্গিক স্পর্শাদি চৈতসিক-ধর্ম্মের কারণ হইয়া থাকে। আয়তন ও আলম্বন ব্যতিরেকে কোনও স্পর্শ এবং মন ও মনালম্বন ব্যতিরেকে কোনও মনঃসংস্পর্শ উৎপন্ন হয় না। এই জন্যই বলা হইয়াছে যে ষড়ায়তনের কারণেই স্পর্শের উৎপত্তি হয়।

৬। "ফস্‌স-পচ্চয়া বেদনা", স্পর্শ হইতেই বেদনা উৎপন্ন হয়। বেদনা (Feeling) ছয় প্রকার, যথা—চক্ষুসংস্পর্শজ বেদনা, শ্রোত্রসংস্পর্শজ বেদনা, ঘ্রাণসংস্পর্শজ বেদনা, জিহ্বাসংস্পর্শজ বেদনা, কায় (ত্বচ) সংস্পর্শজ বেদনা, এবং মনসংস্পর্শজ বেদনা। কুশল অথবা অকুশল কর্ম্মের বিপাকানুসারে কায়িক বেদনা সুখপূর্ণ বা দুঃখপূর্ণ হইয়া থাকে, সেইরূপ মানসিক বেদনাও প্রীতিকর বা অপ্রীতিকর অথবা উপেক্ষা (Neutral) বেদনা হইতে পারে। চক্ষুসংস্পর্শজ বেদনা, শোত্রসংস্পর্শজ বেদনা, ঘ্রাণসংস্পর্শজ বেদনা, জিহ্বা-সংস্পর্শজ বেদনা স্বভাবতঃ উপেক্ষা বেদনাই হইয়া থাকে, কিন্তু পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মানুসারে প্রীতিকর কিম্বা অপ্রীতিকর আলম্বনের সংস্পর্শে আসিলেই ইহার অন্যথা হয় ; আনন্দজনক আলম্বন হইতে হইলে সুখবেদনা এবং ঘৃণা-জনক আলম্বনের সংস্পর্শে আসিলে দুঃখ বেদনাই উৎপন্ন হয়। প্রীতিকর বা অপ্রীতিকর, সুখ বা দুঃখ অথবা উপেক্ষা, কায়িক অথবা মানসিক, অথবা চক্ষুসংস্পর্শজ, শ্রোত্রসংস্পর্শজ, ঘ্রাণসংস্পর্শজ, জিহ্বা-সংস্পর্শজ—যে কোন প্রকার বেদনাই হউক না কেন, ষড়স্পর্শের যে কোন এক স্পর্শের ভিতর দিয়াই উৎপন্ন হইয়া থাকে ; এছাড়া অন্য উপায় নাই। সুতরাং স্পর্শসমূহ,—তজ্জাত বেদনাসমূহের সহজাত প্রত্যয় ছাড়াও, আরও অন্যান্য নানা প্রত্যয়-রূপেও কারণ হইয়া থাকে।

ইহা ইতিপূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে,—চৈতসিক ধর্ম্মসমূহ, মূলতঃ একই চিত্তের বিভিন্ন অথচ আপেক্ষিক অবস্থা মাত্র। সুতরাং ইহারা একে অন্যের সম্বন্ধবিশিষ্ট, এক ছাড়া অন্য কখনই উৎপন্ন হইতে পারে না। কাজে-কাজেই স্পর্শ, বেদনা ইত্যাদি এক সঙ্গেই উৎপন্ন, এই জন্য সহজাত-প্রত্যয় ; এক অন্যের সদা সহচর। এই জন্য বর্ত্তমান-প্রত্যয় এবং ইহারা পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্মিলিত বা সংবদ্ধ, এই জন্য সম্প্রযুক্ত-প্রত্যয়রূপে,—এক অন্যের কারণ হইয়া থাকে। পূর্ব্বজ স্পর্শ তদনুবর্ত্তী বেদনা-উৎপত্তির উপনিশ্রয় প্রত্যয়রূপে (উপনিস্‌সয়-পচ্চয়) কারণ হইয়া থাকে।

সুতরাং স্পর্শই বেদনার কারণ (Through Impression Conditioned is Feeling).

৭। "বেদনা-পচ্চয়া তণ্‌হা"—বেদনার (feeling) ভিতর দিয়াই তৃষ্ণা (Craving) উৎপন্ন হয়।

চক্ষু, কর্ণাদি ষড়িন্দ্রিয়ের যথানুরূপ, রূপতৃষ্ণা, শব্দ-তৃষ্ণা, গন্ধ-তৃষ্ণা, রস-তৃষ্ণা, স্পর্শ-তৃষ্ণা ও ধর্মতৃষ্ণা (craving for mind-objects) ভেদেতৃষ্ণা—ছয় প্রকার। রূপ, শব্দ ইত্যাদি ষড়বিধ আলম্বনের, যে কোন আলম্বনের তৃষ্ণা যদি ভোগলালসার আকাঙ্ক্ষার সহিত জড়িত হয় তখন ইহাকে বলা হয়—কামতৃষ্ণা; যদি ইহা শাশ্বত-দৃষ্টি অর্থাৎ নিত্য, সনাতন অস্তিত্বে বিশ্বাসের সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট হয়, তখন ইহাকে বলা হয়—ভব-তৃষ্ণা; এবং যদি ইহা উচ্ছেদ-দৃষ্টির অর্থাৎ মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই অস্তিত্বের সবকিছুই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া যাইবে—এই বিশ্বাসের সহিত জড়িত হয়, তখন ইহাকে বলা হয়—বিভব-তৃষ্ণা (craving for Self-annihilation)।

মানসিক প্রীতিকর বা অপ্রীতিকর অথবা উপেক্ষা (indifferent) বেদনাই হউক অথবা শারীরিক সুখকর বা দুঃখকর বেদনাই হউক,—বিপাক-অব্যাকৃত[৫২] (Karma-resultant and morally neutral) বেদনার—যে কোন বেদনাই, পশ্চাদ্বর্ত্তী তৃষ্ণোৎপত্তি উপনিশ্রয় (Simple inducement) অথবা আলম্বনোপনিশ্রয় (inducement as object) প্রত্যয়-রূপে কারণ হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, কোন সুন্দরী স্ত্রীলোক বা কোন সুন্দর পুরুষ অথবা কোন সুন্দর বস্তু দর্শন জনিত যে প্রীতিকর বেদনা উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই প্রীতিকর বেদনা—পুনরায়ও সেই রূপ দর্শনের তৃষ্ণা জন্মাইতে পারে; অথবা কোন সুস্বাদু আহার জনিত যে প্রীতিকর বেদনা উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই প্রীতিকর বেদনা—পুনরায় তদ্রূপ আহারের তৃষ্ণা জন্মাইতে পারে; অথবা ব্যয়সাধ্য আমোদ প্রমোদ জনিত সুখকর বেদনার চিন্তা—মানুষের মনে অর্থ সঞ্চয় করণের তৃষ্ণা উৎপাদন করিতে পারে, অথবা অতীতের যে কোন আমোদ প্রমোদ জনিত প্রীতিকর বেদনার অবস্থা স্মরণ-পথে উদিত হইয়া পুনরায় সেই আমোদ উপভোগের তৃষ্ণা জন্মাইতে পারে; অথবা স্বর্গ-লোকের শান্তি বা আমোদ আহ্লাদের চিন্তা—যে কোন মানুষের স্বর্গ-লোকে জন্ম গ্রহণ করিবার তৃষ্ণা উৎপাদন করিতে পারে। সুতরাং প্রীতিকর বেদনা,—তৃষ্ণার উপনিশ্রয় বা আলম্বনোপনিশ্রয়-প্রত্যয় রূপে কারণ হইতে পারে।

কেবল মাত্র প্রীতিকর ও সুখকর বেদনাই নহে, এমন কি, অপ্রীতিকর ও দুঃখকর বেদনা তৃষ্ণোৎপত্তির কারণ হইতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, সকলেরই কায়িক বা মানসিক যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করিবার ইচ্ছা বা তৃষ্ণা উৎপন্ন হইয়া থাকে; কঠোর দারিদ্রতাই দরিদ্রকে তাহার দারিদ্রাবস্থা হইতে মুক্তি লাভ

করিবার আকাঙ্ক্ষা বা তৃষ্ণা জোগাইয়া থাকে ; নির্মম দারিদ্রাবস্থাই ভিক্ষুককে ধনের স্বপ্ন দেখাইয়া থাকে ; রোগ-যন্ত্রণাই রোগীর মনে নীরোগ হইবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মাইয়া থাকে ; কঠোর কারাপীড়নই কয়েদীর মনে আসন্ন মুক্তির ইচ্ছা উৎপাদন করিয়া থাকে। উল্লিখিত প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অপ্রীতিকর ও দুঃখময় কায়িক বা মানসিক বেদনা উৎপন্ন না হইলে, কখনই দুঃখময় অবস্থা হইতে মুক্তি লাভের ইচ্ছা বা তৃষ্ণা উৎপন্ন হইত না। সুতরাং ইহাতেই বুঝা যায়—অপ্রীতিকর ও দুঃখময় বেদনাও তৃষ্ণার উপনিশ্রয়—প্রত্যয়রূপে কারণ হইতে পারে। এমন কি, ভবিষ্যতের সুখবেদনা সম্বন্ধে চিন্তা করিলে, এই অনাগত সুখবেদনাও উপনিশ্রয়-প্রত্যয়রূপে তৃষ্ণার কারণ হইতে পারে। সুতরাং অতীত, বর্ত্তমান ও অনাগত,—যে কোন প্রকার তৃষ্ণাই উৎপন্ন হউক না কেন, সর্ব্বদাই ইহাদের উৎপত্তি—অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ,—কোন না কোন বেদনার উপর নির্ভর করিয়া থাকে। এই জন্যই বলা হইয়াছে—"বেদনা পচ্চয়া তণ্হা" অর্থাৎ বেদনাই তৃষ্ণার কারণ।

৮। "তণ্হা-পচ্চয়া উপাদানং," তৃষ্ণাই উপাদানের (Clinging) কারণ। উপাদান—পরিপক্ক বা প্রবল তৃষ্ণার নামান্তর। উপাদান চারি প্রকার, যথা ঃ—কামোপাদান, দৃষ্ট্যুপাদান, শীলব্রতোপাদান ও আত্মবাদোপাদান। শেষোক্ত তিনটি উপাদানোৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই তৃষ্ণাও উৎপন্ন হইয়া থাকে ; তৃষ্ণা ব্যতিরেকে ইহারা স্বাধীনভাবে কখনই উৎপন্ন হইতে পারে না। কাজে কাজেই তৃষ্ণা ইহাদের সহজাত-প্রত্যয়রূপে কারণ হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা ছাড়াও, তৃষ্ণা এই তিনটি উপাদানের উপনিশ্রয় প্রত্যয়রূপে কারণ হইতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মনে করা যাক্, কোন নির্ব্বোধ ব্যক্তির বিশ্বাস এই যে, কোন প্রকার শীল বা ব্রত পালন করিলে বা সৃষ্টিকর্ত্তার উপরে শ্রদ্ধা বিশ্বাস রাখিয়া চলিলেই মৃত্যুর পর তাহার স্বর্গলাভ হইবে ; সুতরাং সে স্বর্গলাভের তৃষ্ণায় নিজেকে এই সমস্ত বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখে। ইহা হইতেই বেশ বুঝা যায়,—তৃষ্ণা—উপাদানের উপনিশ্রয় প্রত্যয়রূপে কারণ হইয়া থাকে।

তৃষ্ণা কামোপাদানের মাত্র উপনিশ্রয়-প্রত্যয়রূপে কারণ হইতে পারে। রূপ, শব্দ, গন্ধাদি আলম্বনের তৃষ্ণা—ক্রমশঃ পরিপক্ক হইয়া প্রবল কামোপাদান রূপে পরিণত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ইন্দ্রিয়-ভোগ লালসা, অর্থের লালসা, আহারের লালসা, মদ্যপান ও দ্যূতক্রীড়া ইত্যাদি অনুসরণ করিয়া চলিলে,

ক্রমশঃ এইগুলি অসংশোধনীয় অভ্যাসে পরিণত হয়; সুতরাং ভবিষ্যৎ-উৎপত্তির উপাদানই জোগাইয়া থাকে।

৯। "উপাদান-পচ্চযা ভবো।" অর্থাৎ উপাদানই ভবের (Life-proeess) কারণ। ভব—দুই প্রকার, যথাঃ—(১) কার্ম্মিক-জীবনের সক্রিয় অংশ (কম্মভব) এবং (২) কর্ম্মের ফল-স্বরূপ পুনর্জন্ম-প্রক্রিয়া (উৎপত্তি-ভব), অথবা জীবনের অব্যাকৃত (Karmically passive and morally neutral) নিষ্ক্রিয় অংশ। জীবন-প্রক্রিয়ার সক্রিয় (Karmically active) অংশ হইল,—পূর্ব্ব জন্মের অবিদ্যা, সংস্কার, তৃষ্ণা, উপাদান ও ভব (কর্ম্ম-ভব), এবং জীবনপ্রক্রিয়ার নিষ্ক্রিয় (Passive) অংশ হইল,—বিজ্ঞান, নাম-রূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ ও বেদনা। সুতরাং পূর্ব্বজন্মের অবিদ্যা, সংস্কার, তৃষ্ণা, উপাদান ও কর্ম্ম-ভব, বর্ত্তমান অস্তিত্বে বিজ্ঞান, নাম-রূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ ও বেদনার হেতু। এই প্রকারে প্রতীত্য-সমুৎপাদের ব্যাখ্যা অন্য উপায়েও করা যাইতে পারে, যথা—অতীত জন্মের পাঁচ প্রকার হেতু, বর্ত্তমান জন্মে পাঁচ প্রকার ফল প্রসব করিয়া থাকে; আবার বর্ত্তমান জন্মের পাঁচ প্রকার হেতু, ভবিষ্যৎ জন্মে পাঁচ প্রকার ফল প্রসব করিয়া থাকিবে। এই জন্য বিশুদ্ধিমার্গে সপ্তদশ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে ঃ—

"অতীতে হেতবো পঞ্চ, ইদানি ফলপঞ্চকং;
ইদানি হেতবো পঞ্চ আয়তিং ফলপঞ্চকং।"

হেতু[২৩] এবং প্রত্যয় এক কথা নহে, ইহা পূর্ব্বেও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। হেতু শব্দের অর্থ—ইহাই বুঝিতে হইবে, যাহা ইহার আভ্যন্তরিক অবশ্যম্ভাবী প্রক্রিয়ানুসারে ফল প্রসব করিয়া থাকে। ২৪ প্রকার প্রত্যয়ের মধ্যে কর্ম্ম বা চেতনাই একটি মাত্র হেতু; অবশিষ্ট ২৩ প্রকার প্রত্যয় সাহায্যকারী (উপকারকো) কারণ।

যদিও এই কার্ম্মিক হেতু—ইহার আভ্যন্তরিক প্রয়োজনানুযায়ী সময়ে ফল প্রসব করিয়া থাকে, তথাপি ইহা—ইহার প্রত্যয় রূপে (as a condition or help) অতীতের কোন না কোন কর্ম্ম-ফলের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। প্রতীত্য-সমুৎপাদ মতে উৎপন্ন বেদনা, কর্ম্মের বিপাক বা ফল মাত্র; কিন্তু তথাপি এই বিপাক-বেদনা, কার্ম্মিক হেতু তৃষ্ণা উৎপন্ন হইবার কারণ হইয়া থাকে।

প্রসিদ্ধ জার্ম্মান শরীরবিজ্ঞান-বিদ্ প্রফেসর্ বের উর্ন তাঁহার প্রসিদ্ধ 'The Exploring of Life" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন ঃ—

"Our whole task in exploring the mechanical working of sensations, ideas and thoughts does—as everywhere in scientific research—only consist in finding out all their conditions. Let us therefore become accustomed not to search after "Causes" of thc happenings in the world but let us analyze the "conditions" to these happenings. For the world is really a great complex in which even the tiniest Link is determined in an unambiguous manner. The lifeless things, just as the living world, man with his thinking and striving, as well as man's culture with its ideals, which he by an enormous output of energy has created for himself all these things are nothing but the expression of certain conditions changing and developing according to Laws" অর্থাৎ সংক্ষেপে ইহার অর্থ হইল,—বেদনা, সংজ্ঞা এবং চেতনা ইত্যাদির প্রক্রিয়া অনুসন্ধান সম্বন্ধীয় আমাদের কার্য্যতৎপরতা,—ইহাদের ঘটন-প্রণালীর প্রত্যয় বা আপেক্ষিক কারণ (conditions) অনুসন্ধানের উপর সংস্থাপিত। সুতরাং দুনিয়ার ঘটনাবলীর হেতু (causes) অন্বেষণ না করিয়া বরং ইহাদের ঘটনাপ্রক্রিয়ার অনিবার্য্য নিয়ম বা প্রত্যয় বা আপেক্ষিক কারণগুলিই বিশ্লেষণ করা আমাদের দরকার। কারণ সত্যই এই পৃথিবী, মস্ত বড় একটি জটিল ব্যাপার যাহাতে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নিয়ম বা প্রত্যয়কে দ্ব্যর্থহীনভাবে গণ্য করা হয়। সজীব বা নিজ্জীব—সমস্ত পদার্থই—প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে পরিবর্ত্তন ও ক্রমবিকাশের ভিতর দিয়া, কোন না কোন নির্দ্দিষ্ট প্রত্যয়ের বা কারণের অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

এখন পুনরায় আমাদের নবম প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক ঃ—"উপাদান-পচ্চয়া ভবো" "উপাদানই বর্ত্তমান কর্ম্মভবের (Karma-Process) এবং পরজন্মে উৎপত্তি-ভবের (Karma-resultant Rebirth process) কারণ। বলিতে গেলে কর্ম্ম-ভব—পুনর্জ্জন্ম উৎপাদনকারী চেতনা এবং তৎসহগত চৈতসিক ধর্ম্মের সমষ্টিগত নাম মাত্র ; সংস্কার মানে—শুধু

পুনর্জন্ম উৎপাদনকারী চেতনাই বুঝায়। প্রকৃতপক্ষে কর্ম্মভব ও সংস্কার দুই-ই এক কর্ম্মেরই বিভিন্ন নাম মাত্র।

উপাদান (Clinging) সকল প্রকার অকুশল কর্ম্মের উপনিশ্রয়-প্রত্যয় রূপে কারণ হইয়া থাকে। কামোপাদান বা কাম-তৃষ্ণা—হত্যা, ডাকাতি, চুরি, অগম্যগমন (পরদার সেবন), ঘৃণা, ঈর্ষা, প্রতিশোধ ইত্যাদিও নানা প্রকার কায়িক বাচনিক ও মানসিক অকুশল কর্ম্মের উপনিশ্রয় (Inducement) প্রত্যয় রূপে কারণ হইতে পারে। শীলব্রতোপাদান—আত্মপ্রসাদ—মানসিক জড়তা, অন্যের প্রতি ঘৃণা, অসহিষ্ণুতা, ধর্ম্মোন্মত্ততা ও নিষ্ঠুরতার কারণ হইয়া থাকে। এই সমস্ত উদাহরণ হইতে বুঝা যায়, উপাদান কর্ম্মভবের ও কায়িক, বাচনিক ও মানসিক সকল প্রকার অকুশল কর্ম্মের উপনিশ্রয় প্রত্যয় রূপে কারণ হয়। তাছাড়াও উপাদান—সকল প্রকার অকুশল কর্ম্মভবের সহজাত প্রত্যয় রূপে কারণ হইয়া থাকে।

১০। "ভব-পচ্চয়া জাতি",—কর্ম্ম-ভবই—পুনর্জন্মের কারণ। অর্থাৎ অবশ্যম্ভাবী-অস্তিত্ব-সূচক চেতনা-প্রভাবান্বিত-কর্ম্ম-ভবই (Karma Process of Becoming) পুনরুৎপত্তির হেতু হইয়া থাকে। এইখানে পুনর্জন্ম অর্থ, গর্ভসঞ্চার হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ পূর্ণাঙ্গ হওয়া, ভূমিষ্ট হওয়া অবধি সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াকেই বুঝায়। সুতরাং কর্ম্ম-চেতনা-প্রভাবান্বিত-কর্ম-প্রক্রিয়া (কর্ম্ম-ভব) উপনিশ্রয় (Decisive Support) প্রত্যয়রূপে পুনর্জন্মের হেতু। অন্য কথায়, অস্তিত্ব-সূচক চেতনা (Life affirming volition) পুনর্জন্মের কার্ম্মিক-হেতু (কম্মপচ্চয়ো) এবং কার্ম্মিক চেতনাই—পুনরুৎপত্তির বীজ-স্বরূপ ; যেমন আম্রবীজ হইতে ক্ষুদ্র অঙ্কুর নির্গত হয় এবং যাহা সময়ে প্রকাণ্ড আম্রবৃক্ষরূপে পরিণত হয়। কিন্তু কার্ম্মিক-প্রক্রিয়া বা কার্মিক-চেতনাই যে সত্য সত্য পুনর্জন্মের হেতু, ইহা কি প্রকারে বুঝা যায়? বিশুদ্ধিমার্গে সপ্তদশ অধ্যায়ে এই প্রশ্নের সুন্দর উত্তর দেওয়া হইয়াছে, যথা—

"প্রাণিগণের পুনরুৎপত্তির বাহ্যিক অনুকূল অবস্থাগুলি সম্পূর্ণ একরূপ হইলেও উৎপন্ন প্রাণিগণের চরিত্রের বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। পুনরুৎপত্তির বাহ্যিক প্রত্যয় (Condition) রূপে মাতাপিতার শোণিত বা শুক্র সম্পূর্ণ একরূপ হইলেও তজ্জাত প্রাণিগণের মধ্যে চরিত্রের ও গুণের পার্থক্য দৃষ্ট হয় ; এমন কি, একই পিতার ঔরসে, একই মাতার গর্ভে জাত, যমজ সন্তানের মধ্যেও চরিত্রের বা মানসিক প্রবৃত্তির অথবা বিশেষ গুণের বিভিন্নতা দেখা

যায়। যে কোন প্রাণীর ভিতরেই, যে কোন সময়েই এই বিসদৃশতা দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই বৈসাদৃশ্য কখনই কারণ-বিহীন নহে। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম-প্রক্রিয়া ছাড়া ইহার অন্য কোন কারণ হইতে পারে না। সুতরাং কর্ম্ম বা চেতনাই প্রাণিগণের চরিত্রের বা স্বাভাবিক-প্রবৃত্তির বিভিন্নতার কারণ। এই জন্যই ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ বলিয়াছেন—"কম্মং সত্তে বিভজতি যদিদং হীন-পণীততায়"—কর্ম্মই প্রাণিগণকে উচ্চ নীচ ভেদে প্রভেদ করিয়া থাকে। অতএব ইহা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে, কর্ম্ম-প্রক্রিয়াই পুনরুৎপত্তির হেতু।

বৌদ্ধধর্ম্ম মতে বর্ত্তমান অস্তিত্ব—আমাদের পূর্ব্বজন্মের তৃষ্ণা ও উপাদান-প্রভাবান্বিত কার্ম্মিক-চেতনারই ফল এবং বর্ত্তমান জন্মের তৃষ্ণা ও উপাদান-প্রভাবান্বিত কার্ম্মিক-চেতনাই ভবিষ্যৎ জন্মের হেতু হইয়া থাকে। কিন্তু এই মুহুর্মুহু পরিবর্ত্তনশীল নাম-রূপী অস্তিত্ব-প্রক্রিয়ার ভিতরে যেমন এমন কোন পদার্থই পাওয়া যায় না,—এমন কি, যাহা এক মুহূর্ত্তের ঘটনা হইতে অবিকৃত অবস্থায় অন্য মুহূর্ত্তের ঘটনায় অতিক্রম করিয়া থাকে; ঠিক সেইরূপ কোনই শাশ্বত নিত্য অক্ষয় বস্তু বা আত্মা—এক জন্ম হইতে অন্য জন্মে প্রবেশ করে না। পরমার্থতঃ হেতু-সমুদ্ভূত ঘটনা বা ধর্ম্মসমূহের (phenomena) উদয় ব্যয় ছাড়া, এই পুনরুৎপত্তি-প্রক্রিয়ার ভিতরে কোনও নিত্য শাশ্বত পদার্থ পাওয়া যায় না। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে, ইহা আমার আত্মা নহে এবং ইহা আমার শরীরও নহে—যাহা পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে, অথচ ইহা অন্য কেহও নহে। আমি, তুমি, আমার, তোমার, মানুষ, পুরুষ বা ব্যক্তি ইত্যাদি কেবল অন্তঃসারশূন্য শব্দ মাত্র; ইহারা কোনও নিত্য শাশ্বত অস্তিত্বের নির্দেশ দান করে না। প্রচলিত ভাষায় তথাকথিত মানুষের মনের ভাব প্রকাশ করিবার সুবিধার জন্য এইগুলি ব্যবহৃত হয়। পালি ভাষায় এই শব্দগুলিকে "বোহার-বচন" (Conventional terms) বলা হয়। এই জন্য ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ বলিয়াছেন—

"পরবর্ত্তী জন্মে যে কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে—সে এবং পূর্ব্বজন্মে যে কর্ম্ম করিয়াছিল,—দুই-ই সর্ব্বপ্রকারে একই ব্যক্তি, ইহা বিশ্বাস করা—এক অন্ত। পরবর্ত্তী জন্মে যে কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে—সে এবং পূর্ব্বজন্মে যে কর্ম্ম করিয়াছিল—উভয়ই সম্পূর্ণ বিভিন্ন ব্যক্তি, ইহা বিশ্বাস করা অন্য অন্ত। তথাগত এই উভয় অন্তই পরিহার করিয়াছেন এবং এই উভয় অন্তের মধ্যবর্ত্তী চিরন্তন সত্যের সন্ধান দিয়াছেন, যথা—অবিদ্যাই

সংস্কারের কারণ, সংস্কারই পরবর্ত্তী-জন্মে'' বিজ্ঞানের কারণ, বিজ্ঞানই নাম-রূপের কারণ, নাম-রূপই ষড়ায়তনের কারণ, ষড়ায়তনই স্পর্শের (impre-ssion) কারণ, স্পর্শই বেদনার (feeling) কারণ, বেদনাই তৃষ্ণার কারণ, তৃষ্ণাই উপাদানের (clinging) কারণ, উপাদানই ভবের (life process) কারণ, ভবই (কর্ম্ম-ভব) জাতির কারণ, এবং জাতিই জরা মরণ, শোক, পরিদেবন দুঃখ ইত্যাদির কারণ। এইরূপেই যাবতীয় দুঃখেরই উৎপত্তি হইয়া থাকে।"

অনিত্য ও অনাত্মা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বুদ্ধঘোষ বিশুদ্ধিমার্গে বলিয়াছেন—

"কম্মস্‌স কারকো নত্থি বিপাকস্‌স চ বেদকো
সুদ্ধধম্মা পবত্তন্তি এবমেত্থ সম্মাদস্‌সনং।*
ন হেত্থ দেবো ব্রহ্মা বা সংসারস্‌সত্থি কারকো
সুদ্ধধম্মা পবত্তন্তি হেতুসম্ভারপচ্চয়া।"

অর্থাৎ পরমার্থতঃ কর্ম্ম করে—এমন কেহ নাই; কর্ম্মের ফল ভোগ করে—এমনও কেহ নাই। কেবল অন্তঃসারশূন্য ধর্ম্মগুলিই (phenomena) জন্ম-জন্মান্তরে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে; এবং এইরূপেই সংস্কার-চক্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিয়াছে। ঈশ্বর বা ব্রহ্মা কেহই এই সংসার-চক্রের স্রষ্টা নহেন, কেবল শূন্য ধর্ম্মগুলিই হেতু সমুৎপন্ন হইয়া জন্ম-জন্মান্তরে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

বৌদ্ধধর্ম্ম মতে সবকিছুই কারণের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে; সুতরাং কারণ বা প্রত্যয়ের অভাবে কিছুই হয় না, ইহা শুনিয়া হয়ত কেহ এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে পারে যে, "বৌদ্ধধর্ম এক প্রকার অদৃষ্টবাদই শিক্ষা দিয়া থাকে; অথবা বৌদ্ধধর্ম্ম—নির্ব্বাচন করিবার স্বাধীনতা হইতে মানুষকে বঞ্চিত করিয়া থাকে; অথবা ইহাতে নির্ব্বাচনী চেতনার স্বাধীনতা নাই ইত্যাদি।" "মানুষের" নির্ব্বাচন করিবার স্বাধীনতা (Free will) আছে কি? অথবা "নির্ব্বাচনী চেতনা" কি স্বাধীন (Is will Free)? এই প্রকার কোন প্রশ্নই বৌদ্ধধর্ম্মীর পক্ষে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে না; সুতরাং উত্তরদানেরও অযোগ্য। "মানুষের" স্বাধীন চেতনা আছে কি? ইহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে না, কারণ পরমার্থতঃ "মানুষ"—পরিবর্ত্তনশীল নামরূপের (mind and matter) সমষ্টি ছাড়া অন্য কিছুই নহে; এই নাম-রূপের সমষ্টির ভিতরে বা বাহিরে এমন কোনও শাশ্বত নিত্য বা স্বাধীন সত্তা পাওয়া যায়

* অন্য পাঠ "এবেতং সম্মদস্‌সনং"।

না যাহাকে "মানুষ" বলা যাইতে পারে। সুতরাং "মানুষ" শুধুই নাম মাত্র, এ ছাড়া ইহার পিছনে কোনও সত্য নাই। কাজে কাজেই "মানুষই" যখন স্বাধীন নহে, তাহার চেতনাই (will) বা স্বাধীন হইতে পারে কি করিয়া ?

দ্বিতীয় প্রশ্ন—"চেতনা কি স্বাধীন ?" ইহাও জিজ্ঞাস্য হইতে পারে না, যেহেতু বেদনা, সংজ্ঞার ন্যায় চেতনা ও চৈতসিক ধর্ম্ম মাত্র ; চৈতসিক ধর্ম্মগুলি (Mental phenomena) কারণ (Condition) থাকিলেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, আবার কারণের অভাবে চিরতরে বিলীন হইয়া যায় ; সুতরাং ক্ষণস্থায়ী। উৎপন্ন হইবার আগে ইহাদের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। কাজে কাজেই চেতনা স্বাধীন কি অধীন, এই প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। এই সম্বন্ধে একমাত্র প্রশ্ন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে ঃ—"কোনও প্রকার প্রত্যয়ের বশবর্ত্তী না হইয়া স্বাধীনভাবে চেতনার উদয় হয় কি ? অথবা ইহা কি সংস্কৃত (Conditioned) ?" এই একই প্রকার প্রশ্ন নাম-রূপী অন্যান্য ধর্ম্ম বা প্রত্যেক প্রকার ঘটনা সম্বন্ধেও জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। ইহার উত্তরে বলা যায়, "চেতনাই (will) হোক আর বেদনাই (Feeling) হোক, মানসিক অথবা শারীরিক,—যে কোনও প্রকার ঘটনারই উৎপত্তি—কোন না কোন প্রকার প্রত্যয়ের উপর নির্ভরশীল হইয়া থাকে ; প্রত্যয়ের অভাবে কোন কিছুরই উৎপত্তি সম্ভব হইতে পারে না। অন্যথা উৎপত্তি-নিয়মের বিশৃঙ্খলতা ঘটিত, ধর্ম্মতা-নিয়মে না ঘটিয়া সবকিছুই আকস্মিক ঘটনায় পর্য্যবসিত হইত, অর্থাৎ আমগাছে জাম ফলিত এবং জামগাছে হয়ত কাঁঠাল ফলিত। কিন্তু এইরূপ হওয়াও সম্পূর্ণ অসম্ভব এবং এমন কি, ইহা চিন্তা নিয়মেরও বিরোধী।

১১। "জাতি-পচ্চয়া জরামরণং" জাতি বা জন্মই জরা ও মরণের কারণ। জাতি বা জন্ম না থাকিলে জরা মরণও থাকে না। যদি আমরা জন্মগ্রহণ না করিতাম, তাহা হইলে আমাদিগকে নানা প্রকার সাংসারিক দুঃখ যন্ত্রণাও ভোগ করিতে হইত না, আমাদিগকে মরিতেও হইত না। তাহা হইলে দেখা যায়, জাতি বা জন্ম—জরা ও মৃত্যুর উপনিশ্রয় প্রত্যয়রূপে কারণ। এই জন্যই বলা হইয়াছে যে "জাতি-পচ্চয়া জরামরণং।"

প্রতীত্যসমুৎপাদের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা এইখানে সমাপ্ত হইল। প্রতীত্য সমুৎপাদের দ্বারা আনুক্রমিক অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জন্মের পরস্পর সম্বন্ধ ও আপেক্ষিকতা দেখান হইয়াছে। পুনরুৎপত্তির কার্ম্মিক হেতু

সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচটি যথা ঃ—অতীত ভবের অবিদ্যা, সংস্কার, তৃষ্ণা, উপাদান ও কর্ম্মভব, এই পাঁচটি কার্ম্মিক হেতু বর্ত্তমান জন্মে বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ ও বেদনা—এই পাঁচটি ফল প্রসব করিয়াছে। বর্ত্তমানের অবিদ্যা, সংস্কার, তৃষ্ণা ইত্যাদি পাঁচটি কার্ম্মিক হেতু—আবার ভবিষ্যৎ জন্মে বিজ্ঞান, নাম-রূপ ইত্যাদি পাঁচটি ফল প্রসব করিয়া থাকিবে। এই জন্যই বলা হইয়াছে ঃ—

অতীতে হেতবো পঞ্চ, ইদানি ফলপঞ্চকং,
ইদানি হেতবো পঞ্চ, আয়তিং ফলপঞ্চকং।”

নিম্নলিখিত চিত্র হইতে ইহা সহজে বুঝা যাইবে—

অতীত	১। অবিদ্যা ২। সংস্কার	কর্ম্ম-ভব অথবা ৫টি কার্ম্মিক হেতু—১, ২, ৮, ৯, ১০
বর্ত্তমান	৩। বিজ্ঞান ৪। নামরূপ ৫। ষড়ায়তন ৬। স্পর্শ ৭। বেদনা	উৎপত্তিভব অথবা ৫টি কর্ম্ম-বিপাক ঃ ৩-৭,
	৮। তৃষ্ণা ৯। উপাদান ১০। ভব	কর্ম্ম-ভব অথবা ৫টি কার্মিক হেতু—১, ২, ৮, ৯, ১০
ভবিষ্যৎ	১১। জাতি ১২। জরা মরণ	উৎপত্তি ভব অথবা ৫টি কর্ম্মফল ঃ—৩-৭

যদি আমাদের অতীত জন্মের কার্ম্মিক হেতুরূপে অবিদ্য সংস্করাদি অথবা পুনরুৎপত্তিসূচক চেতনা না থাকিত, তাহা হইলে মায়ের গর্ভে প্রতিসন্ধি-বিজ্ঞানের (Rebirth-consciousness) প্রতিষ্ঠা হইত না ; সুতরাং আমাদের বর্ত্তমান জন্মও হইত না। মানুষ যখন গভীর প্রজ্ঞার দ্বারা সর্ব্ব প্রকার অস্তিত্বেই অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মা লক্ষণই উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়, তখন কিছুতেই তাঁহার আর আসক্তি বা তৃষ্ণা থাকে না এবং সঙ্গে সঙ্গেই

অবিদ্যা তৃষ্ণা উপাদান সংস্কারাদি—পুনরুৎপত্তির হেতুসমূহ ধ্বংস হইয়া যায়; হেতু অভাবে তাঁহাকে আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না; সুতরাং জাতি জরা মরণের কঠোর হস্ত হইতে চিরতরে নিস্তার লাভ করিয়া থাকেন। ইহাই ভগবান বুদ্ধ দেশিত—"পরম শান্তি নির্বাণ।"

পাদটীকা

১। জার্মান পণ্ডিত Nyanatiloka দ্বারা ইংরাজী ভাষায় রচিত।

২। বৌদ্ধধর্ম কখনও বিশ্বের আদি-অন্ত নিরূপণ করিবার চেষ্টা করে নাই, এবং ইহা বৌদ্ধধর্মের উদ্দেশ্যও নহে। বৌদ্ধধর্মের উদ্দেশ্য হইল—জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর কঠোর নিয়ম হইতে মুক্তিলাভ করা।

৩। বিজ্ঞান অর্থ—এইখানে প্রতিসন্ধি বিজ্ঞানই (Rebirth Conscicusness) বুঝিতে হইবে। এই প্রতিসন্ধি বিজ্ঞান বা চিত্তই ব্যক্তিগত সারাজীবনের সংস্কার বা কর্মের বিপাক বা ফল; ত্রি-হেতুক, দ্বিহেতুক অহেতুক ইত্যাদি ভেদে ইহাই সত্বগণের পরজন্মের শুভাশুভ নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে; মাতৃগর্ভে প্রতিসন্ধি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই নূতন সত্তার নাম-রূপের সঞ্চার করতঃ ভবঙ্গ-চিত্তরূপে প্রবর্ত্তিত হয়।

৪। সুখ-বেদনা, দুঃখ-বেদনা ও অসুখ অদুঃখ বেদনা।

৫। উপাদান=উপ+আ+দান; উপ অর্থাৎ নিকটে বা কাছে, আদান অর্থাৎ গ্রহণ করা; অন্য কথায় পুনরুৎপত্তির কারণসমূহকে কাছে টানিয়া লওয়া বা তাহাতে লাগিয়া থাকা।

৬। নূতন সত্তার নাম-রূপের সঞ্চার কাল হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হওতঃ মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত অবস্থাকে পুনর্জন্ম-প্রক্রিয়া (Rebirth process) বলা হয়। বৌদ্ধদর্শন মতে ইহাই "জন্ম।"

৭। এইখানে অতীতের কর্ম্ম-ভব বা কর্ম্ম প্রক্রিয়াই (Rebirth-producing Karmic process of the past) বুঝিতে হইবে।

৮। অবিদ্যা=বিদ্=জানা। অবিদ্যা বেদান্তের "মায়া" নহে; বৌদ্ধমতে দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের নিরোধ ও দুঃখ নিরোধের উপায় অথবা অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মা সম্বন্ধে অজ্ঞানতাই অবিদ্যা।

৯। বৌদ্ধদর্শনে কর্ম্ম শব্দের অর্থ—কায়িক, বাচনিক ও মানসিক শুধু পুনর্জন্ম নিয়ন্ত্রণকারী কুশল অকুশল কর্ম্ম বা চেতনাকে বুঝায়। পাশ্চাত্য

পণ্ডিতগণ ও থিওসোফিষ্টগণ (Theosophists) কর্ম্মকে কর্ম্ম-ফল বলিয়া বুঝিতে চেষ্টা করেন। কর্ম্ম কখনও কর্ম্ম ফল নহে। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক।

১০। মহানির্দ্দেশের ভাষ্যকার বলেন,—যং পটিচ্চ ফলং এতি, সো পচ্চয়ো; এতী তি=উপজ্জতি চেব পবত্ততি চা'তি অত্থো। অপিচ উপকারকত্থো পচ্চয়ত্থো। অর্থাৎ যাহার কারণে ফল উৎপন্ন এবং প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাই প্রত্যয়। "এতি" মানে উৎপন্ন ও প্রবর্ত্তিত হওয়া অথচ উপকারকার্থেও প্রত্যয়ের অর্থ গ্রহণ করা যায়। উপ অর্থ—অধিক, অতিরিক্ত, যে অধিক বা অতিরিক্ত করে অথবা অনুগ্রহ বা আনুকূল্য বা সাহায্য করে তার নামই উপকারক। (সদ্ধম্মপজ্জোতিকা P.T.S. ed পৃঃ ২২২.)

১১। অভিধর্ম্ম পিটকের মধ্যে "পট্ঠান প্রকরণ" অতি বৃহৎ, অত্যাবশ্যকীয় অথচ অত্যন্ত জটিল গ্রন্থ। এই পর্যন্ত ইহার এক লাইনও আধুনিক কোন ভাষাতেই অনুবাদ করা হয় নাই। মূল পালি হইতে ইহার এক ষষ্ঠাংশ মাত্র অতিসংক্ষিপ্তাকারে লণ্ডন পালি টেক্সট্ সোসাইটী কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

১২। পালি সাহিত্যে "ধর্ম্ম" শব্দের অর্থ বড়ই ব্যাপক। ইহার বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। আচার্য্য বুদ্ধঘোষ প্রথমতঃ চারি প্রকারে ধর্ম্ম শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা:—(১) গুণধর্ম্ম অর্থাৎ সচ্চরিত্রতা বা সদাচার; (২) দেশনাধর্ম্ম অর্থাৎ দেশনা ও শিক্ষাপদগুলি; (৩) পরিয়ত্তি ধর্ম্ম অর্থাৎ নবাঙ্গ ত্রিপিটক; (৪) নিস্সত্ত ধর্ম্ম অর্থাৎ সত্ত্বশূন্য ধর্ম্ম (Non animistic)। এ ছাড়াও তিনি অধিকতর পর্য্যাপ্ত-রূপে অর্থশালিনীতেও ইহার অন্য চার প্রকার বর্ণনা দিয়াছেন; যথা— (১) পরিয়ত্তি অর্থাৎ সুশৃঙ্খলাকারে যাহা বুদ্ধ বচন বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে; (২) হেতু বা কারণ (Causal antecedent); (৩) গুণ অর্থাৎ সৎগুণ অথবা কর্ম্ম; (৪) নিস্সত্ত-নিজ্জীবতা অর্থাৎ অনাত্মতা ("The Phenomenal" as opposed to "the substantial", "the noumenal," "animistic entity")। ধর্ম্ম শব্দের বিস্তৃত ব্যাখ্যার জন্য 'মহানিদ্দেস' পৃঃ ৯৪, ও ইহার 'অর্থকথা' "সদ্ধম্ম-পজ্জোতিকা", রাইস্ ডেভিড্স্ এর "বুদ্ধিষ্ট ইণ্ডিয়া" পৃঃ ২৯২-৪; মিসেস্ রাইস্ ডেভিড্স এর "বুদ্ধিজম্" পৃঃ ৩২, ১০৭, ২৩৫ ও পালি ইংরেজি অভিধান, P.T.S. অর্থশালিনী দেখুন।

১৩। "উপনিস্সয় পচ্চয়" প্রধানতঃ ৩ শ্রেণীতে বিভক্ত। (১) পকতি-উপনিস্সয় অর্থাৎ সাধারণ প্রেরণা; (২) আরম্মণূপনিস্সয়-পচ্চয় অর্থাৎ

আলম্বনরূপে প্রেরণা ; (৩) অনন্তরূপনিস্সয়, ন+অন্তর=অনন্তর+উপ-নিস্সয় অর্থাৎ অব্যবহিত বা নৈকট্যরূপে প্রেরণা।

১৪। অনুলোম-তিক-পট্ঠান, কুসলত্তিক পঞ্ঞ্হনার প্রকরণে (Guide through the Abhidhamma পৃঃ ১২১ দেখুন) নিম্ন লিখিত উদাহরণগুলি দেওয়া হইয়াছে এবং দেখান হইয়াছে যে, কি করিয়া কুশলকর্ম্ম সম্বন্ধে অসংচিন্তা মনে আলম্বনরূপে উদিত হইয়া অকুশল কর্ম্মের কারণ হইতে পারে। যেমন মনে করুন, কোন ব্যক্তি ভিক্ষুভোজন ইত্যাদি নানাবিধ দানাদি পুণ্যানুষ্ঠান করিয়া যদি চিন্তা করে যে মাত্র আমিই এই প্রকার দানাদি পুণ্যকর্ম্ম করিতে পারি; অথবা আমার মত দান করিবার হৃদয় কাহারও নাই ; অথবা ইহাতে আমি সকলের প্রশংসার পাত্র হইব ইত্যাদি নানা প্রকার কুচিন্তা পোষণ করিয়া মান, অভিমান, বড়ই অহঙ্কার করিয়া থাকে, তাহাতে তাহার মনে নানা প্রকার লোভ, মিথ্যাদৃষ্টি, সন্দেহ, চিত্ত-চাঞ্চল্য ইত্যাদি ভাবের উদয় হয় ; অথবা যদি মনে করে যে, পুণ্য কর্ম্মত করিলাম, কিন্তু অনেক টাকা খরচ হইয়া গেল ইত্যাদি কুচিন্তাতে তাহার মনে দুঃখ-বেদনার সঞ্চার হয়; অথবা অতীতে অনেক কুশলকর্ম্ম করিয়াছে চিন্তা করিয়া উৎফুল্ল হইয়া বড়াই করে, অথবা ধ্যানলাভী কোন পুরুষ বা স্ত্রী ধ্যান হইতে উঠিয়া ধ্যান লাভ করিয়াছে ভাবিয়া খুব আনন্দ উপভোগ ও অহঙ্কার করে, ইত্যাদি কুচিন্তাতে কুশলকর্ম্ম সম্পাদন করিলেও ফল অকুশলই হইয়া থাকে।

১৫। এইখানে "বিঞ্ঞাণং" মানে বিপাক বিজ্ঞান বা চিত্তই বুঝায় (Karma resultant consciousness), যথা—ছয় বিজ্ঞানকায় :— "চক্খু, সোত, ঘাণ, জিব্হা, কায় ও মনোবিঞ্ঞাণং। "চক্খু বিঞ্ঞাণং" কুশল ও অকুশল বিপাকভেদে দুই প্রকার। মনোবিঞ্-ঞাণং" অর্থ—দুই প্রকার বিপাক মনোধাতু অর্থাৎ কুশল ও অকুশল বিপাক দুইটি "উপেক্খাসহগতং সম্পটিচ্ছনচিত্তংতি।" অহেতুক মনোবিজ্ঞান ধাতু তিনটি অর্থাৎ অকুশল বিপাক "উপেক্খাসহগতং সন্তীরণচিত্তং" ও কুশল বিপাক "সোমনস্সহগতং সন্তীরণচিত্তং" ও "উপেক্খাসহগতং সন্তীরণচিত্তং।" আটটি "সহেতুক কামাবচর বিপাক চিত্তানি।" "পঞ্চ রূপাবচর বিপাক চিত্তানি।" "চত্তারি অরূপাবচর বিপাক চিত্তানি।" এই সর্ব্বমোট ৩২ প্রকার লৌকিক বিপাক চিত্ত। তন্মধ্যে কুশল ও অকুশল বিপাক দুই পঞ্চ বিজ্ঞান, কুশল, অকুশল বিপাক দুই মনোধাতু, কুশল বিপাক সৌর্ম্মনস্য সহগত অহেতুক মনোবিজ্ঞান ধাতু—এই তের প্রকার বিপাক চিত্ত কেবল মাত্র

কামলোকেই প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। অবশিষ্ট ১৯ প্রকার বিপাক চিত্ত অর্থাৎ উপেক্ষা সহগত কুশল বিপাক অহেতুক মনোবিজ্ঞান ধাতু (১) কামাবচর কুশল বিপাক সহেতুক চিত্ত (৮) অকুশল বিপাক অহেতুক মনোবিজ্ঞান ধাতু (১) রূপাবচর কুশল বিপাক চিত্ত (৫) অরূপাবচর কুশল বিপাক চিত্ত (৪) এই ১৯ প্রকার বিপাক চিত্ত কাম, রূপ ও অরূপভবে যথানুরূপে প্রবর্ত্তিত ও প্রতিসন্ধি (Rebirth) প্রদান করিয়া থাকে। প্রতিসন্ধিক্ষণে কর্ম্মফলানুযায়ী ১৯ প্রকার প্রতিসন্ধি চিত্তের যে কোন একটি উৎপন্ন হইয়া যথানুরূপে কামভবে রূপভবে ও অরূপভবে প্রতিসন্ধি প্রদান করিয়া থাকে। ইহাদিগকে চ্যুতি, প্রতিসন্ধি ও ভবঙ্গচিত্তও বলা হইয়া থাকে কারণ কর্ম্মফলানুসারে এই ১৯ প্রকার বিপাক চিত্তের যে কোন একটিতে অতীত ভব হইতে চ্যুতি ঘটে বলিয়া চ্যুতি, চিত্ত, চ্যুতির অব্যবহিত পরে সেই একই চিত্তে পরভবে প্রতিসন্ধি হয় বলিয়া প্রতিসন্ধিচিত্ত এবং প্রতিসন্ধির অব্যবহিত পরে সেই একই চিত্ত ভবঙ্গচিত্তরূপে প্রবর্ত্তিত হয় বলিয়া ভবঙ্গচিত্ত বলা হয়। অর্থাৎ ক্রিয়ানুসারে একই চিত্তের তিনটি অবস্থা মাত্র।

১৬। বাস্তবিকই আলম্বনের (Sense objects) গুণের তারতম্যানুসারেই প্রত্যেক মানবের সাংসারিক সুখ ও দুঃখভোগ নির্দ্ধারিত হয়। অর্থাৎ আমরা প্রতি দৈনন্দিন জীবনে আমাদের কর্ম্মফলানুযায়ী যে পরিমাণ বাঞ্ছিত বা অবাঞ্ছিত, প্রীতিকর বা অপ্রীতিকর আলম্বনের সংস্পর্শে আসি ঠিক সেই পরিমাণেই আমরা সাংসারিক সুখ বা দুঃখ ভোগ করিয়া থাকি।

১৭। সাধারণতঃ নাম-রূপ বলিলে—পঞ্চস্কন্ধকেই বুঝায়। প্রতীত্য-সমুৎপাদে কিন্তু নাম—বেদনা, সঞ্ঞা ও সঙ্খারা—এই তিনের পরিবর্ত্তেই ব্যবহৃত হয়; বিজ্ঞানের উপর সমস্ত প্রাণীরই মানসিক ও শারীরিক জীবন ধারণ সম্পূর্ণ নির্ভর।

১৮। মূল পালি ত্রিপিটকে ২৭ প্রকার রূপ নিয়াই রূপস্কন্ধের উল্লেখ দেখা যায়, কিন্তু পরে ভাষ্যকারগণ "হদয়বত্থু" (physical seat of mind) নামে আর একটি নূতন "রূপ" ইহাদের সহিত যোগ করিয়া মোট ২৮টি করিয়াছেন।

১৯। "মনোপুব্বঙ্গমা ধম্মা" ইত্যাদি ধর্ম্মপদের প্রথম গাথাটীতে ও ঠিক এই একই কথা ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে,—চিত্ত ও চৈতসিক ধর্ম্মগুলি এক সঙ্গেই উৎপন্ন হয়; ইহারা পরস্পর অবিয়োজ্য ও একে অন্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

২০। আহার চারি প্রকার, যথা:—'কবলিঙ্কার আহারো'=অর্থাৎ যাহা

সাধারণতঃ আমরা খাইয়া থাকি; (২) 'ফস্সাহারো'=স্পর্শরূপ আহার; (৩) মনোসঞ্চেতনাহারো=চেতনারূপ আহার; (৪) বিঞ্ঞ্-ঞাণাহারো=বিজ্ঞানরূপ আহার।

২১। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ (কায়) ইত্যাদি আয়তনের সহিত তাহাদের রূপ (visible object) রস, শব্দ ইত্যাদি স্ব স্ব আলম্বনের সংস্পর্শ ঘটিলেই যে, শুধু মন-বিজ্ঞান উৎপন্ন হইবে, তাহার কোন মানে নাই। কারণ রূপ, রস, শব্দ ইত্যাদি আলম্বনসমূহ চক্ষু, কর্ণের ধার না ধারিয়া ও মনালম্বনরূপে (mental object) মনে আবির্ভূত হইতে পারে। এই সম্বন্ধে স্বপ্ন চিত্তই সুন্দর দৃষ্টান্ত।

২২। Shwe Zan Aung, Compendium of Buddhist philosophy, London 1910 P 277 f.

২৩। কারণ বৌদ্ধদের উদ্দেশ্য হইল, মনের উদয় ব্যয়, গতিবিধি এবং ইহার কর্ম্মপ্রক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য করিয়া ইহার উপরে সর্ব্বদাই সতর্ক থাকা। এই সতর্ক থাকার অন্য নাম হইল "সতিসম্পজঞ্ঞ্ঞ।" সদা স্মৃতিসম্প্রজানকারী হইয়া ক্রমশঃ মনকে সংযত করতঃ তৃষ্ণা নীবরণাদি পরিত্যাগ করিয়া মনকে লৌকিয় অবস্থা হইতে লোকোত্তর অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করাই প্রধান উদ্দেশ্য। শুদ্ধ-মনের কোন ভৌতিক আয়তন না থাকিলেও প্রকারান্তরে চক্ষায়তনাদি পঞ্চায়তনকেও মনের আয়তন বলা চলে। মহাবেদল্লসূত্রে (মজ্ঝিমনিকায়) এক জায়গায় বলা হইয়াছে—আয়ুষ্মান মহাকোট্ঠিত! এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের আশ্রয় মন, যদিও ইহাদের গোচরভূমি ভিন্ন ভিন্ন এবং একে অন্যের বিষয়-বস্তু উপভোগ করিতে পারে না। পঞ্চেন্দ্রিয় হইতে সম্বন্ধবহির্ভূত হইলে, মন তখন অতীন্দ্রিয়াবস্থা (অরূপ লোক) প্রাপ্ত হয়। মহাবেদল্ল সূত্রে অন্য এক জায়গায় বলা হইয়াছে যে, আয়ুষ্মান! পঞ্চেন্দ্রিয় হইতে অসংবদ্ধ বা বহিভূত শুদ্ধ-মনের দ্বারা কি জ্ঞেয়?

"আয়ুষ্মান! পঞ্চেন্দ্রিয় হইতে অসংবদ্ধ শুদ্ধ মনের দ্বারা আকাশ অনন্ত, এই আকাশানন্ত্যায়তন জ্ঞেয়, বিজ্ঞান অনন্ত, এই "বিজ্ঞানানন্ত্যায়তন" জ্ঞেয়; বিজ্ঞানের বাহিরে কিছুই নাই, এই আকিঞ্চন্যায়তন জ্ঞেয়, ইত্যাদি। অরূপ লোকে অতীন্দ্রিয়ানুভূতি মনের স্বাধীন ক্রিয়া। এই অতীন্দ্রিয় বিষয়াদি চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি সাধারণ ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে।

২৪। অনেকেই স্পর্শ শব্দের (ফস্সো) ইংরেজী অনুবাদ করিতে যাইয়া "Contact" অনুবাদ করিয়া থাকেন "ফস্সো" শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ "Contact" বড়ই সন্দিগ্ধার্থক ও ভ্রান্তিমূলক। এইখানে "স্পর্শ"

শারীরিক প্রক্রিয়া নহে, ইহা শুদ্ধ মানসিক-প্রক্রিয়া। সংস্কার স্কন্ধে চৈতসিক ধর্ম্ম সমূহের তালিকায় প্রথমেই স্পর্শ লিখিত হইয়াছে। ইহা মানসিক প্রক্রিয়া না হইলে সংস্কার স্কন্ধে ইহার স্থান হইত না।

২৫। বিপাক ফল চিত্তগুলি, কুশল বা অকুশল, কোন প্রকার ফল প্রসব করিতে পারেনা ; কারণ ইহারা নিজেরাই পূর্ব্বের কুশল বা অকুশল কর্ম্মের ফল বিশেষ। ইহারা নিষ্ক্রিয়, সক্রিয় নহে (passive, not active) ; এই জন্যই ইহারা অব্যাকৃত।

২৬। হেতু বীজ স্বরূপ ; বীজ অঙ্কুরিত হইবার ও অঙ্কুরিত হইয়া পরে, যে উপযুক্ত মাটি, জল, আর্দ্রতা, উত্তাপ ইত্যাদির প্রয়োজন হয়, এইগুলি হইল প্রত্যয় বা সাহায্যকারী (উপকারকো) অবস্থা বা কারণ।

২৭। প্রতিসন্ধি = বিজ্ঞান।

———

কর্মতত্ত্ব

কর্ম সম্বন্ধে বুদ্ধ এক কথায় বলিয়াছেন ঃ

"কম্মুনা বত্ততি লোকো, কম্মুনা বত্ততি পজা ;
কম্মনিবন্ধনা সত্তা রথস্সানী'ব যায়রে।"

জগত কর্মপ্রভাবে চলিতেছে। কর্মহেতুই প্রাণিগণ সংসার ভ্রমণ করিতেছে। আনিবদ্ধ হইয়া রথ যেমন আঁকাবাঁকা পথে গমন করে, তদ্রূপ কর্মনিবন্ধন প্রাণিগণ বিভিন্ন গতি প্রাপ্ত হয়। প্রাণিগণের মধ্যে বৈষম্যের কারণ সম্বন্ধে বহু মতবাদ বিদ্যমান, কিন্তু বৌদ্ধ সিদ্ধান্তে বৈষম্যের কারণ হইতেছে কর্ম। তাই বৌদ্ধ দর্শনে কর্মতত্ত্বকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে।

কর্মকে বলা যাইতে পারে মানসিক কার্য-কারণ বিধি। কর্মের অনুসিদ্ধান্ত হইতেছে, পুনর্জন্ম। কর্ম এবং পুনর্জন্ম পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। কর্ম ও পুনর্জন্ম সম্বন্ধে ধ্যান-ধারণা ও বিভিন্ন মতবাদ প্রাক্‌বুদ্ধযুগেও বর্তমান ছিল, কিন্তু বুদ্ধই সর্বপ্রথম ইহাদের যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

প্রাণিজগতে মানুষের মধ্যে এত বৈষম্য কেন? কেহ জন্মগ্রহণ করে প্রাচুর্যের মধ্যে, উন্নত শারীরিক, মানসিক এবং নৈতিক গুণবিশিষ্ট হইয়া অন্যজন জন্মগ্রহণ করে নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে—ইহাই বা কেন? কেহ মহাজ্ঞানী, কেহ বা মূর্খ কেন? কেহ সৎ এবং পুণ্যাত্মা, অন্য কেহ পাপী কেন? কেহ বা জন্ম হইতেই প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন, ভাষাবিদ্, শিল্পী, গাণিতিক, সঙ্গীতজ্ঞ কেন? কেহ জন্ম হইতেই অন্ধ, বধির ও বিকৃতাঙ্গযুক্ত কেন? ধার্মিক পিতামাতার গৃহে মহাপাপী, কৃতঘ্ন, খুনী ও ব্যভিচারীর জন্ম হয় কেন? অন্যদিকে মূর্খ অশিক্ষিত পিতামাতার গৃহে উচ্চশিক্ষিত পণ্ডিত সন্তানের জন্ম হয় কেন? কেহ কেহ দেখা যায় সারাজীবন ধর্মজীবন যাপন করিয়াও কেবল পদে পদে দুঃখই ভোগ করিয়াছে, অন্যদিকে কেহ কেহ সারাজীবন পাপাচারী হইয়াও সুখে জীবন অতিবাহিত করিয়াছে—ইহাই বা কেন?

এই সব বৈষম্যের মূলে কি নির্দিষ্ট কোন কারণ বা হেতু আছে, কিম্বা নাই যদি না থাকে তাহা হইলে এই সকল বৈষম্য কি কেবল আকস্মিক ঘটনা মাত্র? কোন যুক্তিবাদী ব্যক্তি ইহাকে দৈব বা আকস্মিক ঘটনা বলিয়া মানিয়া লইবে

না। জগতে কোন ব্যক্তির নিকট এমন কোন ঘটনা ঘটেনা যাহার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সে দায়ী নহে। সাধারণ মানুষ কারণ অনুসন্ধান করিয়া কিছুই খুঁজিয়া পায় না। সাধারণ মানুষ কেন অনেক বিজ্ঞজনও কোন কোন কার্যের কারণ খুঁজিয়া পান না? কারণ তিনি জ্ঞানতঃ এমন কোন কিছু জীবনে করেন নি, যাহার ফলে তিনি এইরূপ ঘটনার সম্মুখীন হইলেন। ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে মানুষ শুধু এই জন্মের কর্মফলই ভোগ করেনা, অতীতের কোন কর্মের ফলও ইহজীবনে তাহাকে ভোগ করিতে হইতে পারে। ব্যক্তির কর্মই জন্মজন্মান্তরে ব্যক্তির পশ্চাদ্ধাবন করে; মাতাপিতা, পরিবেশ ও অন্যান্য বর্তমান ভালমন্দ অবস্থা নিমিত্তমাত্র। স্বকৃত কর্মের ফলস্বরূপ ব্যক্তি ইহজীবনে সুখ-দুঃখ, যশ-অযশ, নিন্দা-প্রশংসা, লাভ-ক্ষতি ইত্যাদি লোকধর্মের সম্মুখীন হয়।

বুদ্ধের জন্মের আগে ও পরেও মানবজাতি তাহাদের নানা বৈষম্যের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছাকেই কারণ বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। বুদ্ধ কিন্তু অস্বীকার করিয়াছেন যে, সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা বলিয়া কেহ নাই যিনি কার্যকারণ শৃঙ্খলায় আবদ্ধ নহেন।

বৈজ্ঞানিকদের ধারণা

মানুষের মধ্যে যে এত বৈষম্য এই বিষয়ে বৈজ্ঞানিকেরা কি বলেন?

বিশিষ্ট জৈববিজ্ঞানী হাক্সলী বলেন:...কোন কোন জীন্ (gene: বংশানুগতির অন্যতম নিয়ন্ত্রক উপাদান) বর্ণকে নিয়ন্ত্রণ করে, কোন কোন জীন্ উচ্চতা বা ওজনকে নিয়ন্ত্রণ করে, কোন কোন জীন্ দেহের ক্রমবৃদ্ধি এবং দীর্ঘায়ুর পক্ষে সহায়ক, কোন কোন জীন্ সাহস জোগায়, আবার কোন কোন জীন্ ভীরুতার কারণ হয়...। সম্ভবতঃ বংশগত স্বভাবের অধিকাংশই জীন্-নিয়ন্ত্রিত। ব্যক্তির যে মানসিকতা তাহারও অনেকটা বংশগত এবং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। দৈহিক বা মানসিক যাহা কিছু উত্তরাধিকারসূত্রে ব্যক্তির মধ্যে বর্তায় তাহার অধিকাংশই জীন্-নিয়ন্ত্রিত বলা যায়।

কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে—জীন্ এক হইলেও ব্যক্তির মধ্যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বা স্থূল বৈষম্য দেখা যায় কেন? এই বিষয়ে বৈজ্ঞানিক যুক্তি খাটে না। যেমন যমজ সন্তান। রূপে, গুণে, জ্ঞানে, স্বভাবে, চরিত্রে দুই যমজ সহোদরের মধ্যেও এত দৈহিক, চারিত্রিক ও বুদ্ধিবৃত্তির বৈষম্য দেখা যায় যে, তাহাকে

বৈজ্ঞানিক কোন ব্যাখ্যা দিয়া বোঝানো সম্ভব নহে। এই বৈষম্য বংশগত কারণে হইতে পারে না, কারণ দেখা যায় যে, বংশগত কারণে সাদৃশ্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্যই বেশী। জীনের প্রভাবে দৈহিক সাদৃশ্য অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, আচার-ব্যবহারেও অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়, কিন্তু মানসিকতার দিকে, জ্ঞানে স্বভাব-চরিত্রে সাদৃশ্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্যই বেশী দেখা যায়।

পিতামাতা হইতে প্রাপ্ত এক ইঞ্চির ত্রিশ নিযুত-তম (৩০,০০০,০০০-তম) ক্ষুদ্র বীজাণু মানবদেহের একাংশের ভিত্তি গঠন করে মাত্র। মানুষের অধিক জটিল ও সূক্ষ্ম মানসিক এবং বুদ্ধিগম্য নৈতিক পার্থক্য বুঝিতে আমাদের অধিকতর জ্ঞানালোক দরকার। সম্ভ্রান্ত বংশের দীর্ঘ জন্ম-পরম্পরায় হঠাৎ এক অপরাধীর জন্ম (খুনী বা মাতাল বা ব্যাভিচারী) এবং হীন কুলে সৎ-পুরুষ, অদ্ভুত শিশু, প্রতিভাধর মানব ও মহান্ ধর্মগুরুর উৎপত্তির কারণ বংশগত গুণবাদ সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারে না।

বৌদ্ধধর্ম মতে এই পার্থক্য কেবলমাত্র বংশগত, গুণ, পরিবেশ, প্রকৃতি এবং পোষণের জন্য নহে, পরন্তু ইহার কারণ হইতেছে আমাদের অতীত ও বর্তমান কর্মের ফল। আমরা নিজেরাই আমাদের সুখ এবং দুঃখের জন্য দায়ী। আমরা নিজেরাই আমাদের স্বর্গ-নরকের স্রষ্টা। আমরাই আমাদের ভাগ্যবিধাতা। সংক্ষেপে আমরা আমাদের নিজেদের কর্মের প্রতীক।

বৈষম্যের কারণ

কেন এই বৈষম্য, ইহার হেতুই বা কি? এই প্রশ্ন সর্বদাই জ্ঞানীহৃদয়কে আলোকিত করে। যতক্ষণ ইহার সুসমাধান হয় তাহার অনুসন্ধিৎসু প্রাণ শান্তি পায় না। আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে বারাণসীর শ্রেষ্ঠীকুমার শুভ মাণবের মনেও এই প্রশ্ন জাগিয়াছিল। তাই সে জেতবনে ভগবান বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল (মধ্যমনিকায় সূত্র সংখ্যা ১৩৫): ভগবন্, মানুষের মধ্যে এত বৈষম্যের কারণ কি? মানুষের মধ্যে কেহ স্বল্পায়ু, কেহ দীর্ঘায়ু, কেহ স্বাস্থ্যবান, কেহ রুগ্ন, কেহ সুন্দর, কেহ কুৎসিত, কেহ ক্ষমতাশালী, কেহ ক্ষমতাহীন, কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র, কেহ উচ্চ-কুলজাত, কেহ বা নিম্নকুলজাত, কেহ মূর্খ, কেহ বুদ্ধিমান—ইহার কারণ কি?

তদুত্তরে ভগবান বলিয়াছিলেনঃ "কম্মস্‌সকা, মাণব, সত্তা, কম্মদায়াদা,

কম্মযোনি কম্মবন্ধু, কম্মপটিসরণা···কম্মং সত্তে বিভজতি যদিদং হীনপ্‌পণীততায়া" তি।—হে মাণবক, প্রাণিগণের কর্মই স্বকীয়, উহারা কর্মেরই অধিকারী, কর্মই তাহাদের জন্মের কারণ, কর্মই বন্ধু, কর্মই আশ্রয় ···কর্মই সত্ত্বগণকে উচ্চনীচ নানাভাবে বিভাগ করিয়া থাকে।

শুভমাণ বক, বুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ভাষণের বিস্তৃত ব্যাখ্যা চাহিলে বুদ্ধ বলিয়াছিলেন ঃ

"হে মাণবক, এখানে কোন কোন স্ত্রী বা পুরুষ প্রাণহন্তা, রুদ্রপ্রকৃতি, প্রাণীহত্যায় নিরত বলিয়া লোহিতপাণি, হনন ও প্রহারে নিবিষ্ট, সর্বজীবের প্রতি অদয়ালু ও নিষ্ঠুর হয়। এইভাবে অনুষ্ঠিত ও সম্পাদিত কর্মের ফলে সে দেহাবসানে মৃত্যুর পর অপায়, দুর্গতি, নরকে উৎপন্ন হয়। যদি দেহাবসানে পুনরায় মনুষ্যত্ব লাভ করে, তাহা হইলে যেখানে যেখানে জন্মগ্রহণ করে অল্পায়ু হয়।

"হে মাণবক· এখানে কোন কোন স্ত্রী বা পুরুষ প্রাণীহত্যা হইতে বিরত হইয়া নিহিতদণ্ড, নিহিতশস্ত্র, লজ্জী, দয়ালু, সর্বজীবের প্রতি হিতানুকম্পী হইয়া অবস্থান করেন। ইহার কারণে দেহাবসানে মৃত্যুর পর তিনিবাপী সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হন, মনুষ্যত্ব লাভ করিলে দীর্ঘায়ু হন।

"হে মাণবক, এখানে কোন কোন স্ত্রী বা পুরুষ জীবগণের প্রতি স্বভাবে অনিষ্টকারী হয়, অন্যকে হস্তদ্বারা, লোষ্ট্র দ্বারা, দন্ড দ্বারা, শস্ত্র দ্বারা আঘাত করে। ইহার কারণে দেহাবসানে সে মনুষ্যত্ব লাভ করিলে বহুরোগগ্রস্ত হয়।

"হে মাণবক· এখানে কোন কোন স্ত্রী বা পুরুষ তাদৃশ অনিষ্টকারী হয় না, ফলতঃ দেহাবসানে সে মনুষ্যত্ব লাভ করিলে নীরোগ হয়।

"হে মাণবক, এখানে কোন কোন স্ত্রী বা পুরুষ অত্যন্ত ক্রোধপরায়ণ হয়। তাহাকে সামান্য কথা বলিলেও সে রাগান্বিত হয়, কুপিত হয়, অন্যের ক্ষতি করে, অন্যের প্রতি দ্বেষ ও দৌর্মনস্য পোষণ করে। দেহাবসানে সে যদি মনুষ্যত্ব লাভ করে তাহা হইলে সে কুৎসিত হয় দুর্বর্ণ হয়।

"হে মাণবক, এখানে কোন কোন স্ত্রী বা পুরুষ তাদৃশ ক্রোধী হয় না। ফলতঃ দেহাবসানে যদি সে মনুষ্যত্ব লাভ করে, তাহা হইলে সে সুশ্রী হয়, সুন্দর হয়।

"এইভাবে যে ঈর্ষাপরায়ণ হয়, অন্যকে হিংসা করে, সে দেহাবসানে শক্তি-

হীন দুর্বল হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে যে ঈর্ষাপরায়ণ হয় না এবং অন্যকে হিংসা করে না, সে দেহাবসানে মহাশক্তি সম্পন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

"এইভাবে যাহারা কৃপণ হয়, শ্রমণ-ব্রাহ্মণকে দানধর্ম করে না তাহারা দেহাবসানে দরিদ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করে। পক্ষান্তরে যাহারা অকৃপণ হয়, যথাসময়ে শ্রমণ-ব্রাহ্মণকে দানধর্ম করে তাহারা দেহাবসানে ধনী ও মহাভোগ-সম্পন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

"কোন কোন স্ত্রী বা পুরুষ অতিমানী হয়, অহংকারী হয়। অভিবাদন-যোগ্যকে অভিবাদন করে না, মাননীয়কে মান্য করে না, পূজনীয়কে পূজা করে না। সে দেহাবসানে নীচকুলে জাত হয়। পক্ষান্তরে যে অতিমানী বা অহংকারী হয় না, অভিবাদনযোগ্যকে অভিবাদন করে, মাননীয়কে মান্য করে, পূজনীয়কে পূজা করে, সে দেহাবসানে উচ্চকুলে সম্ভ্রান্তবংশে জাত হয়।

…এইভাবে হে মাণবক, আমি বলি যে, জীবগণের কর্মই নিজের, তাহারা কর্মের ফল ভোগ করে, কর্ম তাহাদের যথাকর্ম উৎপত্তির কারণ, কর্ম তাহাদের বন্ধু, কর্ম তাহাদের শরণ, কর্মই জীবগণকে হীন-উৎকৃষ্টভাবে বিভক্ত করে।"

একথা ঠিক যে, মানুষ কিছু কিছু বংশগত স্বভাব লইয়া জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু ইহা ছাড়াও এমন কতকগুলি গুণধর্ম আমাদের মধ্যে প্রকাশ পায় যাহার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই। পিতামাতার স্থূল শুক্র-শোনিতের দ্বারা আমাদের স্থূল দেহ গঠিত হয় ঠিক। কিন্তু শুধু ইহার দ্বারা মানব-জীবনের সমস্ত কিছুকে ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ পূর্ব পূর্ব জন্মে সঞ্চিত কর্মের ফল ব্যক্তির দৈহিক এবং মানসিক স্তরে বংশগত জীন্ অপেক্ষা বেশী প্রভাব বিস্তার করে।

অন্যান্যদের ন্যায় বুদ্ধও তাঁহার পিতামাতার বংশগত জীনের (genes) উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, কিন্তু দৈহিক নৈতিক এবং জ্ঞানের দিক হইতে তাঁহার পূর্বপুরুষদের কেহই তাঁহার মত ছিলেন না, সর্বদিকে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। তাঁহার পূর্ব পূর্ব জন্মে সঞ্চিত পুণ্যকর্মই তাঁহাকে অন্যান্য-দের হইতে পৃথক্ করিয়াছে। পালি দীর্ঘনিকায়ের "লক্খণ সুত্তে" বুদ্ধের ৩২ প্রকার মহপুরুষলক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে এবং তাঁহার পূর্ব পূর্ব জন্মের

পুণ্যকর্মই যে এই সকল মহাপুরুষ লক্ষণের কারণ তাহাও বলা হইয়াছে। বুদ্ধের মতে কর্ম বংশগত জীনের স্বভাবকেও নস্যাৎ করিয়া দিতে পারে। তাই তিনি বলিয়াছেন ঃ "আমরা আমাদের কর্মেরই উত্তরাধিকারী।"

"কম্মুনা বত্ততি লোকো, কম্মুনা বত্ততি পজা
কম্মনিবন্ধনা সত্তা রথস্সানী'ব যায়তে॥"

অতএব, বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে আমাদের যাবতীয় বৈষম্যের মূলে আছে আমাদের অতীত এবং বর্ত্তমান কর্ম।

সমস্ত কিছু কর্মনিয়ন্ত্রিত নহে

যদিও বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, কর্মই সত্ত্বগণের মধ্যে বিবিধ বৈষম্যের কারণ, তথাপি ভগবান বুদ্ধ ইহাও স্বীকার করেন নাই যে, সমস্ত কিছুই কর্মনিয়ন্ত্রিত। "আমরা যাহা কিছু সুখ-দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ অনুভূতির স্বীকার হই তাহার পশ্চাতে শুধু কর্মই আছে"—এই ধারণার বিরুদ্ধে বুদ্ধ বলিয়াছেন যে, যদি পূর্বকর্মই মানুষের সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করে তাহা হইলে, পূর্বকর্ম বশতঃ মনুষ্য হত্যাকারী হইবে, চোর হইবে, ব্যভিচারী হইবে, মিথ্যাবাদী হইবে, লোভী হইবে, হিংসুক হইবে, মাৎসর্যপরায়ণ হইবে...। তাহা হইলে মানুষ ইহ জন্মে কর্মরহিত হইবে, কর্ম করা হইতে নিবৃত্ত হইবে। তাহা হইলে একজন মন্দ লোক, সর্বদাই মন্দ থাকিত কেন না তাহার কর্মই তাহাকে মন্দ করিয়াছে। রোগমুক্ত হইবার কাহারও কর্ম থাকিলে, তাহা হইলে রোগমুক্তির জন্য তাহাকে চিকিৎসকের নিকট যাইতে হইত না। যদি পূর্বকর্মই সমস্ত নিয়ন্ত্রণ করিত তাহা হইলে কর্ম নিয়তি বা অদৃষ্টবাদে পর্যবসিত হইত। ব্যক্তি তাহার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতকে শুদ্ধ করিতে প্রয়াসী হইবে না। তাহা হইলে স্বাধীন ইচ্ছা বলিয়া কিছুই থাকিত না। জীবন যন্ত্রবৎ হইয়া যাইত। তাহা হইলে আমরা কোন সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছি যিনি আমাদের সমস্ত কিছুর নিয়ন্তা অথবা আমাদের পূর্বকর্ম যাহা আমাদের ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং আমাদের জীবনধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে—উভয়ই এক হইয়া যাইত। বৌদ্ধ কর্মতত্ত্বের মধ্যে ঈদৃশ অদৃষ্টবাদের স্থান নাই।

বুদ্ধের মতে জড় ও চেতন রাজ্যে পাঁচটি নিয়ম আছে ঃ যেমন—

১। ঋতু নিয়ম ঃ যেমন সময়োপযোগী বৃষ্টি হওয়া, বায়ু প্রবাহিত হওয়া ইত্যাদি।

২। কর্ম নিয়ম ঃ কর্ম ও কর্মফলের নিয়ম, যেমন ভাল ও মন্দ কর্ম ভাল ও মন্দ ফল প্রদান করে।

৩। বীজ নিয়ম ঃ অঙ্কুর বা বীজের নিয়ম, যেমন ধানের বীজ হইতে ধান জম্মায়, ইক্ষু হইতে চিনির স্বাদ পাওয়া যায়, মধু হইতে মধুর স্বাদ পাওয়া যায় ইত্যাদি। সৃষ্টিতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এবং যমজ সন্তানের মধ্যে শারীরিক সাদৃশ্যের ব্যাখ্যা এই প্রণালীতে করা যাইতে পারে।

৪। চিত্ত-নিয়ম মানসিক নিয়ম। যেমন চিত্তের গতি প্রণালী এবং মনের শক্তি ইত্যাদি।

৫। ধর্ম-নিয়ম স্বাভাবিক নিয়ম। যেমন বোধিসত্ত্বের শেষ জন্মে সংঘটিত ঘটনা এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তি প্রভৃতি।

এই সর্বাত্মক পঞ্চ নিয়মের দ্বারা জড়-চেতন প্রত্যেক পদার্থের ব্যাখ্যা করা যায়।

বিশ্বে বিদ্যমান এই পঞ্চ নিয়মের মধ্যে কর্ম-নিয়ম একটি নিয়ম মাত্র। এই নিয়ম স্বয়ংসৃষ্ট। এই নিয়মে কর্তার প্রয়োজন নাই। যেমন প্রাকৃতিক নিয়ম, মাধ্যাকর্ষণের নিয়মে কর্তা নিষ্প্রয়োজন। বাহ্যিক স্বাধীন শাসকের বা কর্তার হস্তক্ষেপ ব্যতীত ইহা আপন ক্ষেত্রে কাজ করিয়া যাইতেছে। উদাহরণস্বরূপ, যেমন কোন ব্যক্তিই অগ্নিকে দাহ করিতে আদেশ দেয় নাই, জলকে তাহার সমতার অনুসন্ধান করিতে বলে নাই, বায়ুকে কেহ প্রবাহিত হইতে বলে নাই—এইগুলি ঐসকল মহাধাতুর অন্তর্নিহিত গুণ। তদ্রূপ, কর্ম অদৃষ্ট যেমন নহে, তেমন পূর্ব নির্ধারিত বিধানও নহে, যাহা কোন রহস্যময় অজ্ঞাত শক্তি আমাদের উপর চাপাইয়া দিয়াছে যাহার নিকট আমাদের অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। মানুষ তাহার ভাল-মন্দ কর্মের ফলস্বরূপ স্বাভাবিকভাবেই সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। উপযুক্ত ফল প্রসবই কর্মের অন্তর্নিহিত শক্তি। কর্ম ফল দেয়, ফল কারণ নির্দেশ করে। বীজ ফল প্রদান করে এবং ফল বীজের বর্ণনা করে, উভয়েই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। সেইরূপ কর্ম ও কর্মফল পরস্পর সম্পর্ক জড়িত। ফলই পূর্ব হইতে কর্মের মধ্যে অঙ্কুররূপে বর্তমান থাকে।

কর্ম কাহাকে বলে ?

দৈহিক, মৌখিক এবং মানসিক যে কোন ইচ্ছাকৃত ক্রিয়া বা কার্যকে কর্ম বলা হয়। চিন্তন, কথন এবং করণ (দৈহিক) সমস্তই কর্মের অন্তর্গত। সাধারণতঃ ভাল-মন্দ যে কোন ক্রিয়ার নামই কর্ম। পারমার্থিক ভাষায় সকল প্রকার কুশল এবং অকুশল চেতনাই কর্ম। অনিচ্ছাকৃত এবং অচেতন ক্রিয়াকে কর্ম বলা হয় না, কারণ সেখানে কর্তার 'চেতনা' অনুপস্থিত। বুদ্ধ বলিয়াছেন 'চেতনা' হং ভিকখবে কম্মং বদামি। চেতয়িত্বা কম্মং করোতি কায়েন বাচা মনসাপি।—হে ভিক্ষুগণ আমি চেতনাকেই কর্ম বলি। কারণ চেতনার দ্বারা ব্যক্তি কায়-বাক্য মনের দ্বারা কর্ম সম্পাদন করে।

কেবলমাত্র বুদ্ধ এবং অর্হৎগণের চেতনা কর্মের অন্তর্গত নহে. কারণ তাঁহারা পাপ-পুণ্য উভয় সংস্কার হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন। কর্মের মূল কারণ অবিদ্যা এবং তৃষ্ণাকে তাঁহারা ক্ষয় করিয়াছেন। অতএব, বহু-জনহিতায় বহুজনসুখায় তাঁহারা যে কর্ম সম্পাদন করেন সেই কর্মের দ্বারা কর্মবীজ উৎপন্ন হয় না, যেহেতু তাঁহাদের কর্মের মধ্যে অবিদ্যাও নাই, তৃষ্ণাও নাই।

কর্মের উৎপত্তিস্থল হইতেছে মন। কায়কর্ম ও বাক্‌কর্ম সমস্তই মনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই ধম্মপদে বলা হইয়াছে ঃ

"মনোপুব্বংগমা ধম্মা মনোসেট্‌ঠা মনোময়া।
মনসা চে পদুট্‌ঠেন ভাসতি বা করোতি বা।
ততো নং দুক্‌খমন্বেতি চক্কং'ব বহতো পদং॥"

আবার ঃ "মনোপুব্বংগমা ধম্মা মনোসেট্‌ঠা মনোময়া।
মনসা চে পসন্নেন ভাসতি বা করোতি বা।
ততো নং সুখমন্বেতি ছায়া ব অনপায়িনী॥"

—মন ধর্মসমূহের (চিত্ত-চৈতসিক ধর্মসমূহের) পূর্বগামী, মন ইহাদের প্রধান এবং ইহারা মনোময় বা মনের দ্বারা গঠিত। যদি কেহ দোষযুক্ত মনে কোন কথা বলে কিংবা কাজ করে, তবে শকটবাহী বলদের পদানুগামী চক্রের ন্যায় দুঃখ তাহার অনুসরণ করে।

আবারঃ মন ধর্মসমূহের পূর্বগামী, মন ইহাদের প্রধান এবং ইহারা মনের দ্বারা গঠিত। যদি কেহ প্রসন্ন মনে কোন কথা বলে কিংবা কাজ করে, তবে দেহের অনুগামী ছায়ার ন্যায় সুখ তাহার অনুগামী হয়।

কর্ম বলিতে শুধুমাত্র অতীতের কর্মকেই বুঝায় না, ইহার দ্বারা অতীত এবং বর্তমান উভয়কালের কর্মকেই বুঝায়। অতএব, এক কথায় বলিতে গেলে বলা যায় যে আমাদের অতীত বর্তমানকে নিয়ন্ত্রিত করে, এবং বর্তমান ভবিষ্যতকে নিয়ন্ত্রিত করে। অতীতের 'আমি'র কারণে বর্তমানের 'আমি' এবং বর্তমানের 'আমি'র কারণে ভবিষ্যতের 'আমি'। অর্থাৎ বর্তমান হইতেছে অতীতের সন্তান এবং ভবিষ্যতের মাতাপিতা। কিন্তু এই কথা বলা যুক্তিযুক্ত হইবে না যে, বর্তমানের 'আমি' হুবহু অতীতের 'আমির' প্রতিরূপ এবং ভবিষ্যতের 'আমি' বর্তমান 'আমির'ই প্রতিরূপ। কারণ, অদ্যকার দস্যু আগামীকল্য সাধু-সন্তে পরিণত হইতে পারে (যেমন দস্যু রত্নাকরই বাল্মীকি মুনি হইয়াছিলেন)। আবার অদ্যকার সাধুব্যক্তি আগামীকল্য দস্যুতে পরিণত হইতে পারে।

কর্ম ও বিপাক

কর্ম হইতেছে ক্রিয়া বা কার্য, বিপাক হইতেছে ক্রিয়া বা কার্যের ফল। প্রত্যেক বস্তুর যেমন ছায়া আছে এবং ছায়া সেই বস্তুকে সব সময় অনুসরণ করে, তদ্রূপ কর্ম-বিপাক কর্মকে অনুসরণ করে। কর্ম হইতেছে, বীজবৎ (যাহা হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি হয়) এবং কর্মফল হইতেছে (সেই বৃক্ষেরই ফলের ন্যায়)। কর্ম যদি ভাল মন্দ হয় বিপাকও ভাল-মন্দ হইবে। কর্মের উৎপত্তিস্থল মন (চেতনা) অতএব কর্মফলের উৎপত্তিস্থলও মন। কর্মবীজের প্রকৃতি অনুসারে সুখ-দুঃখাদি অনুভূতি মনে অনুভূত হয়। কুশল কর্মের (পালি, **আনিসংস**) বিপাকস্বরূপ উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি, সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ইত্যাদি লাভ করা যায়। 'আবার' অকুশল কর্মের (পালি **আদীনব**) বিপাকস্বরূপ দারিদ্র্য, কুৎসিত রূপ, ব্যাধি, অল্পায়ু ইত্যাদি লাভ করিতে হয়।

আমরা যেরকম বীজ বপণ করিব, সেই রকমই ফল ভোগ করিব যে কোন সময়ে এবং যে কোন স্থানে ইহজন্মে বা পরজন্মে। কর্ম করিলে তাহার ফল ভোগ করিতেই হইবে। আমরা বর্তমানে যাহা ভোগ করিতেছি তাহা বর্তমান বা অতীতের কোন কর্মেরই ফল।

ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছেন ঃ

"যেমন বীজ বপন করা হয়, তেমনই ফল লাভ হয়। কল্যাণকারী কল্যাণ লাভ করে এবং পাপকারী পাপ প্রাপ্ত হয়।"

আবার বুদ্ধ ইহাও বলিয়াছেন ঃ

"মানুষ চেষ্টার দ্বারা তাহার কর্মফলকে কিছুটা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে।"

কর্মের কারণ বা হেতু

অবিদ্যা বা অজ্ঞতাই (অর্থাৎ বস্তু বা বিষয়কে যথাযথভাবে না জানা) কর্মের মুখ্য কারণ। অবিদ্যার সহিত কর্মের দ্বিতীয় কারণ তৃষ্ণা যুক্ত হয়। সমস্ত প্রকার পাপকর্মের কারণ এই অবিদ্যা এবং তৃষ্ণা। সংসারী ব্যক্তির যাবতীয় কুশল কর্মের মূল অলোভ, অদ্বেষ এবং অমোহ হইলেও ইহাদিগকে কর্মই বলা হয়, কারণ তাহার মধ্যে অবিদ্যা ও তৃষ্ণা প্রসুপ্তই থাকে। শুধুমাত্র লোকোত্তর মার্গচিত্তকে কর্ম বলা হয় না, কারণ ইহারা অবিদ্যা ও তৃষ্ণার ধ্বংসের জন্যই প্রবৃত্ত হয়।

কর্মের কারক বা কর্তা

কর্মের কর্তা কে? কে কর্মফল ভোগ করে? ইহার উত্তরে আচার্য বুদ্ধঘোষ তাঁহার বিসুদ্ধিমগ্গে বলিয়াছেন ঃ

> "কম্মস্স কারকো নত্থি, বিপাকস্স চ বেদকো।
> সুদ্ধধম্মা পবত্তন্তি, এবেতং সম্মাদস্সনং ॥"

—পরমার্থতঃ শুভাশুভ কর্মের কর্তা ও বিপাকের ভোক্তা নাই। ক্ষণ-বিধ্বংসী জড়-চেতনময় ধর্মপ্রবাহ কর্ম ও কর্মফলরূপে চলিতেছে। বৌদ্ধ সাহিত্যে ইহাকে উপলব্ধি করাই সম্যক্ দর্শন। আমি কর্ম করি এবং আমিই ফল ভোগ করি—এই সকল উক্তি ব্যবহারিক সত্য মাত্র। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে যাহাকে আমরা টেবিল বলি পারমার্থিক দৃষ্টিতে টেবিল হইতেছে কিছু কর্মশক্তি ও দ্রব্যগুণের সমষ্টি মাত্র। একজন বৈজ্ঞানিক সাধারণ ভাষায় যাহাকে 'জল' বলেন ল্যাবরেটরী তাহাকে বলে H_2O। এইভাবে, ব্যবহারিক দৃষ্টিতে আমরা বলি, পুরুষ, স্ত্রী, সত্ত্ব, জীব, ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে এইগুলি ক্ষণ-পরিবর্তনশীল ও ক্ষণবিধ্বংসী ঘটনাপ্রবাহ মাত্র। সেইজন্য

বৌদ্ধরা শাশ্বত কোন সত্তাকে বিশ্বাস করে না, কর্ম ব্যতীত কোন কর্তাকে স্বীকার করে না, অনুভূতি ব্যতীত অনুভবকারীকে স্বীকার করে না, চেতনা ব্যতীত চেতন কোন সত্তাকে স্বীকার করে না। তাহা হইলে কর্মের কর্তা কে? কর্মের ফলভোক্তাই বা কে? বুদ্ধের মতে চেতনাই কর্তা। বেদনা (অনুভূতি) হইতেছে কর্মের ফলভোক্তা। ইহারা ব্যতীত বীজবপকও নাই, ফলভোক্তাও নাই। সংক্ষেপে বলা যায় "চিন্তাই চিন্তনকারী" (Thought itself is the thinker)

কর্ম কোথায় থাকে

রাজা মিলিন্দ ভদন্ত নাগসেনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন: "ভন্তে, কর্ম কোথায় থাকে?"

ভদন্ত নাগসেনের উত্তর: "মহারাজ, এই ক্ষণপরিবর্তনশীল নামরূপের (Mind and body) মধ্যে কর্ম কোথাও সঞ্চিত থাকে না। কিন্তু নামরূপকে ভিত্তি করিয়া ইহা প্রবর্তিত হয় এবং উপযুক্ত মুহূর্তে আসিলে ফল প্রসব করে, যেমন আম্রফল আম্রবৃক্ষের কোথাও লুক্কায়িত থাকে না, তবে আম্রবৃক্ষকেই ভিত্তি করিয়া ইহার অবস্থিতি এবং যথাকালে ফলাকারে ইহার আবির্ভাব।

বায়ু বা তেজঃ যেমন কোন স্থানে লুক্কায়িত থাকে না, কার্য্যকারণের শৃঙ্খলার দ্বারা ইহাদের অনুভব করা যায়, তদ্রূপ কর্ম এই নামরূপ সমন্বিত কায়ের অভ্যন্তরে বা বাহিরে কোথাও অবস্থান করে না।

কর্ম হইতেছে একটি স্বকীয় শক্তি, এক জন্ম হইতে অন্য জন্মে ইহা সংক্রামিত হয়। ইহা জন্ম-জন্মান্তরে ব্যক্তির স্বভাবকে প্রভাবিত করে। ইহারই ফলে আমরা অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন শিশুকে দেখিতে পাই, যমজ সন্তানের দুইজনের মধ্যে দুই রকম স্বভাব ও প্রতিভা লক্ষ্য করি, একই পিতামাতার সন্তান হইলেও সেই সন্তানদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার গুণাবলী ও স্বভাব-চরিত্র দেখিতে পাই। ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত ও জাগতিক কল্যাণের জন্য এই কর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

কর্মের ক্রিয়া বা কার্যকারিতা

কর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভের জন্য চিত্তবীথি (=চিত্তের ভ্রমণ-পথ)

বা চিত্তবৃত্তির সহিত পরিচিত হইতে হইবে। মন বা চিত্ত বা বিজ্ঞান (Consciousness) হইতেছে মানুষের সমস্ত কিছুর নিয়ন্তা। ইহাই মানুষকে সৎপথে এবং বিপথে পরিচালিত করে। অতএব মন বা চিত্ত হইতেছে একদিকে মানুষের চরমতম শত্রু, অন্যদিকে পরমতম মিত্র।

চিত্তবীথি হইতেছে চিত্তের ভ্রমণপথ। চক্ষু-শ্রোত্রাদি দ্বারপথে আলম্বনের স্পর্শে ভবাঙ্গ অবস্থা হইতে চিত্ত জাগ্রত হইয়া নির্দিষ্ট স্থানাদির মধ্য দিয়া নির্দিষ্ট কৃত্যাদি সমাপনান্তে পুনঃ ভবাঙ্গে পতিত হয়।—(ভবাঙ্গ কাহাকে বলে? যেই প্রতিসন্ধি-বিজ্ঞান (rebirth-consciousness) নবীন জন্মের সহিত প্রতিসন্ধি (re-union) ঘটায়. সেই প্রতিসন্ধি বিজ্ঞান প্রতিসন্ধি-ক্ষণের পরবর্তী ক্ষণ হইতে বীথিচিত্তোৎপত্তির অনুপস্থিতে ভবের (অস্তিত্বের) অঙ্গ বা কারণরূপে আমরণ প্রবাহিত হইতে থাকে। ভবের অঙ্গরূপী এবম্বিধ প্রতিসন্ধি-বিজ্ঞানের নাম 'ভবাঙ্গ') এইরূপে চিত্ত-পরম্পরা অশ্রান্তভাবে বীথি ও ভবাঙ্গে উঠিয়া-পড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু চিত্ত-পরম্পরা ভবাঙ্গের মধ্য দিয়া এইরূপ দ্রুত গতিতে বীথির পর বীথি অতিক্রম করে যে, অলাত-চক্রের আলো-রেখার কিংবা চলচ্চিত্রের পার্থক্যের ন্যায় এই চিত্ত-পরম্পরার পার্থক্য আমাদের সাধারণ জ্ঞানে ধরা পড়ে না। সেইজন্য এই অসংখ্য চিত্ত-পরম্পরাকে একটি মাত্র চিত্ত বলিয়া প্রতীতি জন্মে। প্রতীতি জন্মে যে চিত্তের একটি মাত্র অনুভূতি, যাহা বাক্য দ্বারা ব্যক্ত হয় যে, "আমি একটি বৃক্ষ দেখিতেছি," তাহা একটি মাত্র চিত্তের ক্রিয়া।

বীথিচিত্ত ও ভবাঙ্গ উভয়েই স্ব স্ব আলম্বন, কৃত্য, স্বভাব সম্বন্ধে বিপরীত ভাবাপন্ন। তরঙ্গহীন নদীস্রোতের ন্যায় ভবাঙ্গ শান্তভাবে প্রবহমান। কিন্তু বাত্যাঘাতে যেমন শান্ত নদীপ্রবাহে তরঙ্গোচ্ছ্বাস হয়, তেমনি চক্ষু-শ্রোত্রাদি দ্বারপথে আলম্বনের অভিঘাতে ভবাঙ্গ-প্রবাহে চিত্তোৎপত্তি হয়। নবীন আলম্বনের স্পর্শে ভবাঙ্গালম্বন পরিত্যাগ করিয়া, চিত্তের সেই নবীন আলম্বন গ্রহণই **চিত্ত-নিয়ম**। নদী-তরঙ্গের উচ্ছ্বাস আছে, স্থিতি আছে ও পতন আছে। চিত্তেরও তদ্রূপ উৎপত্তি আছে, স্থিতি আছে, ভঙ্গ আছে। ভবাঙ্গালম্বন পরিত্যাগ করিয়া নবীনালম্বন মননই চিত্তের "উৎপত্তি" সেই লব্ধ আলম্বনে চিত্তের অনিবৃত্তিই "স্থিতি", এবং নিবৃত্তি বা অন্তর্ধানই "ভঙ্গ"। কোন কোন দার্শনিক চিত্তের "স্থিতি-ক্ষণ" স্বীকার করেন না। কিন্তু স্থিতি বলিতে চিত্তের নিশ্চল অবস্থাকে বোঝায় না। যেমন বীথিতে,

তেমন ভবাঙ্গাবস্থায় চিত্ত চির-প্রবহমান। চিত্তের উৎপত্তি-ক্ষণের পর ভঙ্গাভিমুখী ক্ষণটিই স্থিতিক্ষণ। চিত্তের "ক্ষণ" বলিতে এক নিমেষের, বা অঙ্গুলির এক তুড়ী (=চুট্‌কী) সময়ের বহু কোটি-শত-সহস্র ভাগের এক ভাগ সময়কে বুঝায়। এইরূপ এক উৎপত্তি-ক্ষণ, এক স্থিতি-ক্ষণ ও এক ভঙ্গ-ক্ষণ—এই প্রকার তিন ক্ষণে এক "চিত্তক্ষণ" হয়। এই এক চিত্তক্ষণই চিত্তের আয়ু। পালি অঙ্গুত্তর নিকায়ে সর্বজ্ঞ বুদ্ধও স্বীকার করিয়াছেন যে, চিত্তের দ্রুতপরিবর্তনশীলতার উপমা মিলে না। তবে চিত্ত কিভাবে আলম্বনের স্পর্শে শান্তভাবে প্রবহমান ভবাঙ্গাবস্থা হইতে উত্থিত হইয়া ঐ ঐ নির্দিষ্ট স্থানে ঐ ঐ নির্দিষ্ট কৃত্য সমাপনান্তে পুনঃ ভবাঙ্গে পতিত হয় তাহা আচার্য বুদ্ধঘোষ উপমার সাহায্যে বুঝাইয়া দিয়াছেন ঃ

১। চিত্তের ভবাঙ্গাবস্থা—	একটি আম্রবৃক্ষের নীচে এক ব্যক্তি কাপড়ে মুখ ঢাকিয়া নিদ্রা যাইতেছে।
২। অতীত ভবাঙ্গ-কাল। দ্বারপথে আগত আলম্বন এক চিত্তক্ষণের জন্য ভবাঙ্গ-স্রোতের সহিত প্রবাহিত হইল	—এক দম্‌কা বাতাস ঐ আম্রবৃক্ষের উপর দিয়া বহিয়া গেল।
৩। ভবাঙ্গ-চলন কাল। এক চিত্তক্ষণের জন্য ভবাঙ্গে কম্পন উপস্থিত হইল	—তাহাতে আম্রবৃক্ষের শাখা আন্দোলিত হইল
৪। ভবাঙ্গ-উপচ্ছেদ কাল। এই এক চিত্তক্ষণে ভবাঙ্গ স্বীয় আলম্বন পরিত্যাগ করিল	—একটি আম্র বৃন্তচ্যুত হইয়া ভূপতিত হইল।
৫। মনস্কারের জাগরণ-কাল। নবীন আলম্বনের দিকে মনস্কার আবর্তিত হইল। ইহাই **পঞ্চদ্বারাবর্তনচিত্ত**। এইখানে বীথি-ভ্রমণ আরম্ভ হইল। ইহা বীথির **প্রথম চিত্তক্ষণ**	—পতন শব্দে লোকটি জাগিয়া উঠিল।

৬। চক্ষু-বিজ্ঞান কাল (২য় চিত্তক্ষণ)	—এবং মুখবস্ত্র অপসারিত করিয়া আম্রটি দর্শন করিল।
৭। সম্প্রতীচ্ছ কাল (৩য় চিত্তক্ষণ) (চিত্তের নিষ্ক্রিয়ভাবে প্রতি-গ্রহণই সম্প্রতীচ্ছকৃত্য।) সম্প্রতীচ্ছ শব্দের অর্থ হইতেছে গ্রহণ, সমর্থন। সং+প্রতি+ইচ্ছা=সম্প্রতীচ্ছা। পঞ্চ-বিজ্ঞান গৃহীত আলম্বনকে পুনঃ ইচ্ছাকারী বা গ্রহণকারী চিত্তই সম্প্রতীচ্ছ-চিত্ত।	—তৎপর আম্রটি কুড়াইয়া লইল।
৮। সন্তীরণ কাল (৪র্থ চিত্তক্ষণ) সম্প্রতীচ্ছ চিত্তের দ্বারা সমর্থিত আলম্বনের লক্ষণ বিচারই সন্তীরণ কৃত্য।	—এবং মর্দন ও পরীক্ষা করিল।
৯। ব্যবস্থাপন কাল (৫ম চিত্তক্ষণ) ঐ আলম্বন লইয়া চিত্ত কি করিবে তাহার ব্যবস্থা করাই ব্যবস্থাপন কৃত্য।	—উহা আস্বাদনযোগ্য সুপক্ক আম্র বলিয়া নির্ধারণ করিল।
১০। জবন কাল (৬ষ্ঠ—১২শ চিত্তক্ষণ) ব্যবস্থাপনের পর সেই ব্যবস্থানুযায়ী চিত্তের অশনিবেগে পুনঃ পুনঃ সেই আলম্বনের অনুভূতি জবন কৃত্য (জু+অনট্=জবন=বেগ) জবনচিত্ত অর্থাৎ বেগবান চিত্ত ক্রিয়াশীল বা কর্মশীল চিত্ত। চিত্ত-বীথির এই জবনস্থানেই সংস্কার বা কর্ম পুনগঠিত হয়।	—আম্র পরিভোগ করিল।

১১। তদালম্বন কাল (১৩শ—১৪শ চিত্তক্ষণ) 'তৎ' অর্থাৎ সেই জবন-গৃহীত আলম্বনের পুনরালোচনা তদালম্বন-কৃত্য	—"পরিভোগ করিয়াছি" এই স্মৃতি উপভোগ করিল।
১২। পুনঃ ভবাঙ্গ কাল অর্থাৎ চিত্ত ভবাঙ্গ স্থানে, ভবাঙ্গ কৃত্যে ও ভবাঙ্গালম্বনে পুনঃ নিযুক্ত হইল।	—ঐ ব্যক্তি পুনরায় নিদ্রামগ্ন হইল।

এই উপমা হইতে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, চিত্তের বীথি পর্যটনে বীথির জবন স্থানেই (অর্থাৎ ৬ষ্ঠ—১২শ চিত্তক্ষণ) চিত্ত সক্রিয়, ইহাই 'কর্মভব'। জবনস্থানেই কর্ম নবীভূত ও গঠিত হয়। তাই বলা হইয়াছে—কম্মস্স কারকো নত্থি। অর্থাৎ কর্মের কোন কর্তা নাই। বীথিস্থ চিত্তপরম্পরা, যেমন প্রত্যেক বীথির পর, তেমন বীথির প্রত্যেক স্থানে প্রত্যেক চিত্তক্ষণের পর ভবাঙ্গে পতিত হয় ও পুনরুৎপন্ন হয়। এইরূপ উঠা-নামা দ্বারা চলচ্চিত্রের অভিনয় করিয়া বীথি পরম্পরার প্রত্যেক বীথি তদালম্বন স্থানে (অর্থাৎ ১১শ স্থান) সমাপ্ত হয় ও ভবাঙ্গপাত হয়। পুনঃ উঠিয়া পড়িয়া বীথি ভ্রমণ, পুনঃ ভবাঙ্গে পতন। পুনঃ ভ্রমণ, পুনঃ পতন। এই ভাবেই চিত্ত চলিয়াছে, এই ভাবেই চিত্ত সক্রিয় হয়, কাজ করে। চিত্ত ব্যতীত কর্মের কোন কর্তা নাই। চিত্তবীথির জবন স্থানে কিভাবে চিত্ত সক্রিয় হইয়া কর্মভবের কারণ হয়, এই বিষয়ে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন আছে। 'জবন' শব্দের দ্বারা 'বেগ' 'গমন' বুঝাইলেও দার্শনিক অর্থে ইহা চিত্তের বেগ, চিত্তেরই গমন বুঝায়। আলম্বনে চিত্তের গমন অর্থ সক্রিয়ভাবে চিত্তের আলম্বন উপলব্ধি। সম্প্রতীচ্ছ চিত্ত (=৩য় চিত্তক্ষণ) নিষ্ক্রিয়ভাবে আলম্বন গ্রহণ করে (উপরের উদাহরণের ৭ম ভাগ দ্রষ্টব্য)—ইহা স্বাধীনতা-হীন, স্রোত-বাহিত কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায়। ইহা কর্মফল যাহাকে লৌকিক ভাষায় বলা হয় ভাগ্য বা অদৃষ্ট। কিন্তু জবন-চিত্ত আলম্বনকে সক্রিয়ভাবে অশনিবেগে গ্রহণ করে, জানে ও ব্যবহার করে। ইহা স্বাধীন, ইহা পুরুষকার এবং ইহা কুম্ভীরের ন্যায় নদীস্রোতের অনুকূল প্রতিকূলে চলন-ক্ষম। এই জবনস্থানে চিত্ত স্বাভাবিক অবস্থায় ৭ (সাত) চিত্ত-ক্ষণ (৬ষ্ঠ হইতে ১২শ চিত্তক্ষণ) আলম্বন উপলব্ধি করে। ১ম জবন চিত্তক্ষণ

আসেবনের (অভ্যাসের) অভাবে দুর্বল। ২য় জবন চিত্তক্ষণ নিজশক্তি ও প্রথম জবন হইতে প্রাপ্ত শক্তি সংযোগে ১ম জবন হইতে বলবত্তর। সেইরূপ ৩য় জবন ২য় হইতে এবং ৪র্থ জবন ৩য় হইতে বলবত্তর। ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম জবন চিত্তক্ষণ পতনোন্মুখ বলিয়া ক্রমশঃ দুর্বলতর। ১ম জবনের বিপাক সেই জন্মেই ফলে। ফলিবার অবকাশ না পাইলে উহা ক্ষীণবীজ হইয়া যায়। ৭ম জবন পতনোন্মুখ হইলেও ১ম জবন হইতে বলবত্তর। এইজন্য ইহার বিপাক পরবর্তী জন্মে ফলে। সেই জন্মে ফলিবার অবকাশ না পাইলে ক্ষীণবীজ হইয়া যায়। মধ্যের ৫ (পাঁচ) জবনের ফলনোপযোগী শক্তি বহু শত-সহস্র জীবন (অর্থাৎ নির্বাণ উপলব্ধি না করা পর্য্যন্ত) সঞ্জীবিত থাকে। তবে ইতিমধ্যে বিপরীত বা অনুকূল কর্মদ্বারা সঞ্চিত বিপাককে পরিবর্তন অর্থাৎ হ্রাসবর্ধন করা যায়। অন্যভাবে বলিতে হইলে বলা যায় যে, এক স্বভাবের জবন (কর্ম) যতই সুগঠিত হইতে থাকে, বিপরীত স্বভাবের বিপাকশক্তি ততই হ্রাস পাইতে থাকে। ইহা না হইলে জীবের উন্নতি ও মুক্তি অসম্ভব হইত।

কোন এক ভবে প্রতিসন্ধির পরই সেই প্রতিসন্ধি চিত্ত ১৫ বা ১৬ চিত্তক্ষণ ভবাঙ্গাবস্থায় থাকে। তদনন্তর "ভব-নিকন্তি" (নিকন্তি শব্দের অর্থ নন্দি-রাগ-সহগতা তৃষ্ণা। ইহার সংস্কৃত প্রতিশব্দ নিকান্তি) নামক লোভজবনচিত্ত মনোদ্বার বীথিতে উৎপন্ন হইয়া এই নবীন জন্মকে অভিনন্দন করে ও পুনঃ ভবাঙ্গে পতিত হয়। ইহা এই নবীন ভবের প্রথম বীথি। এই প্রথম চিত্তবীথি হইতে আরম্ভ করিয়া ছয় দ্বারিক চিত্ত-বীথি ভূমি, পুদ্গল, দ্বার ও আলম্বন অনুসারে উৎপত্তির অনুরূপে আমৃত্যু শুধু ভবাঙ্গ দ্বারা পুনঃ পুনঃ খণ্ডিত হইয়া নিরন্তর প্রবর্তিত হয়। বীথির সহিত ভবাঙ্গের এবং ভবাঙ্গের সহিত বীথির "অনন্তর প্রত্যয়।" বীথিস্থ চিত্ত পরম্পরার মধ্যেও পরস্পর "অনন্তর-প্রত্যয়" সম্বন্ধ। সুতরাং সেই অজ্ঞাত আদি হইতে সত্ত্ববিশেষের যে **চিত্ত-বীথি ও ভবাঙ্গ, ভবাঙ্গ ও চিত্তবীথি** অবিচ্ছিন্নভাবে উঠিয়া পড়িয়া নবীভূত সুতরাং পরিবর্তিত হইতে হইতে প্রবাহিত হইতেছে নিরন্তরভাবে, শুধুমাত্র অর্হতের (বৌদ্ধ সাধনমার্গের চরম সীমায় উপনীত সাধক) চ্যুতিচিত্তেই চিত্ত-বীথি ও ভবাঙ্গ চিরতরে নিরোধপ্রাপ্ত হয়—এই উঠা-নামার নির্বাণ হয়। এই তত্ত্ব সর্বশঃ জ্ঞানগোচর করিবার সৌভাগ্য হইলে "শাশ্বত উচ্ছেদ আত্মবাদ সৎকায়" প্রভৃতি যাবতীয় মিথ্যাদৃষ্টি প্রহীণ হইয়া যায়। দৃষ্টি-বিচিকিৎসার যেখানে শ্মশান সেখানেই লোকোত্তরের সিংহদ্বার।

চিত্তবীথি (১৭ চিত্তক্ষণ)

১	২	৩
অতীত ভবাঙ্গ	ভবাঙ্গ চলন	ভবাঙ্গ উপচ্ছেদ
৪	৫	৬
পঞ্চদ্বারাবর্তন	পঞ্চ বিজ্ঞান	সম্প্রতীচ্ছ
৭	৮	৯-১৫ (সপ্ত চিত্তক্ষণ)
সন্তীরণ	ব্যবস্থাপন	জবন

১৬-১৭ (দুই চিত্তক্ষণ)

তদালম্বন

বিপাক বা ফলপ্রাপ্তি হিসাবে কর্মের শ্রেণীভেদ

১। দৃষ্টধর্মবেদনীয় কর্ম—(ইহজীবনেই কর্মফল অনুভবনীয়)—ইহজন্মে কৃত যে কর্মের ফল ইহজীবনেই ফলদায়ক হয় তাহাই দৃষ্টধর্ম (=বর্তমান জীবন) বেদনীয় কর্ম। উপরিউক্ত চিত্তবীথি অনুসারে কোন ব্যক্তি সপ্ত চিত্তক্ষণ স্থায়ী 'জবন' চলাকালে কুশল (=ভাল) বা অকুশল (=মন্দ) কর্ম সম্পাদন করে। প্রথম জবন চিত্তক্ষণ দুর্বলতম, তাই সেই চিত্তক্ষণের কর্ম ইহজীবনে ফলপ্রদ হয়। ইহাই দৃষ্টধর্মবেদনীয় কর্ম। কোন কারণে যদি তাহা এই জীবনে ফলদান না করে, তবে তাহা অহোসি-কর্ম বা ভূতপূর্ব কর্মে (অর্থাৎ পূর্বে ছিল, এখন নাই) পরিণত হয়।

উদাহরণঃ (ক) দৃষ্টধর্মবেদনীয় কুশল কর্মের ফলঃ

জনৈক দরিদ্র দম্পতির একটিমাত্র গাত্রবস্ত্র আছে। অতএব দুইজন একসঙ্গে বাড়ীর বাহিরে যাইতে পারে না। প্রয়োজনে বাড়ীর বাহিরে যাইতে হইলে একজন ঐ বস্ত্রখণ্ড পরিধান করিয়া বাহিরে যায়, অন্যজন বাড়ীতে বস্ত্রহীন অবস্থাতেই থাকিতে বাধ্য হয়। একদিন তাহারা শুনিতে পাইল যে ভগবান বুদ্ধ তাহাদের লোকালয়ে আসিয়াছেন এবং জনসাধারণের নিকট ধর্মোপদেশ দিতেছেন। শুনিয়া ঐ দম্পতি বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণের জন্য আকুল হইল। কিন্তু দুইজন একসঙ্গে যাইতে পারিবে না। তাই জায়া তাহার পতিকেই পাঠাইল। পতি বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ করিয়া এতই মুগ্ধ

হইল যে তাহার দানচেতনা উৎপন্ন হইল। কিন্তু সে বুদ্ধকে কি দান করিবে, তাহার পরিহিত বস্ত্রখণ্ড ব্যতীত অন্য কিছুই সঙ্গে নাই। তাহার ইচ্ছা হইল ঐ বস্ত্রখণ্ডই বুদ্ধকে দান করিবে। কিন্তু পরক্ষণে তাহার লোভচিত্ত প্রকট হইয়া তাহাকে নিবারিত করিল। তাহার মানসিক দ্বন্দ্ব উৎপন্ন হইল। সে বস্ত্রখণ্ড দান করিবে কি করিবে না। অবশেষে সে তাহার লোভচিত্তকে জয় করিয়া বুদ্ধকে বস্ত্রখণ্ড দান করিয়া উল্লসিত হইয়া বলিল—'আমি জয় করিয়াছি, আমি জয় করিয়াছি'। মগধের রাজা বিম্বিসার সেই ধর্মসভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি ঐ ব্যক্তির সমস্ত বৃত্তান্ত বুদ্ধের নিকট অবগত হইয়া তাহাকে ৩২ খানি বস্ত্র দান করিলেন। ঐ ব্যক্তি তাহা হইতে একখানি বস্ত্র রাখিল নিজের জন্য, আর একখানি বস্ত্র তাহার সতীসাধ্বী স্ত্রীর জন্য। অবশিষ্ট ৩০ খানি বস্ত্র বুদ্ধকেই দান করিল। ইহাই দৃষ্টধর্মবেদনীয় কুশল কর্ম বিপাকের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

(খ) দৃষ্টধর্মবেদনীয় অকুশল কর্মের ফল ঃ

জনৈক পশুশিকারী একদিন তাহার কয়েকটি শিকারী কুকুরকে সঙ্গে লইয়া বনে শিকারে গিয়াছিল। পথিমধ্যে সে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুকে ভিক্ষান্ন সংগ্রহের জন্য গ্রামের দিকে যাইতে দেখিয়াছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেইদিন সে বনে যাইয়া কোন শিকারের সন্ধান পাইল না। সে তখন ভাবিল —ঐ ভিক্ষুকে দেখার ফলেই তাহার অশুভ হইয়াছে, তাই সে কোন শিকার পাইল না। তাহার সমস্ত আক্রোশ ঐ ভিক্ষুর উপর যাইয়া পড়িল। সে যখন বন হইতে ফিরিয়া আসিতেছিল আবার পথিমধ্যে সেই ভিক্ষুকেই দেখিতে পাইল। তখন সে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া তাহার শিকারী কুকুরগুলিকে ঐ ভিক্ষুর দিকেই লেলাইয়া দিল। কুকুরগুলি তীব্রগতিতে ধাবিত হইয়া ভিক্ষুকে আক্রমণ করিল। ভিক্ষুটি উপায়ান্তর না দেখিয়া নিকটস্থ একটি গাছের উপর উঠিয়া পড়িল। শিকারীও তখন ঐ ভিক্ষুকে ধরার জন্য গাছে উঠিতে লাগিল এবং উঠন্ত অবস্থায় ভিক্ষুর পদযুগলের নাগাল পাইয়া তীরের ফলা দিয়া ভিক্ষুর দুই পদতল ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিল। যন্ত্রণায় কাতর হওয়াতে ভিক্ষুর গাত্র হইতে চীবর নীচে পড়িয়া গেল। ইতিমধ্যে ঐ শিকারীও নীচে নামিয়া আসিয়াছিল এবং ভিক্ষুর ঐ চীবরে শিকারীর সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া গেল। শিকারী কুকুরগুলি তাহাকেই উক্ত ভিক্ষু

ভাবিয়া শিকারীকে চতুর্দিক হইতে কামড়াইতে কামড়াইতে মারিয়া ফেলিল— ইহাই দৃষ্টধর্মবেদনীয় অকুশল কর্মবিপাকের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

২। উপপদ্য-বেদনীয় কর্ম—(যাহার বিপাক পরবর্তীকালে ফল দান করে)—পরবর্তী দুর্বলতম কর্ম হইল সপ্তম জবন-চিত্তক্ষণ। ইহার কুশল ও অকুশল পরবর্তী জন্মে ফলদান করে। পরবর্তী জন্মেও যদি এই কর্ম ফল প্রদানের অবকাশ না পায় তাহা হইলে তাহা অহোসি বা ভূতপূর্ব কর্মে পরিণত হয়।

উদাহরণ ঃ (ক) উপপদ্যবেদনীয় কুশল কর্মের ফল ঃ

জনৈক কোটিপতি ধনী শ্রেষ্ঠীর একজন ভৃত্য সারাদিন ক্ষেতে পরিশ্রম করিয়া একদিন সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিয়া দেখিল বাড়ীর সকলেই সেইদিন পূর্ণিমার উপবাসব্রত পালন করিতেছে। সকলেই অষ্টাঙ্গ শীল ধারণ করিয়াছে। ঐ ভৃত্য সারাদিন ক্ষেতে কাজ করায় অষ্টাঙ্গ শীল পালন করিতে পারে নাই। সে জিজ্ঞাসা করিল রাত্রিটুকু সে উক্ত অষ্টাঙ্গশীল পালন করিলে ফলদায়ক হইবে কি না। ফলদায়ক হইবে জানিয়া সেও অষ্টাঙ্গ শীল পালনের ব্রতী হইল। সারারাত্রি উপবাসী থাকিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ সারাদিনের খাটুনি এবং রাত্রিবেলার অনাহারের জন্য ঘটনাক্রমে পরদিন প্রাতঃকালেই তাহার মৃত্যু হইল। কিন্তু সারারাত্রি ব্যাপিয়া সে যে কুশল কর্মচেতনা লইয়া জাগ্রত ছিল তাহারই প্রভাবে মৃত্যুর পর সে সঙ্গে সঙ্গে দেবলোকে উৎপন্ন হইল।

(খ) উপপদ্যবেদনীয় অকুশল কর্মের ফল ঃ

মগধের রাজা অজাতশত্রু রাজ্যলোভে পিতা রাজা বিম্বিসারকে হত্যা করিয়াছিল। ইহার পরিণামে মৃত্যুর পরে সে নরকে পতিত হইয়াছিল।

৩। অপরাপর্যায়বেদনীয় কর্ম—(পরবর্তী দ্বিতীয় জন্ম হইতে যে কোন ফল অনুভবনীয়)। মধ্যবর্তী বা দ্বিতীয় হইতে ষষ্ঠ 'জবন' চিত্তক্ষণের কর্ম নির্বাণ লাভ না হওয়া পর্যন্ত যে কোন সময়ে ফল প্রদান করে। এইজন্য এই কর্মকে অপরপর্যায়বেদনীয় কর্ম বলে। এমন কি বুদ্ধ এবং অর্হৎগণও তাঁহাদের জীবন প্রবর্তন কালে এইরূপ কর্মের ফল ভোগ করেন। এই কর্ম হইতে কেহই নিষ্কৃতি পায় না।

অর্হৎ মহামৌদ্গল্যায়ন (বুদ্ধের ধর্মসেনাপতি) কোন এক পূর্বজন্মে তাঁহার দুষ্টা স্ত্রীর দ্বারা প্ররোচিত হইয়া তাঁহার পিতামাতাকে হত্যার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই অকুশল কর্মের বিপাকস্বরূপ তিনি বহুজন্মে নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন এবং শেষ জীবনেও শুদ্ধমুক্ত অর্হৎ হইয়াও ঐ কর্ম হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন নাই। তাঁহার অন্তিম জন্মে দস্যুদের দ্বারা প্রহৃত হইয়া তিনি নির্বাণলাভ করিয়াছিলেন।

বুদ্ধের নামেও অপযশ রটিয়াছিল যে তিনি নির্গ্রন্থ-শ্রাবকদের জনৈকা উপাসিকাকে হত্যা করিয়াছেন। কোন এক অতীত জন্মে গৌতম বুদ্ধ জনৈক প্রত্যেকবুদ্ধকে অপমানিত করিয়াছিলেন (তাহারই ফলস্বরূপ) তাঁহাকে এই অন্তিম জন্মে অপযশের ভাগী হইতে হইয়াছে।

দেবদত্ত বুদ্ধকে হত্যা করিবার জন্য গৃধ্রকূট পর্বত হইতে একটি বিশাল প্রস্তরখণ্ড বুদ্ধের দিকে নিক্ষেপ করিয়াছিল। ঐ প্রস্তরখণ্ড বুদ্ধকে আঘাত করেনি ঠিক, কিন্তু ঐ প্রস্তরখণ্ড হইতে একটি অংশ বিচ্ছুরিত হইয়া বুদ্ধের পায়ে রক্তপাত ঘটাইয়াছিল। বুদ্ধ কোন এক পূর্বজন্মে সম্পত্তির লোভে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে হত্যা করিয়াছিলেন। ইহারই পরিণামে তাঁহার অন্তিম জন্মেও তিনি রক্তপাত হইতে রেহাই পান নাই।

৪। অহোসি কর্ম (= ভূতপর্ব কর্ম)—যে কর্মের ফলপ্রদান শক্তি এক সময় 'ছিল' এখন তাহা 'ক্ষীণবীজ' হইয়াছে। যে কোন কারণেই হউক, যে কর্ম ইহজীবনে বা পরজীবনে ফলপ্রদানে অক্ষম তাহাই অহোসি কর্ম বা ভূতপর্ব কর্ম।

কৃত্য ভেদে কর্মের শ্রেণীভেদ

১। জনক কর্ম (Reproductive karma)—প্রত্যেক জন্ম পূর্বকৃত কুশল বা অকুশল কর্ম দ্বারা প্রভাবিত যাহা মৃত্যুক্ষণে আধিপত্য করে। এইভাবে যে কর্ম ভবিষ্যৎ জন্ম নিরূপণ করে (বা প্রভাবিত করে) তাহাকে জনক কর্ম বলা হয়। ব্যক্তির মৃত্যু কেবলমাত্র সাময়িক ঘটনার সাময়িক বিরতি। বর্তমান রূপ (দেহ) ধ্বংস হইলে অন্য একটি রূপ (দেহ) সেই স্থান গ্রহণ করে যাহা পূর্বেরটিও নহে এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন অন্য একটিও নহে (ন চ সো ন চ অঞ্ঞো)। মৃত্যুক্ষণে চিত্তে যে কর্মশক্তির ফলদায়ক কম্পন

সৃষ্টি হয় তাহাই জীবনপ্রবাহকে বাঁচাইয়া রাখে এবং পরবর্তী জন্ম সৃষ্টি করে। ইহাই কোন এক জন্মের সর্বশেষ চিত্ত যাহাকে সাধারণতঃ 'জনক কর্ম'' বলা হয়। তাহাই পরবর্তী জীবনের ব্যক্তিত্বের অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। তাহা কুশলও হইতে পারে, অকুশলও হইতে পারে।

অর্থকথা অনুসারে জনক কর্ম হইল যাহা গর্ভ ধারণক্ষণে চিত্তস্কন্ধ ও রূপস্কন্ধ উৎপত্তি করে। প্রথম যে চিত্তোৎপত্তি হয় তাহাকে প্রতিসন্ধি বিজ্ঞান বলা হয়। তাহা জনক কর্ম দ্বারা প্রভাবিত। মাতৃগর্ভে প্রতিসন্ধি বিজ্ঞানের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে সেখানে কায়দশক, ভাবদশক এবং বাস্তুদশক উৎপন্ন হয়।

(ক) কায়দশক উৎপত্তির উপকরণ হইল ৪ ধাতু ঃ

পৃথিবী ধাতু (যাহা বিস্তৃতি ঘটায়), আপধাতু (যাহা সংসক্তি ঘটায়), তেজোধাতু (যাহা উষ্ণতা উৎপাদন করে) এবং বায়ুধাতু (যাহা গতির বা বেগের সৃষ্টি করে) ; উক্ত ৪ ধাতুর উপাদারূপ (derivatives) ঃ বর্ণ, গন্ধ, রস এবং ওজঃ ; জীবিতেন্দ্রিয় এবং কায়=১০।

(খ) ভাবদশক উৎপত্তির উপকরণও কায়দশকের প্রথম ৯টি উপকরণ এবং স্ত্রী বা পুংভাব।

(গ) বাস্তুদশকের উৎপত্তির উপকরণও কায়দশকে প্রথম ৯টি এবং চিত্তস্থান (বাস্তু)।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, স্ত্রীভাব বা পুংভাব গর্ভধারণের সঙ্গে সঙ্গেই নির্ধারিত হয়। ইহা কর্ম প্রভাবিত ; আকস্মিক পিতৃবীর্য এবং মাতৃ ডিম্ব-কোষের সংযুক্তিতে ইহা নির্ধারিত হয় না। ইহা ছাড়া সুখ এবং দুঃখ যাহা জীবন-প্রবর্তনকালে অনুভূত হয় তাহা জনক কর্মেরই অপরিহার্য ফল।

২। উপস্তম্ভক কর্ম (Supportive karma)—যে কর্ম জনক কর্মের নিকটবর্তী হইয়া ইহাকে প্রতিপোষণ করে তাহাকে বলা হয় উপস্তম্ভক কর্ম। ইহা কুশলও হইতে পারে, অকুশলও হইতে পারে, তবে জীবন প্রবর্তনকালে ইহা জনক কর্মকে সাহায্য করে বা রক্ষা করে। গর্ভধারণের ক্ষণ হইতে সেই জীবনের অবসান (মৃত্যু) পর্য্যন্ত এই উপস্তম্ভক কর্ম জনক কর্মকে প্রতিপোষণ করিয়া চলে। কুশল উপস্তম্ভক কর্ম সুস্বাস্থ্য, ধন, সুখ ইত্যাদি দ্বারা ব্যক্তিকে সাহায্য করে। অপরপক্ষে অকুশল উপস্তম্ভক কর্ম অকুশল জনক কর্ম প্রভাবে

ব্যক্তিকে দুঃখ, কষ্ট ইত্যাদি দিয়া থাকে। যেমন ভারবাহী পশু এবং পশুবৎ ভারবাহী মনুষ্য।

৩। উপপীড়ক কর্ম (Obstructive or Counter-active karma)—বাধাদানকারী বা উৎপীড়নকারী কর্ম। ইহা পূর্বোক্ত কর্মের ন্যায় নহে। ইহা জনক কর্মকে দুর্বল করে এবং ইহার ফলপ্রদানে বাধা দিয়া থাকে ও ব্যতিক্রম ঘটায়। উদাহরণঃ এক ব্যক্তি কুশল জনক কর্ম প্রভাবে জন্মগ্রহণ করিলেও উপপীড়ক কর্ম প্রভাবে তাহাকে নানা দুঃখ পীড়া মনঃকষ্ট ইত্যাদি দ্বারা উত্যক্ত হইতে হয়। এইভাবে ব্যক্তিকে তাঁহার কুশল জনক কর্মের সুখময় ফলভোগে বাধা জন্মায়। অপরপক্ষে একটি পশু অকুশল জনক কর্ম প্রভাবে পশুযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও ভাল খাদ্য, ভাল বাসস্থান ইত্যাদি লাভ করিয়া সুখভোগ করে। এইস্থলে উপপীড়ক কর্ম অকুশল জনক কর্মকে ফল প্রদানে বাধা দান করে।

৪। উপঘাতক কর্ম (Destructive karma)—কর্ম নিয়ম অনুসারে পূর্বজন্মকৃত আরও শক্তিশালী বিরুদ্ধ কর্ম জনক কর্মের অন্তর্নিহিত শক্তিকে নিষ্ক্রিয় করিয়া দিতে পারে। ইহা সুযোগ লাভ করিলে অতর্কিতেই কর্ম সম্পাদন করিতে পারে। যেমন কোন বলবান প্রতিরোধক শক্তি এক উড়ন্ত তীরকে গতিপথে বাধা সৃষ্টি করিয়া ভূপতিত করে—ঈদৃশ কর্মকেই উপঘাতক কর্ম বলা হয়। ইহা উপস্তম্ভক এবং উপপীড়ক কর্ম অপেক্ষাও শক্তিশালী—তাই ইহা কেবল বাধা প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত হয় না জনক কর্মের শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসও করে। এই উপঘাতক কর্ম কুশল ফলপ্রদ এবং অকুশল ফলপ্রদ উভয় প্রকারের হইতে পারে। উদাহরণঃ দেবদত্তের ক্ষেত্রে উক্ত চারি কর্মই ফলপ্রসূ হইয়াছিল। তিনি বুদ্ধকে হত্যার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং সঙ্ঘভেদ করিয়াছিলেন। তাঁহার কুশল জনক কর্ম তাঁহাকে রাজ পরিবারে জন্মগ্রহণ করায়। রাজপরিবারের সুখসমৃদ্ধি ভোগ তাঁহার উপস্তম্ভক কর্মেরই প্রভাব। সঙ্ঘ হইতে বহিষ্কৃত হওয়া এবং অপমানিত হওয়া তাঁহার উপপীড়ক কর্মের প্রত্যক্ষ ফল। অবশেষে উপঘাতক কর্ম তাঁহার জীবন অবসান করিয়া তাঁহাকে অনন্ত মহাদুঃখে নিপাতিত করে।

উপঘাতক কর্ম যে কুশল ফলপ্রদও হইতে পারে তাঁহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হইতেছে ভিক্ষু অঙ্গুলিমাল। অন্তিম জন্মে বহু নরহত্যা করিয়াও তিনি অর্হত্ত্বফল লাভ করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়াছিলেন।

৫। গরুক (=গুরু) কর্ম (Weighty বা Serious karma)—গুরুতর বা শক্তিশালী কর্মই গুরুকর্ম। ইহা কুশল অকুশল দুই-ই হইতে পারে। ইহা ইহজন্মেও ফল দান করিতে পারে অথবা পরজন্মে ফলদান করিবেই। ইহা যদি কুশল হয় তাহা হইলে মানসিক কুশলই বুঝিতে হইবে, যেমন ধ্যানক্ষেত্রে মানসিক কুশল। অন্যথায় ইহা কায়িক এবং বাচনিক অকুশল। গুরুত্ব অনুসারে অকুশল গুরুকর্ম ৫ প্রকার: যথা ১। সঙ্ঘভেদ, ২। বুদ্ধের প্রতি দৈহিক আঘাত, ৩। অর্হৎ হত্যা, ৪। মাতৃ হত্যা এবং ৫। পিতৃ হত্যা। ইহাকে আনন্তরিয় কর্মও বলে। কারণ এই সকল কর্মের ফল অনিবার্যরূপে পরজন্মে ভোগ করিতেই হইবে। নিয়ত মিথ্যাদৃষ্টিকেও (Permanent Scepticism) গুরুকর্ম বলা হয়।

উদাহরণ: যদি কোন ব্যক্তি ধ্যান উৎপন্ন করিয়াও উক্ত যে কোন একটি নিকৃষ্ট কর্ম সম্পাদন করে, তাহা হইলে তাহার সেই ধ্যানোৎপত্তিজনিত কুশল কর্ম উক্ত নিকৃষ্ট কর্মপ্রভাবে বিনষ্ট হইয়া যাইবে। ধ্যান লাভ করা সত্ত্বেও পরবর্তী জন্ম অকুশল কর্ম দ্বারা প্রভাবিত হইবে। দেবদত্ত তাঁহার ধ্যানলব্ধ ঋদ্ধি হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন ইহজন্মেই এবং মৃত্যুর পর নরকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। কারণ তিনি বুদ্ধকে আঘাত এবং বুদ্ধের সঙ্ঘভেদ জনিত গুরু কর্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন।

রাজা অজাতশত্রু পিতৃ হত্যা না করিলে স্রোতাপত্তি স্তরে উন্নীত হইতে পারিতেন। এই ক্ষেত্রে তাঁহার শক্তিশালী নিকৃষ্ট অকুশল গুরুকর্ম ফলপ্রদ হওয়াতে তিনি স্রোতাপন্ন হইতে পারেন নাই।

৬। আসন্ন বা মরণাসন্ন কর্ম (Death Proximate karma)—যে কর্ম কোন ব্যক্তি মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বক্ষণে সম্পন্ন করেন বা জীবনে কৃত, পুণ্যকর্ম কথা স্মরণ করেন তাহাকে মরণাসন্ন কর্ম বলা হয়। পরবর্তী জীবনকে সুখময়রূপে নির্দিষ্ট করার পরিপ্রেক্ষিতে বৌদ্ধ দেশসমূহে এখনও মরণাসন্ন ব্যক্তিকে তাহার পূর্বকৃত পুণ্যকর্মকথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয় এবং মৃত্যুশয্যায় তাঁহার দ্বারা কুশল কর্ম সম্পাদিত করা হয়।

কোন কোন সময় অকুশল পরায়ণ ব্যক্তিরও সুখমৃত্যু হয় এবং তাহাতে সুখ জন্ম লাভ হয়, যদি সৌভাগ্যক্রমে তিনি মৃত্যুক্ষণে পূর্বকৃত পুণ্যকর্মের কথা স্মরণ করেন বা মৃত্যুশয্যায় কোন কুশল কর্ম সম্পাদন করেন। এই

রূপ একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে ঃ একদা এক জল্লাদ ধর্মসেনাপতি শারী-পুত্রকে ভিক্ষান্ন দান করিয়াছিলেন এবং সেই ব্যক্তি মৃত্যুক্ষণে ঐ পুণ্যকর্মের কথা স্মরণ করিয়া মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তুষিত দেবলোকে উৎপন্ন হন। তবে এই কথার অর্থ ইহা নহে যে, তিনি পূর্বজন্মকৃত অকুশল পাপকর্ম (জল্লাদের কর্ম) হইতে অব্যাহতি পাইবেন।

অপরপক্ষে কোন ধার্মিক ব্যক্তিরও দুঃখবহ মৃত্যু হইতে পারে যদি তাঁহার মৃত্যুক্ষণে অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহার কোন পূর্বকৃত অকুশল কর্মের কথা স্মরণ-হয় বা মৃত্যুক্ষণে কোন অকুশল বিষয় চিত্তে উদিত হয়। কোশলরাজ প্রসেনজিতের প্রধানা মহিষী রাণী মল্লিকা দেবী ধর্ম জীবন যাপন করিতেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুক্ষণে তিনি কোন সময়ে যে একটি মিথ্যাকথা বলিয়াছিলেন তাহাই স্মরণে উদিত হয় অপ্রত্যাশিতভাবে। ইহার কারণে মৃত্যুর পর এক সপ্তাহ তাহাকে অপায় দুর্গতি ভোগ করিতে হয়।

তবে উক্ত ঘটনাগুলি হইতেছে ব্যতিক্রম মূলক দৃষ্টান্ত। এরূপ বিবর্তন-মূলক জন্মান্তর গ্রহণের ঘটনায় ধার্মিক শিশু অধার্মিক এবং অধার্মিক শিশু ধার্মিক পিতামাতার নিকট জন্মগ্রহণ করিতে পারে। কর্ম নিয়ম অনুসারে জীবনের অন্তিম চিত্তবীথি (মৃত্যুক্ষণ বীথি) ব্যক্তির সাধারণ চরিত্রানুযায়ীই প্রভাবিত হয়।

৭। আচরিত কর্ম (পালি আচিণ্ণ কম্ম)—(Habitual karma)—যে কর্মের প্রতি ব্যক্তির অনুরাগ থাকে এবং অভ্যাসবশতঃ তাহা পুনঃ পুনঃ সম্পাদন করে ও স্মরণ করে তাহাকে আচরিত কর্ম বলে।

অভ্যাস কুশল হউক বা অকুশল হউক তাহা ব্যক্তির দ্বিতীয় চরিত্র হইয়া দাঁড়ায়। অবসর সময়ে আমরা আমাদের অভ্যাসগত চিন্তায় ও কর্মে নিয়োজিত থাকি। অনুরূপভাবে মৃত্যুক্ষণেও অনুরূপ চিন্তা ও কর্মের কথা চিত্তপথে উদিত হয়, যদি না অন্য কিছুর দ্বারা ঐ ক্ষণে চিত্ত প্রভাবান্বিত না হয়।

(ক) অকুশল অভ্যাসের উদাহরণ ঃ শূকরঘাতক চুন্দ বুদ্ধের আবাসের অবিদূরেই বাস করিত। কিন্তু মৃত্যুক্ষণে সে শূকরের মত আর্তনাদ করিয়াছিল।

(খ) কুশল অভ্যাসের উদাহরণ ঃ শ্রীলঙ্কার রাজা দুট্‌ঠগামনি অভয় ভিক্ষুগণকে ভিক্ষান্ন না দিয়া স্বয়ং আহার গ্রহণ করিতেন না। এই চির

আচরিত কুশল কর্মের কথাই মৃত্যুকালে তাঁহার স্মরণে উদিত হইয়াছিল। ফলে, মৃত্যুর পর তিনি তুষিত স্বর্গে উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

৮। কৃতত্ব বা সঞ্চিত কর্ম (পালি কটত্তা কম্ম) —(Cumulative karma)—যে কর্ম কৃত হইয়াছে অথচ বিস্মৃত হইয়াছে তাহাই কৃতত্ব কর্ম। জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া কৃত কর্মবীজ ব্যক্তির চিত্ত ভাণ্ডারে সঞ্চিত থাকে। অনেকাংশে ব্যক্তির স্মরণপথে সেইগুলি উদিত হয় না।

কর্মভেদে কর্মবিপাক ভূমি :

কুশলাকুশল কর্মের বিপাক চারিটি ভূমিতে সংঘটিত হয় :

১। অকুশলের বিপাক কামলোকে

২। কিছু কিছু কুশল কর্মের বিপাক কামলোকে

৩। কিছু কিছু কুশল কর্মের বিপাক রূপলোকে এবং

৪। কিছু কিছু কুশল কর্মের বিপাক অরূপলোকে

১। অকুশলের বিপাকপ্রাপ্তি—১০ প্রকার অকুশল কায়-বাক্-মনঃকর্মের বিপাক কামলোকেই সংঘটিত হয়, যেমন প্রাণীহত্যা, অদত্তদ্রব্য গ্রহণ, কামে ব্যভিচার, মৃষাবাদ, চুকলি (slandering), কর্কশ ভাষণ, প্রলাপবাক্য, লোভ, বিদ্বেষ এবং মোহ।

২। কুশলের বিপাক প্রাপ্তি—১০ প্রকার কুশল কর্মের বিপাক প্রাপ্তি কামলোকেই সংঘটিত হয়, যেমন দান করা, শীল (morality) পালন করা, ভাবনা (meditation), সম্মান প্রদর্শন, সেবা, পুণ্য-দান, পুণ্যানুমোদন (অন্যের পুণ্যকর্মে আনন্দিত হওয়া), ধর্মশ্রবণ, ধর্মদেশনা এবং দৃষ্টিপরিশুদ্ধি।

৩। রূপলোকের কুশল—রূপাবচর কুশলকর্ম মানসিক বা মনঃকর্ম। ইহা ভাবনা (meditation) মাধ্যমে চিত্তের উৎকর্ষ সাধন। ইহা ৫ প্রকার ধ্যানাঙ্গ।

(ক) বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ, এবং একাগ্রতা-সহিত প্রথম ধ্যানাঙ্গ।

(খ) বিচার, প্রীতি, সুখ, একাগ্রতা-সহিত দ্বিতীয় ধ্যানাঙ্গ।

(গ) প্রীতি, সুখ, একাগ্রতা-সহিত তৃতীয় ধ্যানাঙ্গ।

(ঘ) সুখ, একাগ্রতা-সহিত চতুর্থ ধ্যানাঙ্গ।

(ঙ) উপেক্ষা, একাগ্রতা-সহিত পঞ্চম ধ্যানাঙ্গ।

৪। অরূপলোকের কুশল—অরূপাবচর কুশলকর্মও মানসিক। ইহা অরূপ ভাবনা মাধ্যমে চিত্তের উৎকর্ষ সাধন। ইহা চারি প্রকার ঃ

(ক) আকাশানন্তায়তন কুশলচিত্ত

(খ) বিজ্ঞানানন্তায়তন

(গ) আকিঞ্চনায়তন

(ঘ) নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন

কর্মফলের তারতম্য

'যেমন কর্ম করিবে তেমন ফল পাইবে'—ইহাই কর্মনিয়ম। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কর্মফলের তারতম্য ঘটিয়াছে। অর্থাৎ যতটা কর্মবীজ ততটা ফলপ্রাপ্তি হয় না। ফলপ্রাপ্তির পরিমাণ কমিতেও পারে, বাড়িতেও পারে। ইহার কারণ কি? বীজ অনুসারে ফলপ্রাপ্তি স্বীকার করিলে ধর্মীয় জীবন যাপন, সদাচরণ, পুণ্যক্রিয়া অনুষ্ঠান ইত্যাদি মিথ্যা হইয়া যায়। কর্মের দ্বারা মানুষ সর্বদুঃখ হইতে মুক্তি পাইতে পারে—এই কথাও মিথ্যা হইয়া যায়। তাই বৌদ্ধধর্মে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে যে, মানুষ সৎ চেষ্টার দ্বারা তাহার পূর্বকৃত কর্মের ফলকে পরিবর্তিত করিতে পারে। অবশ্য ধম্মপদে (শ্লোক ১২৭) বলা হইয়াছে ঃ

"ন অন্তলিক্‌খে ন সমুদ্দমজ্ঝে
ন পব্বতানং বিবরং পবিস্‌স।
ন বিজ্জতি সো জগতিপ্‌পদেসো
যত্থট্‌ঠিতো মুঞ্চেয্য পাপকম্মা।।"—

অন্তরীক্ষে, সমুদ্র মধ্যে কিম্বা পর্বতবিবরে যেখানেই প্রবেশ কর না কেন, জগতে এমন স্থান নাই যেখানে থাকিয়া পাপকর্ম (ফল ভোগ) হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।" তথাপি এই কথা সত্য যে, পূর্বকৃত (পাপ) কর্মফল সম্যক্ প্রচেষ্টার দ্বারা লাঘব করা সম্ভব। তাহা না হইলে দুঃখমুক্তি (= নির্বাণ) লাভ করা অসম্ভব হইত। দুঃখই শাশ্বত হইয়া যাইত।

কোন ব্যক্তি তাহার কৃতকর্মের দাসও নহে, প্রভুও নহে। চেষ্টার দ্বারা মানুষ কর্মকেই দাসে পরিণত করিতে পারে। তাই দেখা যায়, মহাপাপী

ব্যক্তিও সৎচেষ্টার দ্বারা মহাপুণ্যবান হইয়াছে। নিয়তপরিবর্তনশীলতার মধ্যে মানুষের চিত্ত ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হইতেছে। তদনুসারে আমাদের কর্মও পরিবর্তিত হইতেছে এবং ক্ষণে ক্ষণে নূতন নূতন 'আমি'র সৃষ্টি হইতেছে। এই পরিবর্তন ভালও হইতে পারে, মন্দও হইতে পারে—নির্ভর করিবে চেতনার উপর। তাই দুষ্ট প্রকৃতির জন্য কোন ব্যক্তিকে ঘৃণা করা উচিত নহে। কারণ সেই দুষ্ট ব্যক্তিও একদিন সাধু সৎপুরুষে পরিণত হইতে পারে। কাজেই পাপীকে বা দুষ্ট ব্যক্তিকে ঘৃণা না করিয়া তাহার প্রতি করুণা সঞ্চারিত করিতে হইবে। বুদ্ধের এই শিক্ষা হইতেই পরবর্তী-কালে যীশু শিক্ষা দিয়াছেন—পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নহে। কারণ কে বলিতে পারে যে, পাপী ব্যক্তির বর্তমান আচরণ তাহার পূর্বজন্মার্জিত কোন পাপকর্মের ফল হইতে পারে। আবার ঐ ব্যক্তির সেভিংস ব্যাংকে পূর্বজন্মার্জিত কোন কুশল কর্মের বিপাক যে সঞ্চিত নাই, তাহাও বা কে বলিতে পারে। অতএব, পাপী ব্যক্তির বর্তমান কর্মের জন্য তাহাকে ঘৃণা করা উচিত নহে, কারণ তাহার পূর্বজন্মার্জিত পুণ্যকর্মের বিপাক সুরু হইলে সে ত আর পাপী থাকিবে না, তাহার সঞ্চিত সুকর্মফল তাহাকে পুণ্যকর্মানুষ্ঠানের দিকেই লইয়া যাইবে। **অঙ্গুলিমাল** ছিলেন নরঘাতক দস্যু এবং একোণ সহস্রব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছেন। কিন্তু সেই অঙ্গুলিমালই তাঁহার এই অন্তিম জন্মে অতীতের সমস্ত পাপকর্ম হইতে মুক্ত হইয়া অর্হৎ হইয়াছেন, জীবন্মুক্ত সন্ত হইয়াছেন। নরমাংসভুক্ কুখ্যাত **আলবক যক্ষ** বুদ্ধের দ্বারা দমিত হইয়া প্রাণীহত্যা ত্যাগ করিয়াছিল এবং এই জন্মেই স্রোতাপত্তিফল লাভ করিয়াছিলেন। গণিকা **আম্রপালী** বুদ্ধ নির্দেশিত পথে চলিয়া অর্হত্ত্বফল লাভ করিয়াছিলেন। রাজ্যবিস্তারের লোভে যে **অশোক** চণ্ডাশোক হইয়াছিলেন তিনিই পরবর্তীকালে ধর্মাশোকে রূপান্তরিত হইয়া বহু জনহিতকর কর্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাই যতদিন চন্দ্র সূর্য্য আকাশে উদিত হইবে ততদিন সম্রাট অশোকের নামও স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকিবে।

কিন্তু ইহার ব্যতিক্রমও দেখা যায়। ভাল কর্মের ফল অবশ্যই ভাল হইবে। কিন্তু দেখা যায় সব সময়ে তাহা হয় না। দেখিতে হইবে ভাল কর্ম সম্পাদনের সময় সম্পাদনকারীর চেতনা কিরূপ ছিল। একদিন কোশলের রাজা প্রসেনজিত বুদ্ধের নিকট আসিয়া বলিলেন—"প্রভু, এখানে

শ্রাবস্তীতে এক ধনবান শ্রেষ্ঠীর মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু তাহার কোন উত্তরাধিকারী বা পুত্র সন্তানাদি না থাকায় আমি তাহার সমস্ত সম্পত্তি আমার রাজকোষের অন্তর্গত করিয়াছি। তাঁহার এক কোটি স্বর্ণ মুদ্রা ছিল, রৌপ্যমুদ্রা একটিও ছিল না। অথচ শুনিয়াছি সে আমানি এবং পরিত্যক্ত আহার ভোজন করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিত। সে জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করিত। ভগ্নপ্রায় জীর্ণ শকটে আরোহণ করিত। প্রভু ইহার কারণ কি?" বুদ্ধ বলিয়াছিলেন—"মহারাজ, তাহাই হয়, তাহাই হয়। অতীতের কোন এক জন্মে এই শ্রেষ্ঠী তগরসিখী নামক প্রত্যেক বুদ্ধকে অন্নদান করিয়াছিলেন। কিন্তু পরমুহূর্তে তিনি অনুশোচনা করিয়াছিলেন—"কেন আমি এই অন্ন দান করিলাম। আমার ভৃত্য এবং কর্মচারীরা এই অন্ন পাইলে খুশী হইত।" অধিকন্তু তিনি সম্পত্তির লোভে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা করিয়াছিলেন। যেহেতু তিনি তগরসিখী প্রত্যেক বুদ্ধকে অন্নদান করিয়াছিলেন তাহার ফলে তিনি সাতবার স্বর্গে উৎপন্ন হইয়া স্বর্গসুখ ভোগ করিয়াছিলেন। (কারণ প্রত্যেক বুদ্ধকে অন্নদান করিবার সময় তাঁহার চেতনা শুদ্ধই ছিল)। তাহারই ফলে তিনি এই জন্মে ধনবান শ্রেষ্ঠী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু যেহেতু অন্নদান করিবার পরে তাঁহার অনুসোচনা হইয়াছিল তাহারই পরিণামে তিনি ইহ জন্মে ভাল খাদ্য, ভাল বস্ত্র এবং ভাল বাহন ভোগ করিতে পারেন নাই। যেহেতু তিনি সম্পত্তির জন্য তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা করিয়াছিলেন তাহার পরিণামে তিনি বহু শত-সহস্র জন্মে নরক-দুঃখ ভোগ করিবেন। তাহারই পরিণামে তিনি পুত্রহীন হইয়াছেন এবং তাঁহার সম্পত্তি রাজার অধিকারে চলিয়া গিয়াছে।

তাই বুদ্ধ বলিয়াছেন: "চেতনা' হং ভিক্খবে কম্মং বদামি চেতয়িত্বা কম্মং করোতি যদিদং হীনপ্‌পণীততায়।"—চেতনাকেই কর্ম বলা হইয়াছে। কর্মানুষ্ঠানের পূর্বে, কর্মানুষ্ঠানকালে, এবং কর্মানুষ্ঠানের পরে যে চেতনা উৎপন্ন হইবে, তদনুসারে ফলভোগ করিতে হইবে।

কৃতকর্মের পরিণামে যে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। শুভ এবং অশুভ কর্মের পরিণাম কর্মনিয়মকে প্রভাবিত করে। এমন ঘটনা দেখা যায় যে পূর্বজন্মের সুকৃতি বশতঃ কোন ব্যক্তি উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া সুখভোগ করিতে থাকে—অতীতের পাপকর্মের ফল তাহার জীবনে অনেক বিলম্বে আসে। অন্যদিকে, কোন ব্যক্তি দরিদ্রকুলে

জন্মগ্রহণ করিয়া নিত্য দুঃখ ভোগ করিতে থাকে—এই ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির অতীতের পাপকর্মের ফল তাহার জীবনে ত্বরান্বিত হয়।

কোন মূর্খ ব্যক্তিও তাহার পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলে রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া রাজসুখ ভোগ করে এবং জনগণের নিকট সৎকার সম্মান লাভ করে। কিন্তু ঐ ব্যক্তি যদি হীনকুলে জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে সে ঐসব সুখ-সম্মান হইতে বঞ্চিত হয়, বরং দুঃখ-দুর্গতি-দুর্নাম ইত্যাদি ভোগ করে। পিতৃহন্তা রাজা অজাতশত্রুও বুদ্ধের সংসর্গে আসিয়া তাঁহার ধর্মানুরাগ ও ভক্তির জন্য বিখ্যাত হইয়া আছেন। কিন্তু পিতৃহত্যাজনিত পাপকর্মের ফলে মৃত্যুর পরে নরকে উৎপন্ন হইয়া নারকীয় যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন। অতএব তাঁহার প্রতিকূল জন্মপ্রভাবে তিনি ইহলোকে কৃত সৎকর্মের ফল ভোগ করিতে পারিতেছেন না, কারণ নরকে সুখ ভোগ হয় না। দৈহিক সুশ্রী ও বিশ্রীভাবও অনেক ক্ষেত্রে কর্মফল ভোগে বাধা হইয়া দাঁড়ায়। যেমন কোন ব্যক্তি সুকৃতির ফলে সুখী পরিবারে জন্মগ্রহণ করিল, কিন্তু পূর্বজন্মের কোন কর্মদোষে সে বিকলাঙ্গ হইল বা কুৎসিত হইল। এই কারণে সে তাহার কুশল কর্মের সুফল সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করিতে পারিবে না। রাজপুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াও বিকলাঙ্গতার জন্য সিংহাসনের অধিকারী হয়নি, এমন ঘটনাও আছে। পক্ষান্তরে দরিদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও দৈহিক সুশ্রীতার জন্য অনেকে সুনাম-সুখ্যাতির অধিকারী হইয়াছেন। অতএব, দেখা যাইতেছে যে, অনুকূল এবং প্রতিকূল পরিবেশ এবং সময়ে জন্মগ্রহণও জাতকের ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রিত করে। দুর্ভিক্ষ মহামারী হইলে সকলেই কম-বেশী দুর্ভাগ্যের শিকার হয়। কিন্তু দেখা যায়, বিমান দুর্ঘটনায় সকলেই হত হইয়াছে, একজন জীবিত আছে।

প্রচেষ্টা এবং অকর্মণ্যতাও দেখা যায় যে শুভাশুভ কর্মফলকে নিয়ন্ত্রণ করে। কঠোর প্রচেষ্টার দ্বারা কেহ কেহ নূতন কর্ম সৃষ্টি করিয়া তাহার নিজের পরিবেশ এবং নিজের জগৎকে আমূল পরিবর্তিত করিতে পারে। অপরপক্ষে কেহ কেহ সুবর্ণ সুযোগের অধিকারী হইয়াও অকর্মণ্যতার কারণে নিজের সমস্ত সুযোগকে হারাইয়া বসে এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সৎ প্রচেষ্টা জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক উভয়ক্ষেত্রে পরম সহায়ক। তাই বুদ্ধ বলিয়াছেন—

"উট্‌ঠানেন'প্‌পমাদেন সঞ্‌ঞমেন দমেন চ,
দীপং কয়িরাথ মেধাবী যং ওঘো নাভিকীরতি" ॥

—অর্থাৎ উত্থান (সতত জাগরূকতা), অপ্রমাদ, সংযম ও ইন্দ্রিয়দমনের দ্বারা জ্ঞানী ব্যক্তি নিজের জন্য এমন দ্বীপ বা প্রতিষ্ঠা গঠন করিতে সমর্থ হন, যাহাকে সংসার স্রোত বিধ্বস্ত করিতে পারে না।

যদি কোন রোগী তাহার রোগ নিরাময়ের জন্য যত্নবান না হয়, যদি কোন দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তি তাহার দুর্দশা হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য চেষ্টা না করে, যদি কেহ তাহার উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য অপ্রমাদের সহিত চেষ্টা না করে তাহা হইলে তাহার পূর্বকৃত পাপকর্ম পাপফল প্রদানের জন্য সুযোগের সন্ধান করিবে। অন্যদিকে, যদি কেহ তাহার দুঃখ-দুর্দশা অপনোদনের জন্য যত্নবান হয়, তাহার অবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টা করে তাহার সুযোগের সদ্ব্যবহার করে এবং তাহার শ্রীবৃদ্ধির জন্য নিরলসভাবে পরিশ্রম করে, তাহা হইলে তাহার পূর্বকৃত কুশল কর্ম কুশল-ফল প্রদানের জন্য সুযোগের সন্ধান করিবে। মহাজনক জাতকে আছে যে যখন তাঁহাদের জাহাজডুবি হয়, বোধিসত্ত্ব নিজেকে রক্ষা করিবার কঠোর পরিশ্রম করিতে থাকেন, অন্যদিকে তাঁহার সহকর্মীরা ঈশ্বরের ভরসায় ঈশ্বরের প্রার্থনায় কালক্ষেপ করিতে থাকে। ফলে, বোধিসত্ত্ব প্রাণে রক্ষা পান, অন্যদের সমুদ্রে সলিল সমাধি হয়।

উপরিউক্ত ঘটনাবলী হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে যদিও সর্বতোভাবে আমরা আমাদের কর্মের দাসও নহি, প্রভুও নহি, তথাপি পূর্বপূর্বকৃত কর্ম ফল অনেক ক্ষেত্রেই অবস্থা, পরিবেশ, ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার দ্বারা প্রভাবিত হয়। ঈদৃশ কর্মতত্ত্বই একজন বৌদ্ধকে সান্ত্বনা, আশা, নির্ভর-শীলতা ও সৎ সাহস প্রদান করে। যখন জীবনে কোন অঘটন ঘটে, দুঃখ-দুর্দশা আসে, ব্যর্থতা আসে, বারে বারে দুর্ভাগ্যের কবলিত হয়, তিনি মনে করেন যে তিনি তাঁহার কৃতকর্মেরই ফল ভোগ করিতেছেন এবং পূর্বের ঋণের বোঝা কথঞ্চিৎ লঘু করিতেছেন। কর্মের দোহাই দিয়া পশ্চাদপসরণ না করিয়া বা নীরবে সহ্য না করিয়া তিনি মানবজমিতে সোনার ফসল ফলাইবার অভিপ্রায়ে দ্বিগুণ উৎসাহ লইয়া কঠোর পরিশ্রম করেন, আগাছা উৎপাটিত করিয়া ভাল বীজ বপন করেন। কারণ তিনি জানেন যে, তাঁহার ভবিষ্যৎ তাঁহারই হাতে।

যিনি বৌদ্ধ কর্মতত্ত্বে বিশ্বাসী তিনি কোন জঘন্যতম অপরাধীকেও ঘৃণা করেন না, কারণ তিনি জানেন ঐ ব্যক্তি সুযোগ পাইলে মহা মহীয়ান হইতে পারেন। দুর্গতিপ্রাপ্ত হইলে দুঃখ ভোগ করিতেই হইবে, কিন্তু তিনি আশাবাদী যে শাশ্বত শান্তিলাভ দুঃসাধ্য হইলেও অসাধ্য নহে। তাঁহার সুকর্মের দ্বারা তিনি ইহজীবনেই নিজের স্বর্গ নির্মাণ করিতে পারেন।

একজন যথার্থ বৌদ্ধ কখনও কোন দৈবশক্তির নিকট আত্মরক্ষার জন্য প্রার্থনা করেন না। তিনি বুদ্ধবাণীর প্রতি আস্থাশীল। বুদ্ধ বলিয়াছেন ঃ

> "অত্তা হি অত্তনো নাথো, কো হি নাথো পরো সিয়া ?
> অত্তনা'ব সুদন্তেন নাথং লভতি দুল্লভং ॥"

—নিজেই নিজের ত্রাণকর্তা, অন্য ত্রাণকর্তা কোথায় ? সুদান্ত ব্যক্তি নিজের মধ্যেই দুর্লভ নাথ বা আশ্রয় খুঁজিয়া পান।

তাই, কোন দৈবী শক্তির নিকট আত্মসমর্পণ না করিয়া বা কোন দৈবী শক্তিকে তুষ্ট করার চেষ্টা না করিয়া একজন বৌদ্ধ আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া বহুজনের হিত ও সুখের জন্য নিরলসভাবে কর্ম সম্পাদন করিতে থাকেন। কর্মে আস্থা তাহাকে কর্মতৎপর করে এবং তাহার উৎসাহকে উদ্দীপিত করে। একজন সাধারণ বৌদ্ধের নিকট কর্ম হইতেছে দণ্ডবৎ, যেন ভীতি প্রদর্শন করিয়া পাপকর্ম হইতে নিবৃত্ত করায়। কিন্তু একজন জ্ঞানী বৌদ্ধের নিকট কর্ম হইতেছে কুশল সম্পাদনের উদ্দীপক।

বৌদ্ধ কর্মতত্ত্ব দুঃখের রহস্যের উদ্‌ঘাটন করে, যাহাকে ভাগ্য বলা হয় সাধারণ জ্ঞানে তাহার রহস্য উদ্‌ঘাটন করে, কোন কোন ধর্মে প্রচারিত নিয়তিবাদকে খণ্ডন করে এবং সর্বোপরি মানুষে মানুষে যে বিভিন্নতা তাহার রহস্যও উদ্‌ঘাটন করে। আমরা আমাদের ভাগ্য-নিয়ন্তা। আমাদের কর্মই আমাদের সৃষ্টিকর্তা। আমরাই আমাদের ধ্বংসকর্তা। আমরাই রচনা করি নিজেদের স্বর্গ, আমরাই সৃষ্টি করি আমাদের নরক।

আমরা যাহা ভাবি, যাহা বলি এবং যাহা করি—সমস্তই আমাদের ভবিষ্যতকে নিয়ন্ত্রিত করিবে। এই সকল চিন্তা, বাক্য এবং ক্রিয়াকেই 'কর্ম' বলা হইয়াছে। জন্ম-জন্মান্তরে আমাদের সঙ্গী হইয়া সংসারচক্রে যাহা আমাদের ঘোরায়, উত্থান-পতন ঘটায়। সুখ-দুঃখের ভাগী করে।

ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছেন ঃ

"সব্বে সত্তা মরিস্সন্তি মরণন্তং হি জীবিতং।
যথাকম্মং গমিস্সন্তি, পুঞ্ঞপাপফলূপগা ।।
নিরয়ং পাপকম্মন্তা পুঞ্ঞকম্মা চ সুগ্গতিং।
তস্মা করেয্য কল্যাণং, নিচয়ং সম্পরায়িকং ।।
পুঞ্ঞানি পরলোকস্মিং, পতিট্ঠা হোন্তি পাণিনং ।।'

—সকল সত্ত্বগণের মৃত্যু ধ্রুব, জীবনের শেষ মুহূর্তেও পাপ-পুণ্যের ফলানুসারে তাহারা গতিপ্রাপ্ত হয়। পাপকর্মের ফলে নরকে উৎপন্ন হয়। পুণ্যকর্মের ফলে সুগতি প্রাপ্ত হয়। অতএব, সকলের উচিত কল্যাণজনক কর্ম সম্পাদন করা, কারণ কর্মফল সত্ত্বগণকে নিয়ত অনুসরণ করে। পুণ্য-কর্ম পরলোকে প্রাণিগণের (=সত্ত্বগণের) প্রতিষ্ঠাস্বরূপ হইয়া থাকে।

বৌদ্ধ জন্মান্তরবাদ[১]

মানব-জীবনের উৎপত্তি কিরূপে হইল এই প্রশ্ন সমাধান করিবার জন্য সুদূর অতীতকাল হইতে পণ্ডিতগণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু, কেহই এ পর্য্যন্ত এই জটিল প্রশ্নের সমাধান করিতে পারেন নাই। ভবিষ্যতেও কেহ কখনও এই প্রশ্নের সমাধান করিতে পারিবেন না বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না।

হিন্দুধর্ম্মমতে জীবন পরমাত্মা বা ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং এই পরমাত্মা প্রত্যেক মানবহৃদয়ে আত্মারূপে বিরাজ করে। এই মানবাত্মা, পরমাত্মা বা ব্রহ্মে বিলীন না হওয়া পর্য্যন্ত নব নব জন্ম ধারণ করিয়া থাকে।

খৃষ্টধর্ম্মমতে জগতের সমস্তই সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট।

জড়বাদীদের (Materialists) মতে দেশ কাল জড় ও জড়শক্তি—এই তিনটি সজীব ও নিৰ্জ্জীব জগতের উৎপত্তির একমাত্র কারণ।

শরীর-বিজ্ঞানমতে (Physiology) মাতার ডিম্ব ও পিতার শুক্র কীটের সম্মিলনে মানবের উৎপত্তি হয়। কিন্তু মানসিক শক্তির বিকাশ কিরূপে হয়, তাহার কোন সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় না।

জীবনের উৎপত্তি সম্বন্ধে বৌদ্ধধর্ম্মমত কি, তাহা এখানে আলোচনা করা যাউক।

বৌদ্ধমতে জীবনের আদিকারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা নিতান্ত নিষ্ফল। জগৎ শাশ্বত কিম্বা অশাশ্বত? জগতের অন্ত আছে, না জগৎ অনন্ত? ইত্যাদি প্রশ্নের সমাধানের চেষ্টা সময় ও শক্তির অপব্যবহার করা মাত্র। এই সব অবান্তর প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে ভগবান নীরব থাকিতেন।

এক সময় মালুংক্যপুত্র নামক এক ভিক্ষু ভগবান সমীপে উপনীত হইয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন—"ভগবন্, আপনি যদি এই জগৎ শাশ্বত বলিয়া জানেন, তাহা হইলে তাহা আমাকে বলুন। যদি আপনি জগৎ অশাশ্বত বলিয়া জানেন, তাহা হইলে তাহাও আমাকে বলুন। জগৎ শাশ্বত কিম্বা অশাশ্বত তাহা যদি ভগবান না জানেন এবং আপনার যদি সে জ্ঞান না থাকে, তাহাও আপনার স্বীকার করা উচিত। যদি ভগবান এই সব প্রশ্নের উত্তর না দেন, তাহা হইলে আমি আর ভগবানের শাসনে প্রব্রজিত জীবন যাপন করিব না।"

অতি শান্তভাবে ভগবান উত্তর করিলেন—"হে মালুঙ্ক্যপুত্র, তুমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবার সময় কি বলিয়াছিলে যে, ভগবান এই প্রশ্নের সমাধান করিয়া দিলে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে নতুবা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে না ?"

মালুঙ্ক্যপুত্র উত্তর করিল—"না ভগবন্, আমি তাহা বলি নাই।"

অতঃপর ভগবান বলিলেন—"হে মালুঙ্ক্যপুত্র, যদি কেহ বলে যে, ভগবান যতদিন এইসব প্রশ্নের সমাধান করিয়া না দেন, ততদিন আমি ভগবানের শাসনে প্রব্রজিত জীবন যাপন করিব না। তাহা হইলে এইসব প্রশ্নের সমাধান হইয়া যাইবার পূর্ব্বেই তাহার মৃত্যু হইয়া যাইবে। মনে কর কোন ব্যক্তি বিষাক্ত শর দ্বারা বিদ্ধ হইয়াছে এবং তাহার বন্ধুবান্ধবেরা তাহার ক্ষত চিকিৎসার জন্য একজন চিকিৎসক আনয়ন করিয়াছে। যদি সেই শরবিদ্ধ ব্যক্তি বলে—আমার ক্ষত চিকিৎসার পূর্ব্বে আমি জানিতে চাই—কে আমাকে শরবিদ্ধ করিয়াছে। যে আমাকে শরবিদ্ধ করিয়াছে সে ব্রাহ্মণ কিম্বা ক্ষত্রিয়,তাহার নাম কি, সে লম্বা কি খাট, তাহার রং কাল কিম্বা গৌর, তাহার বাসস্থান কোথায় ? তাহার নিক্ষিপ্ত শর শকুনি কিম্বা বকের পালক-দ্বারা নির্ম্মিত ইত্যাদি বিষয় আমার ক্ষত চিকিৎসার পূর্ব্বে জানিতে চাই। তাহা হইলে এই সব বিষয় জানিবার পূর্ব্বেই তাহার মৃত্যু হইয়া যাইবে। ঠিক সেইরূপ যদি কোন ব্যক্তি বলে যে—জগৎ শাশ্বত কিম্বা অশাশ্বত, জগৎ অন্ত কিম্বা অনন্ত এই সব প্রশ্ন ভগবান যতদিন সমাধান করিয়া না দেন, ততদিন আমি ভগবানের শাসনে প্রব্রজিত জীবন যাপন করিব না—তাহা হইলে এইসব প্রশ্নের সমাধান হইবার পূর্ব্বেই তাহার মৃত্যু হইয়া যাইবে।

হে মালুঙ্ক্যপুত্র, যদি বিশ্বাস করা হয় যে জগৎ শাশ্বত, তাহা হইলে তাহার দ্বারা অর্হত্ত্ব লাভ হইবে কি ?"

মালুঙ্ক্যপুত্র উত্তর করিল—"না, ভগবন্।"

পুনরায় ভগবান বলিলেন—"যদি বিশ্বাস করা হয় যে জগৎ অশাশ্বত, তাহা হইলে তাহার দ্বারা অর্হত্ত্ব লাভ হইবে কি ?"

মালুঙ্ক্যপুত্র উত্তর করিল—"না, ভগবন্।"

ভগবান বলিলেন—"হে মালুঙ্ক্যপুত্র, জগৎ শাশ্বত হউক কিম্বা অশাশ্বত হউক জগতে জন্ম, জরা, মৃত্যু বিদ্যমান আছে। এই জন্ম জরা মৃত্যু দুঃখ হইতে কিরূপে মুক্ত হওয়া যায়, তাহাই আমি প্রচার করিয়াছি। জগৎ শাশ্বত কিম্বা অশাশ্বত, জগতের অন্ত আছে কি অন্ত নাই—এই সব প্রশ্নের

সমাধান আমি করি নাই। কেন আমি এই সব প্রশ্নের সমাধান করি নাই? যেহেতু ইহার দ্বারা কোন লাভ হয় না। ধর্মজীবন এই সব প্রশ্নের সমাধানের উপর নির্ভর করে না। ইহার দ্বারা রাগ দ্বেষ মোহ দূরীভূত হয় না, সম্যক্ জ্ঞান লাভ হয় না—নিৰ্ব্বাণে উপনীত হওয়া যায় না।[২]

বৌদ্ধধর্ম্মের উদ্দেশ্য সাংসারিক যাবতীয় দুঃখরাশি হইতে বিমুক্তিলাভ। সম্যক্ জ্ঞান লাভের জন্য কিম্বা দুঃখবিমুক্তি লাভ করিবার জন্য জীবনের আদি কারণ (First cause) অনুসন্ধানের কোন প্রয়োজন নাই।

যদি বলা হয় "ক"ই জীবনের প্রথম কারণ, তাহা হইলে তাহার দ্বারা দুঃখবিমুক্তি লাভ করা যায় কি? না, তাহাদ্বারা মাত্র বালকজনসুলভ অনুসন্ধিৎসা নিবারণ করা যায়। অন্য এক সময় ভগবান ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—

"অনমতগ্গো অযং ভিক্খবে সংসারো। পুব্বকোটী ন পঞ্‌ঞায়তি অবিজ্জানীবরণানং সত্তানং তণ্হা সংযোজনানং সন্ধাবতং··· ।"

"এই সংসার-প্রবাহ আদ্যন্তহীন। সংসার প্রবাহে মুহ্যমান অবিদ্যান্ধ ও তৃষ্ণাবন্ধনে আবদ্ধ সত্ত্বগণের প্রথম উৎপত্তির কারণ আবিষ্কার করা যায় না।"[৩]

যেরূপেই মানবের উৎপত্তি হউক না কেন, ইহা অবিসম্বাদী সত্য যে, মানবজীবন দুঃখময়। জন্ম জরা মৃত্যুজনিত দুঃখ সকলকেই ভোগ করিতে হয়। সংসারে পুনঃপুনঃ জন্ম ও মৃত্যুজনিত দুঃখ হইতে মুক্তিলাভের জন্য জীবন প্রবাহকে সুখশান্তিময় নিৰ্ব্বাণধাতুর দিকে চালিত করাই সকলের কর্ত্তব্য।

যদি কেহ বলেন—ঈশ্বরই মানবজীবনে প্রথম কারণ, তাহা হইলে এই সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের আদিকারণ কি তাহাও জিজ্ঞাসিত হইতে পারে।

জন্ম ও মৃত্যুর কারণ:

বৌদ্ধমতে মানব নাম-রূপের সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে। মানব সকলেই নামরূপের সমবায়ে উৎপন্ন হইলেও পরস্পরের মধ্যে আকৃতিগত ও প্রকৃতিগত বিভিন্নতা অতি বেশী। এই আকৃতি ও প্রকৃতিগত বিভিন্নতা বংশানুগত (hereditary) কি? না, তাহা নহে। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে একই মাতাপিতা দ্বারা সমভাবে লালিত পালিত আকৃতিগত

সাদৃশ্য-বিশিষ্ট যমজ সন্তানদ্বয়ের মধ্যে মানসিক প্রবৃত্তির বিভিন্নতা দৃষ্ট হইত না।

মাতার জরায়ুতে সন্তানের জন্ম কিরূপে হয় তাহা যখন আলোচনা করি, তখন দেখিতে পাই মাতার ডিম্ব (Ovum) ও পিতার শুক্রকীট (Spermatozoa) এই দুইয়ের সম্মিলনে মানবের উৎপত্তি হয়। মাতার ডিম্ব যখন ডিম্বপ্রণালীর (Follopian tube) ভিতর প্রবেশ করে, তখন অনেকগুলি শুক্রকীট ডিম্বটি ঘিরিয়া ফেলে এবং ডিম্বদেহে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু একটীমাত্র শুক্রকীটই ডিম্বদেহে প্রবেশ করিয়া ডিম্বদেহের সহিত মিলিত হইয়া একটি জীবকোষ সৃষ্টি করে। কেবল একটিমাত্র শুক্রকীট ডিম্বদেহে প্রবেশ করে, অন্যগুলি প্রবেশ করে না কেন, তাহার কোন সমাধান শরীর-বিজ্ঞান করিতে পারে নাই।

বৌদ্ধধর্ম্মমতে কেবল ডিম্ব ও শুক্রকীটের সম্মিলনে জীবের উৎপত্তি হইতে পারে না। এই দুইটা জিনিষ ব্যতীত তৃতীয় গন্ধব্বো বা পূর্বজন্ম অন্বেষণকারী সত্ত্ব উক্ত দুইটি জিনিষের সহিত মিলিত হওয়া চাই।

মহাতণহ্াসঙ্খয় সুত্রে ভগবান বলিয়াছেন—"তিণ্ণং খো পন ভিক্খবে সন্নিপাতা গব্ভস্সাবক্কন্তি হোতি। ইধ মাতাপিতরো চ সন্নিপতিতা হোন্তি, মাতা চ ন উতুণী হোতি, গন্ধব্বো চ ন পচ্চুপট্ঠিতো হোতি, নেব তাব গব্ভস্সাবক্কন্তি হোতি। ইধ মাতাপিতরো চ সন্নিপতিতা হোন্তি। মাতা চ উতুণী হোতি, গন্ধব্বো চ ন পচ্চুপট্ঠিরো হোতি, নেব তাব গব্ভস্সাবক্কন্তি হোতি। যতো চ খো ভিক্খবে মাতাপিতরো চ সন্নিপতিতা হোন্তি, মাতা চ উতুণী হোতি, গন্ধব্বো চ পচ্চুপট্ঠিতো হোতি, এবং তিণ্ণং সন্নিপাতা গব্ভস্সাবক্কন্তি হোতি।"

"হে ভিক্ষুগণ, তিনটি জিনিষের সম্মিলনে জীবের উৎপত্তি হয়। মাতা-পিতার যৌন সম্মিলন হইলেও যদি মাতা ঋতুমতী না হয় এবং গন্ধব্বো (Being-to-be-born) উপস্থিত না থাকে, তাহা হইলে জীবের উৎপত্তি হইতে পারে না। যদি মাতাপিতার যৌন সম্মিলন হয় এবং মাতা ঋতুমতী হয়, কিন্তু গন্ধব্বো উপস্থিত না থাকে, তাহা হইলে জীবের উৎপত্তি হইতে পারে না। যদি মাতাপিতার যৌন সম্মিলন হয়, মাতা ঋতুমতী হয় এবং গন্ধব্বো উপস্থিত থাকে, তাহা হইলে এই তিনের সম্মিলনে জীবের উৎপত্তি হয়।

অভিধর্ম্মে এই তৃতীয় পদার্থকে প্রতিসন্ধি বিজ্ঞান (Re-linking consciousness) বলা হইয়াছে।

এই প্রতিসন্ধি বিজ্ঞান কোথা হইতে আসিল? প্রতিসন্ধি বিজ্ঞানের জন্মধারণ করা পূর্ব্বজন্মে অপর একটি বিজ্ঞানের চ্যুতির উপর নির্ভর করে, এবং এই চ্যুতি ও উৎপত্তি (মৃত্যু ও নবজন্ম ধারণ) কর্ম্মশক্তিতেই সংঘটিত হইয়া থাকে। কর্ম্ম বলিতে নিজকৃত ভালমন্দ কর্ম্ম বুঝায়। ভগবান বলিয়াছেন—কর্ম্ম ব্যতীত আরও একটি কারণ বিদ্যমান আছে। সে কারণ অবিদ্যা বা চতুরার্য্যসত্য সম্বন্ধে অজ্ঞানতা। অবিদ্যা প্রভাবে লোকে কাম-প্রবৃত্তিদ্বারা প্রলুব্ধ হইয়া ভালমন্দ কার্য্য করে, এবং এই কার্য্যদ্বারাই কর্ম্ম-শক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেইজন্য অবিদ্যাই জন্ম-মৃত্যুর কারণ।

পূর্বজন্ম বিশ্বাসের কারণঃ
(Reasons to believe in a Past birth)

জগতে আমরা দেখিতে পাই কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কেহ সুন্দর, কেহ কুৎসিত, কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র, কেহ পাপী, কেহ পুণ্যবান, কেহ রাজপ্রাসাদ-বাসী, আর কেহ পর্ণকুটিরবাসী—মানুষে মানুষে এই পার্থক্য কেন? বৌদ্ধমতে যে কর্ম্মশক্তি-প্রভাবে মানুষের পুনর্জন্ম লাভ হয়, সেই কর্ম্মশক্তি সকলের একরূপ নহে বলিয়া মানুষে মানুষে এই পার্থক্য বিদ্যমান। পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলেই মানব ইহজীবনে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল যদি আমরা না মানি, তাহা হইলে জগতের এই বৈষম্যের কোন সন্তোষজনক কারণ খুঁজিয়া পাই না।

জগতে আমরা আবার অনেক পাপীকেও সুখভোগ করিতে এবং অনেক পুণ্যবানকেও দুঃখভোগ করিতে দেখিতে পাই। ইহার কারণও পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল। পাপী পূর্ব্বজন্মের পুণ্যকর্ম্মের ফলে ইহজীবনে সুখভোগ করে এবং পূর্ব্বজন্মের পাপকর্ম্মের ফলে পুণ্যাত্মাও ইহজীবনে দুঃখভোগ করে। অনেক সময় আমরা যখন কোন নূতন স্থানে উপনীত হই, তখন মনে হয় যেন সেই স্থান আমাদের পরিচিত, সেই স্থানের অনেক দৃশ্য যেন পূর্ব্বে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয়। যাহাদের সঙ্গে পূর্ব্বে কখনও দেখা হয় নাই, সেই সব লোকের সঙ্গে আমাদের দেখা হইলে অনেক সময় মনে হয় যেন এই সব লোক আমাদের অনেক দিনের পরিচিত। আমাদের মনে এই যে ভাব উৎপন্ন হয়

তাহার কারণ কি ? ইহার একমাত্র সঙ্গত কারণ এই যে পূর্ব্বজন্মে সেই সব স্থান এবং সেই সব লোক আমাদের পরিচিত ছিল।

ধর্ম্মপদের অর্থকথায় ভগবান বুদ্ধকে দেখিয়া এক দম্পতির ভগবানের প্রতি পুত্রস্নেহ উৎপত্তির কথা লিপিবদ্ধ আছে। উক্ত দম্পতি ভগবানকে দর্শন করিয়া ভগবানের পদপ্রান্তে পতিত হইয়া ও অভিবাদন করিয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন—"প্রিয় পুত্র, মাতাপিতা বৃদ্ধাবস্থায় পতিত হইলে, তাহাদের যত্ন নেওয়া পুত্রের কর্ত্তব্য নহে কি ? কেন এতদিন আমাদিগকে দেখা দাও নাই ? এই প্রথম আমরা তোমার দর্শন লাভ করিলাম।" ভগবান বলিয়াছেন—এই দম্পতি বহু বহু জন্মে তাঁহার পিতামাতা ছিলেন। সেইজন্য তাঁহাকে দেখিয়া হঠাৎ তাঁহাদের পুত্রস্নেহ উৎপন্ন হইয়াছিল।

বৌদ্ধমতে সাধনাদ্বারা লোকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কথা স্মরণ করিতে পারে। বৌদ্ধধর্ম্মে এই জ্ঞানকে পূর্ব্বনিবাসজ্ঞান বলা হইয়াছে। ভগবান বুদ্ধ তাঁহার বহু বহু জন্মের কথা তথা অন্য লোকের বহু পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কথা বলিতে পারিতেন।

মহাসীহনাদ সুত্রে ভগবান বলিয়াছেন—"পুনচপরং সারিপুত্ত, তথাগতো অনেকবিহিতং পুব্বেনিবাসং অনুস্সরতি।

তথাগতো দিব্বেন চক্খুনা বিসুদ্ধেন অতিক্কন্তমানুসকেন সত্তে পস্সতি চবমানে উপ্পজ্জমানে হীনে পণীতে সুবগ্নে দুব্বগ্নে, সুগতে দুগ্গতে যথাকম্মূপগে সত্তে পজানাতি।"

ভগবান বুদ্ধের উপদেশ অনুসরণ করিয়া তাঁহার শিষ্যেরাও পূর্ব্বনিবাসজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন এবং তাহাদের নিজ নিজ পূর্ব্বজন্মের কথা বলিতে পারিতেন।

এই পূর্ব্বনিবাসজ্ঞান যে কেবল বুদ্ধ এবং বুদ্ধশিষ্যেরাই লাভ করিয়াছিলেন তাহা নহে। সাধনা দ্বারা বৌদ্ধ অবৌদ্ধ সকলেই এই পূর্ব্বজন্ম জ্ঞান লাভ করিতে পারে।

থেরগাথা নামক গ্রন্থপাঠে জানা যায়—বঙ্গীশ নামক জনৈক ব্রাহ্মণ আচার্য্য অঙ্গুলিদ্বারা মৃতব্যক্তির মস্তকের খুলি পরীক্ষা করিয়া মৃতব্যক্তি কোথায় পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিয়াছে বলিতে পারিতেন।

ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্ব্বেও ভারতীয় ঋষিদের কেহ কেহ

পূর্ব্বনিবাস জ্ঞান, পরের চিত্ত জানিবার জ্ঞান প্রভৃতি শক্তি লাভ করিয়াছিলেন।

ঋষি কালদেবল—(যিনি রাজকুমার সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভ করিবেন বলিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন—) লোকের অতীত ও ভবিষ্যতের কথা বলিতে পারিতেন।

সংসারচক্র

(The wheel of life)

বৌদ্ধধর্ম্মে পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মৃত্যু প্রবাহকে সংসার বলা হইয়াছে। বৌদ্ধগ্রন্থে মানবজীবনকে নদীর স্রোত ও দীপশিখার সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

অবিদ্যাজনিত কর্ম্মই মানবের পুনঃপুনঃ জন্ম ও মৃত্যুর কারণ। যতদিন এই কর্ম্মশক্তি বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন এই সংসার প্রবাহে ভাসিয়া চলিতে হইবে। প্রতীত্যসমুৎপাদে এই পুনঃপুনঃ জন্ম ও মৃত্যুপ্রণালী বিশদভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। অবিদ্যা সংসারচক্রের প্রথম কারণ। অবিদ্যাবশতঃ সম্যক্‌দৃষ্টি বিকশিত হয় না। অবিদ্যা বা চতুরার্য্যসত্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা হইতে সংস্কার বা কর্ম্মচেতনা (Thought activities) উৎপন্ন হয়। কর্ম্মচেতনা বা সংস্কার হইতে প্রতিসন্ধিবিজ্ঞান বা চিত্ত উৎপন্ন হয়। এই প্রতিসন্ধিবিজ্ঞান অতীত জীবনের সহিত বর্ত্তমান জীবনের সংযোগ সাধন করে। প্রতিসন্ধিবিজ্ঞানের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎ নামরূপ উৎপন্ন হয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায় ও মন এই ছয় ইন্দ্রিয় বা ষড়ায়তন নামরূপ হইতে অবশ্যই উৎপন্ন হয়। ইন্দ্রিয় থাকিলে বহির্জগতের সহিত সংস্পর্শ হইবেই। ছয় ইন্দ্রিয়ের সহিত বহির্জগতের সংস্পর্শ সঙ্ঘটিত হইলে সুখদুঃখ অনুভূতি বা বেদনা উৎপন্ন হয়। অনুভূতি হইতে তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়। তৃষ্ণা হইতে পুনর্জন্ম উৎপাদনকারী কারণ বা উপাদান উৎপন্ন হয়। উপাদান হইতে কর্ম্মভব, কর্ম্মভব হইতে জাতি বা ভবিষ্যত জন্ম সঙ্ঘটিত হয়। জন্ম হইতে জরা-মরণ ঘটিয়া থাকে।

যদি হেতু হইতে ফল উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে হেতুর অন্তর্দ্ধানে ফলের অন্তর্দ্ধান হয়। যখন মানবের জ্ঞানের বিকাশ হয়, তখন অবিদ্যার নিরোধ হয়। অবিদ্যার নিরোধে সংস্কারের নিরোধ; সংস্কারের নিরোধে বিজ্ঞানের নিরোধ; বিজ্ঞানের নিরোধে নামরূপের নিরোধ; নামরূপের নিরোধে ষড়ায়-

তনের নিরোধ; ষড়ায়তনের নিরোধে স্পর্শের নিরোধ; স্পর্শের নিরোধে বেদনার নিরোধ; বেদনার নিরোধে তৃষ্ণার নিরোধ; তৃষ্ণার নিরোধে উপাদানের নিরোধ; উপাদানের নিরোধে কর্ম্মভবের নিরোধ; কর্ম্মভবের নিরোধে জন্মের নিরোধ; জন্মের নিরোধে জরা-মরণ ইত্যাদি যাবতীয় দুঃখের অবসান হয়। যখন জ্ঞানের বিকাশের দ্বারা অবিদ্যার অবসান হয় এবং জীবন-স্রোতকে নির্ব্বাণধাতুর দিকে চালিত করা হয়, তখন সংসারের অবসান হয়।

জন্ম ও মৃত্যু প্রণালী ঃ

বৌদ্ধমতে চারিটি কারণে জীবের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

(১) জনককর্ম্মক্ষয়। যে কর্ম্মশক্তি-প্রভাবে জীবের জন্ম হয়, সেই কর্ম্মশক্তি শেষ হইয়া গেলে জীবের মৃত্যু হয়। এইরূপ মৃত্যুকে কর্ম্মফল মরণ বলা হয়। কর্ম্মশক্তি ফুরাইয়া গেলে বুদ্ধত্ব লাভ করিবার পূর্ব্বেই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

(২) আয়ুক্ষয়। বুদ্ধত্ব হেতু আয়ু অবসানে স্বাভাবিক মৃত্যুকে আয়ুক্ষয় মৃত্যু বলা হয়। বৌদ্ধমতে ৩১টি লোক (Planes of existence) বিদ্যমান আছে। এই ৩১টি লোকের কোন লোকে কত পরমায়ু, তাহা নির্দিষ্ট আছে। জীব যখন পরমায়ুর শেষ সীমায় (maximum age limit) উপনীত হয়, তখন কর্ম্মশক্তি বিদ্যমান থাকিলেও মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। কর্ম্মশক্তি অতীব বলবতী হয়। তাহা হইলে জীব একই লোকে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে। অথবা কোন উর্দ্ধতর লোকে জন্ম গ্রহণ করে, যেমন দেবতার বেলায় ঘটিয়া থাকে।

(৩) উভয়ক্ষয়। জনককর্ম্ম ও পরমায়ু উভয়ক্ষয়ে যে মৃত্যু হয়, তাহাকে উভয়ক্ষয় মরণ বলা হয়।

(৪) উপচ্ছেদক কর্ম্ম। যে কর্ম্মশক্তি প্রভাবে জীবের জন্ম হয়, সেই কর্ম্মশক্তি হইতে কোন অধিকতর শক্তিশালী পূর্ব্বজন্মকৃত বা ইহজন্মকৃত কর্ম্মপ্রভাবে আয়ু থাকা সত্ত্বেও মৃত্যু হইয়া থাকে। দেবদত্ত তাহার জীবদ্দশায় কৃত বুদ্ধরক্তপাতরূপ উপচ্ছেদক কর্ম্ম প্রভাবে আয়ু থাকা সত্ত্বেও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।

প্রথম তিন প্রকার মৃত্যুকে কালমরণ ও চতুর্থ প্রকার মৃত্যুকে অকালমরণ বলা হয়।

দীপনির্ব্বাণের উদাহরণ দ্বারা উক্ত বিষয় বেশ সুন্দরভাবে প্রকাশ করা যায়। প্রদীপ নিম্নলিখিত চারিটি কারণের যে কোন একটির দ্বারা নির্ব্বাপিত হইতে পারে—(১) সলিতা ফুরাইয়া গেলে, (২) তৈল নিঃশেষ হইয়া গেলে, (৩) সলিতা ও তৈল উভয় ফুরাইয়া গেলে, (৪) অন্য কোন বাহ্যিক কারণে যথা—বাতাসের প্রভাবে।

ঠিক সেইরূপ মানবের মৃত্যুও উল্লিখিত চারিটি কারণের যে কোন কারণে ঘটিতে পারে।

বৌদ্ধমতে জীবের জন্মও চারি প্রকারে হইতে পারে—(১) অণ্ডজ (২) জরায়ুজ (৩) স্বেদজ (৪) ওপপাতিক।[৪]

(১) যে সব প্রাণী ডিম হইতে জন্মে তাহারা অণ্ডজ। পক্ষী ও সর্প অন্ডজ প্রাণী।

(২) যাহারা মাতৃগর্ভে জন্মে তাহারা জরায়ুজ। মানব ও ভূমিদেবতা এবং অন্যান্য যে সব প্রাণী মাতৃগর্ভে জন্মে তাহারা জরায়ুজ।

(৩) মশা-মাছি প্রভৃতি ময়লা হইতে জন্মে বলিয়া স্বেদজ।

(৪) যে সব প্রাণী উক্ত তিন কারণ ছাড়া পনর ষোল বৎসর বয়স্ক অবস্থার দেহের ন্যায় হঠাৎ জন্ম গ্রহণ করে, তাহাদিগকে ওপপাতিক সত্ত্ব বলে। তাহারা জরায়ুতে জন্মগ্রহণ করে না বলিয়া পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ করিতে পারে। তাহাদিগকে আমরা চক্ষুতে দেখিতে পাই না। ব্রহ্মা, স্বর্গবাসী দেবতা, প্রেত ও নরকবাসী প্রাণীসমূহ এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

জন্মস্থান:

জীবের জন্ম নানালোকে (Planes of existence) সঙ্ঘটিত হইতে পারে। জীবগণ নিজ নিজ কর্ম্মশক্তি অনুযায়ী ৩১টি লোকের (Planes of existence) যে কোন লোকে জন্ম গ্রহণ করিতে পারে।

এই ৩১টি লোকের বিষয় নিম্নে লিখিত হইল। এই ৩১টি লোককে তিনভাগে বিভাগ করা যায়, যথা—কামলোক. রূপলোক ও অরূপলোক।

কামলোকের সংখ্যা ১১টি, রূপলোকের সংখ্যা ১৬টি, এবং অরূপলোক ৪টি, মোট ৩১টি।

কামলোককে দুইভাগে বিভাগ করা যায়, যথা—(১) দুর্গতিভূমি. (২) সুগতিভূমি।

দুর্গতিভূমি ঃ—

দুর্গতিভূমির সংখ্যা চারিটি

যথা—(১) নিরয় বা নরক (২) তিরচ্ছান বা তির্য্যক্‌যোনি
(৩) প্রেতযোনি (৪) অসুরযোনি

পূর্ব্বজন্ম গ্রহণের এই চারিটি দুর্গতিভূমি। এই চারিটি দুঃখময় দুর্গতিভূমিতে জীবগণ আপন আপন পাপকর্ম্মের ফলে জন্ম গ্রহণ করে। পাপকর্ম্মের গুরুত্ব অনুযায়ী কতদিন এই দুর্গতিভূমিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া কষ্ট ভোগ করিতে হইবে তাহা নির্দ্ধারিত হয়। নির্দ্ধারিত সময় অতীত হইলে জীব অন্যলোকে জন্ম গ্রহণ করে।

প্রেত বলিলে দেহবিহীন আত্মা বুঝায় না। প্রেতদের দেহ অতি কদর্য্য, কখনও অতি দীর্ঘ এবং কখনও অতি ক্ষুদ্র হইয়া থাকে। এই প্রেতদের বিষয় 'প্রেতবস্তু' নামক গ্রন্হে লিপিবদ্ধ আছে। সংযুক্তনিকায়েও প্রেতদের কতকগুলি মনোরম কাহিনী লিখিত আছে। জনৈক প্রেতের বিষয়ে স্থবির মোগ্‌গল্লান এইরূপ বলিয়াছিলেন ঃ—

এইমাত্র আমি গৃধ্রকূট পর্ব্বতশীর্ষ হইতে অবতরণ করিবার সময় আকাশের মধ্য দিয়া একটি নরকঙ্কাল চলিয়া যাইতে দেখিয়া আসিয়াছি। বহু কাক, শকুনি ও গৃধিনী সেই নরকঙ্কালের পিছনে উড়িতে উড়িতে বক্ষপঞ্জরে চঞ্চু দ্বারা আঘাত করিয়া পঞ্জর টানিয়া বিভক্ত করিতেছে। সেই আঘাতজনিত বেদনায় নরকঙ্কাল ক্রন্দন করিতেছে। তখন আমার মনে এই চিন্তার উদয় হইল—অহো! কি আশ্চর্য্য! কি অদ্ভুত! মানবের এইরূপ আকৃতিবিশিষ্ট হইয়া পুনর্জন্ম গ্রহণ করা বড়ই অদ্ভুত! ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছেন, এই জীব পূর্ব্বজন্মে পশুঘাতক ছিল। পাপকর্ম্ম প্রভাবে সে এইভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

অসুরেরাও প্রেতপর্য্যায়ভুক্ত দুঃখী জীব। তাহাদের চেহারাও অতি কদর্য্য। দেবতাদের প্রতিদ্বন্দ্বী অসুরেরা এই পর্য্যায়ভুক্ত নহে।

মিলিন্দ-প্রশ্ন মতে প্রেত চারি প্রকার

যথা—(১) বন্তাসিক।
(২) ক্ষুৎপিপাসিক।
(৩) নিজ্ঝামতৃষ্ণিক।
(৪) পরদত্তউপজীবী।

জন্মস্থান

(Planes of Existence)

লোক	ভূমি		জন্মস্থান	Age Limit আয়ুর পরিমাণ	
অরূপলোক (৪)			নেবসঞ্ঞা নাসঞ্ঞায়তন্	৮০,০০০	মহাকল্প
			আকিঞ্চঞ্ঞায়তন	৬০,০০০	”
			বিঞ্ঞাণঞ্চায়তন	৪০,০০০	”
			আকাসানঞ্চায়তন	২০,০০০	”
রূপলোক (১৬)	চতুর্থ ধ্যান ভূমি	শুদ্ধাবাস	অকনিষ্ঠ	১৬,০০০	”
			সুদর্শী—সুদস্সী	৮০০০	”
			সুদর্শা—সুদস্সা	৪০০০	”
			আতপ্পা	২০০০	”
			অবিহা	১০০০	”
			অসঞ্ঞসত্ত	৫০০	”
			বেহপ্ফল	৫০০	”
	তৃতীয় ধ্যানভূমি		সুভকিহ্ন	৬৪	”
			অপ্পমাণসুভ	৩২	”
			পরিত্তসুভ	১৬	”
	দ্বিতীয় ধ্যানভূমি		আভস্সর	৮	”
			অপ্পমাণাভা	৪	”
			পরিত্তাভা	২	”
	প্রথম ধ্যানভূমি		মহাব্রহ্মা	১	অসংখ্য কল্প
			ব্রহ্মপুরোহিত		অর্দ্ধাসংখ্য কল্প
			ব্রহ্মপারিসজ্জ		তৃতীয়াংশ কল্প
কামলোক (১১)	সুগতি (৭)	দেবলোক	পরনির্ম্মিত বশবর্ত্তী	১৬০০০	স্বর্গীয় বৎসর
			নির্ম্মাণরতি	৮০০০	”
			তুষিত	৪০০০	”
			যাম	২০০০	”
			তাবতিংস	১০০০	”
			চাতুর্ম্মহারাজিক	৫০০	”
			মনুষ্যলোক		অনির্দ্দিষ্ট
	দুর্গতি (৪)		অসুরযোনি		”
			প্রেতযোনি		”
			তিরচ্ছানযোনি		”
			নিরয় বা নরক		”

বন্তাসিক প্রেতেরা বমি খাইয়া বাঁচে (feed on vomit)। ক্ষুধা ও তৃষ্ণার জ্বালায় জর্জরিত প্রেতকে ক্ষুৎপিপাসিক প্রেত বলে। বৃক্ষকোটরে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির ন্যায়, অভ্যন্তরে প্রজ্জ্বলিত তৃষ্ণারূপ অগ্নির দ্বারা দগ্ধীভূত প্রেতকে নিজ্ঝামতৃষ্ণিক প্রেত (who are consumed by thirst) বলা হয়। যে সব প্রেত পরের প্রদত্ত দানবলে জীবিকানির্ব্বাহ করে, তাহাদিগকে পর-দত্তোপজীবী প্রেত বলা হয়। তিরোকুড্ড সূত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে পর-দত্তোপজীবী প্রেতেরা তাহাদের জীবিত আত্মীয়স্বজন কর্ত্তৃক তাহাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত পুণ্যফল লাভ করিয়া অন্য কোন সুগতিভূমিতে জন্ম গ্রহণ করিতে পারে। অন্যান্য প্রেতেরা অপরের প্রদত্ত পুণ্যফল পায় না।

এই চারিটি দুর্গতিভূমির পরই ৭টি সুগতিভূমি বিদ্যমান, যথা—

(১) মনুষ্যলোক ও ৬টি দেবলোক, মোট ৭টি।

দেবলোক ৬টি যথা—

(১) চাতুর্ম্মহারাজিক (২) তাবতিংস বা ত্রয়স্ত্রিংশ (৩) যাম (৪) তুষিত (৫) নিম্মাণরতি (৬) পরনির্ম্মিত বশবর্ত্তী।

মনুষ্যলোকে সুখ ও দুঃখ উভয়ই বিদ্যমান। বোধিসত্ত্বেরা মনুষ্যলোকই পছন্দ করেন। কারণ পারমী পূর্ণ করিবার সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান মনুষ্য-লোক। একমাত্র মনুষ্যলোকেই বুদ্ধগণ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন।

চাতুর্ম্মহারাজিক দেবলোক—চারিজন দিক্‌পাল দেবরাজের বাসস্থান।

তাবতিংস—৩৩জন দেবতার বাসস্থান। তাবতিংস দেবলোকের প্রত্যেক পার্শ্বে ৮টি দেবলোক আছে, মধ্যস্থানে দেবরাজ শক্রের দেবভবন।

যাম—যামদেবগণের বাসস্থান।

তুষিত—আনন্দময় স্বর্গ (Realm of delight)

যে সব বোধিসত্ত্বগণ পারমী পরিপূর্ণ করিয়াছেন, তাঁহারা বুদ্ধত্ব লাভ করিবার জন্য মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত তুষিত দেবলোকে বাস করেন। বর্ত্তমানে মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব এই তুষিত দেবভবনে বাস করিতেছেন।

নিম্মাণরতি—আপনসৃষ্টিকার্য্যে আনন্দপ্রকাশক দেবগণের বাসস্থান। (Realm of the devas who rejoice in their own creation).

নিম্মাণরতি দেবতারা নীল-পীতাদি যেরূপ ইচ্ছা করেন, তাদৃশ রূপ নিম্মাণ করিয়া রমিত হইয়া থাকেন।

পরনির্ম্মিত বশবর্ত্তী—পরের নির্ম্মিত কাম্যবস্তুতে আসক্ত ও বশবর্ত্তী দেবতাদের বাসস্থান। এইসব দেবতাদের মনোভাব অবগত হইয়া তদনুরূপ কাম্যবস্তু তাঁহাদের উপভোগের জন্য অপর দেবতারা নির্ম্মাণ করেন।

উক্ত ছয় দেবলোকবাসী দেবতাদের দেহ মানবদেহ হইতে সূক্ষ্মতর। তাঁহারা অমর নহেন—তাঁহারাও জন্মমৃত্যুর অধীন। কোন কোন বিষয়ে যেমন দেহ, স্বভাব, খাদ্য প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহারা মানব হইতে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তাঁহারা প্রজ্ঞায় মানবকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। এইসব দেবতারা ওপপাতিক সত্ত্ব। তাঁহারা ১৫।১৬ বৎসর বয়স্ক অবস্থার ন্যায় হঠাৎ জন্মগ্রহণ করেন।

চারিটি দুর্গতিভূমি, মনুষ্যলোক ও ছয়টি দেবলোক সমষ্টিগতভাবে কাম-লোক নামে অভিহিত (the sentient existence)। কামলোকের উপরে রূপলোক অবস্থিত। রূপলোকের ১৬টি শ্রেণী বিভাগ (sixteen grades) আছে। তন্মধ্যে **প্রথম ধ্যানভূমি** তিনটি—(১) ব্রহ্মপারিসজ্জ বা ব্রহ্মপারিষদ (২) ব্রহ্মপুরোহিত (৩) মহাব্রহ্ম।

দ্বিতীয় ধ্যানভূমি ঃ

(৪) পরিত্তাভা (৫) অপ্পমাণাভা (৬) আভস্সর

তৃতীয় ধ্যানভূমি ঃ

(৭) পরিত্তসুভ (৮) অপ্পমাণসুভ (৯) সুভকিহ্ন

চতুর্থ ধ্যানভূমি ঃ

(১০) বেহপ্ফল (১১) অসঞ্ঞসত্তা (১২) সুদ্ধাবাস। সুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকের ৫টি শ্রেণী বিভাগ আছে ; যথা—(১) অবিহা (২) অতপ্পা (৩) সুদস্সা (৪) সুদস্সী (৫) অকনিট্ঠ।

প্রথম ধ্যানভূমি ৩টি, দ্বিতীয় ধ্যানভূমি ৩টি, তৃতীয় ধ্যানভূমি ৩টি, চতুর্থ-ধ্যানভূমি ৭টি মোট ১৬টি রূপলোক। যাঁহারা ধ্যান করেন, তাঁহারা উল্লিখিত রূপব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন। যাঁহারা প্রথমধ্যান করেন, তাঁহারা প্রথমধ্যানভূমিতে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন। যাঁহারা দ্বিতীয় ও

তৃতীয়ধ্যান করেন, তাঁহারা দ্বিতীয়ধ্যানভূমিতে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন। যাঁহারা চতুর্থ ও পঞ্চমধ্যান করেন, তাঁহারা যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্যান-ভূমিতে জন্মগ্রহণ করেন।

যাঁহারা অল্পমাত্রায় ধ্যান করেন, তাঁহারা ধ্যানভূমির প্রথমস্তরে জন্মগ্রহণ করেন। যাঁহারা মধ্যম রকম ধ্যান করেন, তাঁহারা দ্বিতীয়স্তরে জন্মগ্রহণ করেন। যাঁহারা ধ্যান সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াছেন, তাঁহারা ধ্যানভূমির তৃতীয়স্তরে জন্মগ্রহণ করেন।

একাদশ রূপব্রহ্মলোক অসঞ্‌ঞসত্তাবাসীদের বিজ্ঞান নাই—রূপ আছে মাত্র। তাহা হইলে তাঁহারা প্রাণহীন জড়পদার্থ কি? না, তাঁহারা জড়পদার্থ নহেন। তাঁহাদের বিজ্ঞান না থাকিলেও জীবিতেন্দ্রিয় বর্ত্তমান থাকে। সুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোক অরহৎ ও অনাগামীদের বাসস্থান। যাঁহারা কামলোকে অনাগামীমার্গফল লাভ করেন, তাঁহারা মৃত্যুর পর সুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হন এবং অরহত্ত্ব লাভ না করা পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করেন। অরূপ-লোকের সংখ্যা চারিটি। অরূপলোকে রূপ নাই—বিজ্ঞান আছে মাত্র। প্রবল মানসিক শক্তির দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইয়া বিজ্ঞান সাময়িকভাবে রূপের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া অরূপলোকে অবস্থান করে।

রূপলোক ও অরূপলোকবাসীদের মধ্যে লিঙ্গভেদ নাই। চারি অরূপ-ধ্যানানুযায়ী অরূপলোকও চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা ঃ—

(১) আকাসানঞ্চায়তন (২) বিঞ্‌ঞানঞ্চায়তন (৩) আঁকিঞ্চঞ্‌ঞায়তন (৪) নেবসঞ্‌ঞানাসঞ্‌ঞায়তন।

অভিধর্ম্মার্থ সংগ্রহে উক্ত ৩১টি লোকের সত্ত্বগণের পরমায়ুর পরিমাণ এইরূপ লিখিত হইয়াছে ঃ

চারি দুর্গতিভূমিতে পরমায়ুর কোন সীমা নির্দ্দিষ্ট নাই। মনুষ্যলোকেও আয়ুর পরিমাণ অনির্দ্দিষ্ট।

চাতুর্মহারাজিক দেবতাদের আয়ুর পরিমাণ ৫০০ স্বর্গীয় বৎসর। মনুষ্যের গণনায় ৯০,০০০০০ বৎসর।

তাবতিংস স্বর্গবাসী দেবতাদের আয়ুর পরিমাণ চাতুর্মহারাজিক দেবতাদের আয়ুর দুইগুণ; যাম দেবতাদের আয়ুর পরিমাণ তাবতিংস দেবতাদের আয়ুর দুই গুণ; তুষিতবাসীদের আয়ুর পরিমাণ যাম দেবতাদের আয়ুর দ্বিগুণ।

নির্ম্মাণরতি দেবতাদের আয়ুর পরিমাণ তুষিত দেবতাদের আয়ুর দ্বিগুণ। পরনির্ম্মিতবশবর্ত্তী দেবতাদের আয়ুর পরিমাণ নির্ম্মাণরতি দেবতাদের আয়ুর দ্বিগুণ।

ব্রহ্মপরিসজ্জ বাসীদের আয়ু	—	১ অসংখ্যেয় কল্পের ৩ ভাগের ১ ভাগ
ব্রহ্মপুরোহিত	—	১ অসংখ্যেয় কল্পের ২ ভাগের ১ ভাগ
মহাব্রহ্মা	—	১ অসংখ্য কল্প
পরিত্তাভা	—	২ মহাকল্প
অপ্পমাণাভা	—	৪ "
আভস্সর	—	৮
পরিত্তসুভ	—	১৬
অপ্পমাণসুভ	—	৩২ "
সুভকিহ্ন	—	৬৪ "
বেহপ্ফল	—	৫০০
অসঞ্ঞসত্ত	—	৫০০
অবিহা	—	১০০০
আতপ্পা	—	২০০০
সুদস্সা "	—	৪০০০
সুদস্সী "	—	৮০০০
অকনিট্ঠ	—	১৬০০০
আকাসানঞ্চায়তন "	—	২০০০০
বিঞ্ঞাণঞ্চায়তন	—	৪০০০০
আকিঞ্চঞ্ঞায়তন	—	৬০০০০
নেবসঞ্ঞানাসঞ্ঞায়তন	—	৮০০০০

পুনর্জন্ম কিরূপে সংঘটিত হয়:

মনে করুন একজন লোকের মৃত্যু আসন্ন। মরণক্ষণ হইতে পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তদশ চিত্তক্ষণ পর্য্যন্ত নূতন শারীরিক কর্ম্মশক্তি রহিত থাকে। কর্ম্মজরূপ আর উৎপন্ন হয় না। কিন্তু উক্ত সপ্তদশ চিত্তক্ষণের পূর্ব্বে উৎপন্ন কর্ম্মজরূপ-সমূহ মরণকালীন চিত্তক্ষণ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে; তৎপর নিরুদ্ধ হইয়া যায়।

এই অবস্থাকে নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

এই মরণাপন্ন ব্যক্তির নিকট কর্ম্ম, কর্ম্মনিমিত্ত ও গতিনিমিত্ত উপস্থিত হয়। কর্ম্মদ্বারা এখানে তাহার কৃত ভালমন্দ কর্ম্ম বুঝাইতেছে। ইহা পুণ্যময় সমাধি কর্ম্ম অথবা পিতৃহত্যাদি গুরুতর (গরুক কম্ম) কর্ম্মও হইতে পারে। এই গুরুতর কর্ম্মসমূহ এত শক্তিশালী যে তাহারা অন্যান্য সমস্ত কর্ম্মকে আবৃত করিয়া রাখিয়া মনশ্চক্ষুর সম্মুখে অতি স্পষ্টভাবে উপস্থিত হয়। যদি তাহার কোন গুরুতর কর্ম্ম না থাকে, তাহা হইলে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে কৃতকর্ম্ম (আসন্ন কর্ম্ম) তাহার মৃত্যুকালীন চিন্তার বিষয় হইবে—যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের মরণক্ষণে তাহার স্মৃতিপথে নরহত্যার কথা উদিত হইবে। কাজেই তাহার পরজন্ম ভাল হইতে পারে না। আসন্ন কর্ম্মের অভাবে মরণাপন্ন ব্যক্তির স্বাভাবিক ভালমন্দ কর্ম্ম (আচিন্ন কর্ম্ম) মনে উপস্থিত হয়—যথা চোরের চুরি করার কথা, ডাক্তারের রোগী নীরোগ করার কথা উদিত হয়। এই সমস্তের অভাবে পূর্ব্ব পূর্ব্বজন্মে কৃত সঞ্চিত কর্ম্ম (কতত্তা কর্ম্ম) তাহার চিন্তার বিষয় হয়।

কর্ম্মনিমিত্ত :

কর্ম্মনিমিত্তের দ্বারা কর্ম্ম করিবার সময় যে দৃশ্য দেখিয়াছে, যে শব্দ শুনিয়াছে, যে গন্ধ বা যে স্বাদ অনুভব করিয়াছে, অথবা যে ভাব হৃদয়ে উদিত হইয়াছে তৎসমুদয় বুঝাইতেছে।

গতিনিমিত্ত :

গতিনিমিত্তের দ্বারা মরণাপন্ন ব্যক্তি কোথায় উৎপন্ন হইবে, তাহার দৃশ্য দর্শন করা বুঝায়। যাহারা স্বর্গে উৎপন্ন হইবে, তাহারা রথ, দেববিমান ও দিব্য শয্যা ইত্যাদি দেখে। যাহারা নরকে উৎপন্ন হইবে, তাহারা নরকাগ্নি, অসিহস্তে ঘাতক ইত্যাদি ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া ভয় পায়।

গতিনিমিত্ত যদি খারাপ হয়, তাহা হইলে মরণাপন্ন ব্যক্তির চিন্তাকে প্রভাবান্বিত করিয়া ভাল করা যায়। পরিত্রাণ পাঠ শ্রবণ করাইয়া, তাহার কৃত কুশলকর্ম্ম স্মরণ করাইয়া, পুষ্প, পুষ্পমালা ও সুন্দর দৃশ্য দেখাইয়া গতিনিমিত্ত ভাল করা যায়।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে মৃত্যু হইলেও কর্ম্ম, কর্ম্মনিমিত্ত ও গতিনিমিত্তের মধ্যে যে কোন একটি নিমিত্ত উৎপন্ন হয়।

অভিধর্ম্মে পুনর্জন্ম গ্রহণ করার বিশ প্রকার প্রণালী বর্ণনা করা হইয়াছে। আমরা এখানে একজন সৎপুরুষের মনুষ্যলোকে উৎপত্তির কথা বর্ণনা করিব। তাহার মরণকালীন চিন্তার বিষয় কোন পুণ্যকর্ম্ম।

তাহার ভবাঙ্গচিত্ত বাধাপ্রাপ্ত হইয়া দুই চিত্তক্ষণ স্পন্দিত হয় এবং তৎপর চলিয়া যায়। তৎপর তাহার মনোদ্বারবিজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া চলিয়া যায়। তৎপর জবনচিত্ত উৎপন্ন হইয়া স্বাভাবিক সপ্তচিত্তক্ষণের স্থানে দুর্ব্বলতা বশতঃ পঞ্চচিত্তক্ষণ থাকিয়া চলিয়া যায়। জবনচিত্তের প্রজননশক্তি নাই, তাহার কাজ নবজন্মের শৃঙ্খলা সম্পাদন করা। এখানে তাহার কর্ম্মনিমিত্ত ভাল হওয়ার দরুণ তাহার সংবিষয় স্মরণ হয়—আপনাআপনিও স্মরণ হইতে পারে, ইচ্ছাপূর্ব্বকও স্মরণ করিতে পারে। তৎসঙ্গে তাহার সুখও অনুভূত হয়। জ্ঞান থাকিতেও পারে, নাও পারে। তৎপর তদাবলম্বন চিত্ত উৎপন্ন হইতেও পারে—নাও পারে। তৎপর চ্যুতিচিত্ত বা মরণকালীন চিত্তক্ষণ ইহজীবনে উৎপন্ন হয়।

কেহ কেহ বলিয়া থাকে, চ্যুতিচিত্ত পরবর্ত্তীজন্ম নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহা ভুল। চ্যুতিচিত্তের একা কোন বিশেষ কাজ (Special function) করিবার শক্তি নাই। জবন প্রণালীতে যে চিত্ত উৎপন্ন হয়, তাহার দ্বারাই নবজন্ম নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। মরণকালীন শেষ চিত্ত (চ্যুতিচিত্ত) নিরুদ্ধ হইয়া গেলে মৃত্যু হয়। তখন চিত্তজ ও আহারজ রূপও নিরুদ্ধ হয়। কেবল ঋতুজরূপ বা উত্তাপ মৃতদেহ ধূলিসাৎ না হওয়া পর্য্যন্ত অবস্থান করে।

মৃত্যু অর্থে এখানে একটা পরমায়ুর অবসান বুঝাইতেছে।

আয়ু, জীবনীশক্তি (উষ্মা) এবং বিজ্ঞানের তিরোধানে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। মৃত্যুর দ্বারা জীবের ধ্বংশ হইয়া যায় না। যে কর্ম্মশক্তি জীবন চালিত করিতেছিল, তাহা অবশিষ্ট থাকে। সেই কর্ম্মশক্তি দেহ ধ্বংশ হইয়া গেলেও বিনষ্ট হয় না। বিজলী বাতি (Electric light) যেরূপ অদৃশ্য বিজলী শক্তির (Electric energy) দৃশ্যমান বাহ্যিক অভিব্যক্তি, সেইরূপ আমরাও অদৃশ্য কর্ম্মশক্তির বাহ্যিক অভিব্যক্তি। বিজলী বাতির Bulb বা চিমনি ভাঙ্গিয়া গেলে আলো নিবিয়া যায় বটে, কিন্তু বিদ্যুৎপ্রবাহ বর্ত্তমান থাকে, এবং অপর একটি চিমনি লাগাইয়া দিলে আলো পুনরায় উৎপন্ন হয়।

ঠিক সেইরূপ দেহ বিনষ্ট হইয়া গেলেও কর্ম্মশক্তি বিদ্যমান থাকে। বর্ত্তমান বিজ্ঞানের তিরোধানে, অপর জন্মে নব বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ বর্ত্তমান চিত্তের চ্যুতি অপর জন্মে অপর এক চিত্ত উৎপন্ন করে।

এইখানে মৃত্যুকালে সৎবিষয় স্মরণ হওয়ার দরুণ, পুনর্জ্জন্মগ্রহণকারী চিত্ত মানবগর্ভে পিতার শুক্রকীট ও মাতার ডিম্বের সহিত মিলিত হইয়া নবজন্ম ধারণ করে। তৎপর পুনর্জ্জন্মগ্রহণকারী চিত্ত বা প্রতিসন্ধিবিজ্ঞান ভবাঙ্গে পর্য্যবসিত হয়।

প্রতিসন্ধিবিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই যুগপৎ পঞ্চস্কন্ধ উৎপন্ন হয়। জীব উৎপত্তির প্রথমক্ষণেই লিঙ্গবিশিষ্ট হইয়া জন্মে। জীবের পুংলিঙ্গ অথবা স্ত্রীলিঙ্গ প্রাপ্তি তাহার কর্ম্মানুসারে ঘটিয়া থাকে।

মৃত্যু হইতে নবজন্ম ধারণের সময়ের ব্যবধান এক চিত্তক্ষণ মাত্র। চ্যুতিচিত্তের পর, কর্ম্মশক্তির দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইয়া প্রতিসন্ধিচিত্ত ভবান্তরে জন্ম গ্রহণ করে।

ক্ষণিকবাদ :

গাড়ীর চাকা যেরূপ একটি বিন্দুতে অবস্থান করে, ঠিক সেইরূপ আমরাও একটি চিত্তক্ষণ মাত্র বাঁচিয়া থাকি। এক চিত্তক্ষণ বলিলে, চোখের পলক ফেলিতে যে সময়ের প্রয়োজন হয়, সেই সময়ের এক নিযুত ভাগের এক ভাগ সময় বুঝায় (One billionth part of the time required for an eyewink or of flash.)। এই এক চিত্তক্ষণের মধ্যেই জীবের উৎপত্তি স্থিতি ও ধ্বংশ সংঘটিত হয়। তুলাদণ্ডের একদিক নীচ হইলে যেরূপ অন্যদিক উচ্চ হয়, ঠিক সেইরূপ ধ্বংশের সঙ্গে সঙ্গেই নবজন্ম সাধিত হয়। এক চিত্তক্ষণ পরে মানবের যে মৃত্যু হয়, তাহাকে ক্ষণিকমরণ বলা হয়। মানবের ক্ষণিক-মরণ আমরা চোখে দেখিতে পাই না, এবং উপলব্ধি করিতে পারি না। আয়ুকর্ম্মাদির ক্ষয়ে জীবিতেন্দ্রিয়ের উপচ্ছেদ হইলে যে মৃত্যু হয়, তাহাতে মৃত্যুর দৃশ্য আমরা দেখিতে পাই। নতুবা ক্ষণিক মরণের সহিত এই মৃত্যুর কোন পার্থক্য নাই।

অভিধর্ম্মমতে চিত্তপ্রবাহ মৃত্যুর দ্বারা রুদ্ধ হয় না এবং চ্যুতিচিত্ত ও প্রতিসন্ধিচিত্তের মধ্যে কোন অবকাশ নাই। প্রত্যেক চিত্ত ধ্বংস হইয়া যাইবার সময় তাহার সমস্ত শক্তি ও অভিজ্ঞতা পরবর্ত্তী চিত্তকে প্রদান করে। এইরূপে

একটি চিত্তপ্রবাহের মধ্যে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী চিত্তপ্রবাহ সমূহের সমস্ত শক্তি নিহিত আছে। কাজেই মৃত্যুর পরও যখন চিত্তপ্রবাহের বিরাম হয় না, তখন চ্যুতিচিত্তের সমস্ত শক্তি প্রতিসন্ধিচিত্তের মধ্যে নিহিত আছে। সুতরাং প্রতিসন্ধিচিত্তের পক্ষে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জীবনের ঘটনা স্মরণ করিতে পারাও সম্ভব।

মৃতব্যক্তি ও পুনর্জন্মধারী ব্যক্তি একই কর্ম্মশক্তির অভিব্যক্তি হইলেও তাহারা একও নহে, বিভিন্নও নহে (ন চ সো ন চ অঞ্ঞো)। উভয়ের পঞ্চস্কন্ধ বিভিন্ন বলিয়া তাহারা এক নহে (not Identical) এবং উভয়ের মধ্যে ধর্ম্মসন্ততি বিদ্যমান আছে বলিয়া বিভিন্নও নহে।

ব্রহ্মালোক, স্বর্গ, নরক, তির্য্যকযোনি ও মনুষ্যলোক যেখানেই জীব পুনর্জন্ম গ্রহণ করুক না কেন, মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে একই সময়ের প্রয়োজন হয়। এই বিষয়ে রাজা মিলিন্দ ও স্থবির নাগসেনের প্রশ্নোত্তর অতীব চিত্তাকর্ষক।

রাজা মিলিন্দ বলিলেন—ভদন্ত নাগসেন, যে এখানে মরিয়া ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়, আর যে এখানে মরিয়া কাশ্মীরে উৎপন্ন হয়, ইহাদের মধ্যে কে বিলম্বে আর কে শীঘ্র জন্ম গ্রহণ করে ?

নাগসেন বলিলেন—"একক্ষণেই উভয়ে জন্ম গ্রহণ করিবে।"

"উপমা প্রদান করুন।"

"মহারাজ আপনার জন্মস্থান কোথায় ?"

"ভন্তে, আমার জন্মস্থান কলসী গ্রামে।"

"মহারাজ, এখান হইতে কলসীগ্রামের দূরত্ব কত ?"

"দুইশত যোজন, ভন্তে।"

"মহারাজ, এখান হইতে কাশ্মীরের দূরত্ব কত ?"

"বার যোজন, ভন্তে।"

"আচ্ছা মহারাজ, আপনি কলসী গ্রামের কথা চিন্তা করুন।"

"চিন্তা করিলাম, ভন্তে।"

"পুনঃ কাশ্মীরের কথা চিন্তা করুন মহারাজ।"

"চিন্তা করিলাম, ভন্তে।"

"মহারাজ, আপনি কোন্‌টি বিলম্বে, আর কোন্‌টি শীঘ্র চিন্তা করিলেন ?"

"দুইটি এক সমান, ভন্তে।"

"এই প্রকার মহারাজ, দূরে ব্রহ্মলোকে হউক অথবা নিকটে কাশ্মীরে হউক—জন্ম গ্রহণে এক সমান সময় লাগিবে।"

"ভন্তে আর একটি উপমা প্রদান করুন।"

"মনে করুন, মহারাজ, দুইটি উড্ডীয়মান পক্ষীর একটি উচ্চবৃক্ষের শাখায় ও একটি নীচবৃক্ষের শাখায় একই সময়ে উপবেশন করিল। বলুন দেখি মহারাজ, কোন পাখীর ছায়া পৃথিবীতে প্রথমে পড়িবে? কোন্ পাখীর ছায়া বিলম্বে পড়িবে?"

"একই সমান, ভন্তে।"

"এই প্রকার মহারাজ, নরব্রহ্মলোকের উৎপত্তিক্ষণ একই সমান।"

এখানে আর একটি বিষয় বিবেচ্য আছে। পিতার শুক্রকীট ও মাতার ডিম্বের সম্মিলনে উৎপন্ন জীবকোষ প্রতিসন্ধিচিত্ত গ্রহণের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত আছে কিনা। উপর হইতে পতনোন্মুখ প্রস্তরখণ্ডকে গ্রহণ করিবার জন্য নিম্নস্থ ভূমি যেরূপ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে, সেইরূপ প্রতিসন্ধিচিত্ত গ্রহণের জন্য পুরুষের শুক্রকীট ও মাতার ডিম্বের সম্মিলনে উৎপন্ন জীবকোষও সর্ব্বদা প্রস্তুত আছে।

জন্ম গ্রহণ করে কে?

বৌদ্ধমতে জীব নামরূপের সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই নামরূপ অনিত্য, দুঃখময় ও অনাত্মভাবাপন্ন। এই পঞ্চস্কন্ধ সমন্বিত জীব প্রতিক্ষণে মরিয়া নব জন্ম ধারণ করিতেছে। প্রথমক্ষণের জীব ও দ্বিতীয়ক্ষণের মধ্যে অপরিবর্ত্তনীয় কোন আত্মা নাই। অথচ এই দুইয়ের মধ্যে ধর্ম্মসন্ততি বিদ্যমান। বৌদ্ধমতে জীবের এমন কোন স্থায়ী আত্মা নাই, যাহা এক দেহ ত্যাগ করিয়া অপর দেহ গ্রহণ করিতে পারে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, যদি স্থায়ী আত্মা না থাকে, তাহা হইলে জন্ম গ্রহণ করে কে? বৌদ্ধমতে সত্য দুই প্রকার—ব্যবহারিক সত্য ও পারমার্থিক সত্য।

মানুষ, দেবতা, পশু, জীব, আমি, তুমি ইত্যাদি ব্যবহারিক সত্য। পারমার্থিক সত্য মতে ইহাদের কোন অস্তিত্ব নাই। নামরূপ ব্যতীত কিছুই বিদ্যমান নাই।

সুপ্রসিদ্ধ অর্থকথাকার বুদ্ধঘোষ তাঁহার বিশুদ্ধিমার্গ নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন ঃ— "দুক্‌খং এব হি, ন চ কোচি, দুক্‌খিতো
কারকো ন, কিরিয়া চ বিজ্জতি।
অত্থি নিব্বুতি, ন নিব্বুতো পুমা,
মগ্‌গং অত্থি, গমকো ন বিজ্জতি ॥"

দুঃখ আছে, কিন্তু দুঃখিত ব্যক্তি কেহ নাই, কর্ম্ম আছে, কিন্তু কর্ত্তা নাই। নির্ব্বাণ আছে, কিন্তু নির্ব্বাপিত বা নির্ব্বাণপ্রাপ্ত কেহ নাই। মার্গ বা পথ আছে, কিন্তু পথিক নাই।

পরমার্থতঃ পুনর্জন্ম গ্রহণকারী বলিয়া কেহ নাই।

বৌদ্ধমতে জন্ম অর্থে পঞ্চস্কন্ধের আবির্ভাব বা জন্ম (খন্ধানং পাতুভাবো) বুঝায়। পূর্ব্ববর্ত্তী জন্মের পঞ্চস্কন্ধ ও বর্ত্তমান জন্মের পঞ্চস্কন্ধ এক নহে। কিন্তু পূর্ব্বজন্মের পঞ্চস্কন্ধের ধ্বংশের সময় কর্ম্মশক্তি বিদ্যমান ছিল। সেই কর্ম্মশক্তি প্রভাবে বর্ত্তমান পঞ্চস্কন্ধের উৎপত্তি হইয়াছে। সেইজন্য তাহারা বিভিন্নও নহে। উভয়ের মধ্যে ধর্ম্মসন্ততি বিদ্যমান। ব্যক্তির বৌদ্ধদর্শনের পরিভাষা সন্ততি।

জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে রাজা মিলিন্দ ও স্থবির নাগসেনের কথোপকথন অতীব চিত্তাকর্ষক।

রাজা বলিলেন—"ভন্তে, কিছুই যায় না, অথচ জন্ম গ্রহণ করে কি ?"

"হাঁ মহারাজ, জন্ম গ্রহণ করে।"

"তাহা কিরূপ ভন্তে ! উপমা প্রদান করুন।"

"যেমন মহারাজ, কোন পুরুষ একটি প্রদীপ হইতে আর একটি প্রদীপ জ্বালাইল। কেমন, পূর্ব্বের প্রদীপ হইতে শেষের প্রদীপে কিছু গেল কি ?"

"না ভন্তে।"

"এই প্রকার মহারাজ, কিছুই যায় না বটে, অথচ জন্মগ্রহণও করে।"

"পুনরায় উপমা প্রদান করুন ভন্তে !"

"মহারাজ বাল্যকালে আপনি কোন শিক্ষকের নিকট হইতে শ্লোক শিক্ষা করিয়াছেন কি ?"

"হাঁ ভন্তে, করিয়াছি।"

'মহারাজ, সেই শ্লোক শিক্ষক হইতে আপনার নিকট চলিয়া আসিয়াছে কি ?"

"না ভন্তে, আসে নাই।"

"এই প্রকার মহারাজ, এক জন্ম হইতে অপর জন্মে কিছুই যায় না, অথচ জন্ম গ্রহণও করে।"

হিন্দুধর্ম্মের জন্মান্তরবাদ ও বৌদ্ধধর্ম্মের জন্মান্তরবাদ এক নহে। হিন্দু ধর্ম্মমতে লোকে জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া যেরূপ নববস্ত্র পরিধান করে, সেইরূপ মানবের আত্মা পুরাতন দেহ ত্যাগ করিয়া নবদেহ ধারণ করে। বৌদ্ধমতে এমন কোন জীব নাই, যে এই দেহ ত্যাগ করিয়া অন্য দেহে চলিয়া যাইতে পারে।

মানবের শাশ্বত আত্মা বলিয়া যদি কিছু থাকে, তাহা হইলে শাশ্বত আত্মার উন্নতি বা অবনতি হইতে পারে না। যদি একই পরমাত্মা হইতে মানবের আত্মা উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে আত্মা সব সময় একরূপ হওয়ার কথা। কিন্তু মানবে মানবে পার্থক্য কেন?

যদি শাশ্বত পরমাত্মা হইতে মানবের উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে মানবের পঞ্চস্কন্ধও শাশ্বত বা নিত্য হওয়া দরকার। শাশ্বত পরমাত্মা হইতে অনিত্য পঞ্চস্কন্ধ উৎপন্ন হইতে পারে না।

হিন্দু দার্শনিক শঙ্করাচার্য্য বলেন—মানবের পঞ্চস্কন্ধ মায়া বা অলীক মাত্র। একমাত্র আত্মাই সত্য।

মানবের পঞ্চস্কন্ধকে মায়া বা মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় কি না—তাহা সুধিগণ বিচার করিবেন।

কর্ম্মের দায়িত্ব ঃ

মানব জীবন যদি ক্ষণিক হয় এবং মানবের যদি স্থায়ী আত্মা না থাকে, তাহা হইলে যে কার্য্য করে এবং যে ফলভোগ করে, তাহারা এক, না ভিন্ন?

কর্ম্মকর্ত্তা ও কর্ম্মফলভোক্তা বিভিন্ন এই একটা দিক এবং কর্ত্তা ও ভোক্তা একই ব্যক্তি এইটা অপর দিক। বৌদ্ধেরা এই দুই দিক ত্যাগ করিয়া মধ্যপথ গ্রহণ করিয়াছেন। বৌদ্ধেরা বলেন—কর্ত্তা ও ভোক্তা একও নহে, বিভিন্নও নহে। কর্ম্মকর্ত্তা ও কর্ম্মফলভোক্তার মধ্যে অপরিবর্ত্তনীয় কোন আত্মা নাই; অথচ এই দুইয়ের মধ্যে ব্যক্তিত্বের সন্ততি আছে।

শাশ্বতবাদীরা বলিতে পারে—যদি স্থায়ী আত্মা না থাকে, তাহা হইলে লোকের কর্ম্মের দায়িত্বও নাই। কারণ যে কর্ত্তা সে ত সেই কর্ম্মের ফলভোগ

করিবে না। কর্ম্মফল ভোগ করিতে না হইলে যে যাহার ইচ্ছামত কার্য্য করিবে। তাহা হইলে জগতে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে।

বৌদ্ধেরা বলেন—কর্ম্মফল অব্যর্থ। কর্ম্মফল কেহ এড়াইতে পারিবে না। বালক ও যুবক বিভিন্ন হইলেও বাল্যকালে লোকে যে কাজ করে, যৌবনে সেই কাজের ফলভোগ করিতে হয়। কর্ম্মের দায়িত্ব ব্যক্তিসন্ততির (Continuity) উপর নির্ভর করে—ব্যক্তির একত্বের উপর নহে।

এখন শাশ্বতবাদীরা বলিতে পারে, বালকটি যৌবনপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত জীবিত ছিল। সেইজন্য সে তাহার বাল্যকালের কৃতকার্য্যের জন্য দায়ী। সে ত মরিয়া পুনরায় যুবকরূপে জন্ম গ্রহণ করে নাই।

ইহজীবনে লোকে যে সকল কুশলাকুশল কর্ম্ম করে, মৃত্যুর পর সেই কর্ম্মসমূহকে আশ্রয় করিয়া পরবর্ত্তী জন্ম সংঘটিত হয়। পরবর্ত্তী জীবন ইহজীবনেরই সন্ততি (Continuity) মাত্র। সেইজন্য লোকে কর্ম্মফল হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে না।

যদি বালকটি যৌবনে পদার্পণ করিবার পর তাহার স্মৃতিশক্তি নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে সে তাহার বাল্যকালে কৃতকার্য্যের জন্য দায়ী হইবে কি? স্মৃতিশক্তি নষ্ট হইয়া গেলেও সে পূর্ব্বকৃত কার্য্যের জন্য দায়ী হইবে। নরহত্যা করার পর যদি একজন নরহন্তার স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহা হইলেও তাহাকে নরহত্যার জন্য শাস্তি দেওয়া হইবে। কেহ কেহ বলিতে পারে যদি তাহাকে কি জন্য শাস্তি দেওয়া হইবে, তাহা সে জানিতে না পারে, তাহা হইলে তাহাকে শাস্তি দিয়া কি লাভ? একমাত্র অপরের শিক্ষার জন্য ব্যতীত তাহাকে শাস্তি দেওয়ার কোন সার্থকতা নাই। কিন্তু জগতে কর্ম্মের সেরূপ বিচারকর্ত্তা নাই। আমাদের এই পৃথিবী জড় ও নৈতিক নিয়মে চালিত হইতেছে।

যদি একজন পুরুষ নিদ্রিতাবস্থায় কোন কাজ করে, বা নিদ্রিতাবস্থায় বিছানা হইতে উঠিয়া ঘরের বারান্দার কিনারায় গিয়া দাঁড়ায়, ও বারান্দা হইতে নিদ্রিতাবস্থায় পড়িয়া যাওয়ার দরুণ যদি তাহার হাত পা ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলে এই হস্তপদ ভাঙ্গা তাহার ঘুমন্ত অবস্থায় হাটিয়া যাওয়ারূপ কর্ম্মের ফল মাত্র—শাস্তি নহে। সে নিদ্রিতাবস্থায় কখন বিছানা হইতে উঠিয়া বারান্দায় আসিয়া নীচে পড়িয়া হস্তপদ ভাঙ্গিয়াছে, তাহা তাহার স্মরণ না

হইলেও তাহাকে তাহার ঘুমন্ত অবস্থায় হাঁটারূপ কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হইল।

তাহা হইলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে কর্ম্মের দায়িত্ব স্মৃতির উপর নির্ভর করে না।

মৃত্যুর দ্বারা স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত হইয়া গেলেও মানবকে মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম লাভ করিয়া ইহজীবনের কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করিতে হইবে। একজন লোক তাহার পূর্ব্বকৃত কার্য্যের কথা পরজন্মে স্মরণ নাও করিতে পারে, তাহা হইলেও তাহাকে কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হইবে।

কর্ম্মফলে উন্নতি-অবনতি :

কর্ম্মফলে মানবের পশুজন্ম লাভ সম্ভব কি ? হাঁ সম্পূর্ণ সম্ভব। দেবতা, মনুষ্য ও পশুরূপ, কর্ম্মশক্তির সাময়িক দৃশ্যমান অভিব্যক্তি। বর্ত্তমান দেহ পূর্ব্বজন্মের দেহ হইতে উৎপন্ন হয় নাই—যদিও তাহারা এক-ই কর্ম্মশক্তির বিভিন্ন অভিব্যক্তি। বিদ্যুত যেরূপ ক্রমান্বয়ে, উত্তাপ, আলো ও গতিশক্তি (Motion) রূপে বিকাশ পাইতে পারে, ঠিক সেইরূপ কর্ম্মশক্তিও মানুষ, পশু ও দেবতা রূপে আবির্ভূত হইতে পারে। জীব মৃত্যুর পর কিরূপ দেহধারী জীবরূপে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিবে, তাহা তাহার কর্ম্মই নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে।

একজন মানব পশু হইয়াছে এইরূপ (বুঝা গেল না) বলিয়া, যে কর্ম্মশক্তি পূর্ব্বে মানবরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা এখন পশুরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে বলিলে নির্ভুল বলা হইবে।

সংসারে পরিভ্রমণ করিতে করিতে আমরা নানা প্রকারের অভিজ্ঞতা, নানা ভাব, নানা প্রবৃত্তি লাভ করি। সংসারে কখনও দেবরূপে, কখনও মানবরূপে, কখনও পশুরূপে, কখনও প্রেতরূপে জন্মগ্রহণ করার দরুণ আমরা নানা প্রবৃত্তি লাভ করি। এইসব প্রবৃত্তি সুপ্তভাবে আমাদের মধ্যে অবস্থান করে ; কোন কোন সময় হঠাৎ আবির্ভূত হইয়া আমাদের সুপ্ত কর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রকাশ করে।

কোন সৎপুরুষকে কোন এক সময় পাপকর্ম্মে প্রবৃত্ত দেখিয়া আমরা বলিয়া থাকি "অহো, এই সাধুপুরুষ কিরূপে এরূপ পাপকর্ম্ম করিলেন।

আমরা কখন চিন্তা করিতে পারি নাই যে, এইরূপ সৎপুরুষ এমন পাপকর্ম্ম করিবেন।”

ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই, কারণ তিনি তাহার লুক্কায়িত প্রকৃতিই প্রকাশ করিয়াছেন।

মানবের অতীতদ্বারা সব সময় তাহার ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারিত হয় না। যেহেতু আমরা প্রতিক্ষণে নূতন নূতন কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছি। একদিকে দেখিতে গেলে, বাস্তবিকই আমরা অতীতে যাহা ছিলাম, বর্ত্তমানে আমরা তাহারই অভিব্যক্তি এবং বর্ত্তমানে যাহা আছি, ভবিষ্যতে তাহা হইব। কিন্তু অন্যদিকে দেখিতে গেলে, অতীতে আমরা যাহা ছিলাম, বর্ত্তমানে তাহা নহি, এবং বর্ত্তমানে যাহা আছি, ভবিষ্যতে তাহা হইব না।

গতকল্য যে চোর ছিল, অদ্য সে সাধু হইতে পারে ; অদ্য যে সাধু আছে, আগামী কল্য সে চোর হইতে পারে। কাজেই এই অনন্ত বর্ত্তমানই (Eternal present) আমাদের অবস্থা উপলব্ধি করাইয়া দেয়। এইক্ষণেই আমরা আমাদের ভবিষ্যতের বীজ বপন করিতেছি। এইক্ষণেই আমরা পাপকার্য্যের দ্বারা নিজের নরক এবং পুণ্যকার্য্যের দ্বারা নিজের স্বর্গ সৃষ্টি করিতে পারি।

বর্ত্তমান চিত্তক্ষণ তাহার পরবর্ত্তী চিত্তক্ষণের জনক। বৌদ্ধ দর্শন মতে ভবিষ্যত জন্মও আমাদের মরণকালীন চিত্তক্ষণের দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। যেমন একচিত্ত ধ্বংশ হইবার সময় তাহার সমস্ত শক্তি পরবর্ত্তী চিত্তকে প্রদান করে, ঠিক সেইরূপ আমাদের এই জীবনের মরণকালীন চিত্ত তাহার সমস্ত প্রবৃত্তি ও শক্তি পরজন্মের প্রতিসন্ধি-চিত্তকে প্রদান করে।

যদি কোন মরণাপন্ন ব্যক্তি পশুভাব পোষণ করে. অথবা পশুর উপযোগী বাসনা পোষণ করে অথবা কার্য্য করে, তাহা হইলে তাহার এই অসৎ কর্ম্ম তাহাকে পশুযোনিতে জন্মধারণ করাইবে।

যে কর্ম্মশক্তি মানবরূপে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা পশুরূপে প্রকাশিত হইবে। তবে তাহার অতীত সৎকর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া যায় না। এই অতীত সৎকর্ম্মবশতঃ ভবিষ্যতে তাহার মানবরূপে জন্ম হইবে। তাহার অতীত সৎকর্ম্ম সুপ্তভাবে থাকে। সুযোগ পাইলে তাহা ফল প্রদান করে।

আমাদের শেষচিত্তক্ষণ আমাদের জীবনের কর্ম্ম সমষ্টির উপর নির্ভর করে না। সাধারণতঃ সৎপুরুষ সুগতি ভূমিতে এবং অসৎপুরুষ দুর্গতি ভূমিতে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু ইহার ব্যতিক্রমও কদাচিৎ দেখা যায়।

পালিগ্রন্থ পাঠে দেখিতে পাই—রাণী মল্লিকা অতীব পুণ্যবতী রমণী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর সময়ে একটি পাপ চিন্তা উদয় হইয়াছিল বলিয়া তাঁহাকে নরকে উৎপন্ন হইতে হইয়াছিল। তাঁহার পুণ্যকর্ম্ম অধিকতর বলবান ছিল বলিয়া, তাঁহাকে মাত্র ৭ দিন নরকভোগ করিতে হইয়াছিল।

আমরা দেখিতে পাই কোন কোন সাধুলোকও আকস্মিক উত্তেজনাবশতঃ নরহত্যা করিয়া থাকে। কিন্তু নরহত্যা করিলে সাধুও মুক্তি পাইতে পারে না। তাহাকে নরহত্যার দায়ী করা হয় এবং এই ঘৃণিত কাজের জন্য শাস্তি দেওয়া হয়। তাহার পূর্ব্বকৃত সৎকর্ম্ম তাহার শাস্তির পরিমাণ কিছু কম করিতে পারে বটে, কিন্তু তাহাকে মুক্ত করিতে পারে না। তাহার এই ঘৃণিত কার্য্যের জন্য অন্যান্য পাপীলোকের সহবাসে তাহাকে শাস্তিভোগ করিতে হইবে। চিন্তা করিয়া দেখুন—সাধুলোকের জীবনের একটি মাত্র পাপকর্ম্ম তাহাকে কি হীন অবস্থাপন্ন করিয়াছে।

এই সময় গোব্রত ও কুকুরব্রত পাপকারী পূর্ণ ও সেনীয় নামক দুইজন সন্ন্যাসী ভগবান বুদ্ধ সমীপে উপনীত হইয়া তাহাদের গতি কি হইবে ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। ভগবান বলিয়াছিলেন—যে গোব্রত পালন করে, তাহার গরুরূপেই ভবিষ্যতে জন্ম হইবে। যে কুকুরব্রত পালন করে, ভবিষ্যতে কুকুরযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে।

কর্ম্মফলে লোকের উন্নতি ও অবনতি দুইই হইতে পারে। মানব যেরূপ কর্ম্মফলে পশুজন্ম ধারণ করে, সেইরূপ পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মফলে পশুও মানবজন্ম ধারণ করিতে পারে। পশুর মৃত্যুর সময় তাহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সৎকর্ম্ম স্মরণ হওয়ার দরুণ মানব জন্ম লাভ হয়। পশুর শেষচিত্তক্ষণ পশুজন্মকৃত চিন্তা বা কর্ম্মের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে না। কারণ সাধারণতঃ পশুর পুণ্য কর্ম্ম করিবার কোন সুযোগ নাই।

বেলজিয়ামের অধ্যাপক Poussin লিখিয়াছেন—"A man may be like his grand father but not like his father. The germs of a disease have been introduced into the organism of an ancestor, for some generation they may remain dormant ; but suddenly they manifest themselves in actual diseases."

"একজন লোক তাহার পিতার সদৃশ না হইয়া তাহার পিতামহের সদৃশও

হইতে পারে। কোন কোন রোগের বীজ পুরুষানুক্রমে সঞ্চারিত হয়। কিন্তু কয়েকপুরুষ একটি রোগে ভুগিবার পর, তাহাদের পরবর্ত্তী কয়েকপুরুষে উক্ত রোগ প্রকাশ নাও পাইতে পারে। তৎপর একপুরুষ আবার উক্তরোগে ভুগিতে দেখা যায়।"

উপসংহার :

আমরা কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় যাইব, কখন যাইব—তাহা আমরা জানি না। এ জগৎ হইতে যে চলিয়া যাইতে হইবে, তাহা ধ্রুব সত্য। আমাদের বিষয়-সম্পত্তি, প্রিয়পরিজন ও এই সযত্নে রক্ষিত দেহ আমাদের সঙ্গে যাইবে না। যশ-অযশ, নিন্দা-প্রশংসা বাতাসে মিশিয়া যাইবে। এই বাত্যাবিক্ষুব্ধ সংসার-সমুদ্রে আমরা একাকী ভাসিয়া চলিয়াছি। কর্ম্মবশতঃ কখনও তির্য্যক্‌যোনিতে, কখনও নরলোকে, কখনও দেবলোকে, কখনও ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়।

আমরা পরস্পর মিলিত হইয়া পুনরায় বিচ্ছিন্ন হই। আবার হয়ত অজানিতভাবে মিলিত হই। আমরা পরস্পরের মাতা পিতা, ভ্রাতা ভগ্নী, পুত্র কন্যারূপে কতবার যে এই সংসারে পরিভ্রমণ করিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। অনন্ত সংসারচক্রে আমরা অনন্তকাল ধরিয়া ঘুরিতেছি।

কত অগণিত জন্ম আমরা ধারণ করিয়াছি, অনন্তকাল ধরিয়া কত যে দুঃখভোগ করিয়াছি, তাহার সীমা নাই। এই অন্তহীন সংসারচক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রন্দন ও বিলাপ করিতে করিতে যে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছি, তাহা চারি মহাসমুদ্রের জলের অপেক্ষা বেশী হইবে।

একজন লোকের প্রত্যেক মৃত্যুর পর যদি অস্থিগুলি স্তূপীকৃত করিয়া রাখা হইত, তাহা হইলে অস্থিস্তূপ বৈপুল্য পর্ব্বত অপেক্ষা বৃহত্তর হইত।

পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ বড়ই দুঃখজনক।

এই দুঃখময় জন্ম-মৃত্যুপ্রবাহ হইতে বিমুক্তিলাভের চেষ্টা করা সকলেরই উচিত।

পাদটীকা

১। শ্রীদ্বারিকা মোহন মুচ্ছদ্দী-লিখিত এবং "সত্যশক্তি" পত্রিকায় প্রকাশিত (২৪৮২ বুদ্ধাব্দ)।

২। মজ্ঝিম নিকায়, চুলমালুঙ্ক্য সূত্র, নং ৬৩।

৩। Inconceivable is the beginning of this Sansara. not to be discovered a first beginning of beings, who, obstructed by ignorance and ensnared by craving, are hurrying, and hastening through this round of rebirths—

Nyantiloka Bhikkhu.

৪। চতস্সো খো ইমা সারিপুত্ত, যোনিজা—কতমা চতস্সো ?

অণ্ডজা যোনি, জলাবুজা যোনি, সংসেদজা যোনি, ওপপাতিকা যোনি। (মহাসীহনাদ সুত্ত, মজ্ঝিমনিকায়)। Four in number, Sariputta, are the species of existence according to mode of birth. That is egg-born existence, womb-born existence, moisture-born existence and existence due to supernatural appearing.

Translated by—Bhikkhu Silachar.

বৌদ্ধ নির্বাণ

বৌদ্ধ 'নির্বাণ' লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে জল্পনা-কল্পনার শেষ নাই। ভগবান গৌতম বুদ্ধ বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষমূলে তপস্যা করিয়া নির্বাণ লাভ করিয়াছেন এবং সর্বজ্ঞ বুদ্ধ হইয়াছেন—এই নির্বাণ কি? আবার অন্তিমে তিনি কুশীনগরে যাইয়া দেহত্যাগ করিয়া মহাপরিনির্বাণ লাভ করিয়াছেন—এই নির্বাণ-ই বা কি? বুদ্ধের মতে যিনি নির্বাণ লাভ করিয়াছেন কেবল তিনিই উপলব্ধি করিবেন—নির্বাণ কি? অন্য কাহারও পক্ষে তাহা জানা সম্ভব নহে।

নির্বাণ দুঃখক্লিষ্ট মানবজাতির জন্য ভগবান বুদ্ধের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান, নির্বাণ বিশ্বের দর্শন জগতের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শন, নির্বাণ মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। এই নির্বাণ-সত্যের জন্যই বুদ্ধ বিশ্বে সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব-রূপে পূজিত হইয়াছেন এবং হইতেছেন। নির্বাণ বিশ্বের দার্শনিকগণের নিকট পরম বিস্ময়, কিন্তু বুদ্ধের নিকট নির্বাণ হইতেছে পরমসত্য, মানব-জাতির কল্যাণের জন্য শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। এই প্রসঙ্গে পণ্ডিত শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবিরের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন।[১]

"মানব সমাজ যেদিন আপন প্রধান সত্তার উপলব্ধি করিল, সেদিন হইতে জীবের স্থিতি ও পরিণতি সম্বন্ধে বিবিধ সমস্যা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই সমুদায় সমস্যার সমাধান কল্পে বিভিন্ন সময়ে অনেক প্রতিভাবান মনীষী অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহাদের উর্বর মস্তিষ্ক এক এক সিদ্ধান্তে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু একের সহিত অপরের বৈষম্য রহিল যথেষ্ট। এসব দেখিয়া মহাভারতকার বলিলেন—"বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ঃ বিভিন্না। নাস্তি মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।"—বেদসমূহ বিভিন্ন, স্মৃতিশাস্ত্রও তদ্রূপ বিভিন্ন। এমন কোন মুনি নাই, যাঁহার মত ভিন্ন নহে। এ সকল বিভিন্ন দার্শনিক মত যখন পরস্পর খণ্ডন-মণ্ডন করিয়া আপন শ্রেষ্ঠতা খ্যাপনে ব্যস্ত, তখন দর্শনযুগের সেই পরমোৎকর্ষতার দিনে ভগবান বুদ্ধ জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। অসাধ্য সাধনায় সিদ্ধ হইয়া তিনি মানব-মনের চির-প্রহেলিকা উদ্ঘাটন করিলেন। দার্শনিক চিন্তা এতদিন যেখানে ব্যাহত ছিল, তাঁহার অপ্রতিহত গতি সে সীমা অতিক্রম করিল। তিনি আবিষ্কার করিলেন—জীব কার্য্য-কারণ প্রবাহের স্থূল প্রতীক এবং তাহার চরম পরিণতি পরিনির্বাণ।

তাঁহার এই সিদ্ধান্তে দার্শনিক মহল আলোড়িত হইল। অধিকাংশ দার্শনিক পণ্ডিত ইহা চরম সিদ্ধান্তরূপে মানিয়া নিলেন। আজ সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া অসংখ্য জ্ঞানী হৃদয় এই সিদ্ধান্তে উদ্ভাসিত হইতেছে।"

'নির্বাণ কি' তাহা জাগতিক ভাষা দ্বারা ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। কারণ নির্বাণ হইতেছে একটি অলৌকিক বা অতিজাগতিক অবস্থা। যাঁহারা নির্বাণ উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহাদের ভাষায় নির্বাণ হইতেছে সমস্ত চিত্তক্লেশ হইতে চরম বিমুক্তির অবস্থা ; নির্বাণ হইতেছে বিশুদ্ধি, শান্তি, সুখ, দুঃখাবসান, তৃষ্ণানিবৃত্তি, ধ্রুব, শুভের চরম অবস্থা। অধ্যাপক নারদ মহাথেরোর ভাষায়[২]— নির্বাণ শব্দকে যত প্রকার প্রদীপ্ত শব্দ ও বিশেষণের দ্বারা ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করার চেষ্টা করা হউক না কেন—তাহার দ্বারা নির্বাণের প্রকৃত সত্য জানা যাইবে না। ইহা তর্কদ্বারাও অববোধ্য নহে, কারণ তর্ক অপ্রতিষ্ঠ। এক তার্কিকের সীমাবদ্ধ সঙ্কল্প অপরে খণ্ডন করে। তাই বলা হইয়াছে যে বুদ্ধের সমস্ত বাণী ন্যায়সঙ্গত বুদ্ধিগ্রাহ্য বিজ্ঞজনবোধ্য। কিন্তু তাঁহার আবিষ্কৃত নির্বাণ অতর্কাবচর, দার্শনিক তর্ক-বিতর্কের দ্বারা জ্ঞাতব্য নহে, বুদ্ধিগ্রাহ্যও নহে—কেবলমাত্র অন্তর্মুখী হইয়া সম্যক্ শীল-সমাধি-প্রজ্ঞাবলের দ্বারা আত্মোপলব্ধি করিতে পারিলেই নির্বাণ-সত্যকে অধিগত করা সম্ভব। নির্বাণোপলব্ধি দুঃসাধ্য হইলেও অসাধ্য নহে, কারণ বুদ্ধ এবং তাঁহার মহা-শ্রাবক ও মহাশ্রাবিকগণ নির্বাণ-সত্যকে অধিগত করিয়া স্বগতোক্তি করিয়াছেন ঃ

> "খীণা জাতি বুসিতং ব্রহ্মচরিয়ং
> নত্থি দানি পুনব্ভবো।"

—"অর্থাৎ আমার জন্ম শেষ করিয়াছি, ব্রহ্মচর্য (=শ্রেষ্ঠ চর্যা) পালন করিয়াছি। আমার আর পুনর্জন্ম হইবে না।" ইহা হইতে বুঝা যায় যে, যাহা কিছু সংস্কৃত ধর্ম অর্থাৎ কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ-সঞ্জাত তাহাদের বিপরীত হইতেছে অসংস্কৃত ধর্ম অর্থাৎ কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ-সঞ্জাত নহে। ইহাদের অন্যতম হইতেছে এই নির্বাণ যাহা হেতুপ্রভব নহে বলিয়া ইহা জন্ম-জরা-মৃত্যুর অতীত অজর অমর দুঃখহীন পরম সুখময় শাশ্বত শান্তির একটি অবস্থা।

নির্বাণ শব্দের সংজ্ঞা :

নির্বাণ (পালিতে নিব্বান) শব্দটি নি-উপসর্গের সহিত বান/বাণ শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। 'বান' তৃষ্ণারই নামান্তর। তৃষ্ণা অপর সাধারণ সহকারী কারণ সহযোগে জীবগণকে ভব হইতে ভবান্তরে রজ্জুবৎ 'সিব্বন' বা বন্ধন করায় বলিয়া 'বান' নামে অভিহিত। 'নি' উপসর্গ তৃষ্ণার অভাব বা নিরবশেষ অতিক্রম অর্থ প্রকাশ করিতেছে। অতএব, যে ধর্ম প্রত্যক্ষ করিলে, স্বয়ং উপলব্ধি করিলে জন্মজন্মান্তর ধরিয়া কৃত তৃষ্ণাবন্ধন ছিন্ন করিতে সমর্থ হয়, তাহারই নাম নিব্বান (=নির্বাণ)।

"পুনশ্চ, 'ণ' সহযোগে বাণ-শব্দের অর্থ হইতেছে অগ্নি। এই অর্থে নির্বাণ শব্দের অর্থ হইতেছে রাগাগ্নি (=লোভাগ্নি), দ্বেষাগ্নি এবং মোহাগ্নির চিরতরে নির্বাপণ বা ধ্বংস। ভগবান গৌতম বুদ্ধ প্রায়শই বলিতেন :

পজ্জলিতো ভিক্খবে অয়ং লোকো। পজ্জলিতো ভিক্খবে অয়ং লোকো"তি।

—হে ভিক্ষুগণ এই জগত প্রজ্বলিত হইতেছে। এই জগত প্রজ্বলিত হইতেছে।

"কেন'গ্গিনা পজ্জলিতো? রাগগ্গিনা পজ্জলিতো, দোসগ্গিনা পজ্জলিতো, মোহগ্গিনা পজ্জলিতো"তি। —অর্থাৎ এই জগত কিসের দ্বারা প্রজ্বলিত হইতেছে। এই জগত রাগাগ্নির দ্বারা প্রজ্বলিত হইতেছে, দ্বেষাগ্নির দ্বারা প্রজ্বলিত হইতেছে, মোহাগ্নির দ্বারা প্রজ্বলিত হইতেছে। এই জগত জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, দুঃখ, শোক, পরিদেবনা, দৌর্মনস্য এবং হতাশারূপ অগ্নির দ্বারা প্রজ্বলিত হইতেছে।

ইহা মনে করা ভুল হইবে যে নির্বাণ হইতেছে কেবলমাত্র রাগদ্বেষাদি অগ্নির চিরতরে নির্বাপণ। উপায় এবং উপেয়কে একাত্মক করিলে চলিবে না। এখানে রাগদ্বেষাদি অগ্নির চির-নির্বাপণকে বুঝাইতেছে নির্বাণ লাভের উপায়। অর্থাৎ রাগদ্বেষাদি অগ্নির চির-নির্বাপণের দ্বারা নির্বাণমুখী স্রোতে (যে স্রোতে পতিত হইলে আর বিপরীতমুখী হইবার সম্ভাবনা থাকে না) পতিত হওয়া যায় মাত্র। ইহার পরেও অনেক তপস্যার দ্বারা অন্যান্য চিত্ত-ক্লেশ (ঊর্ধ্ব-ভাগীয় সংযোজন বা বন্ধন) চিরতরে ধ্বংস করিতে পারিলেই নির্বাণোপলব্ধি সম্ভব। মহাকবি অশ্বঘোষ তাই প্রদীপের চির-নির্বাপণের সঙ্গে নির্বাণের তুলনা করিয়া বলিয়াছেন :[৩]

"দীপো যথা নিবৃতিমভ্যুপেতো নৈবাবনিং গচ্ছতি নান্তরীক্ষম্ ।
দিশং ন কাঞ্চিৎ বিদিশং ন কাঞ্চিৎ স্নেহক্ষয়াৎ কেবলমেতি শান্তিম্ ॥
এবং কৃতী নিবৃতিমভ্যুপেতো নৈবাবনিং গচ্ছতি নান্তরীক্ষম্ ।
দিশং ন কাঞ্চিৎ বিদিশং ন কাঞ্চিৎ ক্লেশক্ষয়াৎ কেবলমেতি শান্তিম্ ॥"

—প্রদীপ যেমন নির্বাপিত হইলে ইহা পৃথিবী বা অন্তরীক্ষের কোথায়ও যায় না, দিক্-বিদিক্ কোথায়ও যায় না, স্নেহ বা তৈলজাতীয় পদার্থের ক্ষয় হইলে ইহা চিরশান্তি লাভ করে অর্থাৎ চির-নির্বাপিত হয়, ঠিক তদ্রূপ কৃতী (অর্থাৎ মুমুক্ষু ব্যক্তি) নিবৃতি বা নির্বাণ লাভ করিলে তিনি পৃথিবী বা অন্তরীক্ষের কোথায়ও গমন করেন না, দিক্-বিদিক্ কোথায়ও গমন করেন না, চিত্তক্লেশ ক্ষয় হইলে তিনি পরমা শান্তি লাভ করেন।

নির্বাণ শূন্য কি ? ঃ

নির্বাণ দিক্ দেশের অন্তর্গত নহে বলিয়া একান্তশূন্য নহে। যদি একান্ত শূন্য হয়, দুঃখময় সংসারে নিঃসরণ বা অবসান কখনও হইবার নহে। বুদ্ধ উচ্ছেদবাদকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। সেইজন্য নির্বাণ একান্ত বিনাশ হইতে পারে না। তাহা হইলে সাধনা নিরর্থক হইয়া পড়ে; বৌদ্ধধর্মে সাধনার যে বিরাট ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহার কোন সার্থকতা থাকে না। ভগবান গৌতম বুদ্ধ বহু জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া পুণ্য পারমিতা অর্জন করিয়াছেন এই নির্বাণ-উপলব্ধিকেই লক্ষ্য করিয়া। বর্তমান তাঁহার অন্তিম জন্মেও তিনি ছয় বৎসর ধরিয়া কঠোর তপস্যা করিয়াছেন এবং শরীর ও মনকে নিপীড়িত করিয়াছেন ঐ একই লক্ষ্যকে সম্মুখে রাখিয়া। নির্বাণ যদি একান্তশূন্য হইত তাহা হইলে তাঁহার ঐ কৃচ্ছ্রসাধনের প্রয়োজন ছিল না। বিদ্যুতকে দেখা যায় না, তাহা বলিয়া কেহ বলিতে পারে না যে বিদ্যুৎ নাই। অন্ধ আলো দেখিতে পায় না বলিয়া এই সিদ্ধান্তে আসা ভুল যে আলোর অস্তিত্বই নাই। আমরা ক্ষুৎ-পিপাসাকে দেখিতে পাইনা, তাহা বলিয়া ক্ষুৎ-পিপাসা কি নাই ? আমরা ক্ষুৎ-পিপাসা উপলব্ধি করি বলিয়াই খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করি।

শূন্য শব্দ হইতে দুই প্রকার প্রতীতি জন্মে। ঘট শূন্য বলিতে আমরা যাহা বুঝি, পট শূন্য বলিতে তাহা হইতে অন্য কিছু বোঝায়। প্রথমটির দ্বারা জলাদি আধেয়ের অভাব বুঝা যায়। ঘটের অবিদ্যমানতা নহে।

দ্বিতীয়ে সর্বশূন্যতা বুঝা যায়। নির্বাণ তদ্রূপ সর্বশূন্য নহে। বুদ্ধ বলিয়াছেন—'অত্থি নিব্বুতি, ন নিব্বুতো পুমা।' নিবৃতি (=মুক্তি) চিরদিনই আছে, ছিল ও থাকিবে। কিন্তু নিবৃ'ত (=নির্বাপিত) কোন ব্যক্তি ছিল না, বর্তমানে নাই, ভবিষ্যতেও থাকিবে না। ইহাই নির্বাণের শূন্যতা বা বৌদ্ধধর্মের শূন্যবাদ। অতএব শূন্যতারূপে নির্বাণ নিত্য বিরাজমান। অপরোক্ষানুভূতি ব্যতীত ইহা দুর্জ্ঞেয় দুর্বোধ্য। খাদ্যগ্রহণে ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়, জলপানে তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত ইহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান না জন্মে ততক্ষণ কেহ কাহাকেও বুঝাইতে পারে না। লৌকিক পদার্থের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া এবং তৎ সম্বন্ধে যতপ্রকার প্রশ্নই হউক না কেন, উত্তর কেবল 'নেতি নেতি'—ইহা নহে, ইহা নহে। কিন্তু ইহা যে নাই এমনও নহে।

এক সমুদ্রমৎস্যের সহিত কোন কচ্ছপের বন্ধুত্ব হয়। ঘটনাক্রমে কচ্ছপ একদিন তীরে চলিয়া গেল। ফিরিয়া আসিলে মৎস্য বলিল—'বন্ধু, এতদিন কোথায় ছিলে?' কচ্ছপ বলিল—'তীরে এক উপবনে ছিলাম।' মৎস্য বলিল—'উপবন? এ কেমন পদার্থ, আমি তো জানি না? তথায় জলের গভীরতা কত? যথেচ্ছা সন্তরণ করা যায় কি? উত্তাল তরঙ্গ-লহরী নাচায় কি? কচুরীপানা কেমন জন্মায়? হাঙ্গর কুমীরের উপদ্রব নাই ত?'

মৎস্যের সকল প্রশ্নের উত্তরে কচ্ছপ শুধু বলিল—'না এরূপ নহে।'

তখন মৎস্য বলিয়া উঠিল—'সব মিথ্যা, উপবন নামক কোন পদার্থ থাকিতেই পারে না।' —এই বলিয়া মৎস্য অট্টহাস্য করিতে লাগিল। কচ্ছপ শত চেষ্টা করিয়াও মৎস্যকে উপবনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বুঝাইতে পারিল না

নির্বাণও ঠিক তদ্রূপ। ইহা অবাঙ্মনসগোচর হইলেও অবিদ্যমান নহে। ইহা যত সূক্ষ্মই হউক জড় পদার্থ নহে। যত পরিশুদ্ধই হউক চেতন পদার্থ নহে। ইহা জড়-চেতন উভয়-অবস্থা বিনির্মুক্ত।

নির্বাণের বৈশিষ্ট্য :

নির্বাণ নঞর্থক যেহেতু ইহাতে আছে রাগ-দ্বেষ-মোহের নিরবশেষ ধ্বংস। কিন্তু ইহা সদর্থক যেহেতু ইহা ধ্রুব, শাশ্বত, শুভ এবং সুখময়। লৌকিয় এবং লোকোত্তর সমস্ত ধর্মকে দুইভাগে ভাগ করা হইয়াছে—

সংস্কৃত (=হেতুপ্রভব) এবং অসংস্কৃত (=অহেতুপ্রভব=অকারণসঞ্জাত)। সমস্ত সংস্কৃত ধর্মেরই প্রতিমুহূর্তে উৎপত্তি-স্থিতি-ধ্বংস হইতেছে। কি বস্তু জগত, কি মনোজগত সর্বত্রই এই নীতি চলিতেছে। অনিত্য স্বভাবের জন্য সংস্কৃত ধর্মসমূহ অশুভ, অসুখ, উৎপত্তি-স্থিতি-বিলয়ধর্মী। কিন্তু বুদ্ধ এবং অর্হৎগণের দ্বারা উপলব্ধ নির্বাণ অকারণ-সম্ভূত বলিয়া ইহা উৎপত্তি-স্থিতি ও বিলয়ের অধীন নহে। ইহা অজাত, অনিরোধ, অমৃত। ইহা কার্যও নহে, কারণও নহে। সেইজন্য নির্বাণকে বলা হইয়াছে এক কথায় 'অনুপম'।

নির্বাণকে লৌকিক ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, কারণ ইহা হইতেছে স্বপ্রত্যাত্মবেদনীয় (পালিতে ঃ পচ্চত্তং বেদিতব্বো বিঞ্ঞূহি) এবং প্রত্যেক সিদ্ধ পুরুষ তাঁহার গভীর অন্তরে নির্বাণের উপলব্ধি করিতে পারেন। তবে ইহার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করা যায় বলিয়া বুদ্ধ বলিয়াছেন যে নির্বাণ হইতেছে— অনন্ত (endless), অসংস্কৃত (non-conditioned), অনুত্তর (supreme), পরায়ণ (highest refuge), ত্রাণ (safety), যোগক্ষেম (safety and security), অনালয় (abodeless), অক্ষর (imperishable), বিশুদ্ধ (absolute purity), লোকোত্তর (supra-mundane), অমৃত (immortality), মুক্তি (emancipation), শান্তি (peace) এবং পরমং সুখং (bliss supreme)।

নির্বাণ কোথায় ? ঃ

দশ দিকের কুত্রাপি নির্বাণের অস্তিত্ব নাই, তথাপি নির্বাণ আছে। তেজোধাতুর অস্তিত্ব যেমন কোন স্থানবিশেষে নাই, প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ সম্মিলিত হইলেই, ইহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়, নির্বাণও ঠিক তদ্রূপ। নির্বাণের মধ্যে পৃথিবী, অপ্, তেজঃ ও বায়ু—এই চারি মহাভূতের অস্তিত্ব নাই। পালি দীঘনিকায়ে[৪] বুদ্ধ বলিয়াছেন ঃ

"কত্থ আপো চ পথবী, তেজো বায়ো ন গাধতি।
কত্থ দীঘঞ্চ রস্সঞ্চ, অণুং থূলং সুভাসুভং।
কত্থ নামঞ্চ রূপঞ্চ, অসেসং উপরুজ্ঝতি ?"

তত্র বেয়্যাকরণং ভবতি—

"বিঞ্ঞাণং অনিদস্সনং, অনন্তং সব্বতোপভং।
এত্থ আপো চ পথবী, তেজো বায়ো ন গাধতি।

এত্থ দীঘঞ্চ রস্সঞ্চ, অণুং থূলং সুভাসুভং।
এত্থ নামঞ্চ রূপঞ্চ, অসেসং উপরুজ্ঝতি।
বিঞ্ঞাণস্স নিরোধেন, এত্থেতং উপরুজ্ঝতি॥'

—পৃথিবীধাতু, অপ্‌ধাতু, তেজধাতু, বায়ুধাতু এই চারি মহাভূত কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয় না? কোথায় দীর্ঘ ও হ্রস্ব, অণু ও স্থূল, শুভ ও অশুভ চারি মহাভূতোৎপন্ন রূপ এবং নাম (বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান) কোথায় নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়?

তাহার উত্তর এই—

বিজ্ঞান (অর্থাৎ বিজ্ঞাতব্য নির্বাণ) অনিদর্শন, অনন্ত এবং সর্বতঃপ্রভ—এইখানেই পৃথিবীধাতু, অপ্‌ধাতু, তেজধাতু এবং বায়ুধাতু প্রতিষ্ঠিত হয় না। এইখানেই দীর্ঘ-হ্রস্ব, অণু-স্থূল, শুভাশুভ এবং নামরূপ নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয়। বিজ্ঞানের (অর্থাৎ অর্হতের চরম বিজ্ঞানের) নিরোধ হইলে এই-খানেই এই সমুদয় নিরুদ্ধ হইয়া থাকে।

নির্বাণ কোন স্বর্গ নহে, যেখানে লোকোত্তর আত্মা অবস্থান করে। নির্বাণ হইতেছে 'ধর্মতা' (উপলব্ধি) যাহা মুমুক্ষু সকলের আয়ত্তাধীন। নির্বাণ আমাদের এই সাড়ে তিন হাত (নিজ নিজ হাতের মাপে) কায়ার মধ্যেই উপলব্ধব্য। ইহা কাহারও দ্বারা সৃষ্টও নহে, কেহ ইহাকে সৃষ্টিও করিতে পারে না বিশ্বের যেখানেই যিনি থাকুন না কেন শীল-সমাধি-প্রজ্ঞারূপ অষ্টাঙ্গিক মার্গের সম্যক্ অনুশীলনের দ্বারা সকলেই নির্বাণ উপলব্ধি করিতে পারে।

কে নির্বাণ লাভ করে এই প্রশ্ন অবান্তর। কারণ বুদ্ধের ধর্মে শাশ্বত আত্মা অস্বীকার করা হইয়াছে। পঞ্চস্কন্ধের (নামরূপের) সমষ্টির দ্বারাই জীবন প্রবাহ চলিতে থাকে। শাশ্বত আত্মা অথবা অলীক 'অহং' এর পরিবর্তে সক্রিয় চিত্ত-সন্ততিকে স্বীকার করা হইয়াছে যাহা অবিদ্যা এবং তৃষ্ণার দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া অনন্তকাল ধরিয়া প্রবাহিত হইতেছে। অবিদ্যা এবং তৃষ্ণা চিরতরে প্রশমিত হইলে ব্যক্তি অর্হত্ত্বফল (= নির্বাণ) লাভ করেন। যখন এই অন্তিম শরীরকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান তখন বলা হয় তিনি (অর্হৎ) পরিনির্বাণ লাভ করিয়াছেন। 'অর্হৎ' 'ব্যক্তি' 'তিনি' 'আমি' ইত্যাদি ব্যবহারবচনমাত্র, প্রকৃতপক্ষে ভোক্তা বা নির্বৃত কোন ব্যক্তি নাই। তাই বলা হইয়াছে ঃ

"দুক্খমেব হি, ন কোচি দুক্খিতো।
কারকো ন, কিরিয়া ব বিজ্জতি।
অত্থি নিব্বুতি, ন নিব্বুতো পুমা।
মগ্গমত্থি, গমকো ন বিজ্জতি॥"[৫]

—দুঃখ আছে, দুঃখিত কোন ব্যক্তি নাই। কর্তা নাই, ক্রিয়াই শুধু আছে। নির্বাণ আছে, নির্বৃত কোন ব্যক্তি নাই। মার্গ আছে, পথিক নাই।

বৌদ্ধ 'নির্বাণ' এবং হিন্দু 'মোক্ষে'র মধ্যে পার্থক্য এই যে, বৌদ্ধরা কোন শাশ্বত আত্মা বা সৃষ্টিকর্তা বিশ্বাস করেন না। কিন্তু হিন্দুগণ শাশ্বত আত্মা এবং সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী। অতএব বৌদ্ধধর্ম শাশ্বতবাদও নহে, উচ্ছেদবাদও নহে। স্যর্ এডুইন আর্ণল্ড যথার্থই বলিয়াছেন:[৬]

"If any teach Nirvāṇa is to cease,
Say unto such they lie.
If any teach Nirvāṇa is to live,
Say unto such They err."

অর্থাৎ 'নির্বাণ'কে উচ্ছেদ বলিলেও ভুল বলা হইবে, শাশ্বত বলিলেও ভুল বলা হইবে।

বৌদ্ধধর্মে নির্বাণ-প্রশ্ন খুবই জটিল, কারণ আমরা যতই জল্পনা-কল্পনা বা তর্ক-বিতর্ক করি না কেন নির্বাণের স্বরূপ অবগত হইবে না। নির্বাণকে জানিবার শ্রেষ্ঠ উপায় হইল প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা স্বয়ং উপলব্ধি।

যদিও নির্বাণ পঞ্চেন্দ্রিয়গোচর নহে এবং সাধারণ জনের নিকট ইহা দুর্বোধ্য, তথাপি ভগবান বুদ্ধ নির্বাণোপলব্ধির প্রকৃষ্ট উপায় বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। উপেয় প্রচ্ছন্ন হইলেও উপায় স্বচ্ছ, উপায় সম্যক্ভাবে জ্ঞাত হইলে উপেয় (=নির্বাণ)ও মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় স্বচ্ছ হইবে।

নির্বাণ হইতেছে **অচ্যুতপদ** অর্থাৎ নির্বাণ লাভ করিলে তথা হইতে চ্যুত হইয়া কোথাও পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। অধিকন্তু, চ্যুত হইবার মত কোন অবস্থাও অবশিষ্ট থাকে না। পুনরায় নির্বাণ হইতেছে **অত্যন্তপদ** অর্থাৎ অন্তহীন (=অনন্ত)পদ। নির্বাণ **অসংস্কৃত** অর্থাৎ কার্য্য-কারণ-জাত নহে। নির্বাণ **অনুত্তর পদ** (Highest state)=শান্তিপদ। আচার্য্য অনুরুদ্ধের ভাষায়:

"পদমচ্চুতমচ্চন্তমসংখতমনুত্তরং।
নিব্বানমিতি ভাসন্তি বানমুত্তা মহেসয়ো ॥"[৭]

নির্বাপিতের অবস্থাভেদে এবং সুখপ্রাপ্তির পর্যায় বিশেষে নির্বাণ দুই প্রকার : সোপাদিশেষ নির্বাণ এবং অনুপাদিশেষ নির্বাণ। উপাদি (=উপাদান) বা পঞ্চস্কন্ধময় শরীর বিদ্যমান থাকিতে সমুদয় চিত্তক্লেশ বিধ্বংস করিয়া যাঁহারা অর্হৎ হইয়াছেন তাঁহারা সোপাদিশেষ (স+উপাদি [=উপাদান =পঞ্চ-স্কন্ধ] শেষ [অবশিষ্ট) নির্বাণে নির্বাপিত। ভগবান বুদ্ধ বজ্রাসনে সম্বোধি লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে এই সোপাদিশেষ নির্বাণধাতুতে নিবৃ্ত হন। তাঁহাদের মৃত্যু হইলে পঞ্চস্কন্ধের কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে না। তখনই তাঁহারা অনুপাদিশেষ (=ন+উপাদি+শেষ) নির্বাণে নিবৃ্ত হন। বুদ্ধত্ব-লাভের পঁয়তাল্লিশ বৎসর পরে কুশীনগরে মল্লদের শালবনে বুদ্ধ অনুপাদি-শেষ নির্বাণধাতুতে নিবৃ্ত হইয়া মহাপারিনির্বাণ লাভ করেন। এই অবস্থা অনির্বচনীয়। ইহার বর্ণনা করিতে যাইয়া ভগবান বুদ্ধ একস্থানে বলিয়াছেন :

"বিঞ্ঞাণস্স নিরোধেন তণ্হাক্খয়বিমুত্তিনো।
পজ্জোতস্সেব নিব্বানং বিমোক্খো হোতি চেতসো ॥"

—প্রজ্বলিত অগ্নিস্কন্ধ নির্বাণের মত তৃষ্ণাক্ষয় বিমুক্ত জীবন্মুক্ত যোগীর চরম বিজ্ঞান নিরোধের সহিত চিত্তের বিমোক্ষ হয়। স্বকীয় অনাদি সংসার-প্রবাহের অবসান তখনই হয়। মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের আচার্য্য নাগার্জুনও এই ব্যাখ্যার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন :

"অপ্রতীতম্ অসম্প্রাপ্তম্ অনুচ্ছিন্নম্ অশাশ্বতম্।
অনিরুদ্ধম্ অনুৎপন্নম্ এতন্নির্বাণমুচ্যতে।"[৮]

চরম বিজ্ঞান নিরোধের পর চিত্তসন্ততির যে অবস্থা হয়, তাহা প্রতীতির অতীত। কোন প্রকারে লভ্য নহে। এই অবস্থা কোন শাশ্বত পদার্থের উচ্ছেদও নহে। অথবা ভঙ্গুর অবস্থার শাশ্বতভাবপ্রাপ্তি নহে। ইহার বিনাশ নাই, যেহেতু ইহার উৎপত্তি হয় নাই। এই সকল লক্ষণযুক্ত অবস্থাকে নির্বাণ বলা হয়।

ব্রাহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ ঋষি বাবরির অন্যতম শিষ্য উপসীব গুরুর নির্দেশিত পন্থায় আকিঞ্চনায়তন অরূপ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন। এই অরূপ ব্রহ্মলোকের আয়ু অতি দীর্ঘ। তিনি দেখিলেন এই অবস্থায় যদিও ষাট হাজার

কল্পকাল জরা-ব্যাধির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, তথাপি আয়ুক্ষয় হইলে পুনঃ জন্ম-জরার অধীন হইতে হইবে। আপাতদৃষ্টিতে এই ব্রাহ্ম-সাযুজ্য যদিও সুদীর্ঘ উপশান্তির কারক, তথাপি অনন্তকালের পক্ষে ইহা নিতান্তই স্বল্প, কয়েকক্ষণমাত্র। কাজেই ইহা জীবনের চরম লক্ষ্য হইতে পারে না। ইহা চিন্তা করিয়া উপসীব অনন্তকালের শান্তি কামনা করিয়া বুদ্ধকে কহিলেন—

"হে শক্র, আমি একাকী সহায়হীন হইয়া এই ভবস্রোত অতিক্রম করিতে অসমর্থ। হে সর্বদর্শী, যে আলম্বনের সাহায্যে আমি এই ভবস্রোত অতিক্রম করিতে পারি তাহার উপায় বলুন।"

বুদ্ধ কহিলেন ঃ

"হে উপসীব, শূন্যতায় বদ্ধ দৃষ্টি-ও জাগ্রত চিত্ত হইয়া নাস্তিত্বের চিন্তা করিয়া তুমি ভবস্রোত উত্তীর্ণ হইবে। ইন্দ্রিয়সুখ পরিহার করিয়া সংশয় মুক্ত হইয়া অহোরাত্র তৃষ্ণাক্ষয়ের চিন্তা করিবে।"

উপসীব কহিলেন ঃ

"হে সমন্তচক্ষু (সর্বদর্শী), যিনি ভবস্রোত উত্তীর্ণ হইয়া শান্ত ও বিমুক্ত হন, তাদৃশ ব্যক্তির কি বিজ্ঞানের অস্তিত্ব থাকিবে?"

ভগবান কহিলেন ঃ[৯]

"অচ্চি যথা বাতবেগেন খিত্তো,
অত্থং পলেতি ন উপেতি সংখং।
এবং মুনী নামকায়া বিমুত্তো
অত্থং পলেতি ন উপেতি সংখং॥"

—হে উপসীব, বায়ুবেগে ক্ষিপ্ত অগ্নিশিখা যেরূপ অদৃশ্য হইয়া যায়, তাহার অস্তিত্ব থাকে না, সেইরূপ নাম-কায়বিমুক্ত (ক্ষীণাস্রব অর্হৎ) মুনি অদৃশ্য হইয়া যান, তাঁহার অস্তিত্ব থাকে না (দিগ্‌দেশ ও কালাদি দ্বারা পরিমাণ করিবার যোগ্য তাঁহার কোন অবস্থা থাকে না।)

ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া উপসীব আবার ভগবানকে প্রশ্ন করিলেন ঃ

"অত্থংগতো সো উদবা সো নত্থি
উদাহু বে সস্সতিয়া অরোগো,
তং মে মুনি সাধু বিয়াকরোহি
তথা হি তে বিদিতো এস ধম্মো।"[১০]

—হে মুনি, যিনি অস্তগত হইয়াছেন, তিনি কি নাই ? অথবা তিনি চিরকালের মত জরা-ব্যাধি-মৃত্যুহীন ? ইহা আমাকে প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করুন। কারণ এই সকল গভীর তত্ত্ব আপনারই সুবিদিত।

ভগবান কহিলেন ঃ

"অত্থংগতস্স ন পমাণমত্থি
যেন নং বজ্জু তং তস্স নত্থি।
সব্বেসু ধম্মেসু সমূহতেসু
সমূহতা বাদপথা পি সব্বে," তি ॥[১১]

—(হে উপসীব) যিনি অস্তগত হইয়াছেন তিনি অসংজ্ঞেয় (তাঁহাকে পরিমাপ করিবার কোন উপায় নাই)। যাহা দ্বারা তাঁহার অস্তিত্ব কল্পিত হইয়াছিল তাহা আর তাঁহার নাই (যে সমস্ত নামগোত্র, গুণদোষ অথবা জড়-চেতনরূপ অভিধেয় দ্বারা তাঁহাকে অভিহিত করা হইত, সে সকল কারণ তাঁহার আর বিদ্যমান নাই)। যখন সর্বধর্ম সমূহত হয়, তখন সকল বাদপথ বা বিতর্কের অবসান হয়। অর্থাৎ অনুপাদিশেষ পরিনির্বাণে যোগীর যে অনির্বচনীয় অবস্থা হয়, তাহাকে আর কোন লক্ষণ দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। সাধারণতঃ কোন অবস্থাবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া আমরা অস্তিত্ব না নাস্তিত্ব, দেবত্ব বা নরত্ব আরোপ করিয়া থাকি। যাঁহারা সেই অবস্থাকে অতিক্রম করিয়াছেন তাঁহারা সর্বথা অনির্বচনীয়, তাঁহাদের সেই অবস্থা অবাঙ্মনসগোচর।'[১২]

মিলিন্দপ্রশ্নে রাজা মিলিন্দ ও ভদন্ত নাগসেনের মধ্যে নির্বাণ-বিষয়ক যে আলোচনা হইয়াছে তাহা হইতে নির্বাণ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যাইতে পারে। তাই এখানে আমরা তাহা উপস্থাপিত করিতেছি ঃ[১৩]

নির্বাণের স্বরূপ

"ভন্তে নাগসেন ! 'নির্বাণ নির্বাণ' বলিয়া যাহা বলিতেছেন, সেই নির্বাণের স্বরূপ, আকার, বয়স ও প্রমাণ যুক্তি, উপমা, হেতু ও প্রণালী দ্বারা প্রদর্শন করিতে পারা যায় কি ?"

"মহারাজ ! নির্বাণ অসদৃশ। নির্বাণের স্বরূপ আকার, বয়স ও পরিমাণ উপমা যুক্তি ও প্রণালী দ্বারা প্রদর্শন করা যায় না।"

"ভন্তে! বিদ্যমান স্বভাব নির্বাণের যে স্বরূপ, আকার বয়স ও পরিমাণ যুক্তি, উপমা, হেতু ও প্রণালী দ্বারা প্রকাশ হয় না, ইহা আমি বিশ্বাস করি না। আপনি যুক্তি দিয়া তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিন।"

"মহারাজ! তথাস্তু, কারণসহ বুঝাইয়া দিব। মহাসমুদ্র আছে কি?"

"হাঁ ভন্তে! মহাসমুদ্র আছে।"

"মহারাজ! যদি কেহ আপনাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করে, 'মহারাজ! মহাসমুদ্রে জল কি পরিমাণ? কত সংখ্যক জীব তথায় বাস করে?' এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া আপনি তাহাকে কি উত্তর দিবেন?"

"ভন্তে! যদি আমাকে কেহ এইরূপ জিজ্ঞাসা করে, 'মহারাজ! মহাসমুদ্রে জল কি পরিমাণ? এবং তাহাতে কত সংখ্যক জীব বাস করে?' ভন্তে! আমি তাহাকে এইরূপ বলিতে পারি, 'মহাশয়! আপনি আমাকে অবান্তর বিষয় প্রশ্ন করিয়াছেন। এইরূপ প্রশ্ন কাহারো পক্ষে করা অনুচিত। এই প্রশ্ন স্থগিতের যোগ্য। লোকতত্ত্ববাদীদের দ্বারা মহাসমুদ্র বিভাজিত হয় নাই। মহাসমুদ্রের জলের পরিমাণ করা কিংবা তথায় যে সকল জীব বাস করে তাহাদের সংখ্যা গণনা করা সম্ভব নহে।' ভন্তে! আমি তাহাকে এই প্রত্যুত্তর দিতে পারি।"

"মহারাজ! আপনি বিদ্যমান বস্তু মহাসমুদ্র সম্বন্ধে এইরূপ প্রত্যুত্তর দিতে যাইবেন কেন? উহা গণনা-করিয়া তাহাকে বলা উচিত নহে কি যে, মহাসমুদ্রে এই পরিমাণ জল এবং এত সংখ্যক জীব বাস করে।"

"ভন্তে! সম্ভব নহে। এই প্রশ্ন উত্তরের বিষয় নহে।"

"মহারাজ! যেমন বিদ্যমান বস্তু মহাসমুদ্রে জলের পরিমাণ কিংবা উহাতে যে সকল জীব উপস্থিত আছে, তাহাদের পরিমাণ করা সম্ভব নহে, সেইরূপ বিদ্যমান নির্বাণের স্বরূপ, আকার, বয়স কিংবা পরিমাণ উপমা, কারণ, হেতু ও যুক্তি দ্বারা প্রদর্শন করা সম্ভব নহে। মহারাজ! বশীভূতচিত্ত ঋদ্ধিমানগণ মহাসমুদ্রের জলরাশি এবং তদাশ্রিত জীবগণকে গণনা করিতে পারেন। তথাপি সেই বশীভূতচিত্ত ঋদ্ধিমানগণ নির্বাণের স্বরূপ, আকার, বয়স কিংবা পরিমাণ উপমা, কারণ, হেতু ও যুক্তি দ্বারা প্রদর্শন করিতে পারিবেন না।

মহারাজ! তৎপর অপর কারণও শুনুন। বিদ্যমান স্বভাব নির্বাণের স্বরূপ, আকার, বয়স, কিংবা পরিমাণ উপমা, কারণ, হেতু ও যুক্তি দ্বারা

প্রদর্শন করিতে পারা যায় না। মহারাজ! দেবতাদের মধ্যে (অরূপদেহী) নিরাকার দেবতা আছেন কি ?"

"হাঁ ভন্তে! দেবতাদের মধ্যে নিরাকার দেবতা আছেন, শোনা যায়।"

"মহারাজ! সেই নিরাকার দেবতাদের স্বরূপ, আকার, বয়স কিংবা পরিমাণ উপমা, কারণ, হেতু ও যুক্তি দ্বারা প্রদর্শন করিতে পারা যায় কি ?"

"না ভন্তে।"

"মহারাজ! তাহা হইলে কি নিরাকার দেবতা নাই ?"

"ভন্তে! নিরাকার দেবতারা আছেন। অথচ তাহাদের স্বরূপ বয়স কিংবা পরিমাণ, উপমা, কারণ, হেতু ও যুক্তি দ্বারা প্রদর্শন করা যায় না।"

"মহারাজ! যেমন বিদ্যমান সত্ত্ব নিরাকার দেবতাদের স্বরূপ আকার, বয়স কিংবা পরিমাণ, উপমা, কারণ, হেতু ও যুক্তি দ্বারা প্রদর্শন করা চলে না, সেইরূপ বিদ্যমান স্বভাব নির্বাণের স্বরূপ, আকার, বয়স কিংবা পরিমাণ উপমা, কারণ, হেতু ও যুক্তি দ্বারা প্রদর্শন করা চলে না।"

"ভন্তে! পরম সুখ নির্বাণ এখন থাক, আর উহার স্বরূপ, আকার, বয়স কিংবা পরিমাণ উপমা, কারণ, হেতু ও যুক্তি দ্বারা প্রদর্শন করা যায় না—তাহাই হউক। কিন্তু অন্যের এমন কোন্ গুণ আছে যাহা নির্বাণে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। উহার কিছুমাত্র উপমা প্রদর্শন করা যায় কি ?"

"মহারাজ! প্রকৃতপক্ষে নাই। অথচ গুণ হিসাবে কিছু উপমা দেওয়া চলে।"

"সাধু, ভন্তে! আমি যে প্রকারে গুণ হিসাবে নির্বাণের একাংশের মাত্র ধারণা গঠন ও প্রকাশ করিতে পারি, তাহা শীঘ্রই বলুন ; আপনার বিনয়-শীতল মধুরবাণী-মারুতের দ্বারা আমার হৃদয়ের প্রদাহ নির্বাপিত করুন।"

"মহারাজ! পদ্মের একগুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট আছে। জলের দুইগুণ, ঔষধের তিনগুণ, মহাসমুদ্রের চারিগুণ, ভোজনের পাঁচগুণ, আকাশের দশগুণ, মণিরত্নের তিনগুণ, রক্তচন্দনের তিনগুণ, সর্পিঃমণ্ডের তিনগুণ এবং গিরিশিখরের পাঁচগুণ নির্বাণে অনুপ্রবিষ্ট আছে।"

"ভন্তে! 'পদ্মের এক গুণ নির্বাণে অনুপ্রবিষ্ট' যাহা বলিতেছেন, পদ্মের কোন গুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট ?"

"মহারাজ! পদ্ম যেমন জল দ্বারা লিপ্ত হয় না। সেই রূপ নির্বাণ সর্ববিধ কলুষে নির্লিপ্ত থাকে। পদ্মের এই এক গুণ নির্বাণে অনুপ্রবিষ্ট আছে।"

"ভন্তে। 'জলের দুই গুণ নির্বাণে অনুপ্রবিষ্ট' বলিয়া যাহা বলিতেছেন, নির্বাণে প্রবিষ্ট জলের সেই দুই গুণ কি ?"

"মহারাজ! জল যেমন শীতল, দাহশান্তিকারক, সেইরূপ নির্বাণ শীতল এবং সর্ববিধ ক্লেশদাহ উপশমকারক। জলের এই প্রথম গুণ নির্বাণে অনুপ্রবিষ্ট আছে। পুনরায় জল যেমন ক্লান্ত, তৃষিত, পিপাসিত ও ঘর্মাক্ত মানুষ ও পশু-পক্ষীদের পিপাসা বিনোদন করে, সেইরূপ নির্বাণ কাম-তৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা ও বিভব তৃষ্ণার পিপাসা দমন করে। জলের এই দ্বিতীয় গুণ নির্বাণে অনুপ্রবেশ করিয়াছে। মহারাজ! জলের এই দুই গুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট আছে।"

"ভন্তে! 'ঔষধের যেই তিন গুণ নির্বাণে অনুপ্রবিষ্ট' বলিয়া যাহা বলিতেছেন, নির্বাণে প্রবিষ্ট ঔষধের সেই তিন গুণ কি ?"

"মহারাজ! ঔষধ যেমন বিষ-প্রপীড়িত প্রাণীদের আরোগ্য লাভের আশ্রয় হয়, সেইরূপ নির্বাণ ক্লেশ-বিষ-প্রপীড়িত প্রাণীদের আশ্রয়স্থল। ঔষধের এই প্রথম গুণ নির্বাণে অনুপ্রবিষ্ট।—পুনরায় ঔষধ রোগসমূহের অন্তকারক, সেইরূপ নির্বাণ সর্বদুঃখের অন্তকারক। ঔষধের এই দ্বিতীয় গুণ নির্বাণে অনুপ্রবিষ্ট।—পুনরায় ঔষধ অমৃত, সেইরূপ নির্বাণও অমৃতস্বরূপ। ঔষধের এই তৃতীয় গুণ নির্বাণে অনুপ্রবিষ্ট। মহারাজ! ঔষধের এই তিন গুণ নির্বাণে প্রবেশ করিয়াছে।"

"ভন্তে! 'মহাসমুদ্রের চারি গুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট' বলিয়া যাহা বলিতেছেন, নির্বাণে প্রবিষ্ট মহাসমুদ্রের চারি গুণ কি ?"

"মহারাজ! মহাসমুদ্র যেমন সর্ববিধ পচা (শব) শূন্য, সেইরূপ নির্বাণ সর্ববিধ কলুষ শূন্য।—মহাসমুদ্রের এই প্রথম গুণ নির্বাণে অনুপ্রবিষ্ট। পুনরায় মহাসমুদ্র মহৎ ও ওর-পার বা সীমা-সংখ্যাহীন। সেইরূপ নির্বাণ মহৎ ও সীমা সংখ্যাহীন। মহাসমুদ্রের এই দ্বিতীয় গুণ নির্বাণে অনুপ্রবিষ্ট। পুনরায় মহাসমুদ্র বড় বড় প্রাণিগণের আবাসস্থল। সেইরূপ নির্বাণ মহৎ অর্হৎ, বিমল ক্ষীণাস্রব, বলপ্রাপ্ত, বশীভূত মহাসত্ত্বদের আবাসস্থল। মহাসমুদ্রের এই তৃতীয় গুণ নির্বাণে অনুপ্রবিষ্ট। পুনরায় মহাসমুদ্র অপরিমিত বিবিধ বীচি-কুসুম-কুসুমিত ; সেইরূপ নির্বাণ অপরিমিত বিবিধ-বিপুল বিদ্যা ও বিমুক্তি কুসুম-কুসুমিত। মহারাজ! মহাসমুদ্রের এই চারি গুণ নির্বাণে প্রবেশ করিয়াছে।"

"ভন্তে! 'ভোজনের পাঁচ গুণ নির্বাণে অনুপ্রবিষ্ট' বলিয়া যাহা বলিতেছেন, নির্বাণে অনুপ্রবিষ্ট ভোজনের সেই পাঁচ গুণ কি?"

"মহারাজ! ভোজন যেমন সকল প্রাণীর জীবন-রক্ষক ও আয়ু-বর্ধক, সেইরূপ সাক্ষাৎকৃত নির্বাণ সাধকের জরা-মরণ নাশের দরুণ আয়ুবর্ধন করে।—ভোজনের এই প্রথম গুণ নির্বাণে অনুপ্রবিষ্ট।—পুনরায় ভোজন সর্বসত্ত্বের বলবর্ধক। সেইরূপ প্রত্যক্ষকৃত নির্বাণ সর্বসত্ত্বের ঋদ্ধি-বল বর্ধক। ভোজনের এই দ্বিতীয় গুণ নির্বাণে অনুপ্রবিষ্ট।—পুনরায় ভোজন সকল জীবের সৌন্দর্য বর্ধক। সেইরূপ সাক্ষাৎকৃত নির্বাণ সকল জীবের গুণ-সৌন্দর্য বর্ধক।—ভোজনের এই তৃতীয় গুণ নির্বাণে অনুপ্রবিষ্ট। পুনরায় ভোজন সকল প্রাণীর ক্ষুধার জ্বালা শান্ত করে, সেইরূপ সাক্ষাৎকৃত নির্বাণ সকল প্রাণীর সর্ববিধ ক্লেশ-যন্ত্রণার উপশম করে।—ভোজনের এই চতুর্থ গুণ নির্বাণে প্রবেশ করিয়াছে। পুনরায় ভোজন সর্বসত্ত্বের ক্ষুধা-দুর্বলতা বিনোদন করে, সেইরূপ সাক্ষাৎকৃত নির্বাণ সর্বসত্ত্বের যাবতীয় দুঃখ-রূপ ক্ষুধার দুর্বলতা অপনোদন করে। ভোজনের এই পঞ্চম গুণ নির্বাণে প্রবেশ করিয়াছে। মহারাজ! ভোজনের এই পাঁচ গুণ নির্বাণে অনুপ্রবিষ্ট আছে।"

"ভন্তে! 'আকাশের দশবিধ গুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট' বলিয়া যাহা বলিতেছেন, নির্বাণে প্রবিষ্ট আকাশের সেই দশ গুণ কি?"

"মহারাজ! আকাশ জন্মে না, জীর্ণ হয় না, মরে না, চ্যুত হয় না, উৎপন্ন হয় না, কেহ লুণ্ঠন করিতে পারে না, কেহ চুরি করিতে পারে না, অনাশ্রিত, অবাধ, বিহগ গমনের অনুকূল, আবরণহীন ও অনন্ত।—সেইরূপ নির্বাণ জন্মে না, জীর্ণ হয় না, মরে না, চ্যুত হয় না, উৎপন্ন হয় না, কেহ লুণ্ঠন করিতে পারে না, চোর হরণ করিতে পারে না, অনাশ্রিত, আর্যদের গমনযোগ্য, নিরাবরণ ও অনন্ত। মহারাজ! আকাশের এই দশ গুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট আছে।"

"ভন্তে! 'মণিরত্নের ত্রিবিধ গুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট' বলিয়া যাহা বলিতেছেন, নির্বাণে প্রবিষ্ট মণিরত্নের সেই তিন গুণ কি?"

"মহারাজ! মণিরত্ন যেমন কাম্য বস্তু দান করে, সেইরূপ নির্বাণ কাম্য বস্তু প্রদান করে। মণিরত্নের এই প্রথম গুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট।—পুনরায় মণিরত্ন আনন্দবর্ধক, সেইরূপ নির্বাণ আনন্দবর্ধক। মণিরত্নের এই দ্বিতীয়

গুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট। পুনরায় মণিরত্ন জ্যোতি বিকিরণ করে, সেইরূপ, নির্বাণ জ্যোতি প্রকাশ করে। মণিরত্নের এই তৃতীয় গুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট আছে। মহারাজ! মণিরত্নের এই তিন গুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট হইয়াছে।"

"ভন্তে! 'রক্তচন্দনের তিন গুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট' বলিয়া যাহা বলিতেছেন, নির্বাণে প্রবিষ্ট রক্তচন্দনের সেই তিন গুণ কি?"

"মহারাজ! রক্তচন্দন যেমন দুর্লভ, সেইরূপ নির্বাণও দুর্লভ। রক্তচন্দনের এই প্রথম গুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট হইয়াছে। পুনরায় রক্তচন্দন অসম সুগন্ধ, সেইরূপ নির্বাণ অসম সুগন্ধ। রক্তচন্দনের এই দ্বিতীয় গুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট হইয়াছে। পুনরায় রক্তচন্দন সজ্জন-প্রশংসিত। সেইরূপ নির্বাণ আর্যজনের প্রশংসিত। রক্তচন্দনের এই তৃতীয় গুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট হইয়াছে। মহারাজ! রক্তচন্দনের এই তিন গুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট আছে।"

"ভন্তে! 'সর্পিঃমণ্ডের তিন গুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট' বলিয়া যাহা বলিতেছেন, নির্বাণে প্রবিষ্ট সেই তিন গুণ কি?"

"ভন্তে। 'সর্পিঃমণ্ড বর্ণসম্পন্ন, সেইরূপ নির্বাণ গুণবর্ণসম্পন্ন। সর্পিঃমণ্ডের এই প্রথম গুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট। পুনরায় সর্পিঃমণ্ড গন্ধসম্পন্ন, সেইরূপ নির্বাণ শীল-গন্ধসম্পন্ন। সর্পিঃমণ্ডের এই দ্বিতীয় গুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট। পুনরায় সর্পিঃমণ্ড রসসম্পন্ন, সেইরূপ নির্বাণ অমৃতরসসম্পন্ন। সর্পিঃমণ্ডের এই তৃতীয় গুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট। মহারাজ! সর্পিঃমণ্ডের এই তিন গুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট রহিয়াছে।"

"ভন্তে! 'গিরিশিখরের পাঁচ গুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট' বলিয়া যাহা বলিতেছেন, নির্বাণে প্রবিষ্ট গিরিশিখরের সেই পাঁচ গুণ কি?"

"মহারাজ! গিরিশিখর যেমন অতি উচ্চ, সেইরূপ নির্বাণও অতি উচ্চ। গিরিশিখরের এই প্রথম গুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট। পুনরায় গিরিশিখর অচল, সেইরূপ নির্বাণ অচল। গিরিশিখরের এই দ্বিতীয় গুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট। পুনরায় গিরিশিখর দুরারোহ, সেইরূপ নির্বাণ দুরারোহ। গিরিশিখরের এই তৃতীয় গুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট। পুনরায় গিরিশিখর সর্ববিধ বীজের অনুৎপত্তিস্থান, সেইরূপ নির্বাণ সর্ববিধ ক্লেশের অনুৎপত্তিস্থান। গিরিশিখরের এই চতুর্থ গুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট। পুনরায় গিরিশিখরের যেমন কাহারও প্রতি অনুরাগও নাই, বিদ্বেষও নাই সেইরূপ নির্বাণ অনুরাগ-বিরাগমুক্ত।

গিরিশিখরের এই পঞ্চম গুণ নির্বাণে প্রবিষ্ট আছে। মহারাজ! গিরিশিখরের এই পাঁচ গুণ নির্বাণে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে।"

"সাধু, ভন্তে! ইহা আপনার দ্বারা সুভাষিত হিসাবে স্বীকার করি।"

নির্বাণ সাক্ষাৎকার ঃ

"ভন্তে নাগসেন! আপনারা বলেন 'নির্বাণ অতীত নহে, ভবিষ্যৎ নহে, বর্তমান নহে, উৎপন্ন নহে, অনুৎপন্ন নহে, এবং উৎপাদনীয় নহে।' ভন্তে! জগতে উত্তমরূপে সুনিয়োজিত যে কোন লোক যদি নির্বাণ সাক্ষাৎ করে, সে উৎপন্ন (নির্বাণ) সাক্ষাৎ করে অথবা উৎপাদন করিয়া সাক্ষাৎ করে?"

"মহারাজ! উত্তমরূপে নিয়োজিত যে কোন লোক নির্বাণ সাক্ষাৎ করে; সে উৎপন্ন সাক্ষাৎ করে না, উৎপাদন করিয়া সাক্ষাৎ করে না, অথচ মহারাজ! এই নির্বাণে ধাতু আছে যাহাকে সে উত্তমরূপে নিয়োজিত হইয়া সাক্ষাৎ করে।"

"ভন্তে! প্রশ্ন প্রতিচ্ছন্ন করিয়া উত্তর দিবেন না। উন্মুক্ত ও প্রকটিত করিয়া প্রকাশ করুন। আমার জানিবার ইচ্ছা ও উৎসাহ জাগ্রত হইয়াছে। আপনি যাহা শিক্ষা করিয়াছেন, তাহা এখানেই সম্পূর্ণ আকীর্ণ করুন। এই বিষয়ে জনগণ মোহাচ্ছন্ন, বিমতিগ্রস্ত ও সংশয়াপন্ন রহিয়াছে। ইহা বিদীর্ণ করুন। দ্বেষশল্যের অবসান হউক।"

"মহারাজ! সেই শান্ত, সুখময় ও উত্তম নির্বাণধাতু আছে। তাহা সম্যক্ নিয়োজিত যোগী বুদ্ধের উপদেশ অনুসারে সংস্কার ধর্মপুঞ্জকে পুনঃপুনঃ চিন্তা করিয়া প্রজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎ করেন। মহারাজ! অন্তেবাসী যেমন আচার্যের উপদেশ অনুসারে প্রজ্ঞা দ্বারা শিল্পবিদ্যা আয়ত্ত করে, সেইরূপ সম্যক নিয়োজিত যোগী বুদ্ধের উপদেশ অনুসারে প্রজ্ঞা দ্বারা নির্বাণ সাক্ষাৎ করেন।

সেই নির্বাণকে কি প্রকার দেখা উচিত? নির্বিঘ্ন, নিরুপদ্রব, নির্ভয়, ক্ষেম, শান্ত, সুখ, স্বাদ, উত্তম, শুচি ও শীতল হিসাবে দেখা উচিত।

মহারাজ! কোন লোক যেমন বহু কাষ্ঠ-সমন্বিত, প্রজ্বলিত, অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় স্বীয় উদ্যমের দ্বারা তাহা হইতে মুক্ত হয় এবং অগ্নিহীন স্থানে উপনীত হইয়া পরম সুখলাভ করে, সেইরূপ যিনি সম্যক নিয়োজিত, তিনি

জ্ঞানযুক্ত মনোনিবেশ দ্বারা ত্রিবিধ অগ্নি সন্তাপ নির্বাপিত করিয়া পরম সুখ নির্বাণ সাক্ষাৎ করেন। মহারাজ! এখানে অগ্নির ন্যায় ত্রিবিধ (রাগ-দ্বেষ-মোহ) অগ্নিকে দেখা উচিত। অগ্নিগত লোকের ন্যায় সম্যক্ নিয়োজিত যোগীকে দেখিতে হইবে। আর অগ্নিহীন স্থানের ন্যায় নির্বাণকে দেখিতে হইবে।

মহারাজ! যেমন মৃত সর্প, কুকুর ও মানুষের শব বা অংশ দ্বারা পূর্ণ কোন গর্ত আছে, যাহা হইতে কুৎসিত গন্ধ বাহির হয়। সেই পচা শবের মধ্যে পতিত কোন জীবন্ত মানুষ যদি হস্তপদ সঞ্চালন করিয়া অনেক প্রচেষ্টায় বাহিরে চলিয়া আসে, তবে তখন তাহার অতি সুখ লাভ হয়। সেইরূপ কেহ সম্যক্‌রূপে নিয়োজিত হইয়া মনকে ধ্যেয় বিষয়ে সংলগ্ন রাখিয়া কলুষরূপ শবাগার হইতে বাহিরে আসে, তাহা হইলে সে পরম সুখ নির্বাণের সাক্ষাৎকার করিয়া থাকে। মহারাজ! পঞ্চ কামবিষয়কে শবরাশির ন্যায় জানিতে হইবে। পচা শবের মধ্যে পতিত লোকের ন্যায় সম্যক্‌রূপে নিয়োজিত যোগীকে জানিতে হইবে। পচাহীন অবকাশের ন্যায় নির্বাণকে বুঝিতে হইবে।

মহারাজ! যেমন ভীত, সন্ত্রস্ত, কম্পিত, বিপন্ন, বিভ্রান্তচিত্ত কোন ব্যক্তি স্বীয় উদ্যোগের দ্বারা তথা হইতে মুক্ত হয় এবং দৃঢ়-স্থির অচল ও ভয়হীন স্থানে প্রবেশ করিয়া তথায় পরম সুখ লাভ করে, সেইরূপ যিনি সম্যক্‌রূপে নিয়োজিত, তিনি জ্ঞানযুক্ত মনোনিবেশ দ্বারা সেই ভয়-সন্ত্রাস-মুক্ত পরম সুখ নির্বাণ সাক্ষাৎ করেন। মহারাজ! জন্ম-জরা-ব্যাধি-মরণ-সঙ্কুল সংসার ভ্রমণ ভয়স্বরূপ জানিতে হইবে। ভীত ব্যক্তির ন্যায় সম্যক্‌রূপে নিয়োজিত যোগীকে জানিতে হইবে। নির্ভয় স্থানের ন্যায় নির্বাণকে বুঝিতে হইবে।

মহারাজ! যেমন ময়লা দুর্গন্ধ কলল-কর্দম পূর্ণ স্থানে কোন ব্যক্তি পতিত হয়। সে নিজের প্রচেষ্টায় সেই কলল-কর্দম অপসারণপূর্বক নির্মল ও পরিশুদ্ধ স্থানে গমন করিয়া পরম সুখ লাভ করে, সেইরূপ যিনি সম্যক্‌রূপে নিয়োজিত, তিনি জ্ঞানযুক্ত মনোনিবেশ দ্বারা ক্লেশ-মল-কর্দম অপসারিত করিয়া পরম সুখ নির্বাণ সাক্ষাৎ করেন। মহারাজ! লাভ-সৎকার-সম্মানকে

কললের ন্যায় জানিতে হইবে। কললে পতিত ব্যক্তির ন্যায় সৎপথে নিয়োজিত যোগীকে জানিতে হইবে। আর নির্মল পরিশুদ্ধ স্থানের ন্যায় নির্বাণকে বুঝিতে হইবে।

সম্যক্ নিয়োজিত যোগী সেই নির্বাণ কিরূপে সাক্ষাৎ করেন?

মহারাজ! যিনি সম্যক্ নিবিষ্ট যোগী, তিনি সংসারের সংস্কারসমূহের প্রবর্তন (অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম রূপে) সম্মর্ষণ বা সমীক্ষণ করেন। পুনঃ-পুনঃ সমীক্ষণ করিবার সময় উহাদিগকে উৎপন্ন হইতে দেখেন, জীর্ণ হইতে দেখেন, ব্যাধিগ্রস্ত হইতে দেখেন, মৃত হইতে দেখেন, উহাদের আদি, মধ্য ও অন্তভাগে কিছুমাত্র সুখ ও আনন্দকর দেখেন না। তিনি তাহাতে গ্রহণযোগ্য কিছু দেখিতে পান না।

মহারাজ! যেমন কোম ব্যক্তি সারা দিন সন্তপ্ত, জ্বলন্ত, কঠিন লৌহ-গোলকের আদিতে, মধ্যভাগে ও অন্ত অবস্থায় কিছুমাত্র গ্রহণযোগ্য স্থান দেখিতে পায় না, সেইরূপ যিনি সংসারের সংস্কারসমূহের প্রবর্তন চিন্তা করেন, তিনি তখন উহাদের উৎপন্ন হইতে দেখেন, জীর্ণ হইতে দেখেন, ব্যধিগ্রস্ত হইতে দেখেন এবং মৃত্যু হইতে দেখেন। ইহার আদিভাগে, মধ্যভাগে ও শেষভাগে কোথাও সুখ বা আনন্দজনক কিছুমাত্র দেখেন না। তিনি তথায় গ্রহণযোগ্য কিছু দেখিতে পান না। গ্রহণযোগ্য কিছু না দেখার দরুণ তাঁহার হৃদয়ে অরতি এবং শরীরে এক প্রকার দাহ উৎপন্ন হয়। তিনি নিজেকে একান্ত অসহায় ও অশরণ মনে করেন, আর সংসার ভ্রমণের প্রতি উদ্বিগ্ন হন।

মহারাজ! যেমন কোন লোক যদি প্রজ্বলিত বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করে, তবে সে তথায় ত্রাণহীন, অশরণ ও নিরাশ্রয় হইয়া অগ্নির প্রতি উদ্বিগ্ন হয়, সেইরূপ তথায় গ্রহণযোগ্য কিছু না দেখার দরুণ তাহার চিত্তে অরতি উপস্থিত হয় এবং শরীরে দাহ উৎপন্ন হয়। সে ত্রাণহীন, অশরণ ও নিরাশ্রয় হইয়া সংসার ভ্রমণের প্রতি উদ্বিগ্ন হয়।

সংসার ভ্রমণে ভয়দর্শী ব্যক্তির এইরূপ চিত্ত উৎপন্ন হয়ঃ হায়। এই সংসার প্রবৃত্তি প্রদীপ্ত, প্রজ্বলিত, বহু দুঃখ এবং ভয়ঙ্কর অশান্তি দায়ক। যদি কেহ সর্ব সংস্কারের উপশম, সর্ববিধ উপাধি পরিত্যক্ত, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ ও নির্বাণরূপ নির্বৃতি লাভ করিতে পারে, তবে উহা শান্ত, উহা উত্তম

এই প্রকারে তাহার নির্বৃতির প্রতি অভিনিষ্ট হয়, প্রসন্ন হয়, হর্ষান্বিত হয় এবং সে সন্তোষ প্রকাশ করেঃ "অহো! আমার নিঃসরণ লাভ হইয়াছে।"

মহারাজ! যেমন কোন উন্মার্গে প্রস্থানকারী নিমজ্জিত মানুষ উদ্ধারের উপায় দেখিয়া তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয়, প্রসন্ন হয়, হর্ষান্বিত হয়, সন্তুষ্ট হয়, আর বলিয়া ওঠেঃ "অহো! আমার উদ্ধারের উপায় লাভ হইয়াছে," মহারাজ! সেইরূপ সংসার প্রবর্তনে কেবল ভয়দর্শীর চিত্ত নিবর্তনের দিকে ধাবিত হয়, প্রসন্ন হয়, হর্ষান্বিত হয়, সন্তুষ্ট হয়, আর বলেঃ "অহো! আমার নিঃসরণ লাভ হইয়াছে।" তখন তিনি নির্বাণ লাভের নিমিত্ত মার্গের অনুসন্ধান করেন, গবেষণা করেন, মনোনিবেশ করেন, ভাবনা করেন, বলবৃদ্ধি করেন। তজ্জন্য তাঁহার স্মৃতি স্থির হয়, উদ্যম স্থির হয়, প্রীতি স্থির হয়। তখন তাঁহার চিত্ত পূর্বাপর মনোনিবেশ করার ফলে সংসার ভ্রমণ অতিক্রম করিয়া নির্বাণের দিকে অগ্রসর হয়। মহারাজ! যিনি সংসার ভ্রমণ রোধ করিয়াছেন, সেই সম্যক্ নিয়োজিত যোগীই নির্বাণ সাক্ষাৎ করেন ইহা বলা হয়।"

"সাধু, ভন্তে! এইরূপে ইহা স্বীকার করি।"

নির্বাণের অবস্থান

"ভন্তে নাগসেন! পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর, ঊর্ধ্ব ও অধোদিকে অথবা অপর দিকে এমন কোন প্রদেশ আছে কি যেখানে নির্বাণ অবস্থিত আছে?"

"মহারাজ! পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর, ঊর্ধ্ব ও অধোদিকে অথবা অপর কোন দিকে সেই স্থান নাই যেখানে নির্বাণ অবস্থিত আছে।"

"ভন্তে! যদি নির্বাণের অবস্থিত স্থান না থাকে তাহা হইলে নিশ্চয় নির্বাণ নাই। আর যাঁহাদের নির্বাণ সাক্ষাৎকার হইয়াছে বলা হয়, তাঁহাদের সাক্ষাৎকারও মিথ্যা। ইহার কারণ বলিতেছি। ভন্তে! ধান্য উৎপত্তির জন্য যেমন ক্ষেত্র আছে, গন্ধ উৎপত্তির স্থান পুষ্প আছে, পুষ্প উৎপত্তিস্থান কিশলয় আছে, ফল উৎপত্তিস্থান বৃক্ষ আছে ও রত্ন উৎপত্তিস্থান আকর আছে। তাহাতে যে কেহ যাহা ইচ্ছা করে, তথায় গিয়া তাহা আহরণ করিতে পারে। ভন্তে! সেইরূপ যদি নির্বাণ থাকে তবে সেই নির্বাণ উৎপত্তির অবকাশও নিশ্চয় বাঞ্ছনীয়। যেহেতু ভন্তে! নির্বাণের উৎপত্তিস্থান নাই, সেই কারণে নির্বাণও নাই, ইহা বলিতেছি। সুতরাং যাঁহাদের নির্বাণ সাক্ষাৎ হইয়াছে, তাঁহাদের সেই সাক্ষাৎকারও মিথ্যা।"

"মহারাজ! নির্বাণের সংস্থিতির কোন অবসর নাই। তথাপি নির্বাণ আছে। সৎপথে নিবিষ্ট যোগী জ্ঞানযুক্ত মনোনিবেশ দ্বারা নির্বাণ প্রত্যক্ষ করেন। মহারাজ! অগ্নি আছে সত্য কিন্তু তাহার অবস্থিতির কোন স্থান নাই। দুই কাষ্ঠের সংঘর্ষণে অগ্নি পাওয়া যায়। সেইরূপ মহারাজ! নির্বাণ আছে, কিন্তু উহার সংস্থিতি-স্থান নাই। অথচ সৎপথে পরিচালিত যোগী জ্ঞানযুক্ত মনোনিবেশ দ্বারা নির্বাণ সাক্ষাৎ করেন।

মহারাজ! যেমন চক্ররত্ন, অশ্বরত্ন, হস্তীরত্ন, মণিরত্ন, নারীরত্ন, গৃহপতি রত্ন ও পরিণায়ক রত্ন—এই সপ্তরত্ন আছে যাহা চক্রবর্তী রাজার নিকট আবির্ভূত হয়। এই সকল রত্নের সংস্থিতির কোন অবকাশ নাই। তথাপি সত্যপথে পরিচালিত চক্রবর্তী রাজার ধর্মাচরণ প্রভাবে সেই সকল রত্ন উপস্থিত হয়। মহারাজ! সেইরূপ নির্বাণ আছে। উহার সংস্থিতির কোন অবকাশ নাই। সৎপথে নিবিষ্ট যোগী জ্ঞানযুক্ত মনোনিবেশ দ্বারা নির্বাণ সাক্ষাৎ করেন।"

"ভন্তে! নির্বাণের অবস্থিতির স্থান না থাকুক, কিন্তু এমন স্থান আছে কি যাহাতে স্থিত থাকিয়া সৎপথে পরিচালিত যোগী নির্বাণ সাক্ষাৎ করিতে পারেন?"

"হাঁ মহারাজ! সেই স্থান আছে, যেখানে স্থিত থাকিয়া সৎপথে পরিচালিত যোগী নির্বাণ সাক্ষাৎ করেন।"

"ভন্তে! সেই স্থান কি?"

"মহারাজ! শীলই সেই স্থান। শীলে প্রতিষ্ঠিত যোগী জ্ঞানযুক্ত মনোনিবেশ করিলে শক-যবন রাজ্যে, চীন, বিলাতে, অলসন্দে, নিকুম্বে, কাশী-কোশলে, কাশ্মীরে, গান্ধারে, পর্বতশিখরে এবং ব্রহ্মলোকে যে কোন স্থানে অবস্থিত যোগী সৎপথে পরিচালিত হইয়া নির্বাণ সাক্ষাৎ করেন। মহারাজ! যে কোন চক্ষুষ্মান পুরুষ যেমন শক-যবনে, চীন, বিলাতে, অলসন্দে, নিকুম্বে, কাশী-কোশলে, কাশ্মীরে, গান্ধারে, পর্বতশিখরে এবং ব্রহ্মলোকে যে কোন স্থানে স্থিত হইয়া আকাশ দর্শন করে, সেইরূপ মহারাজ! শীলে প্রতিষ্ঠিত যোগী জ্ঞানযুক্ত মনোনিবেশ করিলে শক-যবনে···যে কোন স্থানে স্থিত হইয়া সৎপথে পরিচালিত যোগী নির্বাণ সাক্ষাৎ করেন।

মহারাজ! যেমন শক-যবনে···যে কোন স্থানে স্থিত ব্যক্তির পূর্বদিক নিশ্চয় আছে; সেইরূপ শীলে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানযুক্ত মনোনিবেশকারীর শক-যবনে···যে কোন স্থানে অবস্থিত, সৎপথে পরিচালিতের পক্ষে নির্বাণ সাক্ষাৎকার অবশ্যম্ভাবী।

"সাধু! ভন্তে নাগসেন! আপনি নির্বাণ প্রকাশ করিয়াছেন। নির্বাণ সাক্ষাৎকার বিবৃত করিয়াছেন। শীলগুণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সম্যক্ প্রতিপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। ধর্মের ধ্বজা উত্তোলন করিয়াছেন। ধর্ম-নেত্র স্থাপন করিয়াছেন। উত্তমরূপে আত্মনিয়োগকারীর সৎ অধ্যবসায় কখনও নিরর্থক হয় না। হে গণাচার্যপ্রবর। ইহা এইরূপে স্বীকার করি।"

বৌদ্ধ সাধন মার্গের ক্রমবিকাশ—পরিণতি নির্বাণ ঃ

বুদ্ধোপদিষ্ট লোকোত্তর সাধনের ক্রমবিকাশ আছে। যেমন স্রোতাপত্তি মার্গ এবং স্রোতাপত্তিফল। ইহার পরে সকৃদাগামি মার্গ এবং সকৃদাগামি ফল। অনাগামি মার্গ এবং অনাগামি ফল। অর্হত্ত্ব মার্গ এবং অর্হত্ত্বফল (=নির্বাণ)। পণ্ডিত শীলানন্দ ব্রহ্মচারী সুন্দরভাবে এই সকল বর্ণনা করিয়াছেন[১৪]—

যে চিত্তোৎপত্তি জন্মমৃত্যুর খেলা রোধ করিয়া সকল দুঃখজ্বালার অতীত অমৃতলোক নির্বাণে উপনীত করিতে পারে তাহাকে বলা হয় লোকোত্তরচিত্ত। লোক হইতে লোকোত্তরে চিত্তের উন্নয়ন একটি অনির্বচনীয় পরম অবস্থা। এই জীবন অর্থহীন প্রলাপ নহে। ইহার মর্মমূলে যে গভীর সত্য নিহিত আছে তাহারই সাক্ষাৎকার বা সত্যদর্শন লোকোত্তর চিত্তোৎপত্তি; যে মায়ামোহ দৃষ্টিকে আবৃত করিয়া জীবনকে ভবের বৃক্ষে বন্ধন করিয়া অবিরাম পাক খাওয়ায়, তাহারই অপসারণ; অবিদ্যা হইতে বিদ্যার দিকে, অন্ধকার হইতে আলোর দিকে সীমা হইতে অসীমের দিকে বন্ধন হইতে মুক্তির দিকে মহাযাত্রা। জীবনের অনন্ত সমস্যা উদ্ভূত হয় অবিদ্যা হইতেই। তাহারই অবসানে হয় সকল সমস্যার সমাধান যে অহংবোধ মানুষের হৃদয়কে ক্ষুদ্র সংকীর্ণ সীমিত করিয়া রাখে তাহার উৎসাদনে হৃদয়ের উদারতার সিংহ-দ্বার খুলিয়া যায় যেখানে জীবমাত্রেই অনন্ত মৈত্রী-করুণার আলিঙ্গনে আবদ্ধ। পরের ব্যথা সে হৃদয়ে বাজে, পরের কল্যাণে সে হৃদয় হয় উদ্বুদ্ধ।

লোকোত্তর চিত্তোৎপত্তিতে মানুষের সমগ্র পার্থিব প্রকৃতিতে আসে এক বিরাট পরিবর্তন। তাঁহার জীবনযাত্রা পূর্বের মত হয় না। এক নিষ্কলঙ্ক শুদ্ধভাব তাঁহার সমগ্র সত্তাকে অধিকার করে। এক কথায় বলিতে হইলে বলা যায় যে লোকোত্তর চিত্তোৎপত্তি অনুপম অধ্যাত্ম উপলব্ধি। এই উপলব্ধির স্তরভেদ আছে। তদনুসারেই চিত্তের বিভাগ।

সাধন মার্গের ভিতর দিয়া কামচর চিত্ত যেভাবে রূপচর চিত্তে রূপান্তরিত হয়, সেভাবেই রূপচর ধ্যানচিত্তের ভিতর দিয়া নির্বাণকে ভিত্তি করিয়া লোকোত্তর চিত্তোৎপত্তি হয়। তাহাকে বলা হয় মার্গচিত্ত। মার্গ বলিতে বোঝায় পথ পন্হা বা প্রণালী। নির্বাণলাভের পন্হারূপে পরিগণিত মার্গ-চিত্ত চারি প্রকার। প্রথমটি **স্রোতাপত্তি মার্গচিত্ত** নামে অভিহিত যাহা উপলব্ধির প্রথম স্তর। সহজ কথায় স্রোতাপত্তি বলিতে বোঝায় নির্বাণমুখী ধর্মস্রোতে নিমজ্জন, যাহা জানা হইতে অজানায় অমৃতলোক নির্বাণের দিকে লইয়া যায়। এই স্রোতে যিনি পতিত হইয়াছেন, তিনি কি বিপরীত দিকে ফিরিতে পারেন ? তাঁহাকে নির্বাণ পাইতেই হইবে, জগতের কোন বাধাবন্ধনই তাঁহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না। এইজন্যই তাঁহাকে বলা হয় 'নিয়তো সম্বোধিপরায়নো' অর্থাৎ তাঁহার নির্বাণগতি সুনিশ্চিত এবং তিনি সম্বোধি-প্রবণ।

স্রোতাপত্তি মার্গচিত্তোৎপত্তিতে বা উপলব্ধির প্রথম স্তরে সত্যের যে আলোক-সম্পাত হয় তাহাতে তাঁহার দৃষ্টি হইতে মিথ্যাদৃষ্টি বা বিভ্রান্তির (শারীরিক কৃচ্ছ্র সাধনের দ্বারা কিংবা ব্রত মানসাদির দ্বারা চিত্তশুদ্ধিতে ও মুক্তিলাভে বিশ্বাস) আবরণ খসিয়া পড়ে, অন্তরের সকল সংশয় (অতীত, বর্তমান ভবিষ্যতকালে নিজের সত্তা সম্বন্ধে সংশয়) ছিন্ন হইয়া যায়, এবং সৎকায়দৃষ্টি বা দেহাত্মবোধ (heresy of individuality) চিরতরে লুপ্ত হয়। যদিও তখন অহংভাব বা আমিত্ব থাকে, ভোগবাসনা থাকে, তবুও সংসারের মায়ামোহ মনকে আচ্ছন্ন করিয়া জীবনের মহত্তর পরিণতির পথ রুদ্ধ করিতে পারে না, কারণ সত্যোপলব্ধি হওয়ায় মোহ তীব্র হয় না। স্রোতাপন্ন ব্যক্তি সে জন্মে উর্ধ্বতরস্তরলাভে অসমর্থ হইলেও সাতবারের বেশী তাঁহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না অর্থাৎ এই নির্দিষ্ট কালসীমার মধ্যে তাঁহার নির্বাণোপলব্ধি পরিপূর্ণতা লাভ করে।

অষ্টাঙ্গ আর্যমার্গে অধিরূঢ় স্রোতাপন্ন ধ্যানের গভীরে মগ্ন হইয়া নির্বাণোপলব্ধির দ্বিতীয় স্তরে উপনীত হন। ইহাকে বলা হয় সকৃদাগামী মার্গচিত্ত। সকৃৎ+আগামী=সকৃদাগামী শব্দের অর্থ একবার মাত্র আগমনকারী। এই স্তর লাভ করিলে সংসারচক্রে ভ্রমণ সীমাবদ্ধ হইয়া যায় অর্থাৎ একবারের বেশী মর্ত্যলোকে ফিরিতে হয় না। এই স্তরে উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে কামরাগ ও ব্যাপাদ (=হিংসা, বিদ্বেষ) লঘু হইতে লঘুতর হয়।

এইগুলি নির্মূল না হইলেও এত দুর্বল ও নিস্তেজ হইয়া যায় যে, লোভমূলক কিংবা দ্বেষমূলক চিত্তোৎপত্তি ক্ষীণতায় পর্যবসিত হয় অর্থাৎ এবম্বিধ চিত্তোৎপত্তি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হওয়ায় কায়কর্ম বা বাক্‌কর্মে রূপায়িত হইতে পারে না। ফলতঃ তাহা তৎজনিত বন্ধন রচনা করিতে অসমর্থ হয়।

শীল-সমাধি-প্রজ্ঞানোজ্জ্বল আর্যমার্গের উত্তরোত্তর অনুশীলনে নির্বাণোপলব্ধির তৃতীয় স্তরে যখন চিত্ত উন্নীত হয়, তখন আরও দুইটি বন্ধন নিঃশেষে ছিন্ন হইয়া যায়। সেই বন্ধনদ্বয় হইতেছে কামরাগ ও ব্যাপাদ। এই স্তরকে বলা হয় অনাগামী মার্গচিত্ত। কামরাগ ও ব্যাপাদ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হওয়ায় কামলোকে জন্মপরিগ্রহের বীজ বিনষ্ট হয়। অতএব কামলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না কামলোকের দ্বার রুদ্ধ হইয়া যায়। এইজন্য এই তৃতীয় স্তরলাভীকে বলা হয় অনাগামী অর্থাৎ জন্মবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে কাম-লাকে আগমন করিতে হয় না। এই তৃতীয় স্তরে আরও পাঁচটি উর্ধ্বভাগীয় বন্ধন দুর্বল হয়। যেমন রূপরাগ (রূপভবের প্রতি তৃষ্ণা), অরূপরাগ (অরূপভবের প্রতি তৃষ্ণা), মান, ঔদ্ধত্য (মানসিক উত্তেজনা) ও অবিদ্যা।

আর্যমার্গ অনুশীলনের চরম সীমায় উপনীত হইয়া চিত্ত যখন নির্বাণোপলব্ধির চতুর্থস্তরে উন্নীত হয়, তখন রাত্রির অবসানে সূর্যরশ্মিস্নাত মেঘমুক্ত আকাশের মত তাহা সত্যের পরিপূর্ণ আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। সমস্ত অন্তর প্লাবিত করিয়া যেন আলোকের অনন্ত তরঙ্গ বহিতে থাকে। সেই আলোকোজ্জ্বল অবস্থাকে কোন বিশেষণে বিশেষিত করা যায় না, কোন ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ভাষা এখানে মূক, কল্পনা এখানে স্তব্ধ। উপরিউক্ত পঞ্চ উর্ধ্বভাগীয় বন্ধন (রূপরাগ ইত্যাদি) এই অবস্থায় সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়। এই বন্ধনহীন, মুক্ত লোকোত্তর চিত্তকে বলা হয় অর্হত্ত্ব মার্গচিত্ত। যিনি এই চিত্তের অধিকারী হন তাঁহাকে বলা হয় অর্হৎ। অন্তরের সকল রিপু বা অরি হত হওয়ায় অর্হৎ। অর্হতের অবস্থা অর্হত্ত্ব। ইহাতেই জীবনের পূর্ণ পরিণতি সাধনার পরিপূর্ণতা, সকল কর্তব্যের অবসান। এই অর্হত্ত্বই নির্বাণ।

প্রত্যেকটি মার্গচিত্ত (অর্থাৎ স্রোতাপত্তি মার্গচিত্ত, সকৃদাগামী মার্গচিত্ত, অনাগামী মার্গচিত্ত এবং অর্হত্ত্ব মার্গচিত্ত) আকাশে বিদ্যুৎ-চমকের মত ক্ষণকালের জন্য উদিত হইয়া নিরুদ্ধ হয়। তাহারই পরিণতিরূপে তদনুরূপ

বিপাকচিত্ত উৎপন্ন হয়। ইহাকে বলা হয় ফলচিত্ত। এইভাবে লোকোত্তর বিপাকচিত্তও চারিপ্রকার, যথা, স্রোতাপত্তি ফলচিত্ত, সকৃদাগামী ফলচিত্ত, অনাগামী ফলচিত্ত এবং অর্হত্ত্ব ফলচিত্ত। স্পষ্টকথায় বলিতে হইলে বলা যায় যে, লোকোত্তর চিত্তোৎপত্তিতে অনুশীলনাবস্থা মার্গচিত্ত এবং অনুশীলিতাবস্থাই ফলচিত্ত। এই অর্হত্ত্ব ফলচিত্তাবস্থাই নির্বাণ।

নির্ব্বাণ মুক্তি কি?

তথাগত মানব সমাজকে দুইটি বিষয় শিক্ষা দিয়াছেন—দুঃখ এবং দুঃখ-মুক্তি। সাযোজ্য, সারূপ্য, সামীপ্য, সাহব্যত্যাদি দ্বারা যেমন ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হয়, তেমনি উহা দ্বারাই "ব্রহ্ম" ভাব পদার্থের অন্তর্গত হইয়া পড়েন। নির্বাণ-মুক্তি কোন ভাব পদার্থ নহে। উহার কোন ব্যঞ্জনা নাই। অভাবও নহে, যে জন্য দুঃখের অনুভূতিতে আমরা কাতর, একদা যাহার সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের আর দুঃখানুভূতি থাকিবে না। সুতরাং ভাবাভাব অন্তদ্বয় বর্জ্জিত, শাশ্বত-উচ্ছেদ-বাদ অমর্শিত মধ্য-বিন্দুই মুক্তি। দুঃখ আর্য্যসত্য বটে, কিন্তু নিত্য নহে; ইহা ব্যবহার সত্য। জীব-ভাবের ভাবতার উপরই এই আর্য্য-সত্যের প্রতিষ্ঠা। জীবেরই দুঃখ হয়, অজীবের দুঃখ কোথা? কিন্তু আমরা জীব-সংজ্ঞাভিভূত অবিদ্যার মায়া মাধ্যম (মিডিয়ম), সেজন্য দুঃখ আমাদের আছে। কিন্তু যেহেতু অবিদ্যাভিভূত মাধ্যম মাত্র আমরা, প্রকৃত জীব নহি, সুতরাং যথার্থ দুঃখ আমাদের কোথা?

যদি দুঃখ নাই, তবে মুক্তি-কামনা আমাদের নিরর্থক—মুক্তি নাই। তবে "নিরোধ" আর্য্য-সত্যকে যে পরমার্থ সত্য মানা হইয়াছে, কোন্ যুক্তি বলে ইহাকে সমর্থন করা যাইতে পারে। অবিদ্যার মাধ্যমরূপে আমরা জীব; সেজন্য জীবের দুঃখ স্বীকার্য্য। আলোর অভাবই অন্ধকার, অন্ধকার বস্তুবিশেষ নহে। আলোর দ্যোতক মাত্র। ছায়া হইতেই উহার উপলব্ধি আসে। জীবের কিম্বা উদ্ভিদের দেহ আলোককে বাধা প্রদান করে বলিয়াই দেহাবয়বে ছায়া পতিত হয়। ছায়া কোন বস্তুবিশেষ নহে। অন্ধকার না থাকিলে আলো অব্যক্ত। মুক্তিও অব্যক্ত, দুঃখের দ্বারাই তাহার প্রকাশ।

"নির্বাণং নির্বৃতিবৃত্তং নির্বাণঞ্চ ন লভ্যতে
অপ্রবৃত্তেষু ধর্ম্মেষু যথা পশ্চা তথা পুরে।"

মুক্তির বা নির্বাণের স্বভাবই নির্বৃতি (শান্তি) তাহার কোন বৃত্তি নাই,

নিমিত্ত নাই। যাহা অপ্রবৃত্ত স্বভাব ; তাহাকে পাওয়া, তাহার সামীপ্যাদি লাভ করা কিরূপে সম্ভব ? সর্বদা তাহার ঐ একই ভাব "নিবৃতি" ; পূর্ব্ব-পশ্চাৎ দ্বারা উহা সদা অব্যক্ত।

কিন্তু—

"ব্যবহারমনাশ্রিত্য পরমার্থো ন দেশ্যতে
পরমার্থমনাগম্য নির্বাণং নাধিগম্যতে।"

পরমার্থের উপদেশ দিতে হইলে, ব্যবহারকে আশ্রয় করিতে হয়, এই পরমার্থ-জ্ঞানেই মুক্তি সাধিত হয়।

তজ্জন্য—

"দ্বে সত্যে সমুপাশ্রিত্য বুদ্ধানাং ধর্ম্ম-দেশনা
লোকসম্বৃতি সত্যঞ্চ সত্যঞ্চ পরমার্থতঃ।"

ব্যবহার ও পরমার্থ ভেদে দুইটি সত্য তথাগত স্বীকার করিয়াছেন। কারণ, ব্যবহারকে আশ্রয় না করিয়া পরমার্থ দেশনা করা কদাচ সম্ভব নহে। পরমার্থে অজ্ঞতা থাকিলে নির্বাণ প্রতিবেধ হয় না। এই ব্যবহার হইল কিনা অবিদ্যার মায়া-উদ্ভূত অসত্য জীব এবং জীবের দুঃখ। এই মায়িক দুঃখই মুক্তির-দ্যোতক ; নতুবা মুক্তি বা নির্বাণ অব্যক্ত।

মায়া বিলাসিনী অবিদ্যার উচ্ছেদ সাধনে, তাহার মায়া, মায়াময় সংসার, আমি কিম্বা আমার দুঃখ, ইহাদের কিছুই থাকে না। যাহা থাকে, তাহা পূর্ব্বেও ছিল, এখনো আছে, থাকিবেও। কাল ও সীমায় ইহা পরিচ্ছিন্ন নহে এইজন্য ইহাকে মহাশূন্য বলা হইয়াছে। আকাশকেও আমরা শূন্য বলি, কিন্তু ইহা পরিচ্ছেদ ও অবকাশাদি গুণযুক্ত হওয়ায়, ভূতান্তর্গত। মহাশূন্য ভূত নহে, নিতান্ত নির্গুণ ও নির্লেপ।

লোভ-দ্বেষ-মোহ ও অলোভ-অদ্বেষ-অমোহ অকুশল ও কুশলের হেতু এবং সংসার কুশলাকুশলময়। সুতরাং সসংস্কার সোপাদান। কিন্তু মহাশূন্য অহেতুক, অসংস্কার এবং অনুপাদান। আকাশ ঘট-পটাদিতে সাময়িক এবং আংশিক তিরস্কৃত হয়, কিন্তু মহাশূন্যতার তিরস্কৃতি কিছুতেই হয় না। আলো ও অন্ধকারের ব্যাপকতায় আকাশ-রূপ শূন্য যেমন নির্লেপ থাকে।

অভাবটা আবার উচ্ছেদও নহে উৎপত্তির হেতু নিরোধ, অনুৎপত্তি। ভাব পদার্থের কখনো উচ্ছেদ হয় না। জীব কিম্বা দুঃখ মায়িক। অবর্ণ আকাশে

যেন নীল ভ্রান্তি হইতেছে। আসলে আকাশ নীল নহে, বর্ণহীন। অসত্য মায়ার তিরস্কৃতিরই অভাব। নিরোধ ভাব পদার্থও নহে, কারণ,—ভাব পদার্থ হইতে ভাব পদার্থ সম্ভিন্ন হইতে থাকিবে। যেমন সূর্য্যাৎ সৌরকর, চন্দ্রাৎ চন্দ্রিকা সম্ভিন্ন হয়।

ভাবাভাব মুক্ত নির্ব্বাণ কি? লোভাগ্নি নির্ব্বাণ, দ্বেষাগ্নি নির্ব্বাণ, মোহাগ্নি নির্ব্বাণ। এই ত্রিবিধ দাবদাহের নির্ব্বাণ অর্থাৎ পরমা শান্তি। এই নির্ব্বাণে কে শান্তি লাভ করিল? অগ্নি না আমি? প্রশ্ন জটিল, কিন্তু জবাব-হীন নহে। আমি বলিতে—রূপ-বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার-বিজ্ঞান এই পঞ্চোপাদান স্কন্ধকেই বুঝায়, এই পঞ্চোপাদান স্কন্ধই দুঃখ (অগ্নি)। লোভাদিত্রয় চিত্তের চৈতসিক। উহারা, একসঙ্গে উৎপন্ন হয়, একালম্বন গ্রহণ করে এবং একসঙ্গে নিরুদ্ধ হয়। বেদনার নিরোধে সংজ্ঞার নিরোধ, সংজ্ঞার নিরোধে সংস্কারের নিরোধ, সংস্কারের নিরোধে বিজ্ঞানের নিরোধ। এই নাম চতুষ্টয়ের নিরোধে রূপেরও নিরোধ; সুতরাং আমারও নিরোধ। পঞ্চোপাদান স্কন্ধ দুঃখ, সুতরাং দুঃখেরও নিরোধ দুঃখ এবং আমি পরস্পর অদ্বয়; যেন অর্চ্চি আর আভা। সেইজন্য উক্ত হইয়াছে ঃ—

"কম্মস্স কারকো নত্থি, বিপাকস্স চ বেদকো
সুদ্ধধম্মা পবত্তন্তি এবেতং সম্মাদস্সনং।"

বনের অগ্নি নির্ব্বাণে, বন ত আর বন থাকে না; উভয়েরই শান্তি হয়। অগ্নি এবং বন একোৎপাদ একনিরোধ, পরস্পর অদ্বয়। বন ব্যাপ্যার্থ। অর্থাৎ বহু বৃক্ষে ব্যাপ্ত ভূখণ্ড। প্রতি বৃক্ষেই অগ্নি রহিয়াছে; কারণ বৃক্ষের উপাদান—ক্ষিতি-অপ্-তেজ-মরুৎ, সুতরাং বনে অগ্নি আছে, অগ্নিতে বন আছে। বনের অগ্নি গোড়া হইতেই বনকে দগ্ধ করিতে ব্যস্ত। অগ্নি না থাকিলে পত্র ও ফল পক্ক হয় কিরূপে? গাছ শুখায় কিরূপে? সেই অগ্নিরই বলিষ্ঠ ব্যস্ততা হইতে একদা বনাগ্নির সৃষ্টি হইয়া বন এবং বনাগ্নির শান্তি হয়—উপাদানরূপ প্রত্যয়-ক্ষয়ে।

আবার প্রশ্ন হইতে পারে—যে বনটি দাবদাহে শান্ত হইল সে কি আর দেখা দিবে না? প্রশ্ন সমীচীন। দেখা দিবে, যদি সবীজ সমূল বিদগ্ধ না হয়। সেইজন্যই ত সবীজ সমূলে আমি, কোটি কোটিবার নূতন হইয়া আবর্ত্তিত হইতেছি। যাহার বাসনাবীজ এবং লোভাদি হেতু ক্ষয় হইয়া গিয়াছে সে আর নূতন হইয়া আবর্ত্তিত হয় না, পুরাতন রূপেও থাকে না। আসা-যাওয়ার, উদয়-ব্যয়ের চির অবসান ঘটে।

আমি যদি নিবিয়া শান্ত হইয়া গেলাম তবে কে এই নিৰ্ব্বাণের শান্তি উপভোগ করিবে, যে শান্তির জন্য আমার এই বিরাট সাধনা ? হাঁ, এরূপ প্রশ্ন শতবার মনে সমুদিত হয়, হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিকও বটে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, সকল বেদনাই অনিত্য ; সুতরাং দুঃখোদ্রেককর। তিন রকমেই বেদনা আমাদের হয়, হয় সুখ বেদনা, না হয় দুঃখ বেদনা, না হয় অসুখ-অদুঃখ বেদনা। এই বেদনাত্রয় চৈতসিক, চিত্ত সহজাত, একোৎপাদ, একনিরোধ, সমধৰ্ম্মী এবং উদয়-ব্যয়তা কখনো নিত্য নহে, কালাধীন। বেদনা থাকিলে, তৃষ্ণা-উপাদান-ভব-অবিদ্যা সংস্কার রূপ বীজ থাকিয়াই গেল ; কিসের নির্বাণ হইল ? এতৎপ্রত্যয়ে ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান নাম-রূপ ষড়ায়তন স্পর্শ বেদনা এই পঞ্চফলের বা আমির উৎপত্তি হইবেই।

তবে কি শান্তি বা নিবৃতি কিছু না ? না, তাহাও নহে, শান্তি শান্তিই, বিরাট সাধনার উত্তম লাভ। এতাদৃশ সাধনা নিষ্ফল নহে ; অনায়ু চিরায়ু মহৎফল শান্তি। গভীর সুষুপ্তি-সুপ্ত ব্যক্তির দিবসের সৰ্ব্ববিধ শ্রমের যে শান্তি ইহা কে অনুভব করে ? কে তখন এই শান্তির বেদয়িতা ? তখন তাহার চন্দ্র-সূর্য্য, নক্ষত্র-তারকা, বন-বনস্পতি সম্পর্কিত কোন সংসারই থাকে না, অন্ততঃ সে নিজেও কি তখন থাকে ? অথচ সে শান্তিময় অবস্থায় অবস্থিত, একথা সুষুপ্ত ব্যক্তিকে দেখিয়া কে না স্বীকার করিবে ? কিন্তু সুষুপ্ত ব্যক্তি কি অনুভব করে যে আমি শান্তি অনুভব করিতেছি ? তখন তাহার কি কোন অহং থাকে ? নিরহং অথচ সে শান্ত। কিন্তু এই শান্তি ক্ষণিক, এবং ভবাঙ্গ চিত্তের বিষয়। উহাতে অতি সূক্ষ্মভাবে স্পর্শ-বেদনা-সংজ্ঞা-চেতনা-একাগ্রতা মনস্কার-জীবিতেন্দ্রিয় প্রভৃতি চৈতসিক বিদ্যমান থাকে। লোভাদি মূল-বৰ্জ্জিত চিত্তের শুদ্ধাবস্থা অননুভবনীয়, ক্ষণিক চিত্তবিষয় হইয়াও সেই সুষুপ্তি এত শান্তিকর ! নির্ব্বিকল্প বা নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞার সমাপত্তির দীর্ঘ চতুরশীতি সহস্র কল্পায়ুক চিত্ত বিষয় করিতে পারিলে আরও নিস্দরথ শান্তি। এই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির সাধনাকে বেদান্তে গায়ত্রী বলা হইয়াছে। কিন্তু চিত্ত ও চিত্ত-বৃত্তি নিরোধকর নিরোধ-সমাপত্তি আরও শান্তিপ্রদ। ইহাকেই বৌদ্ধমতে সোপাদিশেষ মুক্তি বলে। অনায়ু চিরায়ু বিহিত পঞ্চোপাদান স্কন্ধ নিরোধই পরমা শান্তি। এ শান্তি কাল সীমায় সীমিত নহে। একাত্মক অহংটি, যেমন, তেমনি সৰ্ব্বাত্মক ব্রহ্মবিহারের মহদ্গত ভাবটিরও অপচয় সাধন করে—মানবের বিরাট প্রজ্ঞাবলের সাধনা।

ঈদৃশ প্রজ্ঞাকে মহাযানিয় শ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্রে "তথাগত গর্ভ" বলা হইয়াছে। তথাগত গর্ভই বটে।

অনিমিত্ত, অপ্রণিহিত লক্ষণে লক্ষিত এই মহাশূন্যতারূপ নির্বাণ-মুক্তি মানবের অবশ্য কাম্য। কিন্তু কাম অবস্তুগ্রাহী নহে, নির্বাণ কিন্তু অবস্তু, তথাপি আমরা ইহার যেন কামনা করিতেছি। আসলে তাহা নহে, কামনা উপনিশ্রয়-প্রত্যয় মাত্র, হেতু নহে। এই কামনা নিশ্রয়ে আমরা বস্তুতঃ তাগেরই সাধনা করি। "চাগং ভিক্খবে নিব্বানং"। কেন এই ত্যাগ? উপাদান (গ্রহণ) দুঃখ বলিয়া। আমার আমিত্বে যাহা কিছু তাহা সবই উপাদিন্ন। অতীতের কর্ম্ম সাধনায়, আমিত্বে ভুলিয়া তৃষ্ণা-বশে আমরা পঞ্চস্কন্ধ আদান (গ্রহণ) করিতেছি যাহা স্বরূপতঃ দুঃখ। তাই মুমুক্ষুকে ত্যাগেরই সাধনা করিতে হয়। এই সাধনার মূল প্রজ্ঞা। অনেকে প্রশ্ন করিয়া থাকেন, বুদ্ধ বোধি-মূলে কাহার সাধনা করিয়াছিলেন? বোধ হয় এখন তাহার সদুত্তরে কাহারো আর সন্দেহ থাকিবে না।

কে এই ত্যাগের সাধনার যোগ্য ব্যক্তি? কাহাকে মুমুক্ষু বলা হয়? যে ব্যক্তি জরা-ব্যাধি-মরণ, শোক-তাপ, দুঃখ-দৌর্ম্মনস্য, প্রিয়বিয়োগ, অপ্রিয়-সংযোগ, ইচ্ছার অপ্রাপ্তি, অনিচ্ছার প্রাপ্তিতে প্রপীড়িত সংসার কেবলই দুঃখ, দুঃখপূর্ণ দেখে; যৎকিঞ্চিৎ বৈষয়িক সুখ অনুভূত হয়, তাহাও সবিতা-কিরণে তৃণাগ্রে শিশির বিন্দুটির ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে বিলয় দেখিতে পায়, দুঃখের গাম্ভীর্য্যে যাহার অন্তরে দীর্ঘতর ও উজ্জ্বল রেখাপাতকরিতে সমর্থ হইয়াছে; দুঃখের অনুভূতিতে যাহার অন্তর অহোরাত্র, মাস মাস, বৎসর বৎসর, জীবন-ব্যাপী কাতর, যে মনে করে আমি দ্বাররুদ্ধ জ্বলমান গৃহের বন্দী; মুক্তির কামনায় যাহার অন্তর অনুক্ষণ আগ্রহশীল; দুঃখ প্রাণবন্ত হইয়া যাহার অন্তর-ক্ষেত্রে জাগ্রত; যাহার অন্তর সন্তপ্ত সজ্যোতিঃভূত লৌহ খণ্ডের মত জ্বালাময়; শুধু সেই ব্যক্তিই ত্যাগ সাধনের যোগ্যতম ব্যক্তি। ইহাকে প্রকৃত মুমুক্ষু বলে।

স্থবির জ্ঞানশ্রী মহাতপের জনৈক শিষ্য ছিল। একদিন শিষ্য স্থবিরকে বলিল প্রভু! আর কতদিন আমায় আঁধারে রাখিবেন? আমার অন্তর যে মুক্তির জন্য ব্যাকুল। স্থবির কহিলেন, বৎস, তোমার এখনো সময় হয় নাই, যথা সময়ে আমি তোমাকে মুক্তি-মন্ত্র প্রদান করিব। শিষ্য নীরব হইল; কিন্তু মাঝে মাঝে তাহার প্রাণের কাতরতা জানাইত।

একদিন স্থবির শিষ্যকে সঙ্গে করিয়া গঙ্গায় স্নান করিতে গেলেন। উভয়ে

গল-প্রমাণ জলে গেলে, স্থবির শিষ্যকে জলে ডুবাইয়া ধরিলেন। শিষ্য প্রাণের জন্য কাতর হইয়া ভীষণ উদ্বেগ প্রকাশ করিতে লাগিল। কিন্তু স্থবির তাহাকে কিছুতেই ছাড়িলেন না। অবশেষে সময় বুঝিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। সে উন্মজ্জিত হইয়া দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করিয়াই যেন প্রাণ পাইল। স্থবির জিজ্ঞসা করিলেন, বৎস তুমি জলমগ্ন অবস্থায় কিভাবে ভাবিত হইয়াছিলে ? সে উত্তম করিল—প্রভু ! প্রাণ প্রাণ, শ্বাস শ্বাস ভিন্ন আমি অন্য কিছুর চিন্তা করি নাই। হাঁ বৎস ! তুমি ঠিকই বলিয়াছ। সংসার যখন তোমার দুঃখ-সিন্ধুর মত বোধ হইবে এবং তুমি সেই সিন্ধু-গর্ভে নিমগ্ন বলিয়া, সব ভুলিয়া মুক্তির জন্য এমনই উদ্বেগ প্রকাশ করিতে থাকিবে, তখনই তোমার প্রকৃত সাধনা আরম্ভ হইবে—মুক্তির সাধনা। আর তুমি হইবে প্রকৃত মুমুক্ষু। তথাগতে শ্রদ্ধাবল হইবে তখন তোমার সমস্ত প্রাণ ব্যাপিয়া। ধর্ম্ম-শৌণ্ডের ছন্দ-বলের ন্যায় হইবে তোমার ছন্দবল ; কাঠবিড়ালীর শাবক উদ্ধারে সমুদ্রসিঞ্চনের বীর্য্যবলের ন্যায় হইবে তোমার বীর্য্যবল ; অর্জ্জুনের ভাস পক্ষীর অক্ষি-দর্শনের একাগ্রতার ন্যায় হইবে তোমার একাগ্রতা বল বা সমাধি বল।

যেই মহামানব বুদ্ধের পরার্থে আত্ম-বিসর্জ্জনের অসীম ত্যাগ ও অনন্য-সাধারণ সাধনার জন্য কোটি কোটি মানব জীবনম্মুক্ত হইয়াছেন এবং অনেক কোটি মানব প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন, তাদৃশ মহামানবের মঙ্গলেচ্ছা, আমাদের সংবরশীলে শীলিত জীবনে প্রতিফলিত হইবার সম্বন্ধে বাধা কিছু নাই। বিশ্ব-জীব-হিতসাধক করুণ-হৃদয়ের অমৃত-ধারা, চন্দ্র-চন্দ্রিকার স্নিগ্ধ সুধা-ধারার ন্যায় আমাদের দুঃখ-জর্জ্জরিত জীবন-মরুকে রসায়িত করিতে পারে, যদি হৃদয় দুঃশীলতার বাধামুক্ত হয়। একবার সৌশীল্যে হৃদয়-কপাট উন্মুক্ত কর, দেখিবে স্বর্গের মন্দাকিনী ধারার ন্যায় তোমার হৃদয় করুণার শান্তি-রস ধারায় কেমন সরস হইয়াছে।

যে যে পূরিত-পারমী সত্যসন্ধ মহামানব জগতের দুঃখভার হরণের জন্য একের পর এক তুষিত পুরে বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির জন্য কালের অপেক্ষা করিয়া সংস্থিত হয়েন, তাঁহাদের প্রত্যেকেই অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্ব। তাঁহাদের করুণাবলোকনও আমাদের জন্য ব্যর্থ নহে। কিন্তু চন্দ্র-কিরণ নিরাধারে কখনো বিম্বিত নহে। তজ্জন্য আমাদের হৃদয়কে শীলতায় স্বচ্ছ করিয়া রাখিতে হইবে। বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব এই দ্বিবিধ জ্যোতির এক জ্যোতিঃ বিশ্বহিতের জন্য নিয়ত বিদ্যমান। "তোমাদের হৃদয়-কপাটে সে জ্যোতি

পৌঁছিয়াছে, তোমরা অন্ধকার হৃৎ-কুটিরের অর্গল উন্মোচন কর, জ্ঞানের আলোকে উহা সমুজ্জ্বল হইয়া উঠুক। সে জ্যোতিঃ উপেক্ষা করিয়া আমিত্বের ক্ষুদ্র অন্ধকার গুহায় লুকিয়া, কেন কোটি কোটি জন্মের অকল্যাণ সৃষ্টি করিয়া আত্মঘাতী হইবে ?"

যে পর্য্যন্ত আসক্তি বিষয়ে পতিত না হয়, ইন্দ্রিয় সমূহ তাবৎ কাল বিষয়ে থাকিয়াও আসক্ত হইতে পারে না। যেমন কাষ্ঠ ও বায়ুর বর্ত্তমানে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়, বিষয় ও সঙ্কল্প উভয়ের বর্ত্তমানে তেমনই ক্লেশাগ্নি জ্বলিয়া উঠে। বিষয় বন্ধন বা মুক্তির কারণ নহে, সঙ্কল্পের বৈশিষ্ট্যেই বন্ধন বা মুক্তি সমুচ্ছিত হয়। যে ব্যক্তি স্মৃতি-দ্বারা অরক্ষিত সে পরিচালকহীন অন্ধের ন্যায় নিতান্ত নিরবসথ। বিষয়ে বিচরণ করিলে আসক্তির দাপটে তাহাকে জর্জ্জরিত হইয়া অসীম বেদনায় মর্ম্মপীড়িত হইতে হইবেই। আমি বলবান ও যুবক এ ধারণা মূঢ় জনের ; কারণ মৃত্যুকে জীবনের সর্ব্বাবস্থায় উপস্থিত হইতে দেখা যাইতেছে। সে ত বয়স পর্য্যালোচনা করিয়া চলে না। এমতাবস্থায়ও যদি মানব বিষয়-মূঢ় হইয়া বিচরণ করে, মুক্তি কিরূপে সম্ভব ? মিথ্যার ভিতর যে ভঙ্গুরতা আছে· তাহা তাহাকে নিত্যকালের জন্য টিকিয়া থাকিতে দেয় না। একদা সত্যের কাছে তাহার অলীক ঔজ্জ্বল্য হতপ্রভ হইয়া পড়ে। সত্যোপলব্ধির প্রচেষ্টাকে চিরায়িত করিয়া লাভ কি ? সত্যকে অন্তরালে চাপা দিয়া রাখিবার প্রচেষ্টা জ্ঞানীর পক্ষে নিতান্ত অবিবেচনার কার্য্য।

সমগ্রতায় শক্তি ভূমিষ্ঠ হয়, খণ্ডতা তাহাকে ক্ষীণ করে। মানবীয় অন্তরের শ্রদ্ধা-স্মৃতি-বীর্য্য-সমাধি-প্রজ্ঞা এই পঞ্চচৈতসিক, ইহাদের পরস্পরের সহযোগিতায় (শ্রদ্ধাদি পঞ্চ) ইন্দ্রিয়ে এবং গভীর সংযোগে (শ্রদ্ধাদি পঞ্চ) বলে পরিণতি লাভ করে। উপচিত বলের দ্বারাই মানুষ মুক্তি-মার্গ লাভ করিয়া থাকে। শ্রদ্ধাদি পঞ্চ চৈতসিকের উদ্ধৃত ফণার উপর বিষয়ের কুহক-মন্ত্র পাঠ করিলে উহারা দারুণ বিষয় নিষ্পেষণে অভিসন্ধি ভাঙ্গিয়া একান্ত খিন্ন হইয়া পড়ে। মনুষ্যত্বের এই সুপ্ত চৈতসিকগুলিকে বিষয়ের পাশংকুল হইতে মোচন করা, মানুষের একান্ত প্রাণের করিয়া জ্ঞান করা কর্ত্তব্য। উন্নত শিখরে আরোহণ করিতে হইলে, সাধারণ কর্ত্তব্যের সোপানগুলি আগে পার হওয়া চাই। কোনও ফাঁকিতে তাহাকে উড়াইয়া দেওয়ার কল্পনা বাতুলতা মাত্র। কোন শ্রেষ্ঠ বিষয় পাইতে হইবে বলিয়া, প্রাপ্তব্য বিষয় কোনদিন সহজ হয় নাই। ত্বরাগ্রস্ত হইয়া

বৈধাবিধি উল্লঙ্ঘনে শুধু ক্লেশের কঠোরতা বৃদ্ধি করে, কিন্তু কিছুমাত্র লাঘব করে না। আদর্শের পরিণতি সাধনের ইচ্ছা, লোক-সমাজকে উন্নতির পথে পরিচালিত করে, কোন সন্দেহ নাই ; কিন্তু মানুষ যখন নিজের আকাঙ্ক্ষাকে সাধনারও উপরে করিয়া দেখিতে আরম্ভ করে, তখন তাহার সত্যিকার ন্যায়বুদ্ধি তাহার কাছে দুর্লভতর হইতে থাকে এবং নিজের অবৈধ চেষ্টাকে বিধি-বিহিত অপেক্ষাও গুরুতর করিয়া তুলিবার একটা উগ্র প্রচেষ্টা তাহাকে পাইয়া বসে। অবশেষে এই উগ্রতা নিষ্ফলের কণ্টক-কণ্ঠহারে তাহাকে ব্যথিত ও উত্যক্ত করে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে স্বর্ণের জ্যোতিঃ ঘাত ও বিদারণে স্ফুরিত হয়। তীরবদ্ধ বাপীর মত হৃদয় একই বিধির ভিতর আবদ্ধ থাকিলে আবর্জ্জনাপূর্ণ হয়। গতিই বিশ্বের প্রাণ ; সুতরাং অচল হইয়া থাকার সঙ্কল্পও কিছুতেই আত্ম-পর-কল্যাণের অনুকুল নহে। প্রাচীন জীর্ণতার অরণ্যান্ধকারে বিপন্ন মনকে মনুষ্যত্বের মুক্ত ময়দানে টানিয়া আনিতে হইবে। যুগান্তব্যাপী জড়তার মধ্যগত প্রাণ, নচেৎ ঝিমাইতে ঝিমাইতে একেবারে আড়ষ্ট হইয়া পড়িবে। জন্মান্তর পথে, আমাদের জীবন এভাবে জড়তায় পীড়িত হইয়া কতবার নারকীয় বিবর্ণতা লাভ করিয়াছে, তার সংখ্যা হয় না। মানবীয় চিত্তের ভিতর দুর্ধর্ষ তেজ-বীজ-বিদ্যমান ; কিন্তু মর্ম্মের ভিতর উহা যদি আমরা জড়তায় মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের মত নিবীর্য্য করিয়া রাখি এবং অকর্ম্ম মুখর জটিল কল্পনা-দ্বারা নিজেকে বলিদান দিয়া থাকি, তবে মোক্ষ কিরূপে সম্ভব ?

মনের বেগের উৎপত্তি মনই করে। কিন্তু যেই বেগ অন্তরের গভীর প্রদেশ হইতে অনুদ্ভুত, অজাগ্রত, বাহির প্রয়োগে বেগপ্রাপ্ত তাহা অস্থায়ী, ক্ষণিক। উহাতে একটা স্বভাব বেগের সৃষ্টি হইতে পারে না। অথচ এই স্বভাগ বেগই, মানবাত্মাকে বৈধ-বিধির ভিতর পথে, শ্রেষ্ঠতার দিকে ক্রমান্বয়ে চালিত করিয়া, মুক্তির মঙ্গলালোকে জীবন শান্তিময় করে। যাহা অন্তর দিয়া করিতে হয় তাহা যদি করি আমরা বাক্যে, যাহা পবিত্রতায় করিতে হয় তাহা যদি কুহকে সম্পাদন করি, তবে মঙ্গলালোকের সন্ধান আমাদের কিরূপে হইবে ? উজ্জ্বল গৌরবকে আবর্জ্জনার স্তূপে চাপা দিয়া, যদি আসক্তির মায়াজাল বুনিয়া তাতেই আবদ্ধ থাকি, তবে এ দোষের দায়িত্ব সম্পূর্ণ নিজের।

তথাগত বুদ্ধ আমাদের মনের চোখের কাছে, মুক্তির পথে সমুজ্জ্বল দীপ

ধরিয়াছেন, কিন্তু আমরা আসক্তির ধূলা-বালিতে মনকে করিয়া রাখিয়াছি অন্ধ। মন কথাটি কথায় যত ছোট, তদপেক্ষাও সে সূক্ষ্মতম, কিন্তু জটিলতায় সে কানায় কানায় পূর্ণ। সারাটা এই বিশ্ব-বৈচিত্র্য সেই ছোট মনটিরই শিশুখেলা। সে আপন দুর্নিবার মানসিক শক্তি প্রভাবে, আকাশে আকাশে উড়িয়া যেড়াইতে যেমন সক্ষম, সাগর তলে তলে ঘুরিয়া বেড়াইতে সমশক্তির পরিচয় প্রদান করে। সাগর জলের অণু-পরমাণু পরখ করিয়া করিয়া যেমন সাগরকে অন্তর্হিত করিতে শক্তি ধারণ করে, পৃথিবীর অণু-পরমাণু পৃথক করিয়া করিয়া, মহাপৃথিবীকেও অপসৃত করিতে দক্ষতার পরিচয় প্রদান করে। এমন মনের দিব্য দৃষ্টি ও দিব্য শক্তিকে আসক্তি মদিরা অন্ধ ও পঙ্গু করে। সে আসক্তির ঘোরে ছুটিয়া যায় দুনিয়ার তামসতম আঁধারে—রসাতল-তলে, নরকে নরকে, প্রেতে তির্য্যগে। তার গতি-দৃষ্টি দুই দিকেই সমান দুর্নিবার। সে যেমন হইতে পারে মুহূর্ত্তে নরকের কীট, তেমনি সে হইতে পারে ক্ষণেকে স্বর্গের দেবতা-ব্রহ্মা। সে যেমন ধরিয়াছে বিশ্বরূপ, উহাকেও সে নিমেষে ভাঙ্গিয়া দিতে পারে আত্মাপচয় করিয়া। মনের এই বিকটতায় যাহারা পর্য্যুদস্ত, দুঃখিত বলিয়া মনে করে, তাহারা মনের চরণ তলে পড়িয়া মন-মানসী প্রজ্ঞাদেবীর নিকট ঐকান্তিক প্রার্থনা নিবেদন করিতে পারে—

> "ত্বমেব ত্রাসজননী বালানাং ভীমদর্শনা
> আশ্বাসজননী চাপি বিদুষাং সৌম্যদর্শনা।"

তখন সে (মন) মানসী প্রজ্ঞাদেবী সহকারে শান্ত মূর্ত্তিতে, সমাধি পথে, বিদর্শন মার্গে সমুদিত হইয়া দেখা দিবে এবং ধন্য করিবে।

মহাযানীয় প্রজ্ঞাপারমিতা শাস্ত্রে এইরূপ স্তুতিও দেখা যায়—

> "নাগচ্ছসি কুতশ্চিত্ত্বং ন চ ক্ব চ ন গচ্ছসি
> স্থানেষ্বপি চ সর্ব্বেষু বিদ্বদ্ভির্নোপলভ্যসে"।

তুমি কোন দিক হইতেও আস না, কোথাও গতিও তোমার দৃষ্ট হয় না। তুমি সর্ব্বস্থানে সর্ব্বদা বিদ্যমান রহিয়াছ ; তথাপি বিদ্বান ব্যক্তিরা সাধন মার্গ বিনা তোমাকে উপলব্ধি করিতে সক্ষম নহেন। জননী! তুমি আমাকে সাধন মার্গে পরিচালিত করিয়া শান্ত মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হও এবং আমার সংসার দুঃখ নিবৃত্ত কর।

পাদটীকা

১। বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ১৩৬
২। The Buddha and His Teachings. 1986 edn, p. 287.
৩। সৌন্দরনন্দকাব্য, ১৬/২৮-২৯
৪। দীঘনিকায়, সুত্ত নং ১১
৫। বিসুদ্ধিমগ্‌গ, ১৬/৯০
৬। The Light of Asia, Book 8, p. 150
৭। অভিধম্মত্থসংগহো, অধ্যায় ৬
৮। মূলমাধ্যমিককারিকা, ২৫/৩
৯। সুত্তনিপাত, শ্লোক ১ ৭৪
১০। ঐ, শ্লোক ১০৭৫
১১। ঐ, শ্লোক ১০৭৬
১২। ঐ বঙ্গানুবাদ, ভিক্ষু শীলভদ্র
১৩। মিলিন্দ প্রশ্ন, ধর্মাধার মহাস্থবির, ৩য় প্রকাশ, পৃঃ ২৬২-২৬৬
১৪। অভিধর্ম-দর্পণ, পৃঃ ১০০-১০৪

* দার্শনিকপ্রবর শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির পরম সুখময় নির্বাণশান্তি লাভ করিয়াছেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে। অতএব তিনি তাঁহার 'সত্যদর্শন' গ্রন্থে নির্বাণমুক্তি বিষয়ে যাহা আলোচনা করিয়াছেন তাহা বহুজনহিতায় এই গ্রন্থে (পৃঃ ২০১-২০৯) উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না—গ্রন্থাকার।

নির্বাণ লাভের মার্গ*

সমাধি [এক]

শমথ-ভাবনা

কুশল চিত্তের যাহা একাগ্রতা, তাহাই সমাধি। একটি আলম্বনে চিত্ত-চৈতসিকের সম্যকরূপে সমাধান বা স্থিতিই সমাধির লক্ষ্য। সমাধিকে দুইটি অংশে বিভক্ত করা হইয়াছে। যোগীর ইচ্ছানুসারে যে কোন অংশ গ্রহণ করা যায়। তবে চরিত ভেদে শমথ ধ্যানের পার্থক্য নির্ণীত হইয়াছে।

"**কিলেসং সমেত্তি উপসমেতীতি সমথো**" অর্থাৎ ক্লেশ-তৃষ্ণা-দুঃখকে সাম্য করে, উপশম করে বলিয়া **শমথ** নামে অভিহিত। দুইটি অংশের মধ্যে প্রথমে শমথ-যান ও পরবর্ত্তী কাণ্ডে বিদর্শন-যান সম্বন্ধে বলা হইবে।

যোগী প্রথমে গুরু নির্ব্বাচন করিবেন। তৎপর যথাক্রমে ধ্যানের স্থান, ধ্যানের বৃহৎ উপদ্রব, ধ্যানের ক্ষুদ্র উপদ্রব ও সপ্ত হিতকর অবস্থার সঙ্গে পরিচিত হইবেন। এইগুলি ধ্যানোৎপাদনের আনুষঙ্গিক উপায় হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থ পড়িয়া জ্ঞান লাভ করা, আর ধ্যান প্রভাবে প্রত্যক্ষ ফল লাভ করা আকাশ-পাতাল প্রভেদ। তবে নিমিত্ত বা বিভূতি দর্শন সকলের একরূপ নহে। কোন কোন নিমিত্ত দর্শনে যোগীর চিত্তে চাঞ্চল্য জাত হয়। তখন গুরুর নিকটে ব্যক্ত করিয়া উহার উপায় জানিয়া লইতে হয়।

বৈদ্য যেমন রোগীর সমস্ত অবস্থা শ্রবণ করিয়া রোগোৎপত্তির কারণ, রোগ, ঔষধ নির্ণয় ও পথ্য নির্ব্বাচন করেন, তেমন ধর্ম্মগুরুও যোগীর কাম-প্রাবল্য, হিংসা-প্রাবল্য, শ্রদ্ধা-প্রাবল্য ও মোহ-প্রাবল্য প্রভৃতি জানিয়া কর্ম্মস্থান বা সাধনার প্রয়োগ নির্ব্বাচন করিয়া দিবেন।

এই শমথ-যান ৪০ খানি। এই গুলির সম্পাদন বিধি যথাক্রমে বর্ণিত হইবে। যেই যানে করিয়া গমন করিলে, তৃষ্ণার ক্ষয় সাধন ত্বরান্বিত হয়, স্থূল স্থূল বাধাতিক্রমের সেতুস্বরূপ এই যান সর্ব্বক্ষণ প্রয়োজন।

স্ত্রী-পুরুষ মাত্রেই কার্য্যাবসরে ও ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শমথ-ভাবনা করিতে

পারেন। উপোসথ দিনে নিদ্রা ছয় ঘণ্টা ও স্নানাহার চারি ঘণ্টা বাদ দিয়া, অনায়াসে চৌদ্দ ঘণ্টা রাত্রিদিন ভাবনা করা সুসঙ্গত। ইহাতে দান-শীল-ভাবনার সমন্বয়ে মানব জন্ম সার্থক হয়।

গুরু নির্ব্বাচন

বুদ্ধোপদিষ্ট পরিভাষায় সমাধি, ধ্যান, ভাবনা, যোগ, কর্ম্মস্থান ও সাধনা একই ভাবার্থ বাচক। গুরু বলিতেও কল্যাণমিত্র, সৎসঙ্গ ও আচার্য্য একার্থ বাচক। যিনি সংসার দুঃখে ভীত হইয়া বিমুক্তি মার্গ অনুসরণ প্রয়াসী, তিনি পুনঃপুনঃ জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যুদ্বারা মর্দ্দিত হওয়া অপেক্ষা, যোগবলে ইহাদিগকে সীমাবদ্ধ করিতে চাহেন। কাজেই একজন কল্যাণমিত্রের আশ্রয় তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইবে।

যোগ-সাধনা মানসে যেই গুরুর নিকটে যাইবেন, তাঁহার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস প্রগাঢ় থাকা চাই। সামর্থ্যানুরূপ গুরুপূজার অর্ঘ্য নিবেদন করাও সুসঙ্গত।

সাধারণত কোন কোন ধ্যানানুষ্ঠানে এমন কতকগুলি জটিল নিমিত্তের উদ্ভব হয়, ইহাতে যোগী অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠেন। সেগুলি গুরুর নিকটে বর্ণনা করিয়া ও মীমাংসা করিয়া লইতে হইবে। নিমিত্তের গতি সঠিক অনুধাবন করিতে অসমর্থ হইলে কোন যোগীর মস্তিষ্কবিকৃতিও ঘটিয়া থাকে। সেই কারণে সুদক্ষ গুরু নির্ব্বাচন অপরিহার্য্য।

ধ্যানের স্থান

ধ্যানের স্থান অরণ্যই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। নতুবা গ্রাম ও নগর হইতে কিছু দূরে হওয়া আবশ্যক। শুধু বসিয়া বসিয়া কাহারও যোগসাধনা সম্ভব নহে। সে কারণে পায়চারী বা চঙ্ক্রমণ স্থান সাধনার অনুকূল। ধ্যানের পক্ষে উচ্চশব্দ, মহাশব্দ, লোকের গমনাগমন জনিত কোলাহল, কর্ম্ম-মুখর স্থান, ফল-ফুলের বাগান, সর্ব্বসাধারণের জন্য সংরক্ষিত পানীয় জলের কূপ-পুষ্করিণী ও কৃষিস্থান বড়ই বিঘ্নোৎপাদক।

যে স্থানে সৎগুরু আছেন, যাঁহারা সন্দেহ ভঞ্জন করিতে সমর্থ, যাঁহারা পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করিতে উৎসাহী, সর্ব্বদা যোগীর শ্রীবৃদ্ধিকামী;

তেমন স্থানে কর্ম্মস্থান গ্রহণ করিয়া দৃঢ়বীর্য্য সহকারে উহাতে তন্ময় হইয়া বাস করিতে হইবে।

বুদ্ধকর্ত্তৃক বৃক্ষমূল ও শূন্যাগার বা নির্জ্জন গৃহ ধ্যানানুকূল বলিয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছে। যে কোন বিঘ্নোৎপাদক স্থান সাধনার অনুকূল নহে। সে কারণে উপযুক্ত স্থান নির্ব্বাচনও অপরিহার্য্য।

ধ্যানের বৃহৎ উপদ্রব

যদি কাহারও কোন প্রয়োজনীয় কার্য্য অসম্পন্ন থাকে, তাহা সম্পাদন করিয়া যাইতে হইবে। কাহারও নিকট টাকা পয়সা পাওনা বা দেনা থাকিলে, আদান-প্রদান সমাধা করিয়া যাইতে হইবে। কোন উপদেশ বা সাংসারিক সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার থাকিলে, তাহা সম্পাদন করিয়া যাইতে হইবে। ভিক্ষু সাধক হইলে যদি কোন নিমন্ত্রণ থাকে, দান-দক্ষিণা পাওয়ার আশা থাকিলে, শিষ্যদের উপসম্পদাদি কার্য্য থাকিলে, কোন গ্রন্থ পড়াইবার সামান্য অবশিষ্ট থাকিলে, বিহারের কার্য্য সামান্য পরিমাণ অবশিষ্ট থাকিলে অথবা তদনুরূপ যে কোন বিতর্ক উৎপাদক কাজ থাকিলে সমস্ত নিঃশেষ করিয়া যাইতে হইবে।

যদি এ সমস্ত উপদ্রবমূলক কার্য্য সুসম্পন্ন করা না যায়, ধ্যানাসনে বিতর্ক সহিত উপদ্রবের সৃষ্টি হয়। ইহাতে যোগীর চিত্ত সমাধিমুখী করিয়া রাখা অসম্ভব হয় ও চিত্তের একাগ্রতা সাধনে ঐগুলি পরিপন্থী হয়।

এই বৃহৎ বৃহৎ উপদ্রব জনক কার্য্যগুলি সুসম্পাদন করিলে, যোগী নির্ব্বিঘ্ন চিত্তে শান্তভাবে ধ্যানোৎপাদন করিতে সমর্থ হন। কোন চিত্ত-বিতর্ক-মূলক হেতু থাকিলে, আশানুরূপ ধ্যান-সুধা লাভ করা সম্ভব হয়না।

ধ্যানের ক্ষুদ্র উপদ্রব

নখ দীর্ঘ হইলে ও কেশ-লোম ছেদনের প্রয়োজন মনে করিলে ছেদন করিতে হইবে। বস্ত্র বা চীবর ময়লা হইলে ধৌত করিবেন। যদি শেলাই করিবার আবশ্যক হয়, তাহাও সম্পাদন করিবেন। বিছানা, মশারি, খাট, চেয়ার প্রভৃতি ধৌত বা মেরামত করিবার থাকিলে তাহাও নিঃশেষ করিবেন।

এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপদ্রবগুলিও ধ্যানের অন্তরায় করে। চুল-দাড়ি দীর্ঘ হইলে অস্বস্তি ও উদ্বেগ বোধ হয়। ইহাতে যে বিতর্ক আসে, উহাদ্বারা চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠে।

ক্ষুদ্র-বৃহৎ যাবতীয় উপসর্গ সমুচ্ছেদ করিয়া ধ্যানস্থানে গমন করিতে হয়। সর্ব্ববাধা মুক্ত চিত্তই একাগ্রতার অনুসরণ করে।

ভাবনা-হিতজনক সপ্ত বিধি

১। **'ভাবনা-গৃহ'**—যে গৃহে বাস করিলে অন্তরে প্রীতির সঞ্চার হয় না; অনুৎপন্ন নিমিত্ত উৎপন্ন হয় না, উৎপন্ন নিমিত্ত বিনষ্ট হয়, স্মৃতি উৎপাদিত হয় না অথবা উৎপন্ন স্মৃতি স্থায়ী থাকে না, চিত্ত একাগ্র হয় না, তেমন গৃহ যোগীর পক্ষে হিতজনক নহে।

২। **'ভিক্ষা-গ্রাম'**—যেই গ্রাম ধ্যানাশ্রম হইতে নাতিদূরে দেড় ক্রোশের মধ্যে, ভিক্ষা সুলভ, অথবা নিজ ব্যয়ে আহার সংস্থানের সুযোগ-সামর্থ্য থাকিলে, সেই স্থানই যোগীর পক্ষে হিতজনক।

৩। **'আলাপ-আলোচনা'**—পালি গ্রন্থের বর্ণনা মতে ৩২ প্রকার সারহীন আলাপ ও আলোচনা না করা। রাজনৈতিক, ভয়জনক, কামোদ্দীপক ও দ্বেষমূলক আলোচনা না করা। পত্রিকা, উপন্যাস ও সারহীন গ্রন্থাদি পাঠ না করা। ইহাদ্বারা ধ্যান নিমিত্তের অন্তর্দ্ধান হয়। তবে আর্য্যসম্মত মিতালাপে যোগীর হিত সাধিত হয়। যেমন তৃষ্ণাক্ষয়কর আলাপ, সসন্তোষ আলাপ, অসৎসঙ্গ বর্জ্জন আলাপ, বীর্য্যমূলক, শীল রক্ষণ মূলক, সমাধি-প্রজ্ঞা-বিমুক্তিমূলক আলাপ যোগীর পক্ষে হিতজনক।

৪। **'সমসঙ্গী'**—যিনি বৃথা বাক্য বলেন না, শীলগুণ সম্পন্ন, যাঁহার আশ্রয়ে চিত্ত সমাহিত হয়, সদুপদেশে চিত্ত বিমুক্তিমুখী করে ও দৃঢ়বীর্য্যের সহিত কাজ করিতে উৎসাহিত করেন, তেমন সমসঙ্গী যোগীর পক্ষে হিতজনক।

৫। **'ভোজন'**—কেহ মিষ্ট ভোজন ভালবাসেন, কেহ অম্ল, কেহ অতি মরিচ, কেহ নাতি লবণ ভালবাসেন। আশৈশব যাঁহার যাহা পরিচিত-

অভ্যস্ত, তাঁহার পক্ষে তাহাই রুচিসম্মত। কাজেই ধ্যানকালীন যোগীর অনুকূল আহার গ্রহণে সাধনার শ্রীবৃদ্ধি হয়। সেই কারণে রুচিসম্মত ভাত-ব্যঞ্জন-খাদ্য-ভোজ্য যোগীর পক্ষে হিতজনক।

৬। **'ঋতু'**—কাহারো পক্ষে শীত ঋতু, কাহারো পক্ষে গ্রীষ্ম ঋতু অনুকূল। কাজেই গরম-ঠান্ডা ভোজন বা ঋতু, যাঁহার পক্ষে যাহা স্বাস্থ্যানুকূল, তাহাই তাঁহার পক্ষে নির্ব্বাচন করা উচিত। নতুবা বিরুদ্ধ ঋতু ও আহারে যোগীর চিত্ত চঞ্চল হয়, একাগ্রতার অন্তরায় হয় ও চিত্তে শান্তি বোধ হয় না। শান্তি নিরুদ্বিগ্ন চিত্তই ধ্যানের সহায়ক। এই গুলির অনুকূল ব্যবস্থাই যোগীর পক্ষে হিতজনক।

৭। **'ঈর্য্যাপথ'**—কাহারো চঙ্‌ক্রমণে বা পায়চারীতে চিত্ত একাগ্র হয়। কাহারো শয়নে বা কাহারো উপবেশনে চিত্ত স্থির থাকে। যাহার পক্ষে যেই পন্থাবলম্বনে সমাধি-সুখ আসন্ন মনে হয়, তাঁহার সেই ঈর্যাপথ গ্রহণ করা উচিত।

যোগী মাত্রেই উপরোক্ত সপ্ত বিষয়ের অভাব পূর্ণ করিয়া যোগসাধনে অবহিত হইবেন। এ সব অগ্রাহ্য করিয়া ধ্যানে রত হইলে, অনুতাপের অংশ গ্রহণ ব্যতীত সাফল্য লাভ করা সম্ভব নহে। বুদ্ধবর্ণিত ধ্যানানুকূল পন্থা বিমুক্তিকামীর হিত-সুখাবহ। সে কারণে সাধক মাত্রেই ইহার পরিণাম চিন্তা করিবেন। বুদ্ধ বলিয়াছেন—"নত্থি ঝানং অপঞ্‌ঞস্‌স।"

চল্লিশ প্রকার শমথ ধ্যান বিধি

দশ প্রকার কৃৎস্ন ধ্যান

১। **'পৃথিবী কৃৎস্ন'**—যোগী প্রথমে স্নান করিয়া বা মুখ-হাত প্রক্ষালন করিয়া ও স্থানটি পরিষ্কার করিয়া বিছানায় বা আসনে বসিবেন। তৎপর বুদ্ধ-ধর্ম্ম-সঙ্ঘগুণ অনুস্মরণ করিয়া ও শ্রদ্ধা-প্রণতি জ্ঞাপন করিয়া চিন্তা করিবেন যে—

"অদ্ধা ইমায পটিপত্তিযা জরামরণম্‌হা মুচ্চিস্‌সামি"—

নিশ্চয় আমি এই প্রতিপত্তি বা সাধনা প্রভাবে জরা-মরণ দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিব।—যোগী চিত্তে এরূপ বদ্ধমূল বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ধ্যান কার্য্য আরম্ভ করিবেন। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত ধ্যান-সংস্কার থাকিলে রক্তবর্ণ মৃত্তিকা দর্শনেও নিমিত্ত জাত হয়। তৎপর যোগী অরুণ বর্ণ বা ঈষৎ রক্ত-বর্ণ অমিশ্রিত মৃত্তিকা সংগ্রহ করিবেন। ঐ মাটিতে অন্য নীলাদি বর্ণ বা পাথর, কাঁকর যেন মিশ্রিত না থাকে। কোন নির্জ্জন স্থানে স্থায়ী মণ্ডল করিতে হইলে, মাটিতে ষোড়শাঙ্গুল প্রমাণ পূর্ণিমার চন্দ্রতুল্য পরিমণ্ডলা-কার ও অতিশয় মসৃণরূপে একটা কৃৎস্নমণ্ডল প্রস্তুত করিবেন। যদি স্থায়ী মণ্ডল করার সুবিধা না থাকে, একখানি মোটা বস্ত্রে বা চর্ম্মখণ্ডে ঐ প্রকারে মণ্ডল করিবেন। ভেরীতলের ন্যায় সমতল ও মসৃণ মণ্ডলই ধ্যানের উপযুক্ত। উহাতে দাগ বা কোন দোষ পরিলক্ষিত হইলে, ধ্যানের সময় বাধা জন্মায়। তৎপর কৃৎস্নমণ্ডল হইতে আড়াই হাত দূরে ষোল আঙ্গুল উচ্চ একটি আসনে (চৌকিতে) বসিবেন। উহার চেয়ে দূরে বসিলে মণ্ডল স্পষ্ট হয় না, আসনে বসিলে মণ্ডলের দোষ দেখা যায়। বেশী উচ্চ আসনে বসিলে গ্রীবা নীচ করিয়া দেখিতে হয়। নীচে বসিলে জানু বেদনা করে। সে কারণে প্রমাণ বিশিষ্ট আসনে বসিয়া ভাবিবেন যে—

"কাম সেবনে কোন আস্বাদ নাই, কাম-ভোগীর বহু দোষ সতত প্রত্যক্ষ, বরঞ্চ কাম-বাসনা ত্যাগে যাবতীয় দুঃখ ভোগ হইতে অব্যাহতি লাভ করা যায়। তৎপর ত্রিরত্নের গুণানুসারে চিত্তে আনন্দ উৎপাদন করিয়া—এই পন্থা সমস্ত বুদ্ধ, পচ্চেকবুদ্ধ, আর্য্যশ্রাবকগণ অনুসরণ করিয়াছেন। ইহাই একমাত্র দুঃখ হইতে পরিত্রাণের পথ। তৎপর ইহার প্রতি গৌরবোৎপাদন করিয়া ভাবিবেন—

'অদ্ধা ইমায পটিপত্তিযা পবিবেকসুখরসস্স ভোগী ভবিস্সামি'—
নিশ্চয়ই আমি প্রবিবেক সুখরসের ভোগী হইব। এইভাবে উৎসাহ উৎপাদন করিয়া, 'দর্পণে মুখাবয়ব দর্শনের ন্যায়' চক্ষু উন্মীলন করিয়া মণ্ডলের দিকে লক্ষ্য নিবন্ধ করিবেন। অতিশয় উন্মীলনে চক্ষু দুর্ব্বল হয়, মণ্ডলও অপ্রকাশিত হয়। সে কারণে নিমিত্ত উৎপন্ন হয় না। চক্ষু সঙ্কোচ করিয়া দর্শনে মণ্ডলও অপ্রকট হয়, চিত্তও সঙ্কুচিত হয়। ইহাতেও নিমিত্ত উৎপন্ন হয় না। মণ্ডলের বর্ণের প্রতি ও লক্ষণের প্রতি মনোযোগ দিবেন না। কেবল পৃথিবী বাচক মহী, মেদিনী, ভূমি, বসুধা, বসুন্ধরা প্রভৃতি শব্দের

মধ্যে যে কোন শব্দ আবৃত্তি করিবেন। তন্মধ্যে 'পৃথিবী, পৃথিবী' এই শব্দই অধিকতর ভাব প্রকাশক।

সময়ে চক্ষু উন্মীলিত ও সময়ে নিমীলিত করিয়া ভাবনা করিবেন। যতদিন 'উদ্‌গ্রহ নিমিত্ত' উৎপন্ন না হয়, ততদিন শতবার, লক্ষবার বা ততোধিকবার ভাবনা করিবেন। এই চর্ম্মচক্ষু-দৃষ্ট আলম্বনের নাম 'পরিকর্ম্ম' নিমিত্ত। এ ভাবে কাজ করিতে করিতে যখন চক্ষু বুজিয়াও উন্মীলনের ন্যায় পরিপূর্ণ মণ্ডল দেখা যাইবে, তখন 'উদ্‌গ্রহ নিমিত্ত' লাভ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। তৎপর মন্ডলের সম্মুখে আর বসিবেন না। নিজের বাসস্থানে প্রবেশ করিয়া ভাবনা করিবেন। যদি কোন কারণে নিমিত্ত অন্তর্হিত হয়, পুনঃ মণ্ডল-সমীপে গিয়া নিমিত্ত গ্রহণ করিবেন। পুনঃ কামরায় আসিয়া মনশ্চক্ষে নিমিত্ত দেখিতে দেখিতে 'পৃথিবী, পৃথিবী' বলিয়া তৎপ্রতি চিত্ত সংযোগ করিবেন। এ ভাবে ধ্যান করিতে করিতে সাময়িক ভাবে কাম, হিংসা, আলস্য-তন্দ্রা, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য ও সংশয়, এই পঞ্চ নীবরণ বা ধ্যানের বাধা অপসারিত হইবে। কলুষ (চিত্তের তমভাব) দূরে সরিয়া পড়িবে। তখন যোগীকে মনে করিতে হইবে, তাহার 'উপচার সমাধি' উৎপন্ন হইয়াছে। এই পরিকর্ম্ম ও উদগ্রহ নিমিত্তযোগে যে ধ্যান উৎপন্ন হয়, তাহাকে পরিকর্ম্ম ধ্যান বলে। ইহার পরে প্রতিভাগ নিমিত্ত উৎপন্ন হয়। তবে উদ্‌গ্রহ ও প্রতিভাগ নিমিত্তের মধ্যে পার্থক্য এই, উদ্‌গ্রহ নিমিত্ত চঞ্চল, উহাতে কৃৎস্নদোষ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু পরিশুদ্ধ অকম্পিত 'প্রতিভাগ নিমিত্ত' থলি হইতে দর্পণ বহিষ্করণ তুল্য, সুধৌত শঙ্খথালা তুল্য, মেঘপটল হইতে চন্দ্র মণ্ডল নিষ্ক্রমণ তুল্য ও মেঘমুখে বলাকা তুল্য 'উদ্‌গ্রহ নিমিত্তকে' প্রদলিত করিয়া বহির্গত হয়। উদ্‌গ্রহ নিমিত্ত হইতে শত সহস্র গুণ ইহা সুপরিশুদ্ধ ও উজ্জ্বলতর। উহাতে বর্ণ ও আকৃতির পরিচিহ্ন প্রতিভাত হয় না। যদি উহার স্থূলতা পরিলক্ষিত হইত, তাহা হইলে চক্ষুবিজ্ঞানের পর্য্যায়ে আসিত এবং অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম লক্ষণ দ্বারা সংমর্ষণ করিতে হইত। এই প্রতিভাগ নিমিত্ত তাদৃশ ঘনাকৃতি সম্পন্ন নহে। কেবল সমাধিলাভীর পরিজ্ঞাননাকার মাত্র উপলব্ধি হয়। প্রতিভাগ নিমিত্ত উৎপন্ন কাল হইতে যোগীর পঞ্চ নীবরণ মাত্র বিষ্কম্ভন বা বাধা প্রাপ্ত হয়। কলুষ সাময়িকভাবে অপসৃত হয়। উপচার সমাধিতে চিত্ত দৃঢ়ভাবে সমাহিত হয়। দুইটি কারণে চিত্ত উপচার ভূমিতে সমাধি-পরায়ণ হয়—প্রথমটি উপচার ভূমিতে চিত্ত পূর্ব্বোক্ত নীবরণ ত্যাগ করিয়া,

অপরটি প্রতিলাভ ভূমিতে ধ্যানাঙ্গ প্রাদুর্ভূত করিয়া। এই দুইটি সমাধির বিভিন্ন কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে। উপচারে ধ্যানাঙ্গ বিশেষ প্রবল হয় না। যেমন স্তন্যপায়ী শিশুকে দাঁড় করাইলে সে ভূমিতে পুনঃ পুনঃ পড়িয়া যায়, তেমন উপচার উৎপন্ন হইলেও চিত্ত সময়ে নিমিত্তকে আশ্রয় করে, সময়ে ভবাঙ্গ বা প্রভাস্বর অমিশ্রিত চিত্তে অবতরণ করে। কিন্তু 'অর্পণা সমাধিতে' ধ্যানাঙ্গ সমূহ প্রবলতর হয়। যেমন বলবান পুরুষ সারাদিন দাঁড়াইয়া থাকিতে সমর্থ, তেমন অর্পণা সমাধিতে উৎপন্ন চিত্ত একবার ভবাঙ্গবার ছেদন করিয়া অহোরাত্র স্থিরভাবে থাকিতে সমর্থ হয়। কুশল জবন পাটি-পাটি নিয়মে চিত্ত প্রবর্ত্তিত হয়। তবে উপচার সমাধি সহিত প্রতিভাগ নিমিত্ত উৎপাদন যোগীর পক্ষে বড়ই শক্ত।

যদি যোগী উপচার প্রাপ্ত আসনে বসিয়াই নিমিত্তকে বাড়াইতে সমর্থ হন এবং তখনই অর্পণা ধ্যান লাভে সমর্থ হন, তাহা হইলে 'সোনায় সোহাগা' অর্থাৎ অত্যুত্তম। যদি অর্পণা উৎপাদনে সমর্থ না হন, তথাপি অপ্রমত্তভাবে উপচার নিমিত্ত 'চক্রবর্ত্তী রাজার প্রকোষ্ঠ সংরক্ষণ তুল্য' রক্ষা করিবেন। কারণ—

> "নিমিত্তং রক্‌খতো লদ্ধং, পরিহানি ন বিজ্জতি,
> আরক্‌খম্‌হি অসন্তম্‌হি লদ্ধং লদ্ধং বিনস্‌সতি।"

নিমিত্তকে সযত্নে রক্ষা করিতে সমর্থ হইলে, লব্ধ সমাধির কোন পরিহানি হয় না। যদি কোন কারণে রক্ষা করিতে অসমর্থ হন, লব্ধ সমাধিও বিনষ্ট হয়।

তখন ভাবনার হিতজনক সপ্তবিধির প্রতি অবহিত হওয়া প্রয়োজন। উহার অনুরূপ আচরণে, যথাশীঘ্র অর্পণা ধ্যান উৎপাদনের সম্ভাবনা হয়। এই কারণে বলা হইয়াছে—

> "সপ্‌পাযে সত্ত সেবেথ, এবং হি পটিপজ্জতো,
> ন চিরেনেব কালেন হোতি কস্‌সচি অপ্‌পণা।"

অর্থাৎ যদি সপ্তবিধি পূর্ণ করা হয়, তদনুরূপ আচরণে, অচির কাল মধ্যে কোন কোন যোগীর অর্পণা ধ্যান লাভ হইয়া থাকে। এই উপায়েও যদি অর্পণার সম্মুখীন হইতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে নিম্নোক্ত দশটি নীতি অনুসারে কার্য্য করিতে হইবে।

দশবিধ অর্পণা কৌশল

(১) যোগীর আভ্যন্তরিক বিশুদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দীর্ঘ কেশলোম ছেদন ও ঘর্ম্মাক্ত দেহ স্নান দ্বারা বিশোধন করা কর্ত্তব্য। বাহ্যিক বিশুদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ক্লিষ্ট-জীর্ণ দুর্গন্ধ বস্ত্র ধৌত করিতে হইবে ও বিছানাদি পরিষ্কার করিতে হইবে। যদি এসব কারণে যোগীর ভিতর-বাহির অপরিশুদ্ধ হয়, তাহা হইলে চিত্ত চৈতসিক জ্ঞানও অপরিশুদ্ধ হইয়া থাকে। যেমন মলিন প্রদীপ বর্ত্তিকার দরুন আভার মলিনতা সূচিত হয়, তেমন অপরিশুদ্ধ-জ্ঞানে সংস্কার সংমর্শনে (মর্দ্দনে) সংস্কারও অভিভূত হয়। সে কারণে ভাবনার শ্রীবৃদ্ধি হয় না। কাজেই পরিশুদ্ধ তৈল-বর্ত্তিকার উজ্জ্বল আভা তুল্য ভিতর-বাহিরের পরিশুদ্ধতায় সাধনাও সফল হয়।

(২) যোগীর ইন্দ্রিয়-সমতা সংরক্ষণে যখন শ্রদ্ধা প্রবল হয়, তখন অপর ইন্দ্রিয়গুলি দুর্ব্বল হয়, তাহা হইলে বীর্য্যেন্দ্রিয় প্রগ্রহণ কৃত্য, স্মৃতীন্দ্রিয় উপস্থাপন কৃত্য, সমাধীন্দ্রিয় অবিক্ষেপ কৃত্য ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয় দর্শন কৃত্য সাধন করিতে সমর্থ হয় না। সে কারণে যথাস্বভাব প্রত্যবেক্ষণে পূর্ণ মনোযোগ বাঞ্ছনীয়। অমনোযোগের কারণগুলিকে সযত্নে দূরে ঠেলিয়া দিবেন। সর্ব্বদা শ্রদ্ধা-প্রজ্ঞা-সমাধি-বীর্য্য চতুষ্টয়ের সম সম ভাবকে জ্ঞানিগণ প্রশংসা করেন।

যাঁহার শ্রদ্ধা বলবতী, প্রজ্ঞা মন্দা, তিনি মৌখিক প্রসন্নতা প্রকাশ করিলেও অবিষয়ে প্রসন্ন হন। আর যাঁহার প্রজ্ঞা বলবতী, শ্রদ্ধা মন্দা, তিনি শঠতা পক্ষ অবলম্বন করেন। তাহা ভৈষজ্য উৎপাদিত রোগের ন্যায় দুশ্চিকিৎস্য। শ্রদ্ধা ও প্রজ্ঞার সমতা থাকিলে বিবেচনা সহকারে বিষয়টি গৃহীত হয় বলিয়া উহাতে প্রসন্নতা লাভ হয়।

যদি যোগীর সমাধিবল প্রবল, বীর্য্যশক্তি স্বল্প হয়, তাহা হইলে তিনি আলস্যদ্বারা প্রভাবিত হন। যদি বীর্য্য প্রবল, সমাধি স্বল্প হয়, উদ্ধতভাবে বিচলিত হন। সমাধি বীর্য্যদ্বারা সংযোজিত হইলে আলস্য উৎপাদিত হয় না। বীর্য্য সমাধিদ্বারা সংযোজিত হইলে উদ্ধতভাব উৎপাদিত হয় না। সেই কারণে সমাধি ও বীর্য্য সম সম বাঞ্ছনীয়। উভয়ের সমতায় অর্পণা জাত হয়। অথবা সমাধিকর্ম্মীর শ্রদ্ধা বলবতী হওয়া উচিত। সমাধিও প্রজ্ঞার সমতায় একাগ্রতা বলবতী হয়। কিন্তু বিদর্শন সাধকের প্রজ্ঞা বলবতী হওয়া উচিত। তাহা হইলে যোগী অবস্থা বা লক্ষণসমূহ উপলব্ধি করিতে সমর্থ

হইবেন। সমাধি প্রজ্ঞার সমতায় নিশ্চয়ই অর্পণা লাভ হয়। কিন্তু স্মৃতি সর্ব্বত্র বলবতী থাকা প্রয়োজন। স্মৃতি চৌকিদারের ন্যায় সর্ব্ব বিষয়ে রক্ষা করে। ব্যঞ্জনে লবণ তুল্য স্মৃতি অপরিহার্য্য। বুদ্ধ বলিয়াছেন—

'সতিঞ্চ খো অহং ভিক্খবে সব্বত্থসাধিকা'তি বদামি।'

হে ভিক্ষুগণ, আমি স্মৃতিকে সর্বার্থসাধিকা বলি। চিত্ত স্মৃতির প্রতিশরণ মাত্র। স্মৃতি বিনা চিত্তকে প্রগ্রহ-নিগ্রহ বা ধারণ ও অবরোধ করা সম্ভব নহে।

(৩) কৃৎস্ন সাধনায় কার্য্য কুশলতা, ভাবনা কুশলতা ও রক্ষণ কুশলতা নিতান্ত আবশ্যক। এই তিনটি বিষয়ে যোগীকে তৎপর হইতে হয়। লব্ধ নিমিত্তের সংরক্ষণই অধিকতর তাৎপর্য্য মূলক। কোন কোন যোগী শীলভঙ্গ করিয়া, আলস্য-তন্দ্রার বশীভূত হইয়াও প্রমাদজনক বিষয় চিন্তার পরিসরে স্থান দিয়া লব্ধ নিমিত্তগুলি হারাইয়া ফেলেন। সে কারণে নিমিত্তোৎপত্তির কালে অতিশয় দৃঢ়তাবলম্বন অনিবার্য্য।

(৪) যখন বীর্য্যের শৈথিল্যভাব পরিলক্ষিত হয় এবং চিত্তের সঙ্কোচনা-বস্থা অনুভূত হয়, তখন প্রশ্রব্ধি প্রমুখ তিনটি ভাবনা না করিয়া ধর্ম্মবিচয় প্রমুখ তিনটি ভাবনা করা উচিত। যেমন আর্দ্রকাষ্ঠ নিক্ষেপ করিয়া অগ্নি প্রজ্বলন অসম্ভব, তেমন বীর্য্য দুর্ব্বল সময়ে প্রশ্রব্ধি-সমাধি-উপেক্ষা ভাবনা অসম্ভব অর্থাৎ কার্য্যকরী হয় না। তখন ধর্ম্মবিচয়-বীর্য্য-প্রীতি ভাবনাই বীর্য্যোৎপাদন ও সঙ্কোচন দূরীকরণে সাহায্য কারক। যেমন শুষ্ক কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিরা অগ্নি প্রজ্বলন সম্ভব. তেমন ধর্ম্মবিচয় প্রমুখ তিনটিই কার্য্য-করী।

কারণ আলস্যপরায়ণ, হীনবীর্য্য যোগীর পক্ষে সাধনা সুলভ মনোভাব গঠন করা সম্ভব নহে।

"ন সক্কা কুসীতেন গন্তুং।"

বুদ্ধ প্রমুখ মহাশ্রাবকগণ দৃঢ়বীর্য্য সহকারে পারমিতা পূর্ণ করিয়া দেহের মমতার প্রতি আসক্তি বর্জ্জন করিয়া ও ত্যাগের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া শমথ-বিদর্শন ভাবনা বলে বিমুক্তি পথ অর্জ্জন করিয়াছেন। তাই কোন যোগীর হীন ব্যবহারে এই অমৃত পথ প্রাপ্তি সম্ভব নহে। বীর্য্যবলে চিত্ত ধারণই ধ্যানের মূল উৎস।

(৫) সময়ে উদ্ধত-চঞ্চল চিত্তকে নিগ্রহও করিতে হয়। অতিশয় দৃঢ়তা-অবলম্বনে যোগী চিত্তকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিলে, প্রশ্রব্ধি-সমাধি-উপেক্ষা ভাবনা দ্বারা চিত্তকে শান্ত করিতে হয়। যেমন অগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে হইলে, আরও কাষ্ঠ না দিয়া জল দিয়াই নিবাইতে হয়, তেমন ধর্ম্মবিচয়-বীর্য্য-প্রীতি-ভাবনা তখন নিষ্প্রয়োজন।

যোগীকে উদ্ধত চিত্তের অবস্থা বুঝিয়া, যেই উপায়ে চিত্ত শান্তভাব ধারণ করে ও ভোজন-ঋতু-ঈর্য্যাপথ প্রভৃতির পরিবর্ত্তনে অনুকূল ভাব গ্রহণ করে, তদুপায় অবলম্বন করিতে হইবে। এ কারণে সময়ে চিত্ত নিগ্রহ করাও অত্যাবশ্যক।

(৬) সময়ে চিত্তের সন্তোষ বিধানার্থ অষ্ট সংবেগ বিধান অনুসরণও অপরিহার্য্য। প্রজ্ঞার দুর্ব্বলতা ও চিত্তোপশমের অব্যবস্থার দরুণ চিত্ত ধ্যানে আনন্দ পায় না, এমতাবস্থায় চিত্তের গতিবেগ সঞ্চালন মানসে জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-অপায়-দুঃখ, অতীত বর্ত্মমূলক দুঃখ, অনাগত বর্ত্মমূলক দুঃখ ও বর্ত্তমান আহারান্বেষণ দুঃখ সম্বন্ধে চিন্তা করা দরকার। কোন কোন যোগীর বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘগুণ অনুস্মরণেও চিত্তে প্রসাদ জাত হয়।

(৭) সময়ে চিত্তকে উপেক্ষা করাও আবশ্যক। উন্মত্ত চিত্তের অবস্থা দর্শনে চিত্তের সমতা উৎপাদন একান্ত করণীয়। চিত্তের অবস্থাকে উপেক্ষা করিলে, চিত্ত যখন সঙ্কীর্ণ ভাব ধারণ করে, অনুদ্ধত অবস্থায় উপনীত হয় ও রুচিবিহীন হয়, তখন আস্তে আস্তে চিত্ত আলম্বনে সমভাবে প্রবর্ত্তিত হয় এবং শমথ পথে উপনীত হয়। সেই হইতে চিত্তের প্রতি প্রগ্রহ-নিগ্রহ-প্রসাদন ভাব প্রয়োগের আবশ্যক হয় না। যেমন সারথী অশ্বকে সমগতিতে পরিচালন করে, তেমন সময়ে উপেক্ষার ভিতর দিয়াও চিত্তগতির পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য।

(৮) যে ভবাসক্ত ব্যক্তি সংসার ত্যাগ করিয়া যাইতে চায় না, যে বাহ্যিক কাজে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে, যাহার চিত্ত সর্ব্বদা বিক্ষিপ্ত, তাদৃশ লোকের সঙ্গ যোগীকে ত্যাগ করিতে হইবে।

(৯) যিনি সংসার দুঃখকে জয় করিবার জন্য বৈরাগ্য পথে আগমন করিয়াছেন, যাঁহারা সমাধিলাভী যোগী, সময়ে নবযোগী তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া ধ্যানের গভীর তত্ত্ব সমূহ জানিয়া লইবেন।

(১০) সর্ব্বক্ষণ যোগীকে সমাধি ভাবনার প্রতি গুরুত্ব দান করিতে হইবে, চিত্তগতি সমাধির দিকে যথাক্রমে নত, অবনত, অত্যবনত করিতে হইবে ও যাহাতে অব্যাহত গতিতে সিদ্ধি লাভে অগ্রসর হন, সে ভাবে উঠিয়া পড়িয়া ভাবনায় অবহিত হইতে হইবে।

পূর্ব্বোক্ত দশবিধ—'অর্পণা কৌশল' প্রত্যেক যোগীর সম্পাদন করা উচিত। কাজেই ইহাতে 'অর্পণা' উৎপাদন নিশ্চিত। তথাপি সাফল্য লাভ না করিলে যোগ-সাধন ত্যাগ না করিয়া বার বার চেষ্টা করিবেন। নিশ্চয় তাঁহার কামনা-সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। সে কারণে জ্ঞানী যোগী চিত্তের প্রবর্ত্তনাকার সম্যক পরিজ্ঞাত হইয়া পুনঃপুনঃ সম সম বীর্য্য প্রয়োগ করিবেন। যাহাতে চিত্ত বিক্ষিপ্ত বা চঞ্চল হয় সেরূপ সাধ্যাতীতভাবে সাধন পথে অগ্রসর হওয়া অনুচিত। 'খুব টান ও খুব ঢিলা' অবস্থার অনুসরণ না করিয়া মধ্যপন্থাবলম্বনে যদি যোগী কাজ করেন, নিমিত্ত অভিমুখে তাঁহার গতি প্রসারিত হইবে। যোগীও 'পৃথিবী, পৃথিবী' বলিয়া সেই কৃৎস্নমণ্ডল অবলম্বনে ধ্যান-নিমিত্ত উৎপাদন পূর্ব্বক মনোদ্বারাবর্ত্তন গতি লাভ করেন। সেই আলম্বনে চিত্ত চারি কিম্বা পাঁচবার জবন গতি সঞ্চার করে। তৎপর এক রূপাবচর চিত্ত জাত হওয়ার পর অবশিষ্ট কামাবচর চিত্তে প্রবলভাবে বিতর্ক-বিচার প্রীতি-সুখ-একাগ্রতা ধ্যানাঙ্গলাভে অগ্রসর হইতে থাকেন।

অর্পণাই চিত্তের পরিপূর্ণ একাগ্রতা আনয়ন করে। তৎপর রূপাবচর কুশল চিত্তের অবস্থা জাগ্রত হয়। এই চিত্তই 'কুশল গুরু কর্ম্ম' নামে অভিহিত। এই রূপাবচর প্রথম ধ্যান চিত্তেই বিতর্কাদি ধ্যানাঙ্গ প্রাদুর্ভূত হয়।

তৎপর কামবাসনা ও অকুশল পক্ষভূত অন্যান্য ধ্যানান্তরায় জনক বিষয় হইতে বিবিক্ত থাকিয়া সবিতর্ক-সবিচার ধ্যানাঙ্গ উৎপাদন করিতে হয়। সেই কারণে প্রথম ধ্যানের পরিত্যাজ্য বিষয় প্রথমে বর্ণিত হইয়াছে। তার পরে ধ্যানাঙ্গ-সংযোগ বিষয় বর্ণিত হইতেছে।

পঞ্চ ধ্যানাঙ্গ

(১) **'বিতর্ক'**—চিত্তবৃত্তি বা চৈতসিক। ইহা আলম্বনে চিত্তের অভিনিরোপণ বা স্থাপন লক্ষণ। এ কারণে বিতর্ক ধ্যানাঙ্গবিশেষ। যদিও ইহা চিত্তকে আহনন বা পুনঃপুনঃ আঘাত করে, তথাপি চিত্তকে আলম্বনের

দিকে আকর্ষণ করাই ইহার স্বভাব ধর্ম্ম। যোগীর এই চিন্তাধারা স্ত্যান-মিদ্ধ অভিভূত করে। আকাশে পক্ষীর পক্ষ সঞ্চালন ও ঘণ্টা প্রহার জনিত মহৎ শব্দ তুল্য বিতর্ক উপমেয়।

(২) **'বিচার'**—অনুমজ্জন লক্ষণ। বিতর্ক-গৃহীত আলম্বনের স্বভাব জানিবার জন্য বিচার উহাতে পুনঃ পুনঃ নিমজ্জিত হয়। সেই কারণে বিচিকিৎসা প্রভাবে চিত্ত দোলায়িত হয় না। তদ্ধেতু বিচারও ধ্যানাঙ্গ। উডডীয়মান পক্ষীর স্থির পাখা ও ঘণ্টার শেষ অনুরব তুল্য বিচার উপমেয়।

(৩) **'প্রীতি'**—সংশয় হীন চিত্তালম্বনে প্রীতি জাত হয়। প্রীতির লক্ষণ সম্প্রিয়ায়ন বা প্রফুল্লতা উৎপাদন। প্রীতিপূর্ণ চিত্ত ব্যাপাদ বা হিংসা বলে উৎকণ্ঠিত হয় না। প্রীতি সংস্কার স্কন্ধ। প্রীতি পাঁচ প্রকার।

পঞ্চ প্রীতি—

(ক) **ক্ষুদ্রিকা প্রীতি**—যোগীর ক্ষুদ্রিকা প্রীতি জাত হইলে শরীরে লোমহর্ষণ হয়। কোন আশ্চর্য্যকর বস্তু দর্শনে বা অশ্রুতপূর্ব্ব সংবাদ শ্রবণে যেমন শরীর শিহরিয়া উঠে, তেমন প্রীতিবেগে লোমাগ্র উর্দ্ধমুখী হয়।

(খ) **ক্ষণিকা প্রীতি**—যোগীর ক্ষণিকা প্রীতি জাত হইলে বিদ্যুৎ প্রভার ন্যায় প্রীতিবেগে শরীর ক্ষণে ক্ষণে ঝলসিয়া উঠে।

(গ) **অবক্রান্তিকা প্রীতি**—যোগীর অবক্রান্তিকা প্রীতি জাত হইলে বীচিমালা যেমন সমুদ্র-সৈকত প্লাবিত করিয়া চলিয়া যায়, তেমন যোগীর দেহ প্রীতিবেগে প্লাবিত করিয়া চলিয়া যায়।

(ঘ) **উদ্বেগা বা উল্লম্ফনা প্রীতি**—যোগীর উদ্বেগা প্রীতি জাত হইলে দেহ আকাশের দিকে উৎক্ষিপ্ত হয়। এমন কি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রীতিবেগে আকাশ পথে চলিয়া যাইতে পারেন।

(ঘ) **স্ফারণা প্রীতি**—যোগীর এই স্ফারণা প্রীতি জাত হইলে প্রীতি-

বেগে সমস্ত দেহ ব্যাপৃত হইয়া যায়। যেমন তৈলসিক্ত কার্পাস বর্ত্তিকার সমস্ত অংশ তৈলময় হয়, তেমন যোগীর সমগ্র শরীর প্রীতিময় হইয়া যায়।

যোগীর এই পঞ্চবিধ প্রীতি ক্রমান্বয়ে শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কায়চিত্তে প্রশান্তিভাব জাত হয়। কায়িক-চৈতসিক সুখ পূর্ণতা লাভ করে। ক্ষণিক-উপচার-অর্পণা সমাধি পরিপক্ক হয়। তখন উত্তরোত্তর উৎসাহ জাগ্রত করিয়া মূল কর্ম্মস্থানের প্রতি লক্ষ্য স্থির করা অতিশয় প্রয়োজন। কেবল প্রীতিরসে ডুবিয়া থাকিলে ধ্যানান্তরায় হয়।

(৪) **'সুখ'**—কায়-চিত্তের পীড়াকে সুষ্ঠুভাবে খাইয়া থাকে বলিয়া সুখ নামে কথিত। সুখটি বেদনা স্কন্ধ। সুখ শারীরিক ও মানসিক দুঃখকে বিতাড়িত করে। সুখের স্বাদলক্ষণ। সুখের আগমনে ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য দুর্ব্বল হয়। মঙ্গলজনক বস্তু দর্শনে প্রীতির সঞ্চার হয়, উহা হস্তগত হইলে সুখের উপলব্ধি হয়। তৃষ্ণার্ত্তের জল দর্শনে প্রীতি, জলপানে সে সুখানুভব করিয়া থাকে। প্রীতি ও সুখের ইহাই পার্থক্য। এই প্রীতি ও সুখ ধ্যানের অঙ্গ স্বরূপ বিধায় ধ্যানাঙ্গ।

(৫) **'একাগ্রতা'**—চিত্তের যে একাগ্রতা তাহাই সমাধি। তখন চিত্ত একটি আলম্বনে স্থিত থাকে। এমতাবস্থায় কামবাসনার গতি শিথিল হয়। এখানে একাগ্রতা সমাধি হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। (১) চারি স্মৃতি-প্রস্থান ভাবনা সমাধির নিমিত্ত; (২) চারি সম্যকপ্রধান সমাধির উপকরণ। এই তিন বিষয়ের যাহা আসেবন-ভাবন-বহুলকরণ, তাহা সমাধি ভাবনা।

সংক্ষেপভাবে পাঁচটি ধ্যানাঙ্গ বুঝিতে হইলে 'বিতর্ক' ধ্যেয় বিষয়ে আরোহণ করায় 'বিচার' নিমজ্জিত রাখে, 'প্রীতি' স্ফুরিত করে, 'সুখ' সংগঠন করে ও 'একাগ্রতা' নিবদ্ধ করিয়া রাখে।

যখন প্রথম ধ্যান-চিত্তে এই ধ্যানাঙ্গ-পঞ্চক উৎপন্ন হয়, পঞ্চ নীবরণ স্ব-কৃত্য সাধনে কৃতকার্য্য হয় না।

দ্বিতীয় ধ্যান-চিত্ত বিতর্ক বর্জ্জিত। যখন এই ধ্যানে চিত্ত আলম্বনের সহিত সুপরিচিত হয়, তখন চিত্ত আলম্বনে পরিচালনের প্রয়োজন হয় না। বিনা বিতর্কে চিত্ত ধ্যানালম্বনে একাগ্র হয়।

তৃতীয় ধ্যান-চিত্ত বিতর্ক-বিচার অঙ্গদ্বয় বর্জ্জিত। তখন বিতর্ক-বিচারের কার্য্য আর অনুভূত হয় না। কারণ চিত্ত যথাক্রমে দক্ষতা লাভ করিয়াছে।

চতুর্থ ধ্যানে প্রীতি, সুখ ও একাগ্রতা প্রবলভাবে থাকে। ইহার কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থা অক্ষুণ্ণ থাকে।

পঞ্চম ধ্যান প্রীতি-বর্জ্জিত। সুখের স্থানটি উপেক্ষা অধিকার করিয়া থাকে। সেই কারণে উপেক্ষা ও একাগ্রতা পঞ্চম ধ্যান চিত্তের প্রধান অঙ্গ।

চিত্ত চৈতসিক প্রতিভাগ নিমিত্তে সর্ব্বতোভাবে যখন নিমজ্জিত বা অর্পিত হয়, তখনই অর্পণা সমাধি নামে অভিহিত হয়। সমাধির পূর্ণাবস্থার নামই 'অর্পণা'।

অর্পণা ধ্যানে প্রাপ্ত চিত্ত সর্ব্বদা জাগ্রত থাকে। সেই কারণে বহিরিন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। মনস্কারের অভাবে পঞ্চেন্দ্রিয়ের কার্য্য অচল। যখন একাগ্রতার দরুণ চিত্ত-শক্তি অতিশয় প্রখর হয়, তখন যোগী অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম-লক্ষণে মনোনিবেশ করিলে প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে সমর্থ হন। ইহাতে প্রজ্ঞার উৎপত্তি সহজ হইয়া পড়িলে তৃষ্ণাক্ষয় করা সম্ভব হয়।

এই সব কারণে কৃৎস্ন ভাবনার ভিতর দিয়া রূপাবচর ধ্যান সম্ভব করিয়া তুলিতে পারিলে, নিব্বাণ লাভের পথ আসন্ন হয়। বুদ্ধের এই মহাদান ও মহাচিন্তা বড়ই আশ্চর্য্য। সাধারণ অরুণ বর্ণ মাটিকে অবলম্বন করিয়া যথাক্রমে পরিকর্ম্ম, উদ্গ্রহ, প্রতিভাগ, উপচার ও অর্পণা ধ্যানে উপনীত হইয়া রূপাবচর পঞ্চ ধ্যানকে আয়ত্ত করা যায়। এ ক্ষুদ্র বস্তু হইতে মহৎ কার্য্য সম্পাদনের বিধান সর্ব্বজ্ঞজ্ঞান ব্যতীত আর কে বর্ণনা করিবে? বাস্তবিক তৃষ্ণা ক্ষয় করিয়া নিব্বাণ লাভ করিতে হইলে, বুদ্ধ প্রদর্শিত এই অমোঘ ধ্যান-তত্ত্ব সকলের অনুধাবন করা উচিত।

২। **'অপ্ বা জল কৃৎস্ন'**—পূর্ব্বকৃত ধ্যানবলে কোন কোন যোগীর নদীপুষ্করিণীর জল দর্শনেও নিমিত্ত উৎপন্ন হয়। যদি যোগী অপ কৃৎস্ন ভাবনা করিতে ইচ্ছা করেন, নীল-পীত-লোহিত-শ্বেত এই চারিবর্ণের জল ত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ বৃষ্টি জল বা অন্য কোন স্বচ্ছ জল গ্রহণ করিবেন। নাতিক্ষুদ্র একটি পাত্রে পরিপূর্ণ জল ঢালিয়া নিৰ্জ্জন স্থানে বসিবেন। তৎপর জলের বর্ণের প্রতি লক্ষ্য করিবেন। ক্ষরণ লক্ষণের প্রতি লক্ষ্য করিবেন না। মনোযোগ সহকারে 'জল, জল' বলিয়া ভাবনা করিবেন।

যদি জলস্রোত প্রবাহিত হইতে দেখা যায়, তাহা হইলে 'উদ্গ্রহ নিমিত্ত' উৎপন্ন হইয়াছে বুঝিতে হইবে। আর যদি জল ফেণা বুদ্বুদ্ মিশ্র দেখা

যায়, তাহা- হইলে কৃৎস্ন দোষ বলিয়া মনে করিবেন। যদি আকাশে মণিময় দর্পণ-মণ্ডল তুল্য জল দেখা যায়, তখন বুঝিতে হইবে 'প্রতিভাগ নিমিত্ত' উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাই যোগীর উপচার ধ্যান। এভাবে যোগী যথাক্রমে পঞ্চম ধ্যান পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে সমর্থ হন। অবশিষ্ট পৃথিবী কৃৎস্ন দ্রষ্টব্য।

৩। **'তেজ কৃৎস্ন'**—পূর্বজন্মার্জ্জিত ধ্যান বলে কোন কোন যোগীর দীপ-শিখায়, চুল্লীতে, দাবাগ্নি প্রভৃতিতে নিমিত্ত উৎপন্ন হয়।

তেজ কৃৎস্ন-মণ্ডল নির্ম্মাণ করিতে হইলে, স্নিগ্ধ সারপ্রধান বৃক্ষ টুকরা টুকরা করিয়া কাটিবেন। তৎপর সুবিধা মত নির্জ্জন স্থানে স্তূপাকারে টুকরাগুলি সজ্জিত করিয়া অগ্নি সংযোগ করিবেন ও একপার্শ্বে চর্ম্ম বা মোটা বস্ত্র খণ্ডে ষোল আঙ্গুল পরিমিত গোলাকার একটি ছিদ্র করিবেন। তাহা সম্মুখে রাখিয়া আড়াই হাত দূরে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে বসিবেন। কাঠ বা ধূমের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া ঘন রশ্মির প্রতি লক্ষ্য করিতে করিতে 'তেজ, তেজ' বা অগ্নি, অগ্নি বলিয়া প্রত্যবেক্ষণ করিবেন, উষ্ণত্ব লক্ষণের প্রতি লক্ষ্য করিবেন না।

যখন অগ্নিশিখা ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া পড়িতেছে দেখা যাইবে, তখন যোগীকে অবধারণ করিতে হইবে তাঁহার 'উদ্‌গ্রহ নিমিত্ত' উৎপন্ন হইয়াছে। জ্বলন্ত কাষ্ঠ, অঙ্গার, ভস্ম, ধূমাদি দেখিলে, ইহা কৃৎস্ন দোষ বলিয়া মনে করিবেন। যখন 'প্রতিভাগ নিমিত্ত' উৎপন্ন হইবে, তখন নির্ম্মলাকাশে স্থাপিত একখণ্ড রক্ত কম্বলের ন্যায়, সুবর্ণ তালবৃন্তের ন্যায় অথবা কাঞ্চন স্তম্ভের ন্যায়, বোধ হইবে। তৎপর যথাক্রমে উপচার ও অর্পণা ধ্যান এবং পঞ্চ ধ্যানাঙ্গ প্রাদুর্ভূত হইবে। পূর্ব্ববৎ।

৪। **'বায়ু কৃৎস্ন'**—এই ভাবনা বায়ুর অনুভূতিতেই করিতে হয়। প্রবল বায়ু বহিতেছে দেখিয়া অথবা শরীরকে বাতাস স্পর্শ করিতেছে অনুভব করিয়া ভাবনা করিতে হয়। ঘন পত্র পল্লব সম্পন্ন কোন বৃক্ষাগ্র কাঁপিতেছে বা দুলিতেছে দেখিয়া অথবা জানালা ও প্রাচীর ছিদ্র দিয়া যে বাতাস বহিতেছে, উহা শরীরকে আঘাত করিতেছে ; এই অনুভূতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া 'বায়ু, বায়ু' বলিয়া ভাবনা করিবেন। যখন যোগীর উদগ্রহ নিমিত্ত উৎপন্ন হইবে, তখন চুল্লী হইতে অত্যুষ্ণ পায়াস ভাজন মাটিতে রাখিলে যেরূপ বর্ত্তুলাকার উষ্ণ বাষ্প রাশি উর্দ্ধদিকে উঠে, সেরূপ বাষ্প প্রবাহ দর্শন করিবেন। যখন

প্রতিভাগ নিমিত্ত উৎপন্ন হইবে, তখন নিশ্চল বাষ্পরাশি স্তম্ভতুল্য দর্শন করিবেন। পূর্ব্ববৎ।

৫। **'নীল কৃৎস্ন'**—নীলবর্ণ বস্ত্র বা বাষ্প প্রভৃতিতে পূর্ব্বজন্ম-সঞ্চিত ধ্যানবলে নিমিত্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে। কাহারও কাহারও পূজাবেদীতে সজ্জিত নীল পুষ্পরাশি দর্শনে ও নীল পুষ্প পরিপূর্ণ চঙ্গোটক দর্শনে নিমিত্ত হইয়া থাকে। নতুবা নীলবর্ণ বস্ত্র একটি ভাজন মুখে ভেরীতল তুল্য বাঁধিয়া পূর্ব্ববৎ আড়াই হাত দূরে বসিয়া 'নীল, 'নীল' বলিয়া প্রত্যবেক্ষণ করিবেন। ইহাতেও পৃথিবী কৃৎস্ন তুল্য উদ্‌গ্রহ নিমিত্ত জাত হইবে। 'প্রতিভাগ নিমিত্ত' যখন দেখিবেন, তখন মণিবর্ণ তালবৃন্ত সদৃশ সুস্থির নিমিত্ত দর্শন করিবেন। পূর্ব্ববৎ।

৬। **'পীত কৃৎস্ন'**—নীল কৃৎস্ন তুল্য পীত কৃৎস্নও পীতবর্ণ বস্ত্র, পুষ্পমালা দর্শনে নিমিত্ত জাত হয়। অথবা পীতবস্ত্র ভাজনে বাঁধিয়া পূর্ব্ববৎ ধ্যানে অগ্রসর হইবেন। নিমিত্ত বর্ণানুসারে জ্ঞাতব্য। কেবল 'পীত, পীত' বলিয়া প্রত্যবেক্ষণ করিবেন।

৭। **'লোহিত কৃৎস্ন'**—ইহাও লোহিত বর্ণ বস্ত্র কিম্বা পুষ্প দর্শনে অথবা ভাজনে লোহিতবর্ণ বস্ত্র পূর্ব্বোক্ত নিয়মে বাঁধিয়া 'লোহিত, লোহিত' বলিয়া প্রত্যবেক্ষণ করিবেন। নিমিত্তাদি পূর্ব্ববৎ।

৮। **'অবদাত বা শ্বেত কৃৎস্ন'**—শ্বেতবর্ণ বেলফুল, রাজ মালতী, শ্বেত পদ্ম দর্শনে চন্দ্রমণ্ডল দর্শনে স্বাভাবিকভাবে নিমিত্ত উৎপন্ন হয়। অথবা শ্বেত বর্ণ রঙ টিনে বা তক্তায় পূর্ব্বোক্ত নিয়মে লাগাইয়া 'অবদাত, অবদাত' শব্দ উচ্চারণে প্রত্যবেক্ষণ করিবেন। পূর্ব্ববৎ।

৯। **'আলোক কৃৎস্ন'**—কোন প্রাচীরের ছিদ্র বা জানালা দিয়া যে চন্দ্রালোক ও সূর্য্যরশ্মি ভূমিতে পতিত হয়, ঘন পত্রান্তরালের ভিতর দিয়া চন্দ্র-সূর্য্যের রশ্মি যে কোন আকারে ভূমিতে পড়িলে, উহা দেখিয়া দেখিয়া 'আলোক, আলোক' বলিয়া প্রত্যবেক্ষণ করিবেন। যদি রাত্রিতে ভাবনা করিতে হয়, একটি মৃন্ময় ভাজনে গোলাকার একটি ছিদ্র করিয়া উহার মুখখানি বন্ধ করিয়া দিতে হয়। তৎপর ভাজনের ভিতরে প্রদীপ প্রজ্বলিত করিয়া ভাজনের মুখখানি প্রাচীরের বা তক্তার উপর প্রতিফলিত করিতে হয়।

তখন যে গোলাকার আলোক দেখা যাইবে উহা দেখিয়া দেখিয়াও ভাবনা করা যায়। এই উপায় সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। এখানে 'উদ্‌গ্রহ নিমিত্ত' মণ্ডল সদৃশ প্রতিভাত হয়। 'প্রতিভাগ নিমিত্ত' স্বচ্ছ আলোকপুঞ্জ সদৃশ দেখা যাইবে। পূর্ব্ববৎ।

১০। **'আকাশ কৃৎস্ন'**—প্রাচীরের ছিদ্র দিয়া বা জানালার ছিদ্র দিয়াও 'আকাশ কৃৎস্ন' ভাবনা করা যায়। নতুবা ষোড়শাঙ্গুল পরিমণ্ডলাকারে একখানি চর্ম্মখণ্ডে বা মোটা বস্ত্রে ছিদ্র করিবেন। তৎপর 'আকাশ, আকাশ' বলিয়া প্রত্যবেক্ষণ করিবেন। ঠিক ছিদ্র প্রমাণ গোলাকার আকাশ যখন প্রত্যক্ষ হইবে, তখন 'উদ্‌গ্রহ নিমিত্ত' উৎপন্ন হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। ইহাকে বাড়াইতে চাহিলেও আর বাড়িবে না। 'প্রতিভাগ নিমিত্ত' উৎপন্ন হইলে আকাশ মণ্ডল প্রতিভাত হয়। উহা বাড়াইতে চাহিলেও বাড়াইতে পারা যায়। অবশিষ্ট পৃথিবী কৃৎস্ন তুল্য।

দশ কৃৎস্ন ধ্যানের প্রভাব

১। পৃথিবী কৃৎস্ন প্রভাবে ঋদ্ধিশালী যোগী একজন বহুজন হইতে পারেন; আকাশে ও জলে পৃথিবী নির্ম্মাণ করিয়া পদব্রজে গমন করিতে পারেন, তথায় বসিতে, শুইতে ও দাঁড়াইতে পারেন।

২। অপ কৃৎস্ন প্রভাবে ভূমিতে নিমগ্ন হইতে পারেন, ভূমি-পর্ব্বত-প্রাচীর ভেদ করিয়া যাইতে পারেন ও কম্পন করিতে পারেন।

৩। তেজ-কৃৎস্ন প্রভাবে ধূম উৎপাদন, অগ্নি প্রজ্বালন, অঙ্গার বৃষ্টি বর্ষণ, আলোকোদ্ভাবন ও দিব্যচক্ষু উৎপাদন করিতে পারেন।

৪। বায়ু কৃৎস্ন -প্রভাবে বায়ুগতিতে গমন ও বায়ু-বৃষ্টি-উৎপাদন করিতে পারেন।

৫। নীল কৃৎস্ন প্রভাবে অন্ধকার সৃষ্টি ও সুবর্ণ-দুর্ব্বর্ণ অবস্থা আনয়ন করিতে পারেন।

৬। পীত কৃৎস্ন প্রভাবে পীতবর্ণ রূপোৎপাদন ও সুবর্ণরূপ নির্ম্মাণ করিতে পারেন।

৭। লোহিত কৃৎস্ন প্রভাবে লোহিতরূপ সৃজন প্রভৃতি করিতে পারেন।

৮। অবদাত (শুভ্র) কৃৎস্ন প্রভাবে স্ত্যান-মিদ্ধ বিতাড়ন, অন্ধকার

দূরীকরণ ও দিব্যচক্ষু প্রভাবে রূপ-দর্শন-সমর্থ আলোক উৎপাদন করিতে পারেন।

৯। আলোক কৃৎস্ন প্রভাবে স্ত্যান-মিদ্ধ বিতাড়ন, অন্ধকার দূরীকরণ, দিব্যচক্ষু উৎপাদন প্রভৃতি করিতে পারেন।

১০। আকাশ কৃৎস্ন প্রভাবে আবৃত স্থান বিবৃতকরণ, ভূমিপর্ব্বত মধ্যে আকাশ নির্ম্মাণ করিয়া গমনাগমন ও প্রাচীর ভেদ করিয়া গমনাগমন করিতে পারেন।

দশ প্রকার অশুভ ধ্যান

প্রথমে গুরুর নিকটে অশুভ ধ্যান-বিধান শিক্ষা করিতে হয়। মৃতদেহ লইয়া একাকী ধ্যান করা অতিশয় সাহসের দরকার। এই ধ্যানে যথেষ্ট ভয় ও উপদ্রব আছে। ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র বিধানগুলি গুরু সুচারুরূপে শিক্ষা দিবেন। গমন বিধান প্রভৃতি একাদশ প্রকার নীতি শিক্ষা করিয়া অতি সন্তর্পণে শ্মশানে-মশানে যাইয়া ধ্যানে অবহিত হইবেন। পুরুষ পুরুষ দেহাবলম্বনে ভাবনা করিবেন। পুরুষের পক্ষে স্ত্রীদেহ নিষিদ্ধ। নারী নারীদেহে ভাবনা করিবেন।

১১। **উদ্ধ্মাত মৃতদেহ ঘৃণিত**—এভাবে শত সহস্রবার চিন্তা করিবেন। আবার চক্ষু নিমীলিত করিয়া বার বার ভাবনা করিবেন। তাহা হইলে 'উদ্‌গ্রহ নিমিত্ত' সংগৃহীত হইবে। যখন উন্মীলিত অবস্থায় দর্শনের ন্যায় নিমীলিতাবস্থায় দেখা যাইবে, তখনই নিমিত্ত সংগৃহীত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যদি কখনও নিমিত্ত লাভ না হয়, মৃতদেহটি স্মৃতিতে অঙ্কিত করিয়া আপন বাসস্থানে আগমন করিয়া ভাবনা করিবেন।

কোন কোন যোগীর নিকট মৃতদেহটি যেন সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে, অথবা চাপিয়া ধরিতেছে বলিয়া বিভ্রম হয়। তখন যোগী স্মৃতি সহকারে ভাবিবেন, মৃতদেহ কখনও চলিতে পারে না। ইহা আমার স্মৃতি বিভ্রম। সে কারণে শ্মশানের কোন্ দিকে কি আছে, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিয়া রাখা দরকার। নতুবা গাছ-পাষাণকেও মৃত দেহবৎ মনে হইবে। যদি এভাবে 'উদ্‌গ্রহ নিমিত্ত' সংগৃহীত হইয়াছে, মনে হয়, তাহা হইলে কর্ম্মস্থানে চিত্ত তন্ময় হয়। চক্ষু উন্মীলিত মাত্রেই 'উদ্‌গ্রহ নিমিত্ত' সম্মুখীন হয়। তৎপর 'প্রতিভাগ নিমিত্ত' উৎপন্ন হয়। এই নিমিত্ত লাভের পরে 'অর্পণা ধ্যান'

জাত হয়। অর্পণার উপর স্থিত থাকিয়া ত্রিলক্ষণ দ্বারা বিদর্শনমুখী হইতে পারিলে অর্হত্ত্ব প্রত্যক্ষ হয়।

তবে এখানে দুই নিমিত্তের মধ্যে পার্থক্য এই—'উদ্‌গ্রহ নিমিত্তে' বিরূপ, বীভৎস, ভীষণরূপে মৃতদেহ দেখা যায়। 'প্রতিভাগ নিমিত্তে' পরিপূর্ণ ভোজন করিয়া শায়িত স্থূলাঙ্গ ব্যক্তির ন্যায় মৃতদেহ প্রত্যক্ষ হয়। তখন যোগীর পঞ্চ নীবরণ ধ্বংসপ্রায় হয়। সেই নিমিত্তে চিত্তের অভিনিরোপণভূত বিতর্ক, নিমিত্ত অনুমজ্জন কৃত্য সাধনকারী বিচার, বিশেষত্ব লাভে আনন্দ-দায়িনী প্রীতি, প্রীত চিত্তের প্রশান্তি সম্ভাবনা হেতু সুখ ও সুখিত চিত্তের সমাধি সম্ভাবনা কারণে একাগ্রতা উৎপন্ন হওয়ায় ধ্যানাঙ্গ প্রাদুর্ভূত হয়। তখন প্রথম ধ্যানের প্রতিবিম্বভূত উপচার ধ্যান উৎপন্ন হয়।

১২। **'বিনীলক'**—যেই মৃতদেহের মাংস বহুল স্থানে রক্তবর্ণ, পূয সঞ্চিত স্থানে শ্বেতবর্ণ ও শরীরের অন্যান্য স্থানে নীল বস্ত্রাবৃত তুল্য নীলবর্ণ পরিলক্ষিত হয়, তাহাকে বিনীলক মৃতদেহ বলে।

যোগী এই 'বিনীলক ঘৃণিত দেহ' দর্শনে বার বার চিত্তে স্থান দিবেন। তৎপর যদি 'উদ্‌গ্রহ নিমিত্ত' জাত হয়, তখন কবর বা চিত্র-বিচিত্রবর্ণ দেহ প্রতিভাত হইবে। 'প্রতিভাগ নিমিত্ত' জাত হইলে পরিপূর্ণ দেহ পরিদৃষ্ট হইবে। বিনীলক দেহে নিমিত্ত গ্রহণ করিতে হইলে সহসা কার্য্য সম্পাদনে যোগী মনোযোগী হইবেন। কারণ দেহবর্ণ শীঘ্রই পরিবর্ত্তিত হয়। সেই কারণে এই নিমিত্ত দুর্ল্লভ।

১৩। **'পূয-পূর্ণ'**—মৃতদেহের যেই যেই অংশ কাটিয়া পূয নির্গত হয় ও শরীরের নবদ্বার দিয়া যে পূয ক্ষরিত হয়, তাহাই বিপূয পূর্ণ দেহ।

যোগী 'পূয পূর্ণ দেহ' বার বার বলিয়া অবস্থাটি সম্যকরূপে অবগত হইবেন। তৎপর মৃতদেহ স্রাবিত তুল্য দর্শন করিলে 'উদ্‌গ্রহ নিমিত্ত' ও নিশ্চলতা ভাব পরিদৃষ্ট হইলে 'প্রতিভাগ নিমিত্ত' উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া জানিবেন।

১৪। **'ছিদ্রী-কৃত'**—মধ্যভাগে দ্বিধা বিভক্ত মৃত দেহ। যেই দেহ ছিঁড়িয়া কাটিয়া দুইখণ্ড হইয়াছে, তাহাই বিশেষরূপে ছিদ্রী-কৃত দেহ। যুদ্ধ স্থানে, দস্যুদের জঙ্গলে, রাজাদ্বারা চোর ঘাতনের স্থানে ও সিংহব্যাঘ্র খাদিত দেহে এই ভাবনা করা যায়। নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত দেহাংশ যদি পাওয়া যায়

ভাল, তবে হস্তদ্বারা উহা সংগ্রহ করা উচিত নহে। অন্য লোকেদের দ্বারা সংগ্রহ করাইবেন, লোকের অভাবে যষ্টিদ্বারা এক অঙ্গুলি অন্তর দেহাংশ স্থাপন করিবেন। তৎপর 'ছিদ্রী-কৃত দেহ ঘৃণিত' বার বার বলিয়া ভাবনা করিবেন। যখন দেহের মধ্যভাগে ছিন্ন তুল্য প্রতিভাত হইবে, তখন 'উদ্‌গ্রহ নিমিত্ত' উৎপন্ন হইয়াছে জানিবেন। যখন পরিপূর্ণ দেহ পরিদৃষ্ট হইবে তখন 'প্রতিভাগ নিমিত্ত' উৎপন্ন হইয়াছে জানিবেন।

১৫। **'বিখাদিত'**—মৃত দেহের যেই যেই অংশ কুকুর-শৃগাল প্রভৃতি দ্বারা ভক্ষিত হইয়াছে, তাহাই বিখাদিত মৃতদেহ। এইরূপ দেহ দেখিয়া 'বিখাদিত দেহ ঘৃণিত' এভাবে বার বার ভাবনা করিবেন। যখন খাদিত অংশ সদৃশ প্রতিভাত হইবে, তখন 'উদ্‌গ্রহ নিমিত্ত' উৎপন্ন হইয়াছে, জানিতে হইবে। যখন পরিপূর্ণ দেহ পরিদৃষ্ট হইবে, তখন 'প্রতিভাগ নিমিত্ত' উৎপন্ন হইয়াছে, জানিতে হইবে।

১৬। **'বিক্ষিপ্ত'**—নানা দিকে বিক্ষিপ্ত মৃতদেহ। যেই মৃত দেহের একদিকে হস্ত, একদিকে পদ, একদিকে মস্তক বিক্ষিপ্ত ভাবে পড়িয়া থাকে, ঐ গুলিকে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে একাঙ্গুল অন্তত সজ্জিত করিয়া 'বিক্ষিপ্ত মৃতদেহ ঘৃণিত' এ ভাবে বার বার ভাবনা করিবেন। যখন এক এক খণ্ড দেহ প্রকাশ্য ভাবে অনুভূত হইবে, তখন 'উদ্‌গ্রহ নিমিত্ত' উৎপন্ন হইয়াছে, জানিতে হইবে। যখন পরিপূর্ণ দেহ পরিদৃষ্ট হইবে, তখন 'প্রতিভাগ নিমিত্ত' উৎপন্ন হইয়াছে, জানিতে হইবে।

১৭। **'কর্ত্তিত বিক্ষিপ্ত'**—যেই মৃত দেহের কোন কোন অংশ কাক-পদাকারে অস্ত্রদ্বারা কর্ত্তিত করা হইয়াছে এবং কোন কোন অংশ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহাই কর্ত্তিত বিক্ষিপ্ত মৃতদেহ। উহাও একাঙ্গুল অন্তর সজ্জিত করিয়া 'কর্ত্তিত বিক্ষিপ্ত মৃতদেহ ঘৃণিত' এ ভাবে বার বার স্মৃতি পথে উদিত করিবেন।

যখন কর্ত্তিত মাংস দৃশ্যমানরূপে প্রতিভাত হইবে, তখন 'উদ্‌গ্রহ নিমিত্ত' উৎপন্ন হইয়াছে জানিতে হইবে। যখন পরিপূর্ণরূপে দেহটি পরিদৃষ্ট হইবে, তখন 'প্রতিভাগ নিমিত্ত' উৎপন্ন হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

১৮। **'রক্তাক্ত'**—যেই কর্ত্তিত মৃতদেহের নানা অংশ হইতে রক্ত-স্রাবিত হইতেছে অথবা যেই দেহ হইতে রক্ত স্রাবিত হইয়া শরীর ম্রক্ষিত হইয়া

গিয়াছে, তাহাই রক্তাক্ত মৃতদেহ। যুদ্ধ স্থানে, আঘাত কারণে, ব্রণস্থানে বা মুখ দিয়া রক্তবমি কালে, এসব নিমিত্ত পাওয়া যায়। তাহা দেখিয়া 'রক্তাক্ত মৃতদেহ ঘৃণিত' এ ভাবে বার বার ভাবনা করিবেন। যখন বায়ুচালিত রক্ত পতাকা দুলিতেছে তুল্য পরিদৃষ্ট হইবে, তখন 'উদ্গ্রহ নিমিত্ত' উৎপন্ন হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। যখন উহার স্থির ভাব প্রত্যক্ষ হইবে, তখন 'প্রতিভাগ নিমিত্ত' উৎপন্ন হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

১৯। **'কীট-পুর্ণ'**—যেই মৃতদেহ হইতে দুই তিন দিন পরে, নবদ্বার দিয়া কৃমিরাশি নির্গত হয় অথবা কুকুর, শৃগাল, মনুষ্য প্রভৃতির মৃতদেহ হইতে কৃমিজাত হইয়া যখন শরীর প্রমাণ বেষ্টিত হয়, তখন উহা দেখিয়া 'কীটপূর্ণ এই মৃতদেহ ঘৃণিত' বার বার ভাবনা উৎপাদন করিবেন। যখন চলমান দেহ পরিদৃষ্ট হইবে, তখন 'উদ্গ্রহ নিমিত্ত' উৎপন্ন হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। যখন অন্নপিণ্ডের স্তূপতুল্য কৃমিপূর্ণ দেহ পরিদৃষ্ট হইবে, তখন 'প্রতিভাগ নিমিত্ত' জাত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

২০। **'অস্থি-পঞ্জর'**—মৃতদেহের চর্ম্ম, মাংস, স্নায়ু বর্জ্জিত যে কংকাল, তাহাই অস্থি-পঞ্জর। যোগী দেহের পরিণামের প্রতি লক্ষ্য করিয়া 'শ্বেতবর্ণ এই অস্থি', এ ভাবে না দেখিয়া এই 'অস্থি-পঞ্জর ঘৃণিত' এইরূপে বার বার দেহের অবস্থার প্রতি ভাবনা করিবেন। এই হাতের অস্থি, এই পায়ের, জঙ্ঘার, উরুর, উদরের, বাহুর অস্থি। এভাবে পৃথক পৃথকরূপে উহাকে দর্শন করিবেন। এই অস্থি দীর্ঘ, ক্ষুদ্র, মহৎ এভাবে আকারের প্রতি লক্ষ্য করিবেন না। দেহের প্রত্যেক অস্থিগুলির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে, যেই অস্থির প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, উহাকে অবলম্বন করিয়া ধ্যান নিবিষ্ট হইলে 'অর্পণা ধ্যান' পর্য্যন্ত অগ্রসর হওয়া যায়। যদি নিমিত্ত উৎপাদন সম্ভব না হয়, ললাটাস্থির প্রতি লক্ষ্য করিয়া ভাবনা করিবেন। পুনঃ কীটপূর্ণ দেহ হইতে প্রত্যেকটির পরিণাম চিন্তা করিবেন।

এখানে 'উদ্গ্রহ' ও 'প্রতিভাগ নিমিত্ত' একরূপই হয়, কিন্তু অস্থিপঞ্জরের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ হইলে 'উদ্গ্রহ নিমিত্তে' বিবর দেখা যায়। 'প্রতিভাগ নিমিত্তে' পরিপূর্ণভাব দৃষ্ট হয়।

একখানি মাত্র অস্থিতে ভীষণরূপ দেখা গেলে 'উদ্গ্রহ নিমিত্ত' ও 'প্রতিভাগ নিমিত্তে' প্রীতি-সৌমনস্য ভাব জাগ্রত হয়। ইহাতে যোগী উপচার ধ্যানের আসন্নে পৌঁছেন।

অর্থকথায় বর্ণিত হইয়াছে—'চারি ব্রহ্মবিহার ভাবনায় ও দশ অশুভ ভাবনায় 'প্রতিভাগ নিমিত্ত' লাভ হয় না। ব্রহ্মবিহারের সীমাসম্ভেদেই নিমিত্ত সূচিত হয়।

দশ অশুভ ভাবনার ফল

(১) মৃতদেহের প্রথমাবস্থার পরিণাম দর্শন করিলে, শরীরের আকৃতি-প্রকৃতি দর্শনে যাঁহারা মোহিত হন, তাঁহারা স্ফীত মৃতদেহ দর্শন করিয়া শরীরের প্রতি বিরাগ উৎপাদনে সমর্থ হন। কাজেই ইহা কাম-চিন্তা ত্যাগের সাহায্য করে।

(২) যাঁহারা রূপ দর্শনে আগ্রহশীল, যাঁহাদের সুন্দর বর্ণ দর্শনে নয়ন তৃপ্ত করিবার বাসনা প্রবল, তাঁহাদের বিনীলক ভাবনা উপকারী।

(৩) যাঁহারা সুগন্ধ দ্রব্য দ্বারা বা পুষ্পমালা প্রভৃতি দ্বারা দুর্গন্ধময় শরীরের শোভাবর্দ্ধনে আগ্রহশীল, তাঁহাদের পক্ষে পূযপূর্ণ দেহের পরিণাম চিন্তাস্বরূপ এই ভাবনা উপকারী।

(৪) যাঁহারা দেহের প্রতি অত্যাসক্ত ও প্রিয় ব্যক্তির অদর্শনে অস্বস্তি বোধ করেন, তাঁহাদের পক্ষে ছিদ্রীকৃত দেহের পরিণাম চিন্তাই উপকারী।

(৫) যাঁহারা শরীরের মাংস বহুল স্থানে যেমন মুখ, স্তন, যোনি ও লিঙ্গদর্শনে আনন্দ বোধ করেন এবং বার বার দেখিতে সমুৎসুক, তাঁহাদের পক্ষে বিখাদিত দেহের পরিণাম চিন্তাই উপকারী।

(৬) যাঁহারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের লীলাতে আসক্ত হইয়া মোহিত হন, তাঁহাদের পক্ষে বিক্ষিপ্ত দেহের পরিণাম চিন্তাই উপকারী।

(৭) যাঁহারা সৌন্দর্য্যের অপচয়ে অনুতপ্ত, সর্ব্বদা শরীর সম্পদ রক্ষণে ব্যস্ত ও বিলাসিতার মাত্রা পূর্ণ করিতে সর্ব্বদা যত্নশীল, তাঁহাদের কর্ত্তিত বিক্ষিপ্ত দেহের পরিণাম চিন্তাই উপকারী।

(৮) যাঁহারা অলঙ্কার পরিহিত দেহ দর্শনে বিমুগ্ধ হন, সর্ব্বদা অলঙ্কৃত দেহের অনুরাগী, তাঁহাদের পক্ষে রক্তাক্ত দেহের পরিণাম স্মরণই উপকারী।

(৯) যাঁহারা দেহের প্রতি আমিত্ব পরায়ণ, সর্ব্বদা আমিত্বভাবে গর্ব্বোন্নত থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে কীট-পূর্ণ দেহের পরিণাম চিন্তাই উপকারী।

(১০) যাঁহারা দন্ত-সৌন্দর্য্যে তৃপ্তি লাভ করে, তাঁহাদের পক্ষে দেহাস্থির পরিণাম চিন্তাই উপকারী।

যেমন খরস্রোতা নদীতে নৌকাখানি অরিত্রবলে থামাইতে হয়, তেমন নিমিত্ত-দুর্ব্বল চিত্তকে বিতর্কবলে একাগ্র করিতে হয়। বিতর্ক বিনা চিত্ত স্থির করা কঠিন। সেই কারণে এই ভাবনায় প্রথম ধ্যান মাত্র লাভ হয়।

দেহ ঘৃণিত হইলেও পঙ্কে উৎপন্ন পঙ্কজ তুল্য 'আমি নিশ্চয়ই এই ভাবনা বলে জরা-ব্যাধি-মৃত্যু হইতে মুক্তি লাভ করিব' এই ধারণা যদি প্রবল থাকে, পঞ্চ নীবরণ ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই প্রীতি ও সৌমনস্য উৎপন্ন হয়।

এই অশুভ ভাবনা দশ প্রকার হইলেও লক্ষণত এক প্রকার। কারণ এই দেহ অশুচি, দুর্গন্ধ, ঘৃণিত ও প্রতিকূল। যেমন জীবিত শরীর, তেমন মৃত শরীরও অশুচি প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ। তবে আমরা বস্ত্রাদি আগন্তুক বস্তু দ্বারা শরীরকে আবৃত রাখিয়াছি বলিয়া উহার প্রকৃত লক্ষণ দেখা যায় না। স্বভাবত এই দেহে ত্রিশতাধিক অস্থিপঞ্জর, অশীতিশত সন্ধি, নয়শত স্নায়ু ও নয়শত মাংসপেশী আছে। এই দেহ আর্দ্র মনুষ্য চর্ম্মদ্বারা আবৃত, ছিদ্রানুছিদ্র ও নিত্য ক্ষরণশীল। দেহ কৃমির বাস্তুভূমি, রোগের লীলাক্ষেত্র, অনন্ত দুঃখের আকর, সর্ব্বদা নবদ্বার দিয়া একটা না একটা অশুচি পদার্থ বাহির হইতেছে। সেই কারণে প্রক্ষালন করিয়া সুগন্ধি লেপন করিয়া ও বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া অশুচি ঢাকিবার চেষ্টায় মানুষ তৎপর রহিয়াছে। দেহ আগন্তুক অলঙ্কারে সজ্জিত রাখা হয় বলিয়া স্ত্রী পুরুষকে, পুরুষ স্ত্রীকে ভালবাসে। যদি অশুচি পদার্থ দেহের বহির্ভাগে থাকিত, এমন কি মাতাও পুত্রকে আদর করিত না। দেহের পরিণাম দর্শন করিয়া প্রত্যেক নরনারীর দেহের মধ্যে আসক্তি সঞ্চয়ে স-বিচার সজাগ থাকা উচিত।

দশ প্রকার অনুস্মৃতি ভাবনা

২১। **'বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনা'**—বুদ্ধের নয়টি গুণের মধ্যে যে কোন একটি গুণকে অবলম্বন করিয়া এই ভাবনা করা যায়। বুদ্ধের এক একটি গুণ কি কি কারণে জাত, যোগীকে প্রথমে তাহা জানিতে হইবে। দশটি গুণের বিচার বিভাগ সকলের পরিজ্ঞাত হওয়া উচিত।

কোন কোন আচার্য্যগণ একটি বুদ্ধগুণকে অনুস্মরণ করিতে বলেন। বুদ্ধগুণ অনুস্মরণ কালে যোগীর চিত্ত কাম-দ্বেষ-মোহ দ্বারা মর্দ্দিত হয় না।

তখন বুদ্ধগুণকে অবলম্বন করিয়া চিত্ত-গতি ঋজু হয়। ইহাতে পঞ্চ নীবরণ দূরে সরিয়া যায়, বিতর্ক-বিচার প্রবর্ত্তিত হয়। বুদ্ধগুণে বিতর্ক-বিচার উৎপাদিত হইলে প্রীতিভাবের উদ্রেক হয়। প্রীতচিত্ত প্রভাবে কায়-চিত্ত-বেদনার উপশম হয়। প্রশান্ত বেদনা হেতু কায়িক-চৈতসিক সুখ উৎপন্ন হয়। সুখিত চিত্ত বুদ্ধগুণ আলম্বন প্রভাবে সমাধিস্থ হয়। অনুক্রমে একক্ষণেই ধ্যানাঙ্গ প্রাদুর্ভূত হয়। বুদ্ধগুণ গম্ভীর বিধায় 'অর্পণা' লাভে অসমর্থ হইলেও 'উপচার' ধ্যান লাভ হইয়া থাকে। বুদ্ধগুণানুস্মরণে এই ধ্যান লাভ হয় বলিয়া, ইহাকে বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনা বলে।

ইহাতে বুদ্ধগুণের প্রতি যোগীর গৌরব শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। শ্রদ্ধা-স্মৃতি-প্রজ্ঞা-পুণ্য বিপুলভাবে বর্দ্ধিত হয়। প্রীতি-প্রমোদ বহুল হয়। ভীষণ ভয় ও দুঃখ সহ্য করিবার ক্ষমতা জন্মে। যেন বুদ্ধের সঙ্গে বাস করিতেছেন, এরূপ মনে হয়। অর্হত্ত্ব লাভ না করিলেও সুগতি লাভ অনিবার্য্য।

২২। **'ধর্ম্মানুস্মৃতি ভাবনা'**—ছয়টি ধর্ম্মগুণের মধ্যে এককভাবে বা সমগ্র ভাবে যোগীকে চিন্তা করিতে হইবে। কোন্ ধর্ম্মগুণ কোন্ গুণে মণ্ডিত, তাহা জানিতে হইবে। বুদ্ধগুণ ভাবনার তুল্য যথাক্রমে সমস্ত ফলগুণের অধিকারী হওয়া যায়। ইহাতেও 'উপচার' ধ্যান মাত্র লাভ হয়।

২৩। **'সঙ্ঘানুস্মৃতি ভাবনা'**—পবিত্র অষ্টার্য্য সঙ্ঘের শীল-সাধনগুণ অনুস্মরণ করিয়া ভাবনা করিতে হয়। প্রত্যেক যোগীকে নয়টি সঙ্ঘগুণ শিক্ষা করিতে হইবে। মার্গ-ফল লাভী মহামানবগণের পন্হানুসরণ করিতে হইলে তাঁহাদের গুণানুস্মরণে নিজেকে সেই গুণে মন্ডিত করিতে হয়। ইহাতে 'উপচার' ধ্যান মাত্র লাভ হয়।

বুদ্ধ-ধর্ম্ম-সঙ্ঘগুণে ২৪টি ভাবনা বিধি বর্ণিত হইয়াছে। ইহার সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা ধর্ম্মসংহিতা প্রথম খণ্ডে ও সদ্ধর্ম্ম রত্নাকর গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

২৪। **'শীলানুস্মৃতি ভাবনা'**—সাধক ভাবিবেন যে, 'আমার পরিপূর্ণ-পরিশুদ্ধ শীলগুণ আছে। আমি একটি শীলও ভঙ্গ না করিয়া নিখুঁত ভাবে পালন করিয়াছি। আমার শীল এত পবিত্র যে, শীলগুলির আদি-মধ্য-অন্তভাগে কোন দাগ লাগে নাই। বিশুদ্ধ শীল পালনের জন্য আমার শীল সতত সমাধিমুখী।' এভাবে স্বকীয় শীলগুণ যোগীকে স্মরণ করিতে হইবে। বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনায় কথিত নিয়মে সমস্ত বিষয় জ্ঞাত হইবেন। 'উপচার' ভাবনা মাত্র ইহাতে লাভ হয়।

শীলগুণ ভাবনায় শিক্ষার প্রতি গৌরবশীল হওয়া যায়। সমচিত্ত যাপন, আলাপে অপ্রমত্ততা, আত্মদোষ বিরহিত, সামান্য পাপানুষ্ঠানে ভয়দর্শী ও শ্রদ্ধা-বাহুল্য প্রভৃতি গুণ লাভ হয়। সর্ব্বদা আনন্দময় চিত্তে অবস্থান করিয়া মরণান্তে সুগতি লাভ করিয়া থাকেন।

২৫। **'ত্যাগানুস্মৃতি ভাবনা'**—ত্যাগগুণে জাগ্রত যোগীকে নিত্য দানে অভ্যস্ত হইতে হইবে। অথবা ভাবনারম্ভকাল হইতে 'আমি দান না দিয়া কখনও ভোজন করিব না' বলিয়া অধিষ্ঠান করিতে হইবে। যেই দিন ভাবনা পথে অগ্রসর হইবেন, সেই দিন কোন শীলবানের হাতে দান দেওয়া উচিত। সেই দানকে নিমিত্ত রূপে গ্রহণ করিয়া নির্জ্জন স্থানে ভাবনা করিবেন। আসনে বসিয়া চিন্তা করিবেন—

"বাস্তবিক আজ আমার মহালাভ হইয়াছে। ইহা আমার পক্ষে অতিশয় লাভ জনক। আমি যে বহু মাৎসর্য্য-মর্দ্দিত লোকের মধ্যে কৃপণতা পরিহার করিয়া দান করিতে সমর্থ হইলাম।

আমি দান ফল ব্যাখ্যায় শুনিয়াছি—দান দেওয়া অর্থ আয়ুদান করা, দাতা সুর-নরলোকে দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া থাকেন। এ কারণে আমার মহালাভ হইয়াছে। দান করিলে লোকের প্রিয় হয়, বহুলোক তাঁহার সেবা-সৎকার করেন। দানেই ভালবাসা লাভ হয়।

আমি যেমন সর্ব্বজ্ঞ শাসনে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তেমন মনুষ্যত্বও লাভ করিয়াছি, এই কারণেও আমার বহুলাভ হইয়াছে।

লোভ ও কৃপণতাকে একমাত্র দানবলেই জয় করা যায়, ইহাতে লোভ-দ্বেষাদি মল অপসৃত হয়। ত্যাগে মুক্তহস্ত হয়।

সে কারণে নিত্য মুক্তহস্ত ও সর্ব্বদা ত্যাগ চিত্ত উৎপাদন একান্ত কর্ত্তব্য। দানে যেমন হস্ত শুদ্ধ হয়, তেমন শ্রদ্ধার সহিত দানে হস্ত ধৌত হয় ও দানযজ্ঞানুষ্ঠানে বহু গ্রহীতার উপকার হয়। আমি দান করিয়া এই সৎগুণ সমূহ সঞ্চয় করিয়াছি।" যোগী এভাবে ত্যাগ-গুণ স্মরণ-অনুস্মরণ করিতে থাকিবেন। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত গুণাদি অর্জ্জিত হয় ও ত্যাগ-গুণে সুগতি লাভ হয়।

ত্যাগ-চিন্তার ভিতর দিয়া অধিক ফল অর্জ্জন দান-পতির পক্ষে সম্ভব। তবে দান-দাস ও দান-বন্ধুর পক্ষে ইহা অসম্ভব হইলেও সদ্যজাত চেষ্টায় সুফল সম্ভাবনা হয়।

২৬। **'দেবতানুস্মৃতি ভাবনা'**—যাঁহারা এই ভাবনা করিবেন, তাঁহারা আর্য্যভাব মণ্ডিত শ্রদ্ধা প্রভৃতি গুণের অধিকারী হইবেন। তারপর নির্জ্জনে ধ্যানাসনে বসিয়া ভাবিবেন—'চাতুর্ম্মহারাজিক, তাবতিংস, যাম, তুষিত, নির্ম্মাণরতি ও পরনির্ম্মিতবশবর্ত্তী স্বর্গে বহু দেবগণ আছেন। এমন কি ব্রহ্মকায়িক দেবগণও আছেন। তাঁহারা এই শ্রদ্ধাগুণ ভূষিত হইয়া দেব-ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন। আমার নিকটও তাঁহাদের মত শ্রদ্ধাগুণাদি যেই শীলশ্রুত-ত্যাগ-প্রজ্ঞাগুণ আছে। তাঁহারা দেবত্ব ও ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়াছেন; তাদৃশ শীল-শ্রুত-ত্যাগ-প্রজ্ঞাগুণ আমার নিকটও বিদ্যমান আছে।'

যদি যোগী এভাবে স্বকৃত গুণরাশি স্মরণ-অনুস্মরণ করেন, তখন তাঁহার কামাদি দোষ তিরোহিত হয়। এই দেব-ব্রহ্মগণকে সাক্ষীস্বরূপ গ্রহণ করিয়া যোগী নিজকে আশ্বস্ত করিবেন। দৃঢ়তা-সহকারে প্রথমে দেবগুণ, তৎপর স্বীয়গুণ অনুস্মরণ প্রভাবে যোগীর পূর্ব্বোক্ত নিয়মে গুণরাশি অর্জ্জিত হয়। তখন যোগীর পঞ্চ নীবরণ অপসৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ধ্যানাঙ্গ প্রাদুর্ভূত হয়, 'উপচার ধ্যান' লাভ হয় ও দেহান্তে সুগতি লাভ হয়।

ছয় অনুস্মৃতির ফল

এই বুদ্ধ-ধর্ম্ম-সঙ্ঘ-শীল-ত্যাগ-দেবগুণ পুনঃপুনঃ স্মরণে-অনুস্মরণে চিত্তগতি ঋজু হয় ও আমোদিত-প্রমোদিত হয়। এই ষড় গুণ আর্য্য-শ্রাবকদের স্বভাবত উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাতে চিত্তে বিশুদ্ধভাব সঞ্চারিত হয়। প্রসন্নচিত্তে পঞ্চ নীবরণের স্থান না থাকায় বিপুলানন্দে বিদর্শন গুণের অনুস্মরণে অর্হত্ত্ব প্রত্যক্ষ হয়।

২৭। **'মরণানুস্মৃতি ভাবনা'**—মৃত্যুকে বিভিন্ন ভাবে বুঝিতে হইবে। যেমন অর্হৎগণের সংসারাবর্ত্ত দুঃখ ক্ষয় সমুচ্ছেদ মরণ, সংস্কার সমূহের ক্ষণভঙ্গভূত ক্ষণিক মরণ, বৃক্ষাদির সম্মতি মরণ। এখানে ঈদৃশ মরণ নহে। স্বভাবত পুণ্য ও আয়ুক্ষয়ে কালমরণ হয়। উপচ্ছেদ বা আকস্মিক ভাবে অকাল মরণ হয়।

মৃত্যুকে স্মরণ করিয়া ভাবনা করিতে হইলে—'মৃত্যু হইবে, মৃত্যু হইবে,' অথবা সংক্ষেপে 'মরণ, মরণ' বলিবেন। কিন্তু অতিশয় স্মৃতি সহকারে মৃত্যু চিন্তা করিতে হইবে। যোগী স্মৃতি-বিভ্রান্তাবস্থায় ভাবনা করিলে প্রিয়জনের মৃত্যুতে শোকে ব্যথিত হন ও শত্রুজনের মৃত্যুতে আনন্দিত হন। শত্রু-মিত্র

নহে, এমন ব্যক্তির স্মরণে সংবেগ জাত হয় না। নিজের মৃত্যু স্মরণে সন্ত্রাস উৎপন্ন হয় ও স্মৃতি-সংবেগ-জ্ঞানবিরহিত হয়।

সে কারণে শ্মশানে-মশানে, পথে-ঘাটে পতিত মৃতদেহ দর্শনে স্মৃতি-সংবেগ-জ্ঞান স্থির করিয়া ভাবনা করিবেন। ইহাতে 'উপচার ধ্যান' লাভ হইয়া থাকে।

যোগীর অন্তরে মৃত্যুজ্ঞান অভ্রান্ত ভাবে জাগ্রত হইলে অপ্রমত্ত জ্ঞান জন্মে, তিনি সংসার বাসনায় উৎকণ্ঠিত হন, জীবনের প্রতি মমতা থাকে না, পাপের প্রতি ঘৃণাভাব উৎপন্ন হয়; প্রয়োজনাতিরিক্ত সঞ্চয়ে উদাসীন থাকেন, কৃপণতা বিধ্বংস হয়, অনিত্যভাবে পরিচিত হন। এতৎসঙ্গে দুঃখ ও অনাত্ম সংজ্ঞা অনুভূত হয়, ব্যাঘ্রাক্রমণ জনিত মৃত্যুতে যেরূপ ভয় উৎপন্ন হয়, সেরূপ মৃত্যু ভয় থাকে না। কাজেই স্ব-জ্ঞানে মৃত্যু হওয়ায় সুগতি লাভে সমর্থ হন।

২৮। **'কায়গতানুস্মৃতি ভাবনা'**—এই ভাবনা সম্বন্ধে গুরুর নিকট ভাল রূপে শিক্ষা করিতে হইবে। এখানে সংক্ষেপে শরীরের ৩২ প্রকার অশুচি দ্রব্যের ভাবনা-বিধান বর্ণিত হইতেছে।

ত্বক পঞ্চক অনুলোম (অ)

কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক।

প্রতিলোম (প্র)

ত্বক, দন্ত, নখ, লোম, কেশ।

বৃক্ক পঞ্চক

অ—মাংস, স্নায়ু, অস্থি, অস্থিমজ্জা, বৃক্ক।
প্র—বৃক্ক, অস্থিমজ্জা, অস্থি, স্নায়ু, মাংস।

ফুস্‌ফুস্‌ পঞ্চক

অ—হৃদয়, যকৃৎ, ক্লোমা, প্লীহা, ফুস্‌ফুস্‌।
প্র—ফুস্‌ফুস্‌, প্লীহা, ক্লোমা, যকৃৎ, হৃদয়।

মস্তিষ্ক পঞ্চক

অ—অন্ত্র, অন্ত্রগুণ, উদর, বিষ্ঠা, মস্তিষ্ক।
প্র—মস্তিষ্ক, বিষ্ঠা, উদর, অন্ত্রগুণ, অন্ত্র।

মেদ ষষ্ঠক

অ—পিত্ত, শ্লেষ্মা, পূয, লোহিত, স্বেদ, মেদ।
প্র—মেদ, স্বেদ, লোহিত, পূয, শ্লেষ্মা, পিত্ত।

মূত্র ষষ্ঠক

অ—অশ্রু, চর্ব্বি, থুথু, সিক্‌নি, লসিকা, মূত্র।
প্র—মূত্র, লসিকা, সিক্‌নি, থুথু, চর্ব্বি, অশ্রু।

এইরূপে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাঁচদিন অনুলোম এবং শেষ হইতে প্রথম পর্য্যন্ত পাঁচদিন প্রতিলোম, আর অনুলোম-প্রতিলোম উভয়ের সংমিশ্রণে পাঁচদিন এই পনর দিন ত্বক পঞ্চক মুখে আবৃত্তি করিতে হইবে।

অনন্তর বৃক্কপঞ্চক উক্ত প্রকারে পনর দিন আবর্ত্তি করিয়া আবার ত্বকপঞ্চক ও বৃক্কপঞ্চক দুইটা একত্র করিয়া পনর দিন আবৃত্তি করিতে হইবে।

এই প্রকারে পঞ্চক ও ষষ্ঠক ভেদে ছয় ভাগে বিভক্ত কর্ম্মস্থান উক্তানুসারে তিন মাস ভাবনা করিতে হইবে। আবার পঞ্চক ষষ্ঠক সহ ত্বকাদি প্রথম ভাগ একত্র করিয়া আড়াই মাস ভাবনা করিতে হইবে। মোটের উপর সাড়ে পাঁচ মাস এই কায়গতানুস্মৃতি ভাবনা অভ্যাস করিতে হয়। সাড়ে পাঁচ মাসের মধ্যে পনর দিন না ধরিয়া মোট ছয় মাস ভাবনা করা উচিত বলিয়া গ্রন্থে দৃষ্ট হয়।

(১) ত্রিপিটক বিশারদ হইলেও প্রথম মুখে মুখে আবৃত্তি করিতে হইবে। বাক্যে আবৃত্তি করিলে কর্ম্মস্থান বিশেষরূপে অভ্যাস হয়, চিত্ত উহাতে নিবিষ্ট হয় ও শারীরিক অংশসমূহ মনশ্চক্ষুতে প্রকট হয়।

(২) মুখে আবৃত্তি করিয়া যেইরূপ সুদক্ষ হইতে হয়, সেইরূপ চিত্তেও স্মরণ করা উচিত। বাক্যে বলিয়া অভ্যাস করিলে স্মরণ করিবার পক্ষে সহজ হয়, বহুকাল বাক্যে অভ্যাসকৃত কর্ম্মস্থান স্মরণ করিয়া বিশেষরূপে কল্পনাকারীর প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কোথায়ও ঠেকিতে হয় না, বরং অনুক্রমে অর্থাববোধ হইয়া থাকে। চিত্তে ধারণ করিয়া ভাবনা করিলে, সেই সেই পদের অর্থ স্মরণ করিবার সেই সেই দৈহিক অংশের অশুভ লক্ষণ মনোনিবেশ করিবার এবং প্রতিকূলতা লক্ষ্য করিবার সুবিধা হয়।

(৩) কেশ-লোমাদির বর্ণও চিন্তা করিতে হয়।

(৪) কেশ-লোমাদির আকার এইরূপ বলিয়া উপমাদি দ্বারা চিন্তা করিতে হয়।

(৫) এই শরীরের দুই দিক। নাভি হইতে উপরি অংশ উর্দ্ধদিক, আর নাভি হইতে নিম্নভাগ নিম্নদিক। তদ্ধেতু কায়ের এই অংশ উপর দিকে ও এই অংশ নিম্নদিকে এই প্রকারে দিক্‌নির্ণয় করিয়া চিন্তা করিতে হইবে।

(৬) শরীরের এই অংশ এই অবকাশে (স্থানে) আছে বলিয়া স্থিতস্থান নির্দ্ধারণ করিয়া চিন্তা করা উচিত।

(৭) শরীরের এই অংশ নিম্নে, এই অংশ উপরে, এই অংশ, এই অংশ

হইতে ভিন্ন, এইরূপ দৈহিক অংশের পরস্পর ভিন্নতা প্রতিপাদন, একস্থানে দুইখানি কেশ নাই। এই নিয়মে একটা হইতে একটার পৃথক করাকে সভাগ পরিচ্ছেদ, আর কেশ লোম নহে, লোম কেশ নহে, এইরূপে অসমান অংশ হইতে পৃথক করা বিসভাগ পরিচ্ছেদ। এই দ্বিবিধ পরিচ্ছেদে পরিচ্ছিন্ন করিয়া চিন্তা করিতে হয়। এই সাতটি উদ্‌গ্রহণ কৌশল বা শিক্ষা বিধান। তৎপর মনোনিবেশ বিধান বলা হইতেছে।

মনোনিবেশ বিধান

(১) অনুক্রমে মনোনিবেশ করা। (২) অতি তাড়াতাড়ি মনোনিবেশ না করা। (৩) অতি ধীরে মনোনিবেশ না করা। (৪) অবিক্ষিপ্ত ভাবে মনোনিবেশ করা। (৫) প্রজ্ঞপ্তি অতিক্রম করিয়া মনোনিবেশ করা। (৬) অনুক্রম বাদ দিয়া মনোনিবেশ করা। (৭) অর্পণাভেদে মনোনিবেশ করা। (৮) অধিচিত্ত সূত্র নিয়মে মনোনিবেশ করা। (৯) 'সীতিভাব' সূত্র-নিয়মে মনোনিবেশ করা। (১০) বোধ্যঙ্গ সূত্র নিয়মে মনোনিবেশ করা।

(১) আবৃত্তি কালে একটা ব্যতীত অন্য একটা মনোনিবেশ না করিয়া অনুক্রমে মনোনিবেশ করিতে হইবে।

(২) অনুক্রমে মনোনিবেশ করিবার সময় তাড়াতাড়ি স্মরণ করিলে কর্ম্মস্থান প্রকট হয় না, তদ্ধেতু অতি তাড়াতাড়ি মনোনিবেশ করা উচিত নহে।

(৩) অতি ধীরভাবে মনোনিবেশ করাও উচিত নয়। সেইরূপ করিলে বিশেষার্থ লাভের হেতু হয় না। সুতরাং মধ্যস্থভাবে মনোনিবেশ করিতে হইবে।

(৪) কর্ম্মস্থানালম্বন ছাড়া বাহ্যিক রূপাদি আলম্বনে চিত্ত বিক্ষিপ্ত না করিয়া কর্ম্মস্থানে মনোনিবেশ করাকে অবিক্ষিপ্ত মনোনিবেশ বলে।

(৫) পৃথিবী, অপ্, তেজ, বায়ু, বর্ণ, গন্ধ, রস ও ওজ এই শুদ্ধাষ্টকরূপ, লোকীয় জনসাধারণ কর্তৃক কেশ-লোমাদি রূপে সম্মত বা ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু সেই কেশাদির ব্যবহারিক নাম ত্যাগ করিয়া তৎসমস্ত ঘৃণিত বলিয়া চিন্তা করিতে হইবে।

(৬) মধ্যে মধ্যে কোন একটা যদি বোধগম্য না হয়, যেই যেইটা সুবোধ্য

হয়, তাহাতে মনোনিবেশ করাই অনুক্রম বাদ দিয়া মনোনিবেশ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

(৭) কেশাদি একেক অংশে অর্পণা ধ্যান উৎপন্ন হয় বলিয়া অর্পণা ভেদে মনোনিবেশ করিতে হইবে।

(৮) সুবর্ণকার যেমন সুবর্ণখণ্ড ইন্ধনে দিয়া সময়ে বাতাস দেয়, সময়ে জলে ডুবায় ও সময়ে বিশেষরূপে দেখিয়া অলঙ্কারাদি গড়িবার উপযুক্ত করে, সেইরূপ অধিচিত্তানুভুক্ত যোগীরও এক সময় উপেক্ষা নিমিত্তে মনোনিবেশ করিয়া চিত্ত কর্ম্মক্ষম করিতে হয়। এইরূপে চিত্ত কর্ম্মক্ষম করিতে শিক্ষা করাই "অধিচিত্ত সূত্র" নিয়মে অভিহিত হইয়াছে।

(৯) যথাসময়ে চিত্তকে নিগ্রহ করা, উৎসাহিত করা, চিত্তে সন্তোষ উৎপাদন করা, চিত্তকে বিশেষরূপে দর্শন করা, শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা করা ও নির্বাণাভিরত হওয়া, এই ছয়টি কারণে পূর্ণতাপ্রাপ্ত যোগী লোকোত্তর শিথিলতা লাভ করিতে সমর্থ হন। এইরূপে লোকোত্তর শিথিলতা সম্বন্ধে দেশিত "সীতিভাব" সূত্র নিয়মে অভিহিত হইয়াছে।

(১০) চিত্তের বীর্য্যহীনাবস্থায় (নিরুৎসাহ) ধর্ম্মবিচয়, বীর্য্য ও প্রীতি এই বোধ্যঙ্গত্রয় ভাবনা করা উচিত। চিত্তের উদ্ধতাবস্থায় প্রশ্রব্ধি, সমাধি ও উপেক্ষা এই বোধ্যঙ্গত্রয় ভাবনা করা উচিত। যোগী মাত্রেরই এই বোধ্যঙ্গত্রয় ভাবনা করিয়া ঔদ্ধত্য চিত্ত শান্ত করা উচিত। যখন প্রজ্ঞা প্রয়োগের ন্যূনতা হেতু ও উপশম অলাভহেতু চিত্ত নিরাস্বাদ হইবে, তখন জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণ, অপায় দুঃখ, অতীত সংসারাবর্ত্তন মূলক দুঃখ, ও বর্ত্তমান আহারান্বেষণ দুঃখ, এই অষ্ট সংবেগনীয় বিষয় চিন্তা করিয়া চিত্তকে সংযত করা উচিত। বুদ্ধ-ধর্ম্ম-সঙ্ঘের গুণানুস্মরণ করিয়া চিত্তে প্রসন্নতা উৎপাদন করিতে হইবে। সমবেগবান অশ্বের প্রতি সারথি যেরূপ দেখে, সেরূপ আলম্বনে সমপ্রবর্ত্তিত চিত্তকে দেখিতে হইবে। নৈষ্ক্রম্য মার্গে অনবস্থিত ও নানাকাজে বিক্ষিপ্ত চিত্ত পুদ্গলকে পরিবর্জ্জন করিতে হইবে। নৈষ্ক্রম্য মার্গে অবস্থিত সমাধিলাভী পুদ্গলের সেবা করা উচিত। ইহা বোধ্যঙ্গ সূত্রে কথিত হইয়াছে। এই সূত্রত্রয়ের বিশেষার্থ বিসুদ্ধিমগ্‌গ গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

যাঁহারা এই কায়গতানুস্মৃতি ভাবনা অভ্যাস করিবেন, তাঁহাদের প্রথম কেশে নিমিত্ত গ্রহণ করিতে হইবে। কিরূপে গ্রহণ করিতে হইবে? নিজের মস্তক হইতে এক বা দুইখানি কেশ হাতে রাখিয়া, প্রথম তাহার বর্ণ নির্ণয় ও পরে

কেশের ছিন্নস্থান দেখা উচিত। কেশ কাল হইলে কাল, শ্বেত হইলে শ্বেত বলিয়া মনোনিবেশ করিতে হইবে। আর পক্ব বা অপরিপক্ব কেশের মিশ্র অবস্থায় যেইরূপ কেশের সংখ্যাধিক্য হইবে, সেই বর্ণ ধরিয়া ভাবনা করিতে হইবে।

কেশ সম্বন্ধে যেইরূপ উক্ত হইয়াছে, সেইরূপ ত্বক্ পঞ্চককে দেখিয়া নিমিত্ত গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপে নিমিত্ত গ্রহণ করিয়া দৈহিক সমস্ত অংশ, বর্ণ, আকৃতি, দিক্, আকাশ ও পরিচ্ছেদ ভেদে নির্ণয় করিয়া বর্ণ, সংস্থান, গন্ধ, আশ্রয়, অবকাশ ভেদে পাঁচ প্রকার প্রতিকূল ভাবনা করা উচিত।

প্রতিকূল ভাবনা পাঁচ প্রকার। যথা—এই কেশ বর্ণভেদে, সংস্থান-ভেদে, গন্ধ-ভেদে, আশ্রয়ভেদে ও অবকাশ ভেদে ঘৃণিত।

মনোজ্ঞ যাগুর অথবা ভাতের থালায় কেশের ন্যায় কালবর্ণ যে কোন কিছু দেখিলে তাহাতে ঘৃণা উৎপন্ন হয়। সেইরূপ বর্ণাদিতেও প্রতিকূল সংজ্ঞা উৎপন্ন হইয়া থাকে। রাত্রিতে ভোজন করিবার সময় কোন প্রকার সূতা হাতে লাগিলে, কেশের আকৃতি বলিয়া তাহাতে ঘৃণা উৎপন্ন হয়। কেশে তৈল না মাখা হইলে তাহা দুর্গন্ধ হয়, বিশেষত অগ্নিতে কেশ দগ্ধ করিলে যে দুর্গন্ধ বাহির হয়, সেই গন্ধানুসারে কেশের প্রতি স্বভাবত ঘৃণা উৎপন্ন হইয়া থাকে। কেশ বর্ণ ও আকৃতি-ভেদে বিশেষ ঘৃণিত না হইলেও দুর্গন্ধ-হেতু অতিশয় ঘৃণিত।

মল-মূত্র ত্যাগের স্থান অর্থাৎ অপরিস্কৃত জায়গায় উৎপন্ন শাক-পাতা যেমন নাগরিকেরা ঘৃণা করিয়া খাইতে ইচ্ছা করে না, তেমন কেশসমূহ ও পূয, রক্ত, মূত্র, করীষ, পিত্ত, শ্লেষ্মাদির স্থানে উৎপন্ন হেতু ঘৃণিত। এই হেতু কেশের আশ্রয়-স্থান ঘৃণিত।

এই সমস্ত কেশ গূথরাশিতে উৎপন্ন ক্ষুদ্র তৃণের ন্যায় অপর একত্রিংশৎ অশুচির উপর উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা শ্মশানে ও ময়লাস্থান ইত্যাদিতে উৎপন্ন শাকের ন্যায় এবং পরিখাদিতে উৎপন্ন কমল কুবলয়াদি (নীল পদ্মাদি) পুষ্পের ন্যায় অশুচি স্থানে উৎপন্ন হেতু অতিশয় ঘৃণিত। কেশের প্রতিষ্ঠা স্থান ঘৃণিত বিধায় যোগীদের এই পাঁচ প্রকারে প্রতিকূলতা নির্ণয় করা উচিত।

এপ্রকারে অবশিষ্টাংশেও বর্ণ, সংস্থান, দিক্, অবকাশ ও পরিচ্ছেদ-ভেদে

স্থির করিয়া অনুক্রমে মনোনিবেশ করিতে হইবে। অতি দ্রুত মনস্কার না করিয়া দশবিধ মনস্কার নিয়মে বর্ণ, সংস্থান, গন্ধ, আশ্রয় ও প্রতিষ্ঠা এই পাঁচ প্রকারে প্রতিকূলতা লক্ষ্য করিলে ভাবনাকারী যোগীর কেশাদি লৌকিক স্মৃতি রহিত হইবে। কোন চক্ষুষ্মান পুরুষ একসূত্রে গ্রথিত বত্রিশ বর্ণের পুষ্প দর্শন করিলে, সে যেমন কোন্ পুষ্প কোন্ বর্ণের নির্দ্দেশ করিতে পারে, সেইরূপ "অত্থি ইমস্মিং কাযে কেসা···লোমা···মুত্তন্তি" এই শরীরে কেশ-লোমাদি আছে, এভাবে যথাক্রমে নিজের শরীর দর্শন করিয়াও শারীরিক সমস্ত অংশ অনুক্রমে বোধগম্য হয়। যদি নিজের কায় ছাড়া অপরের কায়ে প্রতিকূল সংজ্ঞা উৎপাদন করে, তাহা হইলে "আমার শরীর যেমন ঘৃণিত, উহার শরীরও তেমন ঘৃণিত।" এইরূপে অপরের শরীরের প্রতিকূল সংজ্ঞা উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহা হইলে মানুষ তির্য্যগ্ প্রভৃতি প্রাণীকে ভ্রমণ করিতে দেখিলে, সত্ত্বাকার ছাড়া কেবল বত্রিশ অশুভ-রাশি বলিয়া ধারণা হইবে। প্রাণীদিগকে আহারাদি করিতে দেখিলেও অশুভ-রাশিতে প্রক্ষেপ করিতেছে বলিয়া মনে হইবে।

এই প্রকারে দৈহিক অংশ সমূহ বারংবার মনোনিবেশ করিলে 'উদ্গ্রহ নিমিত্ত' ও 'প্রতিভাগ নিমিত্ত' উৎপন্ন হয়। তথায় কেশাদির বর্ণ, সংস্থান, দিক্, অবকাশ ও পরিচ্ছেদ-ভেদে বোধগম্য হওয়া 'উদ্গ্রহ' নিমিত্ত। আর সর্ব্বপ্রকার প্রতিকূলতা বোধগম্য হওয়া 'প্রতিভাগ' নিমিত্ত নামে কথিত হয়। ইহাতে ভাবনাকারীর প্রথম ধ্যান-ভেদে অর্পণা ধ্যান লাভ হইয়া থাকে।

যাঁহার এক অংশ প্রকট হইলে অর্পণা ভাবনা লাভ হয়, তাঁহার অন্য অংশের ভাবনায় একটি মাত্র ধ্যান লাভ হইয়া থাকে। যাঁহাদের অনেকাংশ প্রকট হয়, তাঁহাদের মল্লক স্থবিরের ন্যায় অশুভাংশ গণনায় প্রথমাদি ধ্যান লাভ হয়। এইরূপে প্রথম ধ্যান-ভেদে সমৃদ্ধিবান এই কর্ম্মস্থান। উহা স্মৃতিবলে সমৃদ্ধি লাভ করে বলিয়া 'কায়গতাস্মৃতি' নামে অভিহিত হইয়াছে।

এইরূপে বত্রিশ প্রকার অশুচি-রাশি প্রতিকূলভাবে চিন্তা করিলে শমথ ভাবনা, আর ধাতুভেদে চিন্তা ও ধারণা করিলে বিদর্শন ভাবনার অন্তর্গত হয়। এই শমথ-বিদর্শন উভয় ভাবনার অন্তর্ভূক্ত এই কায়গতাস্মৃতি ভাবনা করিলে সৎকায় দৃষ্টি প্রভৃতি ক্লেশ সমুচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এ প্রকারে সৎকায়াদি মিথ্যাদৃষ্টি প্রহীন করিয়া অনুক্রমে স্রোতাপত্তি মার্গ-ফল লাভের পর অমৃত-ময় মহা-নির্বাণ যোগী প্রত্যক্ষ করিতে পারেন।

২৯। **আনাপান-স্মৃতি ভাবনা**—আন+অপান—আনাপান। 'আন' অর্থ দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট বায়ু। 'অপান' অর্থ বহির্গত বায়ু।

"সব্বসমাধি-ভাবনাসু চ সব্বঞ্ঞুবোধিসত্তানং বোধিমূলে ইমিনা'ব সমাধিনা সমাহিতচিত্তানং যথাভূতা'ব বোধতো অযমেব সমাধিভাবনা পধানা তি।"

(পটিসম্ভিদা অট্ঠকথা)

সমস্ত সমাধি ভাবনার মধ্যে এই ভাবনাই প্রধান। কারণ সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞান লাভার্থ বোধিসত্ত্বগণ বোধিমূলেসমাসীন হইয়া প্রথমে আনাপান ভাবনা যোগে সমাধিস্থ হন। ইহাতে চিত্ত সমাহিত হইলে যথাভূত জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই যথাভূত জ্ঞানের অপর নাম 'বুদ্ধ বিদর্শন' নামে অভিহিত। এই নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসকে অবলম্বন করিয়া চিত্ত স্থির করার নামই 'আনাপান' স্মৃতি ভাবনা। "সব্ববুদ্ধানং অবিজহিতকম্মট্ঠানং।"

'সর্ব্ববুদ্ধগণের অপরিত্যাজ্য এই কর্ম্মস্থান, সর্ব্বসাধারণের যে পারত্রিক সুখাবহ এই ভাবনা, তাহা বলা বাহুল্য। কারণ এই ভাবনায় যাবতীয় উৎপন্ন পাপের বিনাশ হয়। পাপ বা অকুশল ধ্যানলাভের সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্হিত হইয়া যায়।

'সতিপট্ঠান সুত্তে' বর্ণিত হইয়াছে, পঞ্চ কামদোষে দূষিত চিত্তের শুদ্ধি হৃদয় তপ্তকারী শোক, বাক্য বিলাপজনিত পরিদেব, কায়িক অশান্তিজনক দুঃখ, চৈতসিক অশান্তিকর দৌর্ম্মনস্য বিধ্বংস করিয়া অষ্টমার্গাবলম্বনে নির্বাণ প্রত্যক্ষ করিবার জন্য যোগীর পক্ষে এই ভাবনাই সার্ব্বজনীন পথ।

"আনাপানপব্বং পন পটিকূলমনসিকারপব্বঞ্চ ইমানেবেত্থ দ্বে সমাধিবসেন বুত্তানি।"

অর্থাৎ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস কর্ম্মস্থান ও প্রতিকূল মনস্কার কর্ম্মস্থান সমাধি ভাবনা কারণে কথিত হইয়াছে।

কিন্তু চারি ঈর্য্যাপথ পর্ব্ব, চারি সম্প্রজ্ঞান পর্ব্ব ও ধাতুমনস্কার পর্ব্ব, এই তিনটি বিদর্শন ভাবনা কারণে কথিত হইয়াছে।

যোগী শব্দহীন নির্জ্জন স্থানে পদ্মাসনে বা সহজাসনে বসিয়া ও দেহাগ্রভাগ ঋজুভাবে রাখিয়া কর্ম্মস্থানাভিমুখে স্মৃতিকে স্থাপন করিবেন; তৎপর স্মৃতিমান হইয়া নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস একটু দীর্ঘভাবে গ্রহণ ত্যাগ করিবেন। তবে নাসাপুটাগ্র স্পর্শ করিয়া যে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বহিতেছে

সেই অনুভূতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণ করিতে হইবে ; নব যোগীর চিত্ত কোন আশ্রয় ব্যতীত সহসা স্থির রাখা অসম্ভব বিধায়, প্রাচীন সাধকগণ একটা উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং তাঁহারা গণনার ভিতর দিয়া কৌশলটি প্রয়োগ করিয়াছেন ।

গণনা প্রণালী এই—১, ২, ৩, ৪, ৫ ; ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ; ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ ; ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ; ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ ; ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০।

পঞ্চম সংখ্যার নীচে ও দশম সংখ্যার উপরে আর গণনা নাই। যোগী অতিশয় স্মৃতিমান হইয়া নাসাপুটাগ্র স্পৃষ্ট নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস গণনা করিবেন।

নব যোগীর পক্ষে প্রথমে গণনা ঠিক না হওয়া স্বাভাবিক, যেখানে ভুল হয়, 'ধান্য মাপার ন্যায়' পুনরায় গণনা করিবেন। যখন গণনা নির্ভুল হইবে, তখন চিত্ত একস্থানে স্থির হইয়া থাকিবে।

"সমতিত্তিকং অনবসেসকং তেলপত্তং যথা পরিহরেয্য,
এবং সচিত্তমনুরক্খে পত্থযানো দিসং অগতপুব্বং।"

যদি কোন ব্যক্তিকে একটা তৈলপূর্ণ পাত্র মস্তকে লইয়া এক বিন্দুও না ফেলিয়া ঘুরিয়া আসিতে বলা হয়, সে একাগ্রচিত্ত হইয়া সমগ্র পথটি যেমন ঘুরিয়া আসে, তেমন যোগীও কর্ম্মস্থানের প্রতি স্মৃতি রাখিয়া চিত্তকে স্থির করিবেন ।

যেমন দুগ্ধচোর বাছুরকে গাভী হইতে দূরে সরাইয়া শক্ত রজ্জুযোগে সু-প্রোথিত খুঁটিতে আবদ্ধ করে, তেমন যোগী চিত্তরূপ বাছুরকে রূপ-শব্দ-গন্ধ-রস-স্পর্শ-নিমিত্ত হইতে দূরে সরাইয়া স্মৃতিরূপ রজ্জুদ্বারা সমাধিরূপ খুঁটিতে আবদ্ধ করিবেন। যেরূপ যোগীর চিত্ত বহু বৎসর পঞ্চকাম গুণের আস্বাদে বিভোর হইয়া তন্ময় রহিয়াছে, সহসা চিত্তকে সেই স্বাদক্ষেত্র হইতে ফিরাইয়া একস্থানে নিবদ্ধ করা কঠিন ব্যাপার। কিন্তু স্মৃতি ও একাগ্রতা প্রবল থাকিলে চিত্তরূপ বাছুর নিশ্চয় দান্ত হইবে। তখন বশীভূত চিত্ত যোগীর বাধ্য হইয়া পড়িবে।

কাজেই গণনা স্থিরের সঙ্গে সঙ্গেই চিত্ত স্থির হইলে, যোগী অনুভব করিবেন যে, দেহের মধ্যে নিঃশ্বাস প্রবেশকালীন নাসাপুটাগ্র আদি, হৃদয় মধ্য,

নাভি অন্ত। প্রশ্বাস বহির্গতকালে নাভি আদি, হৃদয় মধ্য, নাসাপুটাগ্র অন্ত। বায়ু চলাচলের ইহাই সীমা।

যাঁহারা এই ভাবনা করেন না, তাঁহারা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের আদি-মধ্য-অন্ত অনুভব করিতে পারেন না। কিন্তু যোগীর নিকট উহার একটি বিরাট প্রবাহ অনুভূত হয়। এই নাসাবায়ুর স্রোতবেগে কায়-চিত্তের দৃঢ়তা উৎপাদিত হয় বলিয়া শরীর দুলিতে থাকে ঘন ঘন কম্পন অনুভূত হয়। বিছানা 'গুটাইয়া' যায়। খাটিয়ায় বসিলে মচ্ মচ্ শব্দ শ্রুত হয়। কিন্তু যোগী নাসাপুটাগ্রে স্পৃষ্ট বায়ুর প্রতি সর্ব্বদা স্মৃতি স্থির রাখিবেন।

যেমন মাতা দোলায় শায়িত পুত্রকে দোল দিয়া দোলা গমনাগমনের প্রতি লক্ষ্য করেন না, কেবল হস্ত-স্পৃষ্ট স্থানটির প্রতিই লক্ষ্য রাখেন, তেমন যোগীও নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস দোলা ক্ষেপণ করিয়া, উহার গমনাগমনের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন না, কেবল বায়ু-স্পৃষ্ট স্থানটি প্রতি লক্ষ্য থাকিবে।

যেমন চিহ্নিত তক্তা চিড়িবার সময়ে সুতার করাত গমনাগমনের প্রতি লক্ষ্য রাখে না, কেবল করাতদন্ত-স্পৃষ্ট স্থানটির প্রতিই লক্ষ্য রাখে, তেমন যোগীও নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসরূপ করাতের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া করাত-দন্ত-স্পৃষ্ট তুল্য, বায়ু স্পৃষ্ট নাসাপুটাগ্রের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন।

তখন যোগী বুঝিবেন যে, যেমন কর্ম্মকারের ভস্ত্রা, গর্গরা নল ও প্রচেষ্টা বলে ইতস্ততঃ বায়ু সঞ্চালিত হয়, তেমন তাঁহার কায়রূপ ভস্ত্রা, নাসারূপ নল ও চিত্তক্রিয়া বায়ু-ধাতু বলে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস এদিক-ওদিক সঞ্চালিত হইতেছে মাত্র।

যেমন ভস্ত্রা অপনীত হইলে, গর্গরা নল ভগ্ন হইলে ও প্রচেষ্টা না থাকিলে বায়ুর উৎপত্তি হয় না, তেমন দেহ বিনষ্ট হইলে, নাসাপুট বিধ্বস্ত হইলে ও চিত্তক্রিয়া নিরুদ্ধ হইলে, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহিত হয় না। অর্থাৎ নিরুদ্ধ হইয়া যায়।

ইহাতে যোগী অনায়াসে বুঝিতে পারেন যে, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস দেহধর্ম্ম হিসাবে আছে বটে, কিন্তু কোন সত্ত্ব, পুদ্গল, স্ত্রী, পুরুষ, আত্মা ও আত্মবৎ কিছুই নহে। ইহা আমারও নহে, ইহাতে আমিও অবস্থিত নহি, ইহা আমার আত্মাও নহে। ইহাতে যোগীর আত্মসংজ্ঞা তিরোহিত হয়।

কেবল দীর্ঘ নিঃশ্বাস ও দীর্ঘ প্রশ্বাস ও হ্রস্ব নিঃশ্বাস ও হ্রস্ব প্রশ্বাস এই চারিটি বর্ণ নাসিকাগ্রে প্রবাহিত হইতেছে মাত্র। 'চত্তারো বণ্ণা বত্তন্তি'।

তৎপর যোগীর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস এত প্রবলবেগে দ্রুত প্রবাহিত হয় যে, যোগী নাসিকায় বায়ুবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া মুখ দিয়াও নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

যেমন কোন লোক ভারী বোঝা লইয়া পর্ব্বত শিখরে আরোহণ করিলে, যেমন তাহাকে নাসিকা ও মুখ দিয়া নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ করিতে হয়, তেমন যোগীরও এই আনাপান ভাবনায় নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বাড়িয়া যায়।

তৎপর যোগীর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস এভাবে রুদ্ধ হয় যে, তিনি তাহা অনুমান করিতে না পারিয়া ভীত হইয়া পড়েন। যোগী ভাবেন, 'আমি মরিয়া গেলাম কি?' তখন যোগীকে এই ভাবিয়া আশ্বস্ত হইতে হইবে যে, জলে নিমগ্ন ব্যক্তির, মাতৃ-জঠরে সন্তানের, নিরোধসমাধিতে সাধকেরও নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ হইয়া যায়, সেরূপ আনাপান ভাবনাকারী যোগীর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস সমিয়কভাবে লোপ পাইয়া থাকে।

যেমন পরিশ্রান্ত ভারবাহী লোক বোঝাটি তাড়াতাড়ি ফেলিয়া দিয়া বট-বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর শীতল জলে স্নান করে, পুনঃ একখানি আর্দ্র-বস্ত্র বুক্ষের উপরে জড়াইয়া সুশীতল ছায়ায় নিদ্রা যায়, তখন তাঁহার পরিশ্রান্ত দেহে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস লুপ্তপ্রায় হয়। তেমন আনাপান ভাবনায় পরিশ্রান্ত যোগীর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস একেবারে নিরুদ্ধ তুল্য অনুভূত হয়।

তখম যোগী নাসাপুটাগ্রে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহিত করিবার জন্য স্মৃতি সহকারে উদ্যোগ করিবেন। যাহার নাসিকা দীর্ঘ, বায়ু তাঁহার নাসাপুট আঘাত করিতেছে বলিয়া বোধ হয়। যাঁহার নাসাপুট হ্রস্ব তাঁহার উপরোষ্ঠে আঘাত করিতেছে বলিয়া বোধ হয়। তখন যোগী এইস্থানে বায়ু অনুভূত হইতেছে বলিয়া ধারণা করিবেন। সেই কারণে ভগবান বলিয়াছেন—

"নাহং ভিক্খবে মুট্ঠস্সতিস্স অসম্পজানস্স আনাপানস্সতি-ভাবনং বদামি।"

ভিক্ষুগণ, আমি কোন স্মৃতিবিহ্বল ও অমনোযোগী যোগীর জন্য আনাপান ভাবনা নির্দ্দেশ করি নাই। স্মৃতিমানের জন্যই এই ভাবনা বর্ণিত হইয়াছে। এই ভাবনা অতিশয় কঠিন। বুদ্ধ প্রভৃতি মহাশ্রাবকগণের সাধনার বিষয়ীভূত বিষয়। ইহা শান্ত ও সূক্ষ্ম। সে কারণে স্মৃতি ও প্রজ্ঞা বলবতী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

যেমন পট্টবস্ত্র সেলাই করিবার সূচ ক্ষুদ্র, সূচিছিদ্র ততোধিক ক্ষুদ্র, তেমন পট্টবস্ত্র সদৃশ এই কর্ম্মস্থানের আরম্ভ সময়ে সূচ তুল্য স্মৃতি, সূচিছিদ্র-তুল্য প্রজ্ঞা বলবতী থাকা বাঞ্ছনীয়। এই স্মৃতি-প্রজ্ঞা সংযোগে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের স্পষ্ট স্থান যোগী অনুসন্ধান করিবেন।

যেমন কৃষক ভূমি কর্ষণের পরে বলীবর্দ্দদিগকে গোচারণ ভূমিতে ছাড়িয়া দিয়া ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম করে। বলীবর্দ্দগুলি সবেগে অরণ্যে প্রবেশ করিয়া তৃণ-জল ভক্ষণের পর বিশ্রাম স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করে। তখন কৃষক তাহাদিগকে যুগে রজ্জু বদ্ধ করিয়া প্রতোদাঘাতে পুনরায় ভূমি কর্ষণে নিয়োজিত করে। তেমন যোগী স্মৃতিরূপ রজ্জু ও প্রজ্ঞারূপ প্রতোদ (তাড়ন দণ্ড) দ্বারা চিত্তরূপ গরুকে ধ্যানে নিবিষ্ট করেন।

যোগী বীর্য্য সহকারে ধ্যানরত হইলে, সংজ্ঞানুসারে বহু নিমিত্ত দর্শন করিয়া থাকেন। কেহ ধুনিত কার্পাস তুল্য, তারকা মণিগোলক, মুক্তালহরী, কর্কশ স্পর্শ, দারুসূচি, কুমুদদাম, ধূমশিখা, বিতস্তি প্রমাণ মেঘখণ্ড, পদ্ম-পুষ্প, নভলম্বিত পুষ্পমালা, রথচক্র, চন্দ্রমণ্ডল, সূর্য্যমণ্ডল প্রভৃতির ন্যায় নিমিত্ত দর্শন করেন। সকলের এক প্রকার নিমিত্ত হয় না। সংজ্ঞার বিভিন্নতা হেতু নিমিত্তও বিবিধরূপে পরিদৃষ্ট হয়।

যেমন একই সূত্র শ্রোতাদের নিকট নানা প্রকারে উপলব্ধ হয়, তেমন একই আনাপান ভাবনায় নানা নিমিত্ত পরিদৃষ্ট হয়। এখানে নিঃশ্বাস নিমিত্ত, প্রশ্বাস নিমিত্ত ও নিমিত্তালম্বন পৃথক পৃথক। যাঁহার নিকট তিনটি বিষয়ে অনুভূতি নাই, তাঁহার উপচার ও অর্পণা ধ্যান লাভ হয় না।

তাহা হইলে যোগী গুরুর নিকটে উপস্থিত হইয়া ইহার বিবৃতি দান করিবেন। গুরু যোগীকে 'ইহা নিমিত্ত' বলিরা প্রকাশ করিবেন না। তিনি এইমাত্র বলিবেন—

'এরূপ হইয়া থাকে। তুমি মনোযোগের সহিত ধ্যান কর।' যদি গুরু ইহা 'নিমিত্ত' বলেন, যোগীর কাজে অমনোযোগ হয়, যদি 'নিমিত্ত নহে' বলেন, নিরাশ ভাব জাগ্রত হয়। কেহ কেহ 'নিমিত্ত' বলিয়া প্রকাশ করিলে যোগীর উৎসাহ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

যোগী তখন একমনে ধ্যান করিয়া নিমিত্ত বর্দ্ধন করিবেন। ইহাতে পঞ্চ নীবরণ দূরে সরিয়া পড়ে, ক্লেশ-বর্দ্ধন গতি স্থগিত হয়, উপচার ধ্যানে চিত্ত সমাহিত হয়। তৎপর সযত্নে উপচারকে রক্ষা করা উচিত। ইহাতে 'পৃথিবী

কৃৎস্ন' তুল্য চতুর্থ ও পঞ্চম ধ্যান প্রাদুর্ভূত হয়। এই ধ্যানের উপর নির্ভর করিয়া কর্ম্মস্থানের উন্নতি সাধন করিবেন, এবং নাম-রূপ-জ্ঞানের ভিতর দিয়া বিদর্শন ভূমিতে অবতরণ করিবেন। (বিদর্শন কাণ্ড দ্রষ্টব্য।)

৩০। **'উপশমানুস্মৃতি ভাবনা'**—এই ভাবনা করিবার পূর্ব্বে যোগীকে নির্বাণের গুণ কি কি জানিতে হইবে। সংস্কারযুক্ত ও সংস্কারমুক্ত যত স্বভাবধর্ম্ম আছে, তন্মধ্যে বিরাগ স্বভাবই সর্ব্বোত্তম। বিরাগ অর্থ লালসার অভাব। নির্বাণালম্বনে মানমদ প্রভৃতির বিনাশ হয়। কামপিপাসার বা পঞ্চ কামগুণের তিরোধান হয়। ত্রৈভূমিক বর্ত্মদুঃখের সমুদ্ঘাটন নিশ্চিত হয়। তৃষ্ণাশল্যের সমুৎপাটন হয়। যেই বিরাগ সেই নিরোধ, তাহাই তৃষ্ণাক্ষয়ে নির্বাণ। বিনন সংসীবন অর্থে 'বান', 'বান' অর্থ তৃষ্ণা। সেই তৃষ্ণা হইতে নিষ্ক্রমণ, বহির্গমন, সে কারণে বিসংযুক্ত, অসংলগ্নভাব সূচিত হয়। ইত্যাদি কারণে মত্ততা বিনাশন মূলক গুণ সমূহের আধারভূত যে নির্বাণ, সে নির্বাণকে আলম্বন করিয়া 'উপশমানুস্মৃতি ভাবনা' করিতে হয়। ইহাতেও পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পঞ্চ নীবরণাদি দূরে সরিয়া পড়ে। তখন যোগী সদা শান্তি অনুভব করেন। শান্তি পরিবেষ্টিত যোগী নিজকে নৈর্ব্যক্তিক ভাবে সর্ব্বাবস্থায় শান্তিমূর্ত্তিরূপে মানস চক্ষে দর্শন করেন। বিরাগগুণ অতি গম্ভীর ও বিবিধগুণে আবদ্ধ। সে কারণে যোগী উপচার ধ্যান মাত্র লাভ করেন।

এই দশবিধ অনুস্মৃতি ভাবনায় 'কায়গতাস্মৃতি' ও 'আনাপান স্মৃতিতে' 'অর্পণা ধ্যান' লাভ হয়। অবশিষ্ট আট-টিতে 'উপচার ধ্যান' লাভ হয়। এজন্য উপচার ও অর্পণার পার্থক্য নির্দ্দেশ কারণে কেবল আটটি ভাবনায় 'স্মৃতি' শব্দের পূর্ব্বে 'অনু' শব্দ যোগ করা হইয়াছে। 'কায়গতা' ও 'আনাপান' শব্দে কেবল 'স্মৃতি' শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে।

এই কারণে ভাবনা দুইটির বৈশিষ্ট সূচিত হইয়াছে। অঙ্গুত্তর নিকায়ে বর্ণিত হইয়াছে—অমৃতের সন্ধান কায়গতাস্মৃতি ভাবনায় মিলিবে। বোধি-জ্ঞানের সন্ধান আনাপান ভাবনায় মিলিবে। এই উভয় ধ্যান মহামানবগণের বিরাট আদর্শ নির্দ্দেশ করে।

ব্রহ্মবিহার ভাবনা

৩১। **'মৈত্রী ভাবনা'**—দ্বেষ পরিহার করিয়া ও ক্ষান্তিকে অবলম্বন করিয়া, এই ভাবনায় অগ্রসর হইতে হয়। যেমন দ্বেষ দ্বারা অভিভূত ব্যক্তি

প্রাণীবধ করে। ইহা দ্বেষের স্বভাব। ক্ষান্তিই তপস্যার নামান্তর। ইহা ক্ষান্তির স্বভাব। এভাবে দোষ-গুণ বুঝিয়া প্রারম্ভে অতি প্রিয়ব্যক্তিকে, অতি প্রিয়বন্ধুকে, মধ্যস্থ ব্যক্তিকে ও শত্রুজনকে উপলক্ষ্য করিয়া মৈত্রী ভাবনা করিবেন না। পুরুষ যোগী কোন স্ত্রীলোককেও লক্ষ্য করিবেন না। মৃত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিলে উপচার ও অর্পণা ভাবনা উৎপন্ন হয় না। মৈত্রী ভাবনার বিধান এই—

প্রথমত 'আমি সুখী হই, দুঃখহীন হই এ ভাবে নিজকে লক্ষ্য করিয়া পুনঃপুনঃ ভাবনা করিবেন। ইহাতে নিজের সুখ কামনা করিয়া, দুঃখকে ঘৃণা করিয়া, পরে আচার্য্য বা আচার্য্য স্থানীয় লোকের গুণ স্মরণ করিয়া অপরকে সাক্ষী স্থাপন মানসে 'এই পুরুষ সুখী হউক, দুঃখহীন হউক' ভাবনা করিবেন। এই উপায়ে অর্পণা ধ্যানও লাভ হইতে পারে। ভাবনা করিতে করিতে চিত্ত-স্বভাব কোমল হইলে যথাক্রমে পরীক্ষা স্বরূপ অতিপ্রিয় বন্ধুকে লক্ষ্য করিয়া, মধ্যস্থ ও বৈরীজনকে লক্ষ্য করিয়া ভাবনা করিবেন। চিত্তকে স্তরে স্তরে মৃদুভাবে পরিণত করিবেন। মৈত্রী ভাবনার প্রধান দোষ ক্রোধের সঞ্চার করা। যাহাতে ক্রোধের উন্দামতা না হয়, তৎপ্রতি সজাগ থাকা উচিত। বুদ্ধোপদিষ্ট বিবিধ উপদেশ দ্বারা চিত্তকে শান্ত করিতে হইবে। মৈত্রীবলে যিনি বলীয়ান, তাঁহার কোন বিপদের সম্ভাবনা আর থাকে না।

যদি এই ভাবনায় অর্হত্ত্ব লাভে সমর্থ না হন, মরণান্তে সুপ্ত প্রবুদ্ধ তুল্য ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। হস্তক দেবপুত্র মাত্র সাত বৎসর মৈত্রী ভাবনা করিয়া সপ্তকল্প ব্রহ্মলোকে অবস্থান করিয়াছিলেন। তুরীপ্রহার সময় পরিমাণ মৈত্রী ভাবনাও অতিশয় ফলদায়ক। (সুবর্ণ শ্যাম জাতকই প্রমাণ)।

৩২। **'করুণা ভাবনা'**—নিষ্করুণ বা নিষ্ঠুর লোকের পরিণাম স্মরণ করিয়া ও করুণাশীলের গুণ প্রত্যক্ষ করিয়া 'করুণা ভাবনা' আরম্ভ করিবেন। প্রথম প্রিয়ব্যক্তি, প্রিয়বন্ধু, মধ্যস্থ ও শত্রুকে উপলক্ষ্য না করিয়া, যে দুর্গত, দরিদ্র, হস্তচ্ছিন্ন, ভিক্ষাপাত্র হস্তে নিত্য অনাথশালার অনুসরণ করে, তথায় তাহার শয্যা, হস্ত-পদের বিষাক্ত ক্ষত হইতে অহরহঃ কৃমি নির্গত হইতেছে ও দুঃখভরে আর্ত্তনাদ করিতেছে, তাদৃশ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া করুণা ভাবনা করিবেন। যদি এতাদৃশ লোক পাওয়া না যায়, যে সমস্ত চোর দস্যুকে হত্যা

করিবার জন্য দণ্ডাঘাতে বধ্যস্থানে লইয়া যাইতেছে, তেমন লোককে খাদ্য-ভোজ্য দিয়া, তাহার সুখ কামনা করাই করুণা প্রদর্শন করা।

যদি কোন দুঃশীল ব্যক্তি বহুবিধ পাপানুষ্ঠান দ্বারা নিজকে নিরয়মুখী করে, কোন সজ্জন তাহাকে দেখিয়া চিন্তা করেন যে—'অহো! মরণান্তে এই লোকটা কতই অনন্ত দুঃখের ভাগী হইবে।' এ ভাবে তাহার প্রতি করুণা প্রদর্শন করাই করুণা ভাবনার নামান্তর।

সাধারণত দুঃশীল ব্যক্তির উপর সুশীলের করুণা স্বাভাবিক। মৈত্রী ভাবনার ন্যায় করুণাকেও যথাক্রমে বৃদ্ধি করিয়া অর্পণা ধ্যান লাভ করিতে পারেন। ইহাতেও ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি অনিবার্য্য।

৩৩। **'মুদিতা ভাবনা'**—অতি প্রিয়লোকদিগকে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে বর্জ্জন করিয়া, যে ব্যক্তি প্রথমে হাসিয়া পরে আলাপ রত হয়, তাদৃশ লোককে অবলম্বন করিয়া 'মুদিতা ভাবনা' করিবেন।

যে ব্যক্তি সুখে নিরুদ্বেগে জীবন-যাপন করিতেছে, তাহাকে দেখিয়া 'অহো! এ ব্যক্তি বেশ মনানন্দে বাস করিতেছে; অন্যান্য লোকও তাহার ন্যায় সন্তুষ্টভাবে বাস করুক।' এই প্রকারে মুদিতা ভাবকে সম্প্রসারণ করিয়া এক এক দিক ব্যাপৃত করিবেন।

যদি কোন ধনাঢ্য সুখী পরিবার পরে দরিদ্র হয়, তদ্দর্শনে তাহার পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করিয়া মুদিতা ভাবনা করা যায়। অথবা এই ব্যক্তি আবার সম্পত্তিশালী হইয়া ভবিষ্যতে সুখে থাকিতে সমর্থ হইবে। এরূপ ভবিষ্যৎ ভাবিয়াও মুদিতা ভাবনা করা যায়।

এ নিয়মে যথাক্রমে প্রিয় পুদ্গল হইতে শত্রুভাবাপন্ন লোককে পর্য্যন্ত অনুস্মরণ করিয়া মুদিতা ভাবনাকে বৃদ্ধি করিতে হয়। এই ভাবনাতেও অর্পণা ধ্যান উৎপন্ন হয়। মরণান্তে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি অনিবার্য্য।

৩৪। **'উপেক্ষা ভাবনা'**—কোন লোকের ভাল-মন্দ অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া তাহাদের সুখে-দুঃখে চঞ্চল না হইয়া ও চিত্তের শান্ত-ভাবালম্বনে উপেক্ষা ফল প্রত্যক্ষ করিয়া নিজকে প্রকৃতিস্থ করাই মধ্যস্থ পুদ্গলের লক্ষণ। সর্ব্বদা উপেক্ষাভাব প্রদর্শনে উপেক্ষা ভাবকে জাগ্রত করিতে হয়। মনোজ্ঞ ও অমনোজ্ঞ ব্যক্তিকে দেখিয়া উপেক্ষা ভাবে থাকিলে উপেক্ষা ভাবের বিস্তৃতি লাভ করে। সে কারণে শত্রুও নহে, মিত্রও নহে, এমন লোককে অবলম্বন

করিয়া উপেক্ষার সঞ্চার করা সমীচীন। তৎপর প্রিয় হইতে শত্রু পর্য্যন্ত উপেক্ষাকে বাড়াইয়া, ইহার বৃদ্ধি সাধন করিতে পারিলে, চতুর্থ ধ্যান পর্য্যন্ত অগ্রসর হওয়া যায়।

উপেক্ষার বিশেষ প্রভেদ এই—চিত্তের লীন ও মধ্যস্থ অবস্থাই তত্রমধ্যস্থতা উপেক্ষা। ইহার লক্ষণ নিরপেক্ষতা। সুখ-দুঃখহীন অনুভূতি অদুঃখ-অসুখ বেদনা। ইহা কায়িক উপেক্ষা। মানসিক সুখ-দুঃখহীন বেদনাও চিত্তজ উপেক্ষা। কুশল চৈতসিক হিসাবে বোধ্যঙ্গের উপেক্ষা। ব্রহ্মবিহারের উপেক্ষা ও সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞানজ, বেদনাজ নহে।

এই চারি অপ্রমেয় ভাবনার অন্য নাম ব্রহ্মবিহার। ব্রহ্ম শব্দ শ্রেষ্ঠার্থবাচক। যেমন ব্রহ্মচারী। এই ব্রহ্ম বা শ্রেষ্ঠ জীবন যাপন করা মানবমাত্রেরই সাধ্যায়ত্ত। জীবের হিত-সুখ কামনা, পর-দুঃখ অপনোদন ইচ্ছা, পরের সুখ সম্পদ অনুমোদন ও চিত্তের অনুদ্ধতাবস্থা গঠন, মানব ধর্ম্মও বটে।

জাগ্রত-জীবন গঠনের এই মৈত্রী-করুণা-মুদিতা-উপেক্ষা ব্রহ্মবিহার সর্ব্বজন পরিভোগ্য বিষয়। ইহাতে যে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি নিশ্চিত, ইহা সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞানেই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

আচার্য্য বুদ্ধঘোষ দেখাইয়াছেন—

(১) জননীর পক্ষে শিশু-পুত্রের যৌবন কামনা 'মৈত্রী' স্বরূপ।

(২) রুগ্ন সন্তানের আরোগ্য কামনা 'করুণা' স্বরূপ।

(৩) যুবক পুত্রের যৌবনাবস্থার চিরস্থিতি কামনা 'মুদিতা' স্বরূপ।

(৪) আত্মনির্ভরক্ষম উপযুক্ত পুত্রের জন্য নিরুদ্বিগ্নতা 'উপেক্ষা' স্বরূপ।

(১) হিংস্রচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে মৈত্রী ভাবনা উপকারী।

(২) অপরকে দুঃখদানে আত্মপ্রসাদলাভী ব্যক্তির পক্ষে করুণা ভাবনা উপকারী।

(৩) মানসিক অনভিরতি সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে মুদিতা ভাবনা উপকারী।

(৪) কামরূপবহুল ব্যক্তির পক্ষে উপেক্ষা ভাবনা উপকারী।

পৃথিবীতে প্রত্যেক লোকের স্বভাব দর্শনে, চারি ব্রহ্মবিহারের যে কোন একটি গুণ পরিলক্ষিত হয়। যদি ইহাকে সাধনার অনুকূলে গ্রহণ করা যায়, পারলৌকিক প্রতিষ্ঠা তাঁহার উজ্জ্বল হয়। স্মৃতিচিত্তের অভাবে এই গুণ মৃত প্রায়। জাগ্রত জীবন গঠন করিতে হইলে ব্রহ্মবিহার ভাবনা প্রত্যেক নর-নারীর জীবনে অপরিহার্য্য।

এক সংজ্ঞা ভাবনা

৩৫। **'আহারে প্রতিকূল সংজ্ঞা বা এক সংজ্ঞা ভাবনা'**—এখানে আটপ্রকার ওজররূপকে আহরণ করে বলিয়া কবলীকৃতাহার, ত্রিবিধ বেদনাকে আহরণ করে বলিয়া স্পর্শাহার, ত্রিভবে প্রতিসন্ধিকে আহরণ করে বলিয়া মনঃসঞ্চেতনাহার ও প্রতিসন্ধিক্ষণে নামরূপকে আহরণ করে বলিয়া বিজ্ঞানাহার। এভাবে আহারকে চারিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। এখানে যথাক্রমে আহার চতুষ্টয়ে সূক্ষ্ম তৃষ্ণা, উপগমন, উৎপত্তি ও প্রতিসন্ধি এই চারিটি ভয় প্রদর্শিত হইয়াছে। উপমাযোগে যথাক্রমে পুত্র-মাংস ভক্ষণ, চর্ম্মহীন গরু, অঙ্গার গর্ত্ত ও শক্তিশূলে দ্বারা আহার চতুষ্টয় জ্ঞাতব্য।

কবলীকৃত আহার খাদ্য-ভোজ্য-স্বাদনীয় ও পানীয় বস্তুকে বুঝায়। সেই আহার্য্য দ্রব্যের ঘৃণ্যকর পরিণতি সম্বন্ধে জ্ঞানই 'এক সংজ্ঞা' নামে অভিহিত। যোগী নির্জ্জন স্থানে বসিয়া আহারের জন্য যাবতীয় উদ্যোগ আয়োজনে যত শারীরিক-বাচনিক-মানসিক কাজ করিতে হয়, তৎপ্রতি একটা বৈরাগ্যমূলক ঘৃণাভাব উৎপাদন করিবেন। অথচ এরূপ দুঃখ-সঞ্চিত সুন্দর মনোজ্ঞ আহারগুলি রাত্রি অবসানে বিষ্ঠায় পরিণত হয়, বন্ধু-বান্ধবসহ একসঙ্গে ভোজন করিয়া দুর্গন্ধ ত্যাগের জন্য যে গোপন স্থানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য করে, এভাবে উহার আদ্যন্ত অবস্থা অনুধাবন করিলে, আহারের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক।

কাজেই রসতৃষ্ণার প্রতি যোগীর ঘৃণাভাব জাত হইলে, ভাবনার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হয়। পঞ্চস্কন্ধ পোষণ দুঃখাংশ গ্রহণের মূলভূত কারণরূপে জ্ঞাত হইয়া বিতৃষ্ণভাব সঞ্চার করেন। ইহাতে সুগতি লাভ আসন্ন হয়।

৩৬। **'এক ব্যবস্থান ভাবনা'**—এই ভাবনা চারি ধাতু ব্যবস্থান, ধাতু মনস্কার ও ধাতু ধর্ম্মস্থান নামে অভিহিত।

এই পূতিগন্ধময় দেহে কেশ হইতে মগজ পর্য্যন্ত ২০টি 'পৃথিবী ধাতু'; পিত্ত হইতে মূত্র পর্য্যন্ত ১২টি 'আপধাতু'; যাহা দ্বারা দেহ সন্তপ্ত হয়, কেশাদি জীর্ণ হয়, যাহা দ্বারা দেহে দাহ জাত হয়, যাহা দ্বারা খাদ্য-ভোজ্য-স্বাদনীয়-পানীয় দ্রব্য হজম হয়, এই ৪টি 'তেজ ধাতু' ও শরীরের উর্দ্ধগামী, অধোগামী, উদরাশ্রিত, অন্ত্রাশ্রিত, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাশ্রিত ও নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বায়ু ৬টি 'বায়ু ধাতু' মোট ৪২টি ধাতুরূপে দেহে বিদ্যমান আছে।

মনশ্চক্ষে দেহের এই ধাতুগুলিকে বিভাগ করিয়া যোগীকে কায়ের বিচার করিতে হয়। যোগী দেহটা মাংস-পিণ্ড হইতে বিভাগ করিয়া ধাতুরূপে বিভাগ করিলে, ইহার অস্তিত্বে সন্দিহান হয়। গোঘাতক যেমন হত গরুটাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া বিক্রয়ার্থ স্তূপাকারে রাখিলে, উহাকে আর কেহ গরু বলিয়া ধারণা করে না, মনে করে, ইহা মাংস, তেমন নিজ দেহকে কল্পনা চক্ষে ধাতু অনুসারে বিভাগ করিলে, 'আমি বা আমার' এই ধারণা স্বাভাবিকভাবে বিলোপ পায়। কাজেই রূপস্কন্ধের অনাত্মজ্ঞান, ক্রমে নামস্কন্ধের অনাত্মজ্ঞানে পরিণত হয়। (অবশিষ্ট কায়গতাস্মৃতি ভাবনায় দ্রষ্টব্য।)

যোগী দেহের এক একটা অংশকে জ্ঞানত প্রত্যবেক্ষণ করিলে, ধাতুগুলি প্রকট হইয়া উঠে। ইহাতে যোগীর উপচার ধ্যান লাভ হয়। দেহ যে শূন্য, সত্ত্ব-জীব বিরহিত, ইহাতে তাঁহার বদ্ধমূল ধারণা জন্মে। এ ভাবে যোগীর তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞার আবির্ভাব হয়। ধ্যানামৃত পানের পর দেহান্তে তিনি সুগতি লাভ করিয়া থাকেন।

চারি অরূপ ভাবনা

৩৭। **'আকাশানন্তায়তন ভাবনা'**—পৃথিবী বা অন্য কোন কৃৎস্নকে অবলম্বন করিয়া বা নিশ্বাস-প্রশ্বাসকে অবলম্বন করিয়া, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম ধ্যানচিত্ত উৎপন্ন করার পর, যখন যোগী বুঝিতে পারেন যে, শারীরিক দুঃখ-দৈন্য শরীরের অস্তিত্ব হেতু ; তখন যোগী রূপে বিরাগী হইয়া পড়েন। এমন কি ধ্যানের রূপালম্বনকে পর্য্যন্ত বিরক্তির চক্ষে নিরীক্ষণ করেন। এই প্রকারে রূপাবচর ধ্যানের স্থূলতা বুঝিতে পারিয়া যোগী অরূপধ্যানে মনোযোগী হন। অন্য উপায়ে বুঝিতে হইলে যদি যোগী রূপধর্ম্ম জ্ঞান পূর্ব্বক বিচার করিয়া অরূপধর্ম্ম বা চিত্ত-চৈতসিক ধর্ম্ম জ্ঞানগোচর করিয়া বিচার করিতে অসমর্থ হন, তবে যোগী হতাশ না হইয়া উৎসাহ সহকারে রূপধর্ম্মই পুনঃপুনঃ বিচার করিবেন। এভাবে রূপধর্ম্ম যতই তাঁহার জ্ঞানপথে পরিশুদ্ধভাবে প্রকাশিত হইবে, ততই রূপধর্ম্মাশ্রিত অরূপ ধর্ম্মসমূহ সহজেই স্বয়ং প্রকটিত হইবে।

যেমন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি অপরিশুদ্ধ দর্পণে স্ব-মুখের প্রতিবিম্ব স্পষ্টরূপে দেখিতে না পাইলেও, সেই দর্পণ ত্যাগ না করিয়া, যখন তাহা পুনঃপুনঃ

ঘষিয়া-মাজিয়া পরিষ্কৃত করেন, তখন সেই দর্পণে মুখের প্রতিবিম্ব স্বয়ং প্রকটিত হইয়াছে দেখিতে পান। এরূপ যোগীও জ্ঞান পূর্ব্বক পুনঃপুনঃ-বিচার করিবেন, যাহাতে অরূপ ধর্ম্মসমূহ জ্ঞানপথে পরিষ্কৃত ভাবে উদিত হয় এবং উদিত হইলে অরূপ ধর্ম্মসমূহ সহজেই তাঁহার জ্ঞানগোচর হয়।

যদি এক দুই বা তিনটি মাত্র রূপধর্ম্ম যোগীর জ্ঞানপথে উদিত হয়, এবং অপর রূপগুলি পরিত্যাগ করিয়া যোগী অরূপধর্মের বিচারে মনোনিবেশ করেন, তাহা হইলে তাঁহার যোগ-পরিহানি ঘটিয়া থাকে।

পর্ব্বত হইতে পদস্খলিত গাভী যে ভাবে ভূপাতিত হয়, যোগহানির ফলে তাঁহারও সেভাবে পতন হয়। কাজেই প্রথমে সমস্ত রূপধর্ম পরিশুদ্ধাকারে জ্ঞানত উপলব্ধি করিয়া, পরে অরূপধর্ম্মকে মনোনিবেশ করিলে তাঁহার কর্ম্মস্থান ভাবনা সিদ্ধ হয়।

যোগী যতদূর ইচ্ছা করেন, ততদূর কৃৎস্ন মণ্ডল প্রস্তুত করিয়া স্পৃষ্ট স্থানকে 'আকাশ, আকাশ' বলিয়া নতুবা 'অনন্ত আকাশ, অনন্ত আকাশ' বলিয়া কৃৎস্নকে উদ্‌ঘাটন করেন। তখন যোগী আকাশ অসীমঅনন্ত, আকাশ সর্ব্বত্র, আকাশ মেঘান্তরালে, তথা আকাশ শরীরে, লোমকূপে প্রত্যক্ষ করেন। তখন যোগীর মনে হয়, মেঘ অন্তর্হিত হইয়া গিরাছে। নক্ষত্রাবলী নিবিয়া গিয়াছে, সসম্ভার পৃথিবী অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। নিজেও আকাশে তন্ময় হইয়া গিয়াছেন। শুধু অনন্ত আকাশ, নিরাকার শূন্যই চিত্ত অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

যেমন একখণ্ড আকাশকে পরিবেষ্টন করিয়া চারিদিকে চারিটি প্রাচীর ও উপরে ছাউনি দিয়া আমরা বলিয়া থাকি, একখানি ঘর। যদি প্রাচীর ও ছাউনি উৎখাত করা যায়, আবার ঐ স্থান আকাশে পরিণত হয়। তেমন এই দেহখানির প্রত্যেক অংশে যে আকাশ পরিবৃত, যোগী মানস-নেত্রে উহা দেখিতে পান। প্রত্যেক বস্তুর ফাঁকে ফাঁকে যোগী কেবল আকাশই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। যাহা আমরা নিরেট বলিতেছি, তাহাতেই যে আকাশ আছে, যোগীর সূক্ষ্মজ্ঞানে তাহা ধরা পড়ে। ইহাতে অসীম আকাশের অনুভূতি হয়।

৩৮। **'বিজ্ঞানানন্তায়তন ভাবনা'**—যোগী আকাশানন্তায়তনে উপদ্রব প্রত্যক্ষ করিয়া এই শান্ত আয়তনে মনোনিবেশ করেন। সেই আকাশকে ব্যাপৃত করিয়া 'বিজ্ঞান, বিজ্ঞান' বলিয়া পুনঃপুনঃ প্রত্যবেক্ষণ করিবেন।

এভাবে তর্ক-বিতর্ক করিতে করিতে 'অনন্ত, অনন্ত' বলিয়া মনোনিবেশ করিবেন। পূর্ব্বোক্ত নিমিত্তে চিত্তকে ভ্রমিত করাইলে, নীবরণ সমূহ দূরে সরিয়া পড়ে। চিত্তের স্থিরতার সঙ্গে সঙ্গেই উপচার সমাধি উৎপন্ন হয়। আকাশ-স্পৃষ্ট বিজ্ঞানে বিজ্ঞানানন্তায়তন চিত্ত অর্পণাতে যুক্ত হয়।

বিজ্ঞান বা চিত্তের উৎপত্তি-বিলয় আছে। এই অর্থে বিজ্ঞান সান্ত হইলেও অনন্ত আকাশকে অবলম্বন করাতে, ইহাকে অনন্ত বলা হইয়াছে। চিত্ত অনন্ত-আকাশের সহিত নিজকে একীভূত করিবার পর সেই অনন্ত আকাশময়, 'অনন্ত চিত্তকে' আলম্বন করিয়া যোগী ধ্যানানুষ্ঠান করেন। বিভঙ্গ গ্রন্থে কথিত হইয়াছে ঃ—

> "অনন্তং বিঞ্ঞাণন্তি তং যেব আকাসং
> বিঞ্ঞাণেন ফুটং মনসি করোতি, অনন্তং
> ফরতি তেন বুচ্চতি অনন্তং বিঞ্ঞাণং।"

অর্থাৎ অনন্ত বিজ্ঞান বলিলেও যোগী সেই আকাশকে বিজ্ঞান দ্বারা ব্যাপৃত করিয়া মনোনিবেশ করিয়া থাকেন। অনন্তকে ব্যাপৃত করে বলিয়া অনন্ত বিজ্ঞান নামে কথিত হয়। অর্থকথাচার্য আকাশ ব্যাপৃত বিজ্ঞানকে যোগীরা মনোনিবেশ করেন বলিয়া ভাষণ করিয়াছেন। দেবগণের 'দেবায়তন' তুল্য পরিব্যাপ্ত বিজ্ঞানকে বিজ্ঞানায়তন নামে বর্ণনা করা হইয়াছে।

৩৯। **'আকিঞ্চনায়তন ভাবনা'**—যোগী আকাশানন্তায়তন ও বিজ্ঞানানান্তায়তন দুইটির শূন্যতা এবং বিবিক্তাকার প্রত্যক্ষ করিয়া উহাদের প্রতি অমনোযোগী হন। এই অনন্ত চিত্তও কিছু নহে, ইহার ভগ্নাংশও অবশিষ্ট নাই। যেহেতু ইহা অবিদ্যমান। তখন যোগী 'নাই, নাই,' 'শূন্য, শূন্য' 'বিবিক্ত, বিবিক্ত' বলিয়া চিন্তা করিতে থাকেন। এভাবে মনোনিবেশ বা প্রত্যবেক্ষণ করা উচিত। তর্ক ও বিতর্ক উৎপাদন করাও কর্ত্তব্য। সেই নিমিত্তে চিত্তকে ভ্রমিত করার ফলে, যোগীর নীবরণ সমূহ দূরে সরিয়া পড়ে, স্মৃতিও সুস্থিত হয়। উপচার ধ্যানে চিত্ত সমাধিস্থ হয়। সেই নিমিত্ত পুনঃ-পুনঃ বর্দ্ধন করার ফলে, অকিঞ্চন ধ্যান লাভ হয়।

যেমন কোন যোগী সভায় পরিপূর্ণ জনতা দর্শন করিয়া, পরক্ষণে সমস্ত লোক চলিয়া যাওয়ায়, স্থানটি শূন্যময় দেখেন, তদ্দর্শনে যোগীর চিত্তে এভাব জাগে না যে, সমস্ত লোকগুলি মরিয়া গিয়াছে। কেবল স্থানটা শূন্যময়ই

দেখিয়া থাকেন, এই ভাবটাই তাঁহার প্রবল হয় মাত্র। কিঞ্চনের বা কিছুর অভাব দর্শনই এই আকিঞ্চনায়তন। সেই কারণে বলা হইয়াছে ঃ—

"সব্বসো বিঞ্ঞাণঞ্চায়তনং সমতিক্কম্ম নত্থি কিঞ্চী'তি আকিঞ্চঞ্ঞায়তনং উপসম্পজ্জ বিহরতি।" অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত নিয়মে এখানে বিজ্ঞানানন্তায়তন সম্যকরূপে অতিক্রম করিয়া 'কিছুই-নাই বলিয়া' যোগীর এই ধারণা যখন প্রবল হয়, তখন আকিঞ্চনায়তন ধ্যান লাভ করিয়া থাকেন।

৪০। **'নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন'**—যোগী আকিঞ্চনায়তন ধ্যানের পর, সংজ্ঞার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। তখন যোগী সংজ্ঞাসমূহকে রোগতুল্য, গণ্ডতুল্য ও শল্যতুল্য মনে করেন। ইহাই শান্ত, ইহাই শ্রেষ্ঠ যে—সংজ্ঞাও নাই, অসংজ্ঞাও নাই। পূর্ব্বোক্ত ভাবনা হইতে বর্ত্তমান ভাবনার ফলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যোগীর এই দিকেই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া থাকে।

তখন যোগী 'শান্ত, শান্ত' বলিয়া বার বার চিন্তা ও প্রত্যবেক্ষণ করিবেন। এরূপে তর্ক-বিতর্ক উৎপাদন করিতে করিতে নীবরণ সমূহ দূরে সরিয়া পড়ে, স্মৃতি সুস্থিত হয়। উপচার ধ্যানে চিত্ত সমাধিস্থ হয়। সেই নিমিত্ত পুনঃপুনঃ বর্দ্ধনে বিজ্ঞান অপসৃত হয়, আকিঞ্চনায়তন সম্ভূত চতুর্ব্বিধ স্কন্ধে নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞাচিত্ত নিবদ্ধ হয়। ইহাতেই যোগী অর্পণা ধ্যানবিধি অবগত হইবেন।

চরিত ভেদে-ভাবনা নীতি

পূর্ব্বোক্ত ৪০টি কর্ম্মস্থানের মধ্যে চরিত ভেদে ভাবনা করিতে হয় যেমন,

১। রাগচরিতের পক্ষে—দশ অশুভ ও কায়গতাস্মৃতি।

২। দ্বেষচরিতের পক্ষে—নীল-পীত-লোহিত-অবদাত কৃৎস্ন ও মৈত্রী-করুণা-মুদিতা ও উপেক্ষা।

৩। মোহ ও বিতর্ক চরিতের পক্ষে—আনাপান স্মৃতি।

৪। শ্রদ্ধাচরিতের পক্ষে—বুদ্ধ-ধর্ম্ম-সঙ্ঘ-শীল-ত্যাগ-দেবতানুস্মৃতি।

৫। বুদ্ধি-চরিতের পক্ষে—মরণ-উপশমানুস্মৃতি, এক সংজ্ঞা ও এক ব্যবস্থান।

৬। অবশিষ্ট কর্ম্মস্থান সর্ব্বসাধারণের পক্ষে উপযোগী।

ভাবনা বিভাগ

চল্লিশটি শমথ ভাবনা দ্বারা 'পরিকর্ম্ম' ভাবনা লাভ নিশ্চিত। তবে

'বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনা' হইতে 'মরণানুস্মৃতি ভাবনা' পর্য্যন্ত ৮টি, আহারে প্রতিকূল বা অশুভ সংজ্ঞা (যাহা এক সংজ্ঞা নামে অভিহিত) ১টি ও চারি ধাতুর ব্যবস্থান ১টি (যাহা এক ব্যবস্থান নামে অভিহিত ১টি) এই ১০টি ভাবনা দ্বারা। 'উপচার ধ্যান' পর্য্যন্ত অগ্রসর হওয়া যায় কিন্তু 'অর্পণা-ধ্যান' লাভ হয় না।

অবশিষ্ট ৩০টি ভাবনায় 'অর্পণা ধ্যান' লাভ হয়।

ধ্যান প্রভেদ

১। ১০টি কৃৎস্ন ভাবনায় ও একটি আনাপান স্মৃতি ভাবনায় পঞ্চম ধ্যান পর্য্যন্ত লাভ হয়।

২। ১০টি অশুভ ভাবনা ও কায়গতাস্মৃতি ভাবনায় প্রথম ধ্যান পর্য্যন্ত লাভ হয়।

৩। মৈত্রী, করুণা ও মুদিতা ভাবনায় চতুর্থ ধ্যান পর্য্যন্ত লাভ করা যায়।

৪। উপেক্ষা ভাবনায় পঞ্চম ধ্যান লাভ হয়।

৫। চারিটি অরূপ ভাবনায় অরূপলোকের ধ্যান উৎপন্ন করে।

নিমিত্ত-বিভাগ

পরিকর্ম্ম, উদ্‌গ্রহ ও প্রতিভাগ ভেদে নিমিত্ত তিনটি। পরিকর্ম্ম নিমিত্ত ও উদ্‌গ্রহ নিমিত্ত আলম্বনের স্বভাব অনুসারে সমস্ত ভাবনায় লাভ করা যায়। কিন্তু দশ কৃৎস্ন, দশ অশুভ, কায়গতাস্মৃতি ও আনাপানস্মৃতি এই দ্বাবিংশতি ভাবনায় প্রতিভাগ নিমিত্ত লাভ হয়।

অবশিষ্ট ভাবনার আলম্বন গতে উপচার নিমিত্ত প্রভৃতি লাভ হয়।

। চল্লিশ প্রকার শমথ ভাবনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সমাপ্ত।

নির্বাণ লাভের মার্গ
সমাধি [দুই]

বিদর্শন (বিপস্সনা) ভাবনা

দর্শনের বিশেষত্ব সূচক অবস্থাকে নিদ্ধারণ কল্পে 'বিদর্শন' শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। যথা "বিসেসেন রূপেন পস্সতী'তি বিপস্সনা।" এই দর্শন 'সংজ্ঞা-বিজ্ঞানের' সংজানন-বিজানন তুল্য নহে। ইহা প্রকৃষ্টরূপে বিশেষ রূপে সমনুধাবন। ইহার অপর নাম 'প্রজ্ঞা ভাবনা।'

শুদ্ধি-বিশুদ্ধির উপর ইহার উৎপাদন বা অস্তিত্ব নির্ভর করে। সে কারণে প্রথমে সপ্ত বিশুদ্ধির বর্ণনা প্রসঙ্গে ইহার অবতারণা করিতে হইবে। প্রজ্ঞা উৎপাদনের মূলস্বরূপ 'শীলবিশুদ্ধি' ও 'চিত্তবিশুদ্ধি' প্রথমে সম্পাদন করা আশু কর্ত্তব্য। তৎপর প্রজ্ঞা উৎপাদনের দেহতুল্য দৃষ্টিবিশুদ্ধি, কংখাউত্তরণ বিশুদ্ধি, মার্গামার্গ জ্ঞানদর্শন বিশুদ্ধি, প্রতিপদা জ্ঞানদর্শন বিশুদ্ধি ও জ্ঞানদর্শন বিশুদ্ধি ভাবনা অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে যোগী প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন।

সেই কারণে প্রজ্ঞার ভূমিস্বরূপ বিষয়গুলিতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া, তৎপর প্রজ্ঞা উৎপাদনের মূল স্বরূপ দ্বিবিধ বিশুদ্ধিতে (শীলবিশুদ্ধি ও চিত্ত-বিশুদ্ধি) মনোনিবেশ করা প্রয়োজন। ইহার পর প্রজ্ঞার শরীরতুল্য পঞ্চ বিশুদ্ধি সম্পাদন অনিবার্য্য।

যোগীকে বুঝিতে হইবে, যাবতীয় সংস্কার ধর্মমাত্রেই অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মা স্বভাব। যদি ইহা উপলব্ধি করিতে যোগী সমর্থ হন, তাহা হইলে তাঁহার বিদর্শন সাধনা সম্পাদন সার্থক হইবে। ন্যূনকল্পে স্রোতাপত্তিফল লাভ করিলেও সাতজন্মের অধিক আর জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে না। এই 'বিদর্শন যানই' নির্বাণ যাত্রার সহজ উপায়।

শীল বিশুদ্ধি

কায়-সংযম ও বাক্য-সংযমের উপর এই শীলগুলি প্রতিষ্ঠিত। জীবনের পবিত্র ভিত্তি রচনা করিতে হইলে শীলনীতি সংরক্ষণ অপরিহার্য্য। তবে গৃহী-শীল, প্রব্রজ্যা-শীল ও ভিক্ষু-শীল প্রভেদে ইহা ত্রিবিধ। তন্মধ্যে গৃহী-

শীল ত্রিবিধ ঃ পঞ্চ—অষ্ট—দশশীল। শীলের অষ্টাঙ্গ বুদ্ধ-বর্ণিত উপোসথ দিনে পালন করিতে হয়। পঞ্চাঙ্গ ও দশাঙ্গ শীল গৃহীদের নিত্য শীল। তবে দশশীল পালন অত্যধিক বীর্য্য বা উৎসাহের উপর নির্ভর করে। কিন্তু পঞ্চশীল নিত্য পরিহিত বস্ত্রের ন্যায় সর্ব্বদা ধারণ ও পালন করিতে হয়।

প্রব্রজ্যা-শীল শ্রামণেরদিগকে পালন করিতে হয়। ইহাতে দশশীল, দশ-শিক্ষা, দশপারাজিকা, দশ নাশন-অনাশন বিধান, দশ দণ্ডকর্ম্ম, ৭৫টি সেখিয়া বা চারিত্র শীল ও চারি প্রত্যয় সংনিশ্রিত শীল আছে এবং বিনয় চুল-বর্গ গ্রন্থের ব্রত স্কন্ধে বর্ণিত যাবতীয় চারিত্র শীল।

ভিক্ষু-শীল ভিক্ষুদিগকে পালন করিতে হয়। উহা সপ্ত আপত্তি স্কন্ধে বর্ণিত ৯০৮০, ৫৬০০০৩৬ সহস্র।

নির্ব্বাণকামী বীর্য্যবান লোকের পক্ষে শ্রদ্ধার ভিতর দিয়া এই শীল পালন করা সহজ। শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও মুক্তি কামনা এই তিনটির অভাবে শীল পালন কঠিন। বুদ্ধ-বর্ণিত নির্ব্বাণের প্রতি বদ্ধমূল ধারণা জাগ্রত হইলে, শীল সংরক্ষণ অতি সহজ। তবে গৃহী-জীবন বিষয়-পঙ্কিলে আবদ্ধ বিধায় শীল পালনে বহুলোক ঔদাসীন্য প্রকাশ করে। কিন্তু প্রব্রজিত-জীবন উন্মুক্ত আকাশ তুল্য। তাঁহাদের পক্ষে শীল পালন নিষ্কণ্টক।

যাঁহারা শমথ বা বিদর্শন ভাবনা করিবেন, তাঁহাদের পরিশুদ্ধ শীলের উপর ইহার সাফল্য নির্ভর করে। সে কারণে গৃহী-প্রব্রজিত উভয়ে শীল গ্রহণ করিয়া বিশুদ্ধশীলে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। ভিক্ষুরাও বিনয় নির্দ্দিষ্ট শীলগুলির প্রতিপালন ও প্রতিকার করিয়া বিশুদ্ধশীলে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। তৎপর কর্ম্মস্থান গ্রহণার্থ গুরুর নিকট উপস্থিত হইবেন। তদন্যথা ফল লাভের আশা নাই।

প্রত্যেক যোগীকে শীল পালনে সচেতন থাকিতে হইবে। যদি কোন যোগী দশদিন ভাবনা করিয়া দুই তিনটি নিমিত্ত লাভ করেন, তাঁহাকে শীল পালনে আরও অধিকতর দৃঢ়তা উৎপাদন করিতে হইবে। যদি নিমিত্ত লাভের পর শীল ভঙ্গ করেন, তাহা হইলে লব্ধ নিমিত্ত অন্তর্হিত হইবে। পুনরায় শীলে সুস্থিত হইয়া নিমিত্ত লাভ করিতে তাঁহাকে বহুদিন চেষ্টা করিতে হইবে। সে কারণে দুঃশীল ধ্যান-ফল লাভ করিতে পারে না। কেহ ধ্যানারম্ভ করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, শীল পালনের আবশ্যকতা কত গুরুত্বপূর্ণ।

ভিক্ষুর পক্ষে যেমন 'প্রাতিমোক্ষ সংবর শীল' শ্রদ্ধা-দ্বারা পালনীয়, তেমন 'ইন্দ্রিয় সংবরশীল' স্মৃতি দ্বারা রক্ষণীয়। যেমন 'আজীব পরিশুদ্ধ শীল' বীর্য, দ্বারা পালনীয়, তেমন 'প্রত্যয় সংনিশ্রিত শীল' প্রজ্ঞা দ্বারা সুরক্ষণীয়।

যেমন জলদ্বারা ময়লা বস্ত্র পরিশুদ্ধ করিতে হয়, ভস্মদ্বারা দর্পণ পরিস্কার করিতে হয়, অগ্নি-দগ্ধ করিয়া স্বর্ণ-রৌপ্য শোধন করিতে হয়, তেমন জ্ঞান-জল দ্বারা ধৌত করিয়া শীলমলকে পরিশুদ্ধ করিতে হয়।

পরিকর্ম্ম, উদ্‌গ্রহ ও প্রতিভাগ নিমিত্তত্রয় উৎপাদনার্থ শীলবিশুদ্ধি সম্পাদন অপরিহার্য্য। বুদ্ধ দুইটি সত্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"দ্বে সচ্চানি অক্‌খাতং সম্বুদ্ধো বদতং বরো,
সম্মুতং পরমত্থঞ্চ ততিযং নুপলব্ভতি।"

একটি সম্মত সত্য বা ব্যবহারিক সত্য ও একটি পরমার্থ সত্য। শীল পালন, দুঃশীল্য বিরতি যদিও সম্মত সত্য কিন্তু ইহার সদাচরণ ব্যতীত পরমার্থ সত্য লাভ করা যায় না। যাহারা শীলসম্পন্ন নয়, তাহারা দর্শন শাস্ত্র আলোচনায় অধিকার জন্মাইতে পারে না। পঞ্চস্কন্ধে আসক্ত ব্যক্তির পক্ষে বিশুদ্ধ ভাবে শীল পালনও সম্ভব নহে। সংযম ও ত্যাগশীলতার অভাবে শীল পালনে প্রবৃত্তিও জাগ্রত হয় না। আবার স্কন্ধাসক্ত লোকও শীল-সংরক্ষণে অবহিত হয় না। আসক্তির অপর নাম উপাদান। ৫টি কারণে ইহার উৎপত্তি।

(১) চক্ষু ও বর্ণ—রূপস্কন্ধ।
(২) স্পর্শানুভূতি—বেদনা স্কন্ধ।
(৩) যাহা দেখে, দেখিয়াছি বলিয়া ধারণা করে, তাহা সংজ্ঞা স্কন্ধ।
(৪) চক্ষু-বর্ণ-চিত্ত সংযোগে যে স্পর্শ, তাহা সংস্কার স্কন্ধ।
(৫) যাহা চক্ষু বিজ্ঞান, তাহা বিজ্ঞান স্কন্ধ।

"সংখিত্তেন পঞ্চুপাদানক্‌খন্ধা দুক্‌খা।" সংক্ষেপে এই পঞ্চ উপাদান স্কন্ধই দুঃখোৎপত্তির মূল কারণ।

কাজেই যাঁহারা পঞ্চস্কন্ধে আসক্ত, তাঁহারা কি প্রকারে শীল পালন করিবেন?

চিত্তবিশুদ্ধি

'সীলে পতিট্ঠায নরো' যে কোন যোগী শীলসমূহে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া 'চিত্তং পঞ্ঞঞ্চ ভাবযং' সমাধি ও বিদর্শন ভাবনায় মনঃসংযোগ করিবেন। নির্বাণপথের যাত্রী হইতে হইলে শীলবিশুদ্ধির পর চিত্তবিশুদ্ধির প্রতি আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। সমাধিভাবনা ব্যতীত চিত্তবিশুদ্ধির সম্ভাবনা নাই। পূর্ব্বে যে চল্লিশ প্রকার শমথ ভাবনার বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে, উহাতেই চিত্তবিশুদ্ধি সাধিত হইবে। আবার শীলবিশুদ্ধির অভাবে চিত্ত-বিশুদ্ধির স্থান নাই। তবে রোগানুযায়ী যেমন ঔষধের ব্যবস্থা অপরিহার্য্য, তেমন যোগীর চরিতানুযায়ী কর্ম্মস্থান নির্ব্বাচনও অপরিহার্য্য। এই নির্ব্বাচিত কর্ম্মস্থানই পরিকর্ম্ম নিমিত্ত নামে অভিহিত।

পূর্ব্বোক্ত নিমিত্তত্রয় উৎপাদনে চিত্ত যখন সমাধিস্থ হয়, তখন নীবরণ সাময়িকভাবে নিবৃত্ত থাকে। তৎপর চিত্তের প্রীতি সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে ধ্যানাঙ্গ সমূহ শক্তিশালী হইয়া উঠে। ইহাই অর্পণা সমাধি বা পূর্ণ সমাধি। উপচার ও অর্পণা সমাধির প্রভাবে চিত্তের নীবরণ-হীন প্রীতিময় অবস্থার নাম 'চিত্তবিশুদ্ধি।'

যোগী এভাবে চঞ্চল চিত্তকে সমাহিত করিতে সমর্থ হইলে শীলভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া উচ্চতর ধ্যানসমূহ লাভ করিতে পারেন। যোগী রূপাবচর পঞ্চম ধ্যান জাত পঞ্চবিধ অভিজ্ঞা, লৌকিক ঋদ্ধি প্রভৃতি আয়ত্ত করিতে সমর্থ হন। কিন্তু অর্পণা সমাধি বা লৌকিক ঋদ্ধি অর্হত্ত্বপ্রাপ্তির সহায়ক নহে। কারণ অর্পণা সমাধি লাভ ব্যতীত কেবল বিদর্শন ভাবনা দ্বারা উপচারের একাগ্রতা সাধনে আসক্তিসমূহ ক্ষয় করা সম্ভব। তবে এই ক্ষীণাসবকে 'শুষ্ক বিদর্শক' বলে। কারণ যোগী কেবল বিদর্শন জ্ঞানে তৃষ্ণাকে শুষ্ক করিতে সমর্থ হন।

শমথ ধ্যান লাভ করিলেও সপ্তানুশয় নিঃশেষের জন্য বিদর্শন জ্ঞান লাভ অত্যাবশ্যক। শমথ ধ্যান লৌকিক চিত্তের একাগ্রতা হইতে উৎপন্ন হয়। ইহা চিত্তকে সাময়িক ভাবে বিনীবরণ করিয়া শান্ত রাখিতে সমর্থ হয়। কিন্তু 'অনুশয়'[৩] বিধ্বংস করিতে অসমর্থ। সেই কারণে শমথ-শাসিত চিত্তের অনুশয় বিধ্বংস করিতে বিদর্শন ভাবনার প্রয়োজন অপরিহার্য্য।

যদিও শীল আমাদের কায়-বাক্যকে সুপথে পরিচালন করে, ব্যতিক্রম অবস্থা নিবারণ করে, কলুষ সংযত করিয়া চিত্তকে শক্তিশালী করে, বিশেষ

প্রজ্ঞালাভার্থ সুযোগ দানে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করে, তথাপি ইহা শমথ ভাবনার বৈশিষ্ট্য মাত্র। বিদর্শন ভাবনা ব্যতীত মার্গ-ফল লাভ করা সম্ভব নহে। সে কারণে নির্বাণ যাত্রীর পক্ষে বিশুদ্ধ চিত্তে দৃষ্টিবিশুদ্ধির প্রতি অবহিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

দৃষ্টি বিশুদ্ধি

এখানে 'দৃষ্টি' অর্থ পঞ্চস্কন্ধে আমিত্ব ও আত্মবাদ। নাম-রূপের যথা-যথ দর্শন দ্বারা দৃষ্টি বিশুদ্ধ হয়। যোগী পূর্ব্বোক্ত রূপাবচর ও অরূপাবচর ধ্যান হইতে উঠিয়া বিতর্কাদি পঞ্চ ধ্যানাঙ্গ এবং তৎসংযুক্ত অন্যান্য চৈতসিক ধর্ম্ম, উহাদের স্ব স্ব লক্ষণ প্রভৃতি জ্ঞান পূর্ব্বক বিচার করিবেন। তখন যোগী দেখিবেন যে, ঐ ধর্ম্মসমূহ স্বভাবত আলম্বনাভিমুখে নমিত হইতেছে।

যেমন কোন ব্যক্তি গৃহের মধ্যে সর্প দেখিয়া সর্পের অনুসরণ করিতে করিতে উহার আশ্রয় স্থানটুকু দেখিতে পায়, তেমন যোগীও জ্ঞান পূর্ব্বক চিন্তা করিয়া বুঝিতে পারেন যে, এই নমনধর্ম্মী 'নামটি' কোন্ বস্তুকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে। বিচার করিয়া যোগী দেখেন যে, ইহার একমাত্র আশ্রয় 'হৃদয়বস্তু'। আরও সূক্ষ্মভাবে যোগী দেখেন যে, চারি মহাভূত, উহার আশ্রয়ে উপাদারূপও হৃদয়বস্তুর আশ্রিত। এরূপে যোগী ২৮টি রূপধর্ম্ম দেখিতে পান। তন্মধ্যে রূপের রূপ্যন বা পরিবর্ত্তন শীলতাও দেখিতে পান।

যোগী পৃথিবী, অপ্, তেজ, বায়ু, এই চতুর্ভুতের আশ্রয়ে উৎপন্ন বর্ণ, গন্ধ, রস, ওজঃ, চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়প্রসাদ, হৃদয়বস্তু (স্ত্রীত্ব বাদ দিয়া), পুরুষত্ব, জীবিতেন্দ্রিয় ও চিত্তজ-ঋতুজ ভেদে দ্বিসমুত্থানজ শব্দ এই সতর প্রকার 'রূপ' ধর্ম্মকে সম্মর্শনরূপে, নিষ্পন্নরূপে, রূপ-রূপে চিন্তা করেন। এই সতরটি রূপই বিদর্শন ভাবনার উপযুক্ত। এগুলিকে রূপস্কন্ধ বলা হয়।

কায়িক সুখ ও দুঃখ বেদনাদ্বয় ও মানসিক উপেক্ষা-সৌমনস্য-দৌর্ম্মনস্য বেদনাত্রয়ই বেদনা স্কন্ধ। রূপ-শব্দ-গন্ধ-রস-স্পর্শ ও ধর্ম্ম এই ছয় সংজ্ঞাই সংজ্ঞাস্কন্ধ। বেদনা ও সংজ্ঞা এই চৈতসিক দুইটি ব্যতীত ৫০টি চৈতসিক

সংস্কারস্কন্ধ। ৮১ প্রকার লৌকিক চিত্ত বিজ্ঞানস্কন্ধ। এই স্কন্ধ চতুষ্টয়কে 'নাম' বলে।

কায়-বাক্য বিজ্ঞপ্তি, আকাশ ধাতু, রূপের লঘুতা, মৃদুতা, কর্ম্মণ্যতা, উপচয়, সন্ততি, জড়তা ও অনিত্যতা এই দশটি রূপ রূপের আকৃতি-বিকৃতি মাত্র বলিয়া বিদর্শন ভাবনায় গৃহীত হয় নাই। তথাপি সত্তরটি একটি, বিদর্শন ভাবনার যোগ্য সতরটি ও দশটি অনিষ্পন্নরূপসহ ২৮টি রূপ রূপস্কন্ধ রূপে পরিগণিত।

যোগী এই ২৮ প্রকার রূপধর্ম্মের লক্ষণ, রস, উৎপত্তির কারণ ও পরিণাম ফল অনুসারে বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে, নামও রূপ নহে, রূপও নাম নহে, দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

সূর্য্য-রশ্মি ও জলকণিকার বিশেষাকার সংমিশ্রণে যেমন ইন্দ্রধনু উৎপন্ন হয়, তেমন 'নাম' ও 'রূপের' সংমিশ্রণে 'আমির' উৎপত্তি হয়। খঞ্জ ও অন্ধের পারস্পরিক সাহায্যে পথ চলার ন্যায়, এই 'নাম' ও 'রূপ' পরস্পরের সাহায্যে 'আমি' সৃজন করিয়া চলিয়াছে। কোনটি একযোগে বা পৃথক ভাবে আমিও নহে, সত্ত্ব প্রভৃতিও নহে। উভয়ের পরস্পরের সম্মেলনের কারণ তাহাদের মধ্যেই রহিয়াছে। ইহাই সংস্কার বা কর্ম্ম। নাম ও রূপের মধ্যে তৃতীয় পক্ষ নাই। নাম-রূপই সংস্কার, সংস্কারই নাম-রূপ। এই প্রকারে বিচার করিয়া 'নাম-রূপকে' অনাত্মভাবে উপলব্ধি করাই দৃষ্টি-বিশুদ্ধি।

যাঁহারা অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম লক্ষণের ভিতর দিয়া এই পরমার্থ সত্যকে প্রত্যক্ষ করেন, তাঁহারাই যথার্থ সত্য উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হন।

যাদুকর যেমন রজ্জু-সঙ্কেতে নিজ্জীব পুতুলকে চলিতে, বলিতে ও দাঁড়াইতে বাধ্য করে, তেমন এই দেহরূপ পুতুলটা নামরজ্জুর সঙ্কেতে চলা-ফেরা করিতেছে। তাই প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন ঃ—

"নামং চ রূপং চ ইধ'ত্থি—সচ্চতো,
নহেত্থ সত্তো মনুজো চ বিজ্জতি।
সুঞ্ঞং ইদং যন্তমিবাভিসংখতং,
দুক্খস্স পুঞ্জো তিণকট্ঠসদিসো।"

যদি যোগী পরমার্থ সত্য দিয়া দেহখানি বিচার করেন, নামরূপ ব্যতীত ইহাতে কোন সত্ত্ব কিংবা ব্যক্তি দেখিতে পাইবেন না, কেবল নাম-রূপ, নাম-

রূপ মাত্র। পুতুলের মধ্যে যেমন জীব নাই, তেমন আমার মধ্যেও জীব নাই। কেবল তৃণ কাষ্ঠ সদৃশ দুঃখপুঞ্জ, দুঃখপুঞ্জ মাত্র।

এই যুগ্ম 'নাম-রূপ' পর স্পরাশ্রিত, উহাদের একটি ভগ্ন হইলে অপরটিও একক্ষণেই ভাঙ্গিয়া যায়। উভয়ের সংযোগেই যাবতীয় কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে। যেমন তরীকে আশ্রয় করিয়া মানব সমুদ্রে গমন করে, তেমন রূপকে আশ্রয় করিয়া নামকায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে। যেমন মানবের সাহায্যে তরী সমুদ্রে চালিত হয়, তেমন নামের সাহায্যে রূপকায় চালিত হয়। যেমন মানুষ ও তরী পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া জলপথে গমন করে, তেমন নাম ও রূপ পরস্পরের আশ্রয়ে চালিত হইতেছে।

যোগী এই প্রকারে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নাম-রূপের বিচারে অগ্রসর হইলে, পরমার্থ জ্ঞান লাভে সমর্থ হইবেন। এভাবে নাম-রূপের স্বরূপ দর্শনই দৃষ্টি বিশুদ্ধি। ইহাকে সংস্কার পরিচ্ছেদও বলা হয়।

কঙ্খাউত্তরণ বিশুদ্ধি

যোগী নাম-রূপ সম্বন্ধে বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিবার পর উহার মূল কারণ অন্বেষণে তৎপর হন। যেমন সুদক্ষ ভিষক রোগোৎপত্তির মূল কারণ অনুসন্ধান করেন, যোগীও তেমন উহার কারণ নির্ণয়ে অবহিত হন। যোগী তখন বুঝিতে পারেন যে, এই নাম-রূপ অহেতুক নহে। কারণ লোকীয় সব কিছু কারণসম্ভূত। বর্ত্তমান নাম-রূপ অতীত হেতুর ফল। নাম-রূপ ঈশ্বরাদি হেতুমূলক নয়। কারণ ঃ—

"নামরূপতো উদ্ধং ইস্‌সরাদীনং অভাবতো" ইহা কোন অবোধ্য, অনৈসর্গিক পুরুষ বা ঈশ্বরের হেতুহীন ইচ্ছা বা প্রত্যাদেশমূলক নহে। কোন ঈশ্বর বা তাঁহার প্রতিনিধি কর্ত্তৃক নাম-রূপের সৃষ্টি হয় নাই। অতীতের অবিদ্যা-তৃষ্ণা-উপাদান জননীর ন্যায়, কর্ম্ম জনকের ন্যায় এবং আহার ধাত্রীর ন্যায় কাজ করাতে, বর্ত্তমান নাম-রূপের উৎপত্তি। বর্ত্তমানের পঞ্চহেতু—বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ ও বেদনা দ্বারা ভাবী 'নাম-রূপ' উৎপন্ন হইবে।

যোগী যখন 'রূপ-কায়ের' হেতু অবধারণ করেন, তখন দেখিতে পান যে, আমার এই দেহ পদ্মকোরকে জাত হয় নাই। ইহার জন্ম হইয়াছে—মাতার উদর পটল পশ্চাতে রাখিয়া, পৃষ্ঠ কণ্টক সম্মুখে করিয়া ও অন্ত্র অন্ত্রগুণ পরিবৃত হইয়া অতিশয় ঘৃণিত সঙ্কীর্ণ স্থানে। পূতি মৎস্যে যেরূপ

কৃমিজাত হয়, আমিও সেরূপ মাতৃজঠরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। কাজেই এই অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান, কর্ম্ম ও আহার, এই পাঁচটিই রূপ-কায় উৎপত্তির একমাত্র হেতু-প্রত্যয়।

পুনরায় যোগী যখন 'নাম-কায়ের' হেতু অবধারণ করেন, তখন দেখিতে পান যে, চক্ষু-শ্রোত্র-ঘ্রাণ-জিহ্বা-কায়-মন-অনুক্রমে রূপ-শব্দ-গন্ধ রস-স্পর্শ-ধর্ম্ম বিজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া চক্ষু প্রভৃতি বিজ্ঞান উৎপন্ন হইতেছে। নাম-কায় উৎপত্তির ইহাই মূলীভূত কারণ বলিয়া যোগী সিদ্ধান্ত করেন। হেতু-সম্ভূত নাম-রূপজ্ঞানে যোগীর প্রত্যক্ষ পরিচয় হওয়ার পর, ষোড়শ প্রকার বিচিকিৎসার (=সংশয়) প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়।

যোগী অতীত জন্মের প্রতি সন্দেহাকুল হইয়া চিন্তা করেন যে :—

(১) আমি অতীতে ছিলাম কি ?

(২) অতীতে ছিলাম নয় কি ?

(৩) অতীতে আমি কি ছিলাম ?

(৪) আমি অতীতে কিরূপ ছিলাম ?

(৫) আমি অতীতে কি হইয়া কি হইয়াছিলাম ?

অনাগত-অনাগত জন্মের প্রতি সন্দিগ্ধভাব পোষণ করিয়া চিন্তা করেন যে :—

(১) ভবিষ্যতে আমি হইব কি ?

(২) ভবিষ্যতে আমি হইব না কি ?

(৩) ভবিষ্যতে আমি কি হইব ?

(৪) আমি ভবিষ্যতে কিরূপ হইব ?

(৫) আমি ভবিষ্যতে কি হইয়া কি হইব ?

বর্ত্তমান জন্মের প্রতি সন্দেহ পোষণ করিয়া চিন্তা করেন যে :—

(১) এখন আমি আছি কি ?

(২) এখন আমি নাই কি ?

(৩) এখন আমি কি ?

(৪) কিরূপই বা আমি এখন ?

(৫) কোথা হইতে আমি আসিয়াছি ?

(৬) এখন কোথায় যাইব ?

যোগী এভাবে কার্য্য-কারণ পরম্পরা নাম-রূপের ক্রমোৎপত্তি দর্শন করিয়া

থাকেন। তখন সাকার বস্তুর জীর্ণত্ব প্রাপ্তি অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া জরা-মরণ জনিত কর্ম্মভবে জন্ম বা উৎপত্তি প্রত্যক্ষ করেন, তৎপর উৎপত্তি ভবের কারণে উপদান, উপদান জনিত তৃষ্ণা, তৃষ্ণা জনিত বেদনা, বেদনা জনিত স্পর্শ, স্পর্শ জনিত ষড়ায়তান, ষড়ায়তন জনিত নাম-রূপ, নাম-রূপ জনিত বিজ্ঞান, বিজ্ঞান জনিত সংস্কার, সংস্কার জনিত অবিদ্যা। এভাবে প্রাতিলোমিক ভেদে জন্ম রহস্য বিদিত হন। ইহাতে যোগীর সন্দেহগুলির নিরসন হয়।

তৎপর যোগী কর্ম্মবিবর্ত্ত ও বিপাকবিবর্ত্তের ভিতর দিয়া নাম-রূপের কারণ পর্য্যবেক্ষণে বুঝিতে পারেন যে—অতীত কর্ম্মভব হইতে 'অবিদ্যা-সংস্কার-তৃষ্ণা-উপাদান-ভব' বর্ত্তমান জন্ম গ্রহণের হেতু। বর্ত্তমান জাত বিজ্ঞান-নাম-রূপ-ষড়ায়তন-স্পর্শ-বেদনা' অতীত কর্ম্মভবের পরিণামী ফল। বর্ত্তমান কর্ম্মভবে 'তৃষ্ণা-উপাদান-ভব-অবিদ্যা-সংস্কার' ভবিষ্যতে উৎপদ্যমান প্রতি-সন্ধি বিজ্ঞানের হেতু।

যোগী এভাবে হেতু হইতে যে নাম-রূপের উৎপত্তি-বৃদ্ধি হয় তাহা কর্ম্ম, কর্ম্ম-বিপাক, কর্ম্মবিবর্ত্ত, বিপাকবিবর্ত্ত, কর্ম্ম-সন্ততি, বিপাক-সন্ততি, ক্রিয়া ও ক্রিয়াফলের ভিতর দিয়া বার বার বিষয়টি প্রত্যবেক্ষণ করেন। তখন যোগী দেখিতে পান যে ঃ—

কম্মবিপাকা বত্তন্তি বিপাকো কম্ম-সম্ভবো,
তস্মা পুনব্ভবো হোতি, এবং লোকো পবত্ততি।"

কর্ম্ম ও বিপাক (ফল) মাত্র বিদ্যমান। কিন্তু বিপাক কর্ম্মসম্ভূত। সেই কারণে পুনরুৎপত্তি হয়। পঞ্চ-স্কন্ধের উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও বিলয়, এই-রূপেই আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু ঃ—

কম্মস্স কারকো নত্থি, বিপাকস্স চ বেদকো,
সুদ্ধধম্মা পবত্তন্তি, এবেতং সম্মা দস্সনং।"

কর্ম্মের কোন কর্ত্তা নাই। বিপাকের বা ফলের সুখ-দুঃখ ভোগী কোন ভোক্তা নাই। কেবল শুদ্ধধর্ম্ম নাম-রূপ মাত্র সংস্কার রূপে বিদ্যমান আছে। ইহাকেই সম্যক দর্শন বলে। এই কারণে বলা হইয়াছে ঃ—

"এবং কম্মে বিপাকে চ বত্তমানে সহেতুকে,
বীজরুক্খাদিকানং'ব পুব্বকোটি ন ঞায়তি।"

অবিদ্যা প্রভৃতি সহেতুক কর্ম্ম বিপাক বিদ্যমান থাকায় বীজের সঙ্গে বৃক্ষের সম্বন্ধ তুল্য আদি সীমা পরিদৃষ্ট হয় না। সে কারণে ঃ—

"অনাগতেপি সংসারে অপ্পবত্তি ন দিস্সতি,
এতমত্থমনঞ্ঞায় তিত্থিযা অসযংবসী,
সত্তসঞ্ঞং গহেত্বান সস্সতুচ্ছেদদস্সিনা,
দ্বাসট্ঠি দিট্ঠিং গণ্হন্তি অঞ্ঞমঞ্ঞবিরোধিকা।"

ভবিষ্যতে সংসারে ইহার অপ্রবর্ত্তন দেখা যায় না.আবহমানকাল এই রহস্য চলিবেই। কিন্তু শাশ্বত-উচ্ছেদদর্শী অসংযত তীর্থিয়গণ সত্ত্ব সংজ্ঞার কারণে এই বিষয় অবগত না হইয়া, পরস্পর বিরোধী দ্বাষষ্টি দৃষ্টিকে গ্রহণ পূর্ব্বক সংসারপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া থাকে। সেজন্য উক্ত হইয়াছে :—

"দিট্ঠিবন্ধনবদ্ধা তে তণ্হাসোতেন বুয্হরে,
তণ্হাসোতেন বুয্হন্তা ন তে দুক্খা পমুচ্চরে।"

সেই দৃষ্টির আড়ালে আবদ্ধ ব্যক্তিগণ তৃষ্ণাস্রোতে ডুবিয়া যাইতেছে, তৃষ্ণা-স্রোতে নিমগ্ন যাহারা, তাহারা দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে না। এ কারণ অবগত হইয়া :—

"এবমেতং অভিঞ্ঞায ভিক্খু বুদ্ধস্স সাবকো,
গম্ভীরং নিপুণং সুঞ্ঞং পচ্চযং পটিবিজ্ঝতি।"

কিন্তু বুদ্ধের শ্রাবক ভিক্ষু ইহা অভিজ্ঞাত হইয়া গম্ভীর নিপুণ শূন্যতা-ময় কার্য্যকারণ নীতিকে উপলব্ধি করিরা থাকেন এবং প্রত্যক্ষ ভাবে দর্শন করেন যে :—

"কম্মং নত্থি বিপাকম্হি পাকো কম্মে ন বিজ্জতি,
অঞ্ঞমঞ্ঞং উভো সুঞ্ঞতা ন চ কম্মং বিনা ফলং।"

বিপাকে কর্ম্ম নাই, কর্ম্মেও বিপাক নাই, পরস্পর দুইটি শূন্য, কিন্তু কর্ম্ম বিনাও ফল নাই। যেমন :—

"যথা ন সূরিযে অগ্গি ন মণিম্হি, ন গোমযে,
ন তেসং বহি সো অত্থি সম্ভারেহি চ জাযতি।"

সূর্য্য, মণি ও গোবরে অগ্নি বিদ্যমান থাকে না। অথচ তাহাদের বাহিরেও কোন অগ্নি বিদ্যমান নাই, কিন্তু দ্রব্যসম্ভার সংযোগে অগ্নি উৎপাদিত হয়। তাই উহার বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়া :—

"তথা ন অন্তো কম্মস্স বিপাকো উপলব্ভতি,
বহিদ্ধাপি ন কম্মসস, ন কম্মং তত্থ বিজ্জতি।"

সেইরূপ কর্ম্মের মধ্যে বিপাক উপলব্ধ হয় না। কিন্তু কর্ম্মের বাহিরেও

বিপাক অনুভূত হয় না, বিপাকেও কর্ম্ম বিদ্যমান নাই। তাই বলা হইয়াছে :—

"ফলেন সুঞ্ঞং কম্মং, ফলং কম্মে ন বিজ্জতি,
কম্মং চ খো উপাদায ততো নিব্বত্ততি ফলং।"

কর্ম্ম ফলশূন্য, কর্ম্মে ফল বিদ্যমান নাই, অথচ কর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া, তাহা হইতেই ফলের উৎপত্তি হয়। সুতরাং কর্ত্তার অভাব দর্শনে :—

"ন হেত্থ দেবো ন ব্রহ্মা সংসারস্‌সত্থি কারকো,
সুদ্ধধম্মা পবত্তন্তি হেতুসম্ভারপচ্চযা।"

কাজেই সংসারের সৃষ্টিকর্ত্তা কোন দেবতাও নাই, কোন ব্রহ্মাও নাই, হেতুসম্ভার প্রত্যয়ে শুদ্ধ নাম-রূপ ধর্ম্মই প্রবর্ত্তিত হইতেছে মাত্র।

যোগী এভাবে কর্ম্মবর্ত্ত ও বিপাকবর্ত্ত ভেদে নাম-রূপের কারণকে অবগত হইয়া ত্রিকাল ও জন্ম-মৃত্যু রহস্য অবগত হইবেন। অতীত কর্ম্মফলে যে স্কন্ধ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, সেই স্কন্ধ তথায়ই নিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু অতীত কর্ম্ম প্রভাবে বর্ত্তমান ভবে অন্য স্কন্ধ জাত হইয়াছে। অতীত ভব হইতে একটি অবস্থাও ইহজন্মে আসে নাই। এখান হইতেও ভবিষ্যত জন্মান্তরে একটি অবস্থাও যাইবে না।

যেমন শিক্ষকের মুখে মুখে ছাত্র কবিতা আবৃত্তি করে, মুখস্থ করে। ছাত্র শিক্ষা করিল বটে ; কিন্তু শিক্ষকের নিকট হইতে উহা চলিয়া আসে নাই। অথচ ছাত্রও শিক্ষা করিয়াছে।

যেমন দর্পণে মুখের প্রতিবিম্ব ভাসিয়া উঠে বটে, কিন্তু মুখাবয়ব তথায় চলিয়া যায় না।

যেমন একটা প্রদীপ হইতে অন্য প্রদীপ প্রজ্বলিত করিলে, সেই প্রদীপও জ্বলে, এই প্রদীপও নির্ব্বাপিত হয় না।

এইরূপ অতীত ভব হইতে এই ভবে কিছুই আসে না, অথচ স্কন্ধও জাত হয়। ইহাই কার্য্য-কারণ সম্ভূত ব্যাপার।

এভাবে যোগী ধর্ম্মস্থিতি জ্ঞানের ভিতর দিয়া সমস্ত সংস্কার যে অনিত্য, দুঃখময় ও অনাত্মা, তৎপ্রতি নিঃসন্দেহ হন। বিদর্শন সাধক যখন এই জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত হন, তখন বুদ্ধের শাসনে ক্ষুদ্র স্রোতাপন্ন নামে অভিহিত হন।

মার্গামার্গ জ্ঞানদর্শন বিশুদ্ধি

ইহাই যোগের যথার্থ পন্থা, ইহা যোগের যথার্থ পন্থা নহে—এইরূপে পন্থা ও অপন্থা সম্বন্ধে বিদিত হইয়া, যে জ্ঞানে যোগী অবস্থিত হন, তাহাকেই মার্গামার্গ জ্ঞানদর্শন বিশুদ্ধি বলে।

অর্থাৎ নাম-রূপ সম্বন্ধে ত্রৈকালিক সংশয়-বিমুক্তি জনিত বিশুদ্ধজ্ঞান লাভ করিবার পর, যোগী নিম্নোক্ত পর্য্যায়ানুসারে সংমর্শন, উদয়-ব্যয়, ভঙ্গ, ভয়, আদীনব, নির্ব্বেদ, মুক্তি-কাম্যতা, প্রতিসংখ্যা, সংস্কারোপেক্ষা ও অনুলোম এই দশ প্রকার জ্ঞানোৎপাদনের প্রতি মনোনিবেশ সহকারে বিদর্শন ভাবনা করিয়া থাকেন। বিদর্শনা প্রজ্ঞা উৎপাদন করিতে হইলে, নিম্নোক্ত নিয়মে ভাবনা করিতে হইবে এবং গুরু হইতে চারি ঈর্য্যাপথ ও দ্বাবিংশতি সম্প্রজ্ঞান সম্বন্ধে নিখুঁতভাবে জানিয়া লইতে হইবে।

সংমর্শন জ্ঞান

যদি কোন যোগী অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম লক্ষণের সহিত পরিচিত হইতে চান, তাহা হইলে প্রথমে তাঁহাকে চারি ঈর্যাপথ ও দ্বাবিংশতি সম্প্রজ্ঞানের বিষয়বস্তু পরিজ্ঞাত হইতে হইবে। প্রতি চিত্তক্ষণে দেহের যাহা যাহা ক্রিয়া সাধিত হইতেছে, স্মৃতি সহকারে সেগুলির কার্য্য পরিচালন করিতে হইবে। দৈহিক সংস্কার সংযুক্ত একটি কার্য্যও বাদ দিলে, পরিপূর্ণ স্মৃতির সহিত কাজ করিতেছেন বলিয়া গৃহীত হইবে না। অতি দ্রুতশীল চিত্ত, একসঙ্গে বহু কাজ করিলেও, চিত্ত যে ভিন্ন ভিন্ন ইহাই যোগীকে অনুধাবন করিতে হইবে।

"অচ্ছরক্খণেযেব ভিক্খবে কোটিসতসহস্সচিত্তং উপ্পজ্জতি।"

সর্ব্বজ্ঞতা জ্ঞানে বুদ্ধ উপলব্ধি করিয়াছেন যে, অঙ্গুলির তুরী প্রহার ক্ষণে যতটুকু সময় দরকার, সেই সময়ে লক্ষ কোটি চিত্ত উৎপন্ন হয়। এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চিত্তক্ষণ বুদ্ধ ব্যতীত আর কেহ প্রথমে অনুভব (মিলিন্দ প্রশ্ন দ্রষ্টব্য) করিতে পারেন নাই।

এখানে অতি সংক্ষেপে যোগীর অনুভূতির জন্য কয়েকটা অবস্থা প্রদর্শন করা হইতেছে।

ভাবনার প্রাথমিক অনুষ্ঠান

দাঁড়ানে, গমনে, উপবেশনে ও শয়নে এই দেহের চারিটি ঈর্য্যাপথ। প্রত্যেক নব যোগীকে উহাদের সহিত পরিচিত হইতে হইবে।

দাঁড়ানে—গমনে

মনে করুন—আমি দাঁড়াইয়াছি, হাঁটিতে ইচ্ছা হইতেছে, তৎপর পদ তুলিবার ইচ্ছা হইতেছে, পদ তুলিতেছি, পদ তুলিলাম, পদ নিতেছি, পদ বসিতেছে ও পদ বসান হইয়াছে।

এই দাঁড়ানোর সংকল্প হইতে পদ বসান পর্য্যন্ত ৮টি মাত্র কার্য্য লিখিত হইল, এমন সময় অন্য কিছু মনে হইলে তাহাও যোগীর স্বাভাবিক ভাবে ধরা পড়িবে।

যদি আমি 'স্মৃতি' শব্দটি উচ্চারণ করিতে চাই, তাহা হইলে স+ম+ ঋফলা+ত+হ্রস্ব ইকার এই পাঁচটি বর্ণ ও চিহ্নের সঙ্গে আমাকে প্রথম পরিচয় করিতে হইবে। তৎপর বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও উহার তাৎপর্য্যার্থ জানিতে হইবে। কোন অক্ষর বা চিহ্নকে বাদ দিয়া আমি 'স্মৃতি' শব্দটি লিখিতে, উচ্চারণ করিতে ও উহার ভাবার্থকে বুঝিতে পারি না।

তেমন যোগীর চিত্তক্রিয়া বায়ু-ধাতুর বিস্ফারণবলে দেহের যত অবস্থা সূচিত হইবে, প্রত্যেক অবস্থার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া 'স্মৃতিসহকারে কার্য' করিতে হইবে। অক্ষরে ভুল হইলে যেমন উহার উচ্চারণ ও অর্থ সম্পাদন অসম্ভব, তেমন ঈর্য্যাপথে ভুল হইলে, যোগীর ত্রিলক্ষণ পরিচয়-জ্ঞান অসম্ভব। সে কারণে সুতীক্ষ্ণ বা নির্ভুল স্মৃতির সহিত প্রতি চিত্তোৎপন্ন কার্য্য সুসম্পাদন করা নব যোগীর পক্ষে প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য।

উপবেশনে

দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে ও হাঁটিতে হাঁটিতে যদি যোগী ক্লান্ত হইয়া বসিতে চান, 'আমার বসিবার ইচ্ছা হইতেছে, আমি বসিতেছি, আমি বসিলাম।'

শয়নে

বসিতে বসিতে যোগী অতিষ্ঠ হইয়া যদি শুইতে চান, 'আমার শুইবার ইচ্ছা হইতেছে, আমি শুইতেছি, আমি শুইলাম।'

তন্মধ্যে হস্ত-পদ নাড়িতে, শরীর চুলকাইতে বা পাখাখানি হাতে লইতে অথবা যতগুলি অন্যান্য উপসর্গ আসিবে, প্রত্যেকটির প্রতি স্মৃতিসংযোগ বাঞ্ছনীয়।

আহারকালে বেয়াল্লিশ প্রকার স্মৃতি

মনে করুনঃ—'আমি আহার করিব।' তাহা হইলে নিম্নোক্ত মোট ৪২টি নিয়মে কার্য্যগুলি সম্পাদন করতে হইবে।

"আহারের ইচ্ছা হইতেছে, উঠিবার জন্য ইচ্ছা হইতেছে, উঠিতেছি, উঠিতেছি, উঠিলাম, উঠিয়াছি বলিয়া জানিলাম, অগ্রসর হওয়ার ইচ্ছা হইতেছে, পদ তুলিতেছি, পদ তুলিলাম, পদ যাইতেছে, বসিতেছি, বসিলাম আহার্য্য বস্তু দেখিতেছি, হস্ত প্রক্ষালনের ইচ্ছা হইতেছে, জলের দিকে হাত নিতেছি, হাত ধুইতেছি, হস্ত ধৌত করা হইয়াছে, হাত তুলিতেছি, হাত পাত্রের দিকে নিতেছি, থালায় রাখিলাম, হাত দিয়া ভাত ধরিতেছি, গ্রাস প্রস্তুতির ইচ্ছা হইতেছে, গ্রাস প্রস্তুত করিতেছি, গ্রাস প্রস্তুত করা হইয়াছে, গ্রাস মুখে দিতেছি, মুখের কাছে আসিয়াছে, ওষ্ঠে লাগিয়াছে, মুখব্যাদন করিতেছি, করিলাম, মুখে গ্রাস দিতেছি, দিলাম, হাত আনিতেছি, আনিলাম, থালায় রাখিলাম, চর্ব্বণ করিতে ইচ্ছা হইতেছে, চর্ব্বণ করিতেছি, চর্ব্বণ করা হইয়াছে গিলিবার ইচ্ছা হইতেছে, গিলিতেছি, গিলিলাম, গিলিয়াছি বলিয়া জানিলাম।"

যোগী সংক্ষেপে এভাবে পরিচয় করিলে, যতই ভাবনায় অগ্রসর হইবেন, ততই অনুক্রমে আরও নব নব স্মৃতি উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে ও স্খলিত স্মৃতিগুলি ধরা পড়িবে। যখন একটিও বাদ না পড়িয়া নির্ভুল স্মৃতি উৎপাদিত হইবে, তখন এক একটি জ্ঞান উৎপন্ন হইবে। কলাপ সংমর্শনের ইহা অন্যতম উপায়। সংস্কার জাতীয় ধর্ম্মসমূহকে জানিতে হইলে এবং ত্রিলক্ষণকে বিচার করিতে হইলে, যোগীদের এই উপায়ে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ইহাতে দুঃখসত্য অতিশয় প্রকট হয়।

নাম-রূপ ক্ষয়স্বভাব ও বিপরিণামধর্ম্মী বলিয়া অনিত্য-অনিত্যধর্ম্মী বলিয়া সর্ব্বদা ভয়াবহ ; এ কারণে দুঃখময়, নাম-রূপ প্রত্যয় সমুৎপন্ন স্বাবলম্বনহীন, আহার সাপেক্ষ, কাজেই উহা অসার বলিয়া অনাত্ম। সেই কারণে বলা হইয়াছে ঃ—

"অনিচ্চং খয়ট্‌ঠেন, দুক্‌খং ভয়ট্‌ঠেন, অনত্তা অসারকট্‌ঠেনা তি।"

কাজেই অনিত্য দৃষ্টিতে সংস্কারজাতীয় ধর্ম্মগুলি পুনঃ পুনঃ দর্শনে নিত্যজ্ঞান পরিত্যক্ত হয়। দুঃখদৃষ্টিতে দেখিবার ফলে সুখ-সংজ্ঞা পরিত্যক্ত হয় ও অনাত্মদৃষ্টিতে দেখিবার ফলে আত্মসংজ্ঞা পরিত্যক্ত হয়।

সুতরাং নিস্পৃহ কারণে নন্দী বা ভোগতৃষ্ণা, বিরাগ-কারণে আসক্তি, নিরোধ কারণে সমুদয় বা অভ্যুদয় ও পরিবর্জ্জন-কারণে আদান বা পুনরায় গ্রহণের হেতু পরিত্যক্ত হয়।

কলাপ সংমর্শনে মনোনিবেশ করিতে হইলে অতীত অনাগত-বর্ত্তমানভেদে অধ্যাত্ম বা নিজস্ব কিম্বা বাহ্য, স্থূল কিম্বা সূক্ষ্ম, হীন কিম্বা উৎকৃষ্ট, দূরস্থ কিম্বা নিকটস্থ রূপ বলিতে যাহা কিছু আছে, সমস্তই অনিত্য বলিয়া জ্ঞানত প্রত্যক্ষ করেন। সেইরূপ বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার-বিজ্ঞানগুলিও জ্ঞাতব্য। কাজেই ক্ষয়শীল অর্থে এই পঞ্চ স্কন্ধ অনিত্য, ভয়াধীন অর্থে দুঃখাত্মক ও অসার অর্থে অনাত্ম। ইহাই সংমর্শন জ্ঞান লাভের পন্থা।

এই প্রকারে যোগী সময়ে রূপ ও সময়ে অরূপ জ্ঞানত সংমর্শন করেন। রূপ সংমর্শনে রূপের ও নামের সংমর্শনে নামের উৎপত্তি দর্শন করেন।

সংক্ষেপে যাহা লইতে ইচ্ছা হয়, তাহাই 'নাম', যাহা লইলাম তাহাই 'রূপ'। ভোজনের যে প্রবৃত্তি তাহা 'নাম', যাহা প্রবৃত্তির নির্দ্দেশে আহার করিলাম, তাহা 'রূপ'।

৫২ প্রকার চৈতসিক, প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ও নির্ব্বাণ এই ৫৪ প্রকার নাম। ২৮ প্রকার বিকার লক্ষণ প্রাপ্ত রূপ।

সম্মত সত্য বা ব্যবহারিক সত্য ও পরমার্থ সত্যকে উত্তমরূপে জানিয়া নাম ও রূপের সহিত পরিচয় এবং নাম-রূপের বিভাগ করিবার মত জ্ঞানার্জ্জন করিতে হইলে বিদর্শন ভাবনার প্রতি মনোযোগী হইতে হইবে।

নাম-রূপের পরিচয়-অভাবে মুক্তির সন্ধান মিলেনা। আমরা বাহ্যিক যত কিছু সজীব ও নির্জ্জীবের সঙ্গে পরিচয় করিয়াছি, উহাতে মুক্তি লাভ না করিবার বন্ধন দৃঢ়তর হইয়াছে।

কাজেই নাম-রূপ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে কোন বিদর্শন সাধকের নির্দ্দেশে সেই পথ ধরিয়া চলিতে হইবে।

সংমর্শন জ্ঞান বিভাগ

'পটিসম্ভিদামগ্‌গট্‌ঠকথা'র নির্দ্দেশ মতে—"সম্মা আমসনে অনুমজ্জনে পেক্‌খণে ঞাণং, কলাপসম্মসনঞাণং"।

সম্যকরূপে আমর্শনে-অনুমর্দ্দনে-প্রেক্ষণে বা দর্শনে এক একটি বিভাগ করাই সংমর্শন জ্ঞানের তাৎপর্য্যার্থ।

১। অতীত রূপ—পূর্ব্বজন্মে আমার যে রূপ ছিল, তাহা অতীতেই ক্ষীণ হইয়াছে। ইহজন্মে আর সেই রূপ আসে নাই। সে কারণে "অনিচ্চং খয়ট্ঠেন" 'ক্ষয় অর্থে অনিত্য।'

২। অনাগত রূপ—ভাবী জন্মে আমার যেই রূপ হইবে সেই জন্মেই তাহা ক্ষয় হইবে, তৎপরবর্ত্তী ভবে সেই রূপ যাইবে না। সে কারণে 'ক্ষয় হেতু অনিত্য।'

৩। বর্ত্তমান রূপ—বর্ত্তমান জন্মে যেই রূপ আছে, তাহা এখানেই ক্ষয় হইবে। পরজন্মে এই রূপ যাইবে না। সে কারণে 'ক্ষয় হেতু অনিত্য।'

৪। অধ্যাত্ম রূপ—যেই রূপ নিজের পঞ্চস্কন্ধে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই রূপ নিজ দেহেই ক্ষয় পাইতেছে, তাহা বহির্ভাগে যাইবে। সে কারণে 'ক্ষয় হেতু অনিত্য।'

৫। বাহ্য রূপ—ইন্দ্রিয়বদ্ধ বা অনিন্দ্রিয়বদ্ধ রূপ, তাহা বাহিরেই ক্ষয় হইবে। এই কারণে 'ক্ষয় হেতু অনিত্য।'

৬। স্থূল রূপ—চক্ষু-শ্রোত্র-ঘ্রাণ-জিহ্বা-কায় ও রূপ-শব্দ-গন্ধ-রস-স্প্রষ্টব্যভূত পৃথিবী-তেজ-বায়ু এই দ্বাদশ প্রকার রূপ সংঘর্ষণের অন্তর্গত বলিয়া স্থূল। এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ সমূহ ক্ষয় পাইতেছে। সে কারণে 'ক্ষয় হেতু অনিত্য।'

৭। সূক্ষ্ম রূপ—আপধাতু-স্ত্রীইন্দ্রিয়-পুরুষেন্দ্রিয়-জীবিতেন্দ্রিয়-হৃদয়-বস্তু-ওজঃ-আকাশধাতু-কায়বিজ্ঞপ্তি-বাক্‌বিজ্ঞপ্তি, (রূপের) লঘুতা-মৃদুতা কর্ম্মজ্ঞতা-উপচয়-সন্ততি-জরতা-অনিত্যতা এই ষোড়শ প্রকার রূপ সংঘ-র্ষণাতীত সূক্ষ্ম। এই রূপ সমূহ ক্ষয় পাইতেছে। এ কারণে 'ক্ষয় হেতু অনিত্য।'

৮। হীনরূপ—ব্রহ্মা হইতে দেবতার, দেবতা হইতে মনুষ্যের রূপ হীন। এই রূপও ক্ষয় পাইতেছে। এ কারণে 'ক্ষয় হেতু অনিত্য।'

৯। উৎকৃষ্ট রূপ—মনুষ্য হইতে দেবতার, দেবতা হইতে ব্রহ্মের রূপ উৎকৃষ্ট বা প্রণীত। এই রূপও ক্ষয় পাইতেছে। এ কারণে 'ক্ষয় হেতু অনিত্য।'

১০। দূরে রূপ—যাহা সূক্ষ্ম রূপ, তাহার স্বভাব জানা কঠিন।

কাজেই উহা দূরস্থ রূপ। এই রূপও ক্ষয় পাইতেছে। সে কারণে 'ক্ষয় হেতু অনিত্য।'

১১। নিকটে রূপ—যাহা স্থূল রূপ তাহার স্বভাব জ্ঞাত হওয়া সহজ। কাজেই উহা স্থূল স্বভাব। এই রূপও ক্ষয় পাইতেছে। সে কারণে 'ক্ষয় হেতু অনিত্য।'

যেই রূপ অনিত্য, তাহা ভয়াবহ, সে কারণে 'দুক্খং ভয়ট্ঠেন" ভয়াবহ হেতু দুঃখময়। এ ভাবে এগারটি রূপকে সম্মর্শন করিলে, যেমন অতীত জন্মে যে রূপ লাভ করিয়াছি, তাহা 'ভয়াবহ হেতু দুঃখময়।' অপর দশটি রূপকেও যোগী এভাবে সম্মর্শন করিবে।

রূপ অনিত্য, অনিত্য বিধায় দুঃখময়, দুঃখময় বিধায় আত্মা অসার রিক্ত, শূন্য; কাজেই অনাত্মা। সে কারণে উদয়-ব্যয়ের নিষ্পীড়ন আত্মা নিবারণ করিতে সমর্থ নহে। সে কারণে ভগবান বলিয়াছেনঃ—"রূপঞ্চ হিদং ভিক্খবে অত্তা অভবিস্স, নযিদং রূপং আবাধায সংবত্তেয্য।"

কাজেই রূপ যদি অবিনশ্বর আত্মা হইত, তাহা হইলে ইহার পরিবর্ত্তন, নিষ্পীড়ন সূচিত হইত না।

কাজেই ইহা "অনত্তা অসারকট্ঠেন" 'অসার কারণে অনাত্মা।'

উদয়-ব্যয় জ্ঞান

এই ত্রিলক্ষণে জ্ঞান পরিপুষ্ট হইলে যোগী দেখিতে পান যে, নাম-রূপ একটি উৎপত্তিশীল ও বিলয়শীল প্রবাহমাত্র। হেতুর উৎপত্তিতে ইহার উৎপত্তি, হেতুর নিরোধে ইহার নিরোধ। ইহাই উদয়-ব্যয় জ্ঞান।

তখন যোগীর ধারণা হয় যে,—অতীতের নাম-রূপ হইতে বর্ত্তমান নাম-রূপ আসে নাই, বর্ত্তমান রূপও অন্যত্র গমন করে না। তত্তৎস্থানে নাম-রূপ নিরুদ্ধ হইয়া যায়। নিরুদ্ধ হইলেও এক স্থানে স্তূপীকৃত হইয়া থাকে না।

যেমন বীণা বাদনের সময় যেই শব্দগুলি উৎপন্ন হয়, তাহা পূর্ব্বে সঞ্চিত ছিল না, এবং যাহা সঞ্চিত ছিল না, তাহা হইতেও বর্ত্তমান শব্দগুলি আসে নাই; নিরুদ্ধ হইবার সময়েও এই শব্দগুলি বিভিন্ন দিকে যায় না এবং নিরুদ্ধ শব্দগুলি কোন স্থানে সঞ্চিত হইয়া থাকে না। তথাপি বীণা, ছড়ি, বাদকের হস্ত চালনাদি ক্রিয়া ও তাহার চেষ্টা, এই হেতু সমবায়ে অসঞ্চিত পূর্ব্ব শব্দগুলি

জাত হয় এবং জাত শব্দগুলি নিরুদ্ধ হয়। সেইরূপ রূপ-অরূপ বা নাম-রূপ (পঞ্চস্কন্ধ) না হইয়া হয়, হইয়া বিনষ্ট হয়।

কাজেই অবিদ্যা-তৃষ্ণা-উপাদান-আহার-কর্ম্ম পঞ্চকই রূপোৎপত্তির কারণ। এই পাঁচটির নিরোধে রূপস্কন্ধের নিরোধ হয়।

অবিদ্যা-তৃষ্ণা-উপাদান-কর্ম্ম-স্পর্শ, এই পাঁচটি হইতে 'বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কারের' উৎপত্তি ; এই গুলির নিরোধে এই তিনটির নিরোধ হয়।

অবিদ্যা-তৃষ্ণা-উপাদান-কর্ম্ম-নাম-রূপ এই পাঁচটি হইতে বিজ্ঞানের উৎপত্তি, এই গুলির নিরোধে বিজ্ঞানের নিরোধ হয়।

এভাবে পঞ্চস্কন্ধে উদয়-বিলয় দর্শনে যোগীর নিকট দুঃখসত্য প্রকট হয়।

"পঞ্চন্নং খন্ধানং উদযং পস্সন্তো ইমানি পঞ্চবীসতি লক্খণানি পস্সতি। বয়ং পস্সন্তো ইমানি পঞ্চবীসতি লক্খণানি পস্সতি। উদয-বযং পস্সন্তো ইমানি পঞ্ঞাস লক্খণানি পস্সতি।"

পঞ্চস্কন্ধের উদয় বা উৎপত্তি দর্শনে ২৫টি লক্ষণ ও ব্যয় বা বিলয় দর্শনে ২৫টি লক্ষণ যোগীর পরিদৃষ্ট হয়।

হেতুর দিক হইতে বিলয় দর্শনের ফলে যোগী জনন কারণ অবগত হয়। ইহাতে তাঁহার নিকট সমুদয় সত্য প্রকটিত হয় এবং ক্ষণের দিক দিয়া উদয় দর্শনের ফলে জন্ম দুঃখের প্রভাবে দুঃখ সত্যের অবস্থা বুঝিতে সমর্থ হন।

যোগী হেতুর অভাবে উৎপত্তির অভাব যখন বুঝিতে পারেন, তখন তাঁহার নিরোধ সত্য প্রকটিত হয়।

এই উদয়-বিলয় দর্শন লৌকিক মার্গ, এভাবে সম্মোহ বিদূরীত হইবার ফলে, তাঁহার নিকট মার্গ সত্য প্রকটিত হয়।

এরূপে চারি আর্য্যসত্য এবং প্রতীত্যসমুৎপাদ ধর্ম্মের নিয়ম সমূহ প্রকটিত হইলে যোগীর উপলব্ধি হয় যে, পূর্ব্বে অনুৎপন্ন সংস্কার ধর্ম্মসমূহ উৎপন্ন হইতেছে এবং উৎপন্ন সংস্কার ধর্ম্মসমূহ নিরুদ্ধ হইতেছে। এভাবে নিত্য নব নব রূপে সংস্কার ধর্ম্মসমূহ তাঁহার স্মৃতি মধ্যে উদিত হয়।

তখন যোগী দেখিতে পান যে, সূর্য্যোদয়ে শিশির বিন্দুর ন্যায়, জল বুদ্বুদের ন্যায়, জলে দণ্ড রেখার ন্যায়, বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় সংস্কারধর্ম্ম সমূহ অতিশয় ক্ষণস্থায়ী। ক্ষণভঙ্গুর সংস্কার উৎপন্ন হইতেছে, পুনরায় ভগ্ন

হইতেছে। সচরাচর পায়চারি করিবার সময়, যখন পদখানি তুলিতেছি তখন 'উদয়-জ্ঞান' আর যখন পদখানি রাখিতেছি তখন 'ব্যয়-জ্ঞান'। এভাবে প্রত্যেক পদবারে স্মৃতি-চিত্ত সংযোগে যদি উদয়-ব্যয় জ্ঞানে যোগী দক্ষতা লাভ করেন, তাহা হইলে তাঁহার আর্য্যসত্যে জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গেই অবিদ্যাদির হেতুতে যে নাম-রূপের উৎপত্তি, ঐগুলির নিরোধে যে অবিদ্যাদির নিরোধ হয়, ইহা সহজেই যোগী বুঝিতে পারেন। এপ্রকারে সংস্কারের উদয়-বিলয় দর্শনে যোগীর তরুণ বিদর্শন জ্ঞান জন্মে। তখন যোগী একজন আরব্ধ বিদর্শক নামে অভিহিত হন। যেমন আমার অতীত জন্মার্জ্জিত রূপ 'অসার হেতু অনাত্ম'। অপর দশটি রূপকেও যোগী এভাবে সংমর্শন করিবেন।

রূপ ১১টিকে ত্রিলক্ষণ দিয়া সংমর্শন করিলে—৩৩, বেদনা ১১টিকে ত্রিলক্ষণ দিয়া সংমর্শন করিলে—৩৩, সংজ্ঞা ১১টিকে ত্রিলক্ষণ দিয়া সংমর্শন করিলে—৩৩, সংস্কার ১১টিকে ত্রিলক্ষণ দিয়া সংমর্শন করিলে—৩৩, বিজ্ঞান ১১টিকে ত্রিলক্ষণ দিয়া সংমর্শন করিলে—৩৩। তাহা হইলে সর্ব্বমোট ১৬৫ প্রকার সংমর্শন জ্ঞান। যোগী এই জ্ঞান বিভাগে সুপরিচিত হইয়া পরে সংক্ষিপ্ত ভাবে সংমর্শন করিতে পারেন।

অতীত-অনাগত-বর্ত্তমান বেদনা 'ক্ষয়হেতু অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম।'

অধ্যাত্ম বাহ্য বেদনা 'ক্ষয় হেতু অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম।'

স্থূল-সূক্ষ্ম-হীন-উৎকৃষ্ট, দূরস্থ ও নিকটস্থ বেদনা 'ক্ষয় হেতু অনিত্য-দুঃখ অনাত্ম।'

যদি সংমর্শন জ্ঞানে সংস্কার, মর্দ্দন জ্ঞান উজ্জ্বল না হয়, তাহা হইলে তিনি উদয়-ব্যয় জ্ঞান উৎপাদন করিতে পারিবেন না। এভাবে পঞ্চস্কন্ধের প্রত্যেকটিতে সংক্ষিপ্ত ভাবে সংমর্শন করিবেন।

উদয়-ব্যয়-জ্ঞান বিভাগ

জন্ম-উৎপত্তি-অভিনব আকার গ্রহণ করাকে 'উদয়' বলে (নিব্বত্তিলক্খণং)। ক্ষয়-ভঙ্গ-ব্যয় জ্ঞানকে 'ব্যয়' বলে (বিপরিণামলক্খণং)। এই গুলির প্রতি পুনঃপুনঃ মনোযোগ আকৃষ্ট হইলেই অনুদর্শন (অনুপস্সন)।

যোগী ভাবিবেন—"ইমেসং খন্ধানং উপ্পত্তিতো পুব্বে অনুপ্পন্নানং রাসি বা নিচযো বা নত্থি।"

এই পঞ্চস্কন্ধের উৎপত্তির পূর্বে এই রূপ-বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার-বিজ্ঞান স্তূপাকারে কোথাও সঞ্চিত ছিল না। এভাবে পূর্বোল্লিখিত নিয়মে বীণা-বাদনের উপমায় দ্রষ্টব্য।

প্রত্যেক স্কন্ধে উদয় লক্ষণ ৫ প্রকার ও ব্যয় লক্ষণ ৫ প্রকার। অতএব পঞ্চস্কন্ধে ৫০ প্রকার উদয়-ব্যয় লক্ষণের প্রতি যোগী অবহিত হইবেন।

"অবিজ্জাসমুদয়া রূপসমুদয়ো" অবিদ্যার উৎপত্তিতে রূপের উৎপত্তি; আমাদের পূর্ব্ব কর্ম্মভবে 'মোহই' অবিদ্যার নামান্তর। সে কারণে—

"অবিজ্জায সতি ইমস্মিং ভবে রূপস্স উপ্পাদো হোতি।"

কাজেই ইহা কার্য্য-কারণ সঞ্জাত। 'অবিদ্যা-তৃষ্ণা-কর্ম্ম' এই ভবে জন্ম গ্রহণের একমাত্র হেতু। এই তিনের গ্রহণে 'সংস্কার ও উপাদান' স্বভাবত গৃহীত হয়। আহার গ্রহণে কবলী যাহার বলাধিক্য বিধায় 'ঋতু ও চিত্ত' তৎ সহগামী হইয়া থাকে।

রূপস্কন্ধে—অবিদ্যা-তৃষ্ণা-কর্ম্ম-আহার—বিপরিণাম।

বেদনাস্কন্ধে—অবিদ্যা-তৃষ্ণা-কর্ম্ম-স্পর্শ—বিপরিণাম।

সংজ্ঞাস্কন্ধে—অবিদ্যা-তৃষ্ণা-কর্ম্ম-স্পর্শ—বিপরিণাম।

সংস্কারস্কন্ধে—অবিদ্যা-তৃষ্ণা-কর্ম্ম-স্পর্শ—বিপরিণাম।

বিজ্ঞানস্কন্ধে—অবিদ্যা-তৃষ্ণা-কর্ম্ম-নামরূপ—বিপরিণাম।

এখানে কালক্রমে রূপের যাহা ভঙ্গ লক্ষণ, তাহাই সংখত লক্ষণ, তাহাই বিপরিণাম লক্ষণ বা বিপরিবর্ত্তন লক্ষণ।

এভাবে যোগী স্কন্ধসমূহের উৎপত্তি ও ভঙ্গ নিরোধ-বিপরিণাম দর্শনে সমুদয় সত্যে জ্ঞান লাভ করেন। উদয়ের ক্ষণিকত্ব দর্শনে দুঃখসত্য অবগত হন। জন্ম দুঃখের ব্যয় দর্শনে নিরোধসত্য প্রত্যক্ষ করেন। মৃত্যুর পরিণাম উদয়-ব্যয়ের কার্য্য-কারণ প্রতিভাত হইলে লৌকিক মার্গসত্যে পরিচিত হইয়া থাকেন। ইহাই লৌকিক জ্ঞানের পরিচয়। "এবং লোকিযেন, তাব ঞাণেন চতুন্নং সচ্চানং ববত্থানং কতং হোতী' তি।"

দশ প্রকার বিদর্শন উপক্লেশ

"ওভাসো পীতিপস্সদ্ধি অধিমোক্খো চ পগ্গহো,
সুখং ঞাণমুপট্ঠানমুপেক্খা চ নিকন্তি চেতি।"

যোগী দৃঢ়তার সহিত বিদর্শন ভাবনা আরম্ভ করিলে, তাঁহার বিদর্শন,

উপক্লেশের সহিত দশটি প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি হয়। কিন্তু হীনবীর্য্য সাধকের নিকট এই উপক্লেশ উৎপন্ন হয় না।

(১) অবভাস

"ওভাসোতি বিপস্সনোভাসো।"

ধ্যানবলে যোগীর নিকট এই আলোক উৎপন্ন হইলে যোগী ভাবেন যে, পূর্ব্বে কখনো আমার দেহ হইতে এরূপ জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয় নাই। আমি মার্গফল পাইলাম কি? ইহাতে তাঁহার ভ্রান্ত ধারণা জন্মে। তখন যোগী অমার্গকে মার্গ ভাবিয়া বিদর্শন পথ হইতে ভ্রষ্ট হন। তিনি আলোকাস্বাদে তন্ময় হইয়া পড়েন, ইহাতে নিম্নোক্ত লক্ষণ জাত হয়।

(ক) আলোক গ্রহণে দৃষ্টি বিভ্রম হয়।

(খ) আলোকের মনোহারিত্ব ভাব গ্রহণে মানের উদয় হয়।

(গ) আলোকের আস্বাদ গ্রহণে তৃষ্ণার সঞ্চার হয়। কাজেই তৃষ্ণা-দৃষ্টি-মানের দ্বারা অভিভূত যোগী ধ্যানের অন্তরায় করিয়া থাকেন।

এই আলোকে যোগীর আসন, প্রকোষ্ঠ, আবাস, দুই-তিন যোজন পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত করিতে পারে। বুদ্ধের এই আলোক দশ সহস্র চক্রবাল পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত করিয়াছিল।

সুদক্ষ যোগী তখন চিন্তা করেন যে, আমার এই আলোক অনিত্য, সংস্কারযুক্ত, প্রত্যয়-জাত, ইহা ক্ষয়-ব্যয়ের অধীন ও নিরোধ-ধর্ম্মী। যোগী ইহাকে প্রজ্ঞাবলে বিভাগ করেন ও পরীক্ষা করেন। আমার এই আলোক যদি আত্মা হইত, আত্মারূপে গৃহীত হইত। কিন্তু ইহা অস্থির-অবাধ্য, কাজেই অনাত্ম। এ প্রকার দর্শনে ভ্রান্তদৃষ্টির সমুচ্ছেদ হয়। আলোক অনিত্যরূপে দর্শনে মানের সমুচ্ছেদ হয়। ইহা সুখকর নহে। উদয়-বিলয়ে নিপীড়িত বিধায় এই আলোক দুঃখ জনক। এই আলোক আমার নহে, ইহাতে আমি অবস্থিত নহি। ইহা আমার আত্মাও নহে। এই প্রকার দর্শনে যোগী কম্পিত হন না। বরঞ্চ সুস্থিরতা প্রাপ্ত হন।

(২) প্রীতি

"পীতী'তি বিপস্সনা পীতি।"

ইহা তরুণ বিদর্শন জনিত প্রীতি। এই প্রীতি সঞ্চয়ের ফলে যোগী

মার্গফল লাভ হইল বলিয়া মিথ্যা ভ্রমে পতিত হন। ত্রিলক্ষণের দ্বারা ইহাকে প্রতিহত করিয়া যোগাভিমুখে অগ্রসর হইতে হয়।

(৩) প্রশান্তি

"পস্সদ্ধী'তি বিপস্সনা পস্সদ্ধি।"

ইহা বিদর্শন জনিত প্রশান্তি। যোগী ইহাতে শান্তি সলিলে নিমজ্জিত হন। তাঁহার চিত্ত শান্ত হয়, দেহ-দাহ উপশান্ত হয় ও যে কোন অস্বস্তিকর অবস্থা তিরোহিত হয়। ইহাতে যোগীর অমানুষিক প্রবৃত্তি প্রবল হয়। শান্ত-উপশান্ত উদয়-ব্যয় দর্শনে যোগী প্রীতি-প্রামোদ্য অনুভব করেন। ইহাও ত্রিলক্ষণ দ্বারা প্রতিহত করিবেন।

(৪) অধিমোক্ষ

"অধিমোক্খো'তি সদ্ধা।"

অধিমোক্ষ অর্থ বিদর্শন প্রভাবে উৎপন্ন বলবতী শ্রদ্ধা। চিত্ত-চৈতসিকের সম্প্রসাদহেতু ইহাতে যোগীর শ্রদ্ধা শ্রীবৃদ্ধিমুখী হয়। ইহাও ত্রিলক্ষণে উপহত করিবেন।

(৫) প্রগ্রহ

"পগ্গহো'তি বিরিযং।"

প্রকৃষ্টরূপে গ্রহণ হেতু প্রগ্রহ বা বীর্য্য। তখন সাধকের নাতিদৃঢ় ও নাতিশিথিল কর্ম্মশক্তি জাগ্রত হয়। তিনি অত্যুৎসাহে অধীর হইয়া পড়েন। বীর্য্যসমতাই সাধন পথে অগ্রসর হইবার শ্রেষ্ঠ পন্থা। যোগীর উগ্রবীর্য্যও ত্রিলক্ষণে প্রতিহত করিতে হইবে।

(৬) সুখ

"সুখন্তি বিপস্সনা সুখং।"

ইহা তরুণ বিদর্শন জনিত সুখানুভূতি। ইহাতে সাধকের আপাদমস্তক সুখাপ্লুত হয়। এই অভূতপূর্ব্ব সুখের আস্বাদে যোগী তন্ময় হন। ইহাও ত্রিলক্ষণে প্রতিহত করিবেন।

(৭) জ্ঞান

"ঞাণন্তি বিপস্সনা ঞাণং।"

ইহা বিদর্শন জ্ঞান। রূপারূপ ধর্ম্ম সমূহ একাগ্রচিত্তে বিচার করিবার

সময় ইন্দ্রবজ্র সদৃশ যোগীর সুতীক্ষ্ণ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ইহাতে যোগী মার্গ-ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া মনে করেন। ইহাতেও যোগীর ভ্রান্ত ধারণা জাগ্রত হয়। পূর্ব্ববৎ ত্রিলক্ষণ প্রয়োগে ভ্রান্ত ধারণা নিরসন করা কর্ত্তব্য।

(৮) উপস্থান

"উপট্‌ঠানম্পি সতি।"

স্মৃতির নামান্তর উপস্থান। বিদর্শন ভাবনাবলে সাধকের মধ্যে পর্ব্বত সদৃশ অচলা স্মৃতি উৎপন্ন হয়। ইহাতেও ধ্যানান্তরায় হয় বলিয়া ত্রিলক্ষণ দ্বারা প্রতিহত করিতে হয়।

(৯) উপেক্ষা

"উপেক্‌খা'তি বিপস্‌সনুপেক্‌খা চেব আবজ্জনুপেক্‌খা চ।"

বিদর্শন ভাবনা প্রভাবে মধ্যস্থভাব সূচক উপেক্ষা ও আবর্ত্তনোপেক্ষা উৎপন্ন হয়। এই দ্বিবিধ উপেক্ষা বলবতী হওয়ায় যোগীর মূল কর্ম্মস্থানের পরিহানি ঘটে। যাহাতে ঐগুলি উপক্লেশে পরিণত না হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ত্রিলক্ষণ দ্বারা প্রতিহত করিবেন।

(১০) নিকন্তি

"নিকন্তী'তি বিপস্‌সনা নিকন্তি।"

যোগীর নয় প্রকার বিদর্শন ভাবনার তরুণাবস্থায় শান্ত অথচ সূক্ষ্ম অনুরাগ উৎপন্ন হয়। এই সূক্ষ্ম তৃষ্ণাও যোগীকে বিপথগামী করে। তখন যোগী মার্গফল লাভ করিয়াছেন বলিয়া মনে করেন। সাধকের শ্রদ্ধাতিশয্যে তৃষ্ণার শান্তভাব পরিলক্ষিত হওয়ায় 'আমি ফল লাভ করিয়াছি' বলিয়া ভুল ধারণা জন্মে; ইহাও ত্রিলক্ষণদ্বারা প্রতিহত করিয়া মূল কর্ম্ম-স্থানের দিকে অগ্রসর হইবেন।

পূর্ব্বোক্ত দশটি উপক্লেশ বিদর্শন জ্ঞানের পরিপন্থী। সাধককে এ বিষয়ে বিশেষভাবে সতর্কতাবলম্বন করিতে হইবে।

'তথা সতি-তম্বিসযস্‌স মগ্‌গপত্তোম্‌হী'তি গহণস্‌স অসম্ভবো এব।'

উপক্লেশ বর্ত্তমান থাকিলে মার্গলাভ একান্তই অসম্ভব। তৎপ্রভাবে চিত্ত চঞ্চল হয়, যে যোগী ইহা নিবারণ করিতে দক্ষ, তাঁহার চিত্ত বিক্ষিপ্ত ও কম্পিত

হয় না। এ সম্বন্ধে সঠিক পন্থা ধরিতে পারিলেই 'মার্গামার্গ জ্ঞান বিশুদ্ধির' পরিচয় হয়।

যোগী তিনটি সত্যের বিচার করিয়া বুঝিতে পারেন যে 'দৃষ্টি বিশুদ্ধি' দ্বারা দুঃখসত্যে জ্ঞান, 'কঙ্ক্ষাউত্তরণ বিশুদ্ধি' দ্বারা সমুদয় সত্যে জ্ঞান ও 'মার্গামার্গজ্ঞান বিশুদ্ধি' দ্বারা মার্গসত্যে জ্ঞান লৌকিকভাবে অবধারণ করিতে সমর্থ হন।

'সো এবং বিক্খেপং অগচ্ছন্তো সমতিং সবিধং উপক্কিলেসজটং বিজটেত্বা ওভাসাদযো ধম্মা ন মগ্গো ; উপক্কিলেস-বিমুত্তং পন বীথিপটিপন্নং বিপস্সনঞাণং মগ্গো'তি মগ্গঞ্চ অমগ্গঞ্চ ববত্থপেতি।"

যোগী এভাবে বিক্ষিপ্ত না হইয়া এক একটি উপক্লেশ, তৃষ্ণা, দৃষ্টি ও মানভেদে বিভাগ করিয়া ৩০টি উপক্লেশ জটাকে বিজটিত করেন ও অবভাসাদি দশটি ধর্ম্ম মার্গ নহে বুঝিতে পারেন। উপক্লেশ বিমুক্ত বীথি প্রতিপন্ন বা পথপ্রাপ্ত বিদর্শন জ্ঞানই মার্গ বলিয়া জানিয়াই মার্গ-অমার্গ বিচার করেন।

প্রতিপদ জ্ঞান দর্শন বিশুদ্ধি

"অট্ঠন্নং পন ঞাণানং বসেন সিখাপ্পত্তা বিপস্সনানবমঞ্চ সচ্চানুলোমিকঞাণন্তি, অযং পটিপদাঞাণদস্সনবিসুদ্ধি নাম।"

প্রকৃত মার্গ নির্দ্ধারণের পর দশ উপক্লেশ বিমুক্ত উদয়, ব্যয়, ভঙ্গ, ভয়, আদীনব, নির্ব্বেদ, মুক্তিকাম্যতা, প্রতিসংখ্যা ও সংস্কারোপেক্ষাজ্ঞান ৮টি ও সত্যানুলোমিক জ্ঞান ১টি, এই শিখাপ্রাপ্ত জ্ঞান ৯টিই প্রতিপদ জ্ঞান দর্শন বিশুদ্ধি নামে কথিত।

এই সাধনা করিতে হইলে উদয়-ব্যয় জ্ঞান হইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে ভঙ্গজ্ঞান প্রভৃতির প্রতি মনোনিবেশ করিতে হইবে। পুন উদয়-ব্যয় ভাবনার প্রয়োজন এই,—পূর্ব্বে সন্ততি প্রতিচ্ছন্ন উদয়-ব্যয় উপক্লেশযুক্ত ছিল, এখন উপক্লেশ বিমুক্ত। সে কারণে পূর্ব্বে ত্রিলক্ষণ পরিচয় সুষ্ঠুভাবে হয় নাই। বিশেষতঃ নাম-রূপের উৎপত্তি, স্থিতি, লয় এত দ্রুতশীল যে, তাহা সহজে জ্ঞাত হওয়া যায় না। এইরূপে একটির পর একটি উৎপন্ন হওয়াই 'সন্ততি' নামে অভিহিত। কাজেই ইহাতে উদয়-ব্যয় প্রতিচ্ছন্ন থাকে বলিয়া অনিত্য লক্ষণ সহজে জ্ঞানগোচর হয় না। তখন যোগীর দেহে অত্যধিক যন্ত্রণাদায়ক উৎপীড়ন আরম্ভ হয়। ঘন ঘন ঈর্য্যাপথ পরিবর্ত্তনে যোগীকে বাধ্য করে।

কাজেই দুঃখ লক্ষণ দাঁড়ানে-গমনে-উপবেশনে-শয়নে আচ্ছন্ন থাকে ; এ কারণে দুঃখের উপলব্ধি হয় না। পঞ্চস্কন্ধ বিভাগে অমনোযোগ বিধায় ও শরীরকে জীব বলিয়া ধারণা করায় অনাত্মলক্ষণ গোচরীভূত হয় না। 'আমার শরীর বলিয়া' যে আত্মদৃষ্টি, তাহাই সৎকায়দৃষ্টি নামে কথিত। পারমার্থিক দৃষ্টিতে শরীর বিভাগ করিলে আমিত্ব জ্ঞান লোপের সঙ্গে কেবল সংস্কার-পুঞ্জই পরিদৃষ্ট হয়। রজ্জুতে সর্পভ্রম তুল্য অবিদ্যা, যেমন প্রদীপের আলোকে রজ্জু কিন্তু রজ্জুই। তেমন অবিদ্যার আবরণ খুলিয়া জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইলেই সত্য পথ ধরা পড়ে। ইহাই অনাত্মদৃষ্টি বা যথাযথ দর্শন। এই পঞ্চস্কন্ধ অনিত্য, ইহার অতিরিক্ত কোন সংস্কার নাই। সংস্কার-ধর্ম্ম সমূহ যেমন অনিত্য, তেমন নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। জরা-ব্যাধির আকারে নিত্য পরিবর্ত্তনের দরুণ ইহা দুঃখময়। যাহা ইচ্ছার অবাধ্য, সর্ব্বদা দুঃখদায়ক, তাহাই অনাত্ম। এভাবে যোগী উপক্লেশ-বিমুক্ত উদয়-ব্যয় জ্ঞানে ত্রিলক্ষণের সত্যতা উপলব্ধি করেন।

ভঙ্গজ্ঞান

"তস্সেবং উপ্পজ্জিত্বা এবং নাম সঙ্খারগতং নিরুজ্ঝতী'তি পস্সতো একস্মিং ঠানে ভঙ্গানুপস্সনা নাম বিপস্সনা ঞাণং উপ্পজ্জতি।'

নাম-রূপ ধর্ম্মকে অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম লক্ষণ দ্বারা বিচার করিতে করিতে যোগীর উদয়-ব্যয় জ্ঞান সুতীক্ষ্ণ হয়, তখন তিনি দেখিতে পান যে সংস্কার-গুলি দ্রুতবেগে আবির্ভূত ও তিরোহিত হইতেছে। কাজেই উৎপত্তি-স্থিতিক্ষণে অবস্থান করিতে না পারিয়া ভঙ্গক্ষণে অবস্থিত হইতেছে। এভাবে ক্ষণে উৎপন্ন হইতেছে ও ক্ষণে ধ্বংস হইতেছে। যোগী বারবার ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া ভঙ্গজ্ঞান অর্জ্জন করিয়া থাকেন। ত্রিলক্ষণের মধ্যে ইহার অবস্থান লক্ষ্য করিয়া যোগী যেমন আনন্দ লাভ করিতে পারেন না, তেমন আসক্ত হইবার মত কিছুই দেখেন না। তখন বৈরাগ্য লাভের সঙ্গে সঙ্গেই ঔদাসীন্য জাগ্রত হয়। তারপর বুঝিতে পারেন যে, ত্রিলক্ষণ ভাবাপন্ন সংস্কারগুলি আর জীবাত্মা নহে। কোন জীব মরে না। কেবল সংস্কারগুলি ভাঙ্গিতেছে মাত্র। তখন শূন্যতার দিক দিয়া স্মৃতি জাগ্রত হয়। যাহা বিনষ্ট হইতেছে, তাহা পঞ্চস্কন্ধ। তাই বলা হইয়াছে—

"খন্ধানং ভেদো মরণন্তি পবুচ্চতি।"

স্কন্ধের যাহা ভেদ, তাহাই মৃত্যু। মৃন্ময় পাত্র ভগ্ন তুল্য নাম-রূপই অবিরত ভাঙ্গিতেছে। যোগী যে দিকে চায়, সে দিকেই কেবল ভাঙ্গিতেছে, ঘরবাড়ী, বৃক্ষলতা, শিরাজাল বিস্তৃত শরীর, মাংস আর দেখা যায় না। পদতলের মাটি চলিয়া যাইতেছে, এভাবে ভগ্নতার এক চরম পরিণতি চারিদিকে বিরাজ করিতেছে।

"যথা বুব্বুলকং পস্সে যথা পস্সে মরীচিকং"—বুদ্বুদ মরীচিকা তুল্য এই পঞ্চস্কন্ধ, সদা ভাঙ্গা-গড়ার ভিতর দিয়া অনন্ত ভাঙ্গনের সৃষ্টি হইতেছে।

সংস্কার সমূহ ধ্বংসাভিমুখে নিরীক্ষণ করিয়া যোগীর ৮টি বিষয়ে ভঙ্গ-জ্ঞান সুদৃঢ় হয়। যথা—ভবদৃষ্টি বর্জ্জন, জীবনের মায়া পরিত্যাগ, সতত আত্মনিয়োগ, বিশুদ্ধ জীবিকা, ঔৎসুক্য পরিত্যাগ, নির্ভয়তা, ক্ষান্তি, সৌহার্দ্দলাভ, রতি-অরতি ও সহনশীলতা।

যোগী ভঙ্গ জ্ঞানের এই অষ্টগুণ দর্শনে ভঙ্গ লক্ষণের প্রতি পুনঃপুনঃ মনোনিবেশ করিতে থাকেন।

"রূপারম্মণতা বিঞ্ঞাণরম্মণতা চিত্তং উপ্পজ্জিত্বা ভিজ্জতি, তং আরম্মণং পটিসঙ্খা তস্স চিত্তং ভঙ্গং অনুপস্সতি।"

রূপ-বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার-বিজ্ঞান অবলম্বনে চিত্ত উৎপন্ন হইয়া ভগ্ন হইতেছে, জ্ঞান পূর্ব্বক সেই আলম্বনকে অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম লক্ষণ দ্বারা দর্শনে যোগীর ভঙ্গজ্ঞান জাত হয়। ইহাতে তাঁহার উত্তরোত্তর উৎকণ্ঠা, অনাসক্তি, নিরোধ ও অগ্রহণ ভাব বর্দ্ধিত হয়।

"যস্মা ভঙ্গো নাম অনিচ্চতায পরমা কোটি।"

যে হেতু অনিত্য-জ্ঞানের চরম সীমা এই ভঙ্গ জ্ঞান। সে কারণে যোগী সমস্ত সংস্কারগত বিষয়কে অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম রূপে দর্শন করেন।

"যস্মা পন তং অনিচ্চং দুক্খমনত্তা, ন তং অভিনন্দিতব্বং, যঞ্চ অনভিনন্দিতব্বং ন তত্থ রঞ্জিতব্বং, তস্মা একস্মিং ভঙ্গানুপস্সনানুকারেন দিট্ঠে সঙ্খারগতে নিব্বিন্দতি, নো নন্দতি; বিরজ্জতি নো রজ্জতি।"

যে হেতু ত্রিলক্ষণকে অভিনন্দন করিবে না, যাহাকে অভিনন্দন করিবে না, তাহাতে রমিত হইবে না, সে কারণে ভঙ্গানুদর্শনানুসারে দেখিলে উহাতে নন্দিত-রমিত হইবার মত কিছুই নাই।

এখন বুঝা গেল যে, চিত্ত দ্বারা এখন একটি কার্য্য সম্পাদিত হইল,

পরক্ষণে সেই-ই অন্য একটি কার্য্য সম্পাদন করিল। কাজেই পূর্ব্বোৎপন্ন চিত্তের সহিত পরোৎপন্ন চিত্তের আর কোন সঙ্গতি রহিল না। এই পরিবর্ত্তন প্রবাহ লক্ষ্য করিয়া যোগী অনিত্যে নিত্যত্ব, দুঃখে সুখভাব ও অনাত্মায় আত্মভাব উপলব্ধি না করিয়া, ভঙ্গের পরিণতিতে জ্ঞানার্জ্জন করিয়া থাকেন। তখন যোগী ত্রিলক্ষণানুসারে নির্ব্বেদ-বিরাগ-নিরোধ-পরিবর্জ্জন এই চারি বিদর্শন জ্ঞান প্রভাবে ক্ষয়-ব্যয় অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভঙ্গানুদর্শনে নিষ্কম্প থাকেন। সংস্কার ধর্ম্মের গতি যে ভগ্নশীল, ইহা জ্ঞানত প্রত্যক্ষ করিয়া ইহাতে অভিনন্দন যোগ্য কিছুই দর্শন করেন না। উহাতে আনন্দিত বা রমিত হইবার মত কোন সারবস্তু নিরীক্ষণ না করিয়া, সংস্কারগুলি যে জীবাত্মা নহে বা জীবরূপে যে কাহারও জন্ম হইতেছে না ও মৃত্যু হইতেছে না, তাহা যথাযথ ভাবে উপলব্ধি করেন। কেবল উৎপত্তি ও ভঙ্গক্ষণের আবর্ত্তন-বিবর্ত্তনই তাঁহার জ্ঞানে ধরা পড়ে। এই সত্যাববোধই ভঙ্গজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য।

ভঙ্গানুদর্শন জ্ঞান বিভাগ

উদয়-ব্যয় জ্ঞানে পরিচ্ছন্ন সংস্কারগুলি ত্রিলক্ষণে দর্শন করার ফলে যোগীর তীক্ষ্ণ জ্ঞান প্রবাহিত হয়। তখন সংস্কারগুলির লঘুত্ব অনুভূত হইয়া থাকে। তখন "উদয়ং পহায ভঙ্গে যেব সতিং উপট্‌ঠপেতি।" উদয় স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া ভঙ্গস্বভাবেই স্মৃতি উপস্থাপিত হয়। ইহাই ভঙ্গানুদর্শন জ্ঞান। কাজেই যেই চিত্ত সেই রূপালম্বন ক্ষয়-ব্যয় ভাবে অনুদর্শন করে, অপর চিত্তদ্বারা ভঙ্গ দর্শন করে। সে কারণে বলা হইয়াছে—"ঞাতঞ্চ ঞাণঞ্চ উভো বিপস্সতি।"

ভঙ্গ অনিত্যের শেষ সীমা "অনিচ্চতায পরমা কোটি" সে কারণে রূপগত সমস্ত বিষয়কে যোগী অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মরূপে দর্শন করেন। অনিত্যের পরিণতি দুঃখময়, দুঃখের পরিণতি অনাত্ম বিধায় দুঃখরূপে দর্শন করেন। কাজেই সুখের অভাবে অনাত্মরূপে দর্শন করেন। উহাকে আর অভিনন্দন করা যায় না। রমিত হইবার মত কিছুই নাই। তখন ত্রিলক্ষণদ্বারা দর্শনে "রূপগতে নিব্বিন্দাতি" রূপগত বিষয়ে উৎকণ্ঠিত হন। উহাতে আর সপ্রীতিকর তৃষ্ণা বা নন্দী জাত হয় না। রমিত হওয়ার অভাবে লৌকিক জ্ঞানে রাগকে নিরোধ করেন, আর উহা যোগী সমুদিত করেন না। সেই অনিষ্টকারী রাগরজঃ নিরুদ্ধ হওয়ায়, রূপগত বিষয়ের স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে।

ইহাতে যোগীর কলুষ পরিত্যক্ত হয়, নির্ব্বাণের দিকে চিত্ত প্রধাবিত হয়। সে কারণে বলা হইয়াছে "কিলেসে চ পরিচ্চজতি, নিব্বানে চ পক্খন্দতি।"

কলুষ উৎপাদিত হয় মত কোন নিমিত্ত গ্রহণ করেন না। "নাপি নিব্বত্তনবসেন কিলেসে আদিয়তি" যোগী সঙ্খতালম্বনে গৃহীতব্য বিষয়ের অভাব বিধায় নন্দী, রাগ (অবশিষ্ট তৃষ্ণা), সমুদয় (রাগের উৎপত্তি) রূপগত বিষয়ের উদয়, আদান (কলুষ গ্রহণ) কিছুই উৎপাদন করেন না। যোগীর ভঙ্গানুদর্শনের পরে সংস্কার সমূহ ভগ্ন হইতে থাকে।

"ভঙ্গানুপসসতো সঙ্খারা'ব ভিজ্জতি।"

সংস্কার সমূহের ভেদই মৃত্যু। আর কিছু ততোধিক নাই বলিয়া শূন্যত উপলব্ধি করিয়া থাকেন। সে কারণে বলা হইয়াছে—'ন অঞ্ঞো কোচি অত্থী'তি সুঞ্ঞতো উপট্ঠানং ইজ্ঝতি।"

যাহা আলম্বন জ্ঞান, যাহা ভঙ্গানুদর্শন ও যাহা শূন্যত উপলব্ধি, তাহা অধিপ্রজ্ঞা বিদর্শন নামে কথিত হয়।

ভয় জ্ঞান

সংস্কার ধর্ম্মসমূহ যে ক্ষয় বা নিরোধ হইতেছে, যোগী ইহা প্রত্যক্ষ-ভাবে দর্শন করিয়া, যেমন সিংহ-ব্যাঘ্র দর্শনে ভীরু ব্যক্তির ভয় উৎপন্ন হয়, তেমন যোগীরও তদনুরূপ সংস্কারগুলির প্রতি ভয় উৎপন্ন হয়। তখন তাঁহার মনে হয়, ত্রিকালোৎপন্ন সংস্কার ধর্ম্মসমূহ, তত্তৎ কালেই নিরুদ্ধ হয়। ইহাতে যোগীর মন আরও ভয়ে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে।

যেমন একটি স্ত্রীর তিনটি পুত্র রাজা কর্ত্তৃক শিরচ্ছেদ দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ঘাতক প্রথম পুত্রকে বধ করিয়া যখন দ্বিতীয় পুত্রকে বধ করিতে যাইতেছে, তখন মাতা প্রথম পুত্র হত হইয়াছে দেখিয়া মধ্যম পুত্র এখন হত হইবে ভাবিয়া তৃতীয় পুত্রের আশাও ত্যাগ করিল। তেমন সাধকের প্রথম পুত্রের ন্যায় অতীত সংস্কার, দ্বিতীয় পুত্রের ন্যায় বর্ত্তমান সংস্কার ও তৃতীয় পুত্রের ন্যায় ভবিষ্যৎ সংস্কারকে নিরোধ তুল্য দর্শন করিতে হইবে। এই ত্রৈকালিক নিরোধ দর্শনে সাধকের ভয়জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

যেমন কোন পুরুষ নগরদ্বারে প্রজ্বলিত তিনটি অঙ্গারপূর্ণ কূপ দেখিয়া নিজের পতন ভয় আশঙ্কা না করিলেও অন্য লোকের পতন ভয় আশঙ্কা করে এবং পতন জনিত দুঃখ অনুভব করে; তেমন সাধক কাম, রূপ

ও অরূপভবের মধ্যে ত্রিকালে যে সমস্ত সংস্কার নিরুদ্ধ হয়, তাহা বুঝিতে পারেন। কিন্তু নিজে ইহাতে ভীত হন না।

"যস্মা পনস্‌স কেবলং সব্বভব-যোনি-গতি-ঠিতি-নিবাসগতা সঙ্‌খারা ব্যসনাপন্না সপ্‌পটিভযা হুত্বা ভযতো উপদহন্তি। তস্মা ভযতুপট্‌ঠানন্তি বুচ্চতি।"

যেহেতু যোগীর কেবল সমস্ত ভব-যোনি-গতি-স্থিতি-নিবাসগত সংস্কার সমূহ যে ব্যসনপ্রাপ্ত ও ভয় মূলক, ইহাতে তাঁহার ভীতির সঞ্চার হইয়া থাকে। সে কারণে ভয়-ভীতি নামে কথিত হয়।

যদি ভীতির প্রতি ত্রিলক্ষণ জ্ঞানে যোগীর চিত্ত নিবিষ্ট হয়, তাহা হইলে অনিত্যতায় নিমিত্তভয়, দুঃখতায় প্রবর্ত্তনভয় ও অনাত্মতায় নিমিত্ত ও প্রবর্ত্তন এই উভয় ভয় অনুভূত হয়।

এখানে নিমিত্ত বলিলে, ত্রিকালীয় সংস্কার নিমিত্তই বুঝায়। ইহাকে অনিত্যভাবে মনোনিবেশ করিলে, সংস্কার সমূহের মৃত্যুই পরিদৃষ্ট হয়। সে কারণে যোগীর নিমিত্তকে ভয় রূপে অনুভূত হয়।

প্রবর্ত্তন বলিলে রূপারূপভবে প্রবর্ত্তন। ইহাকে দুঃখভাবে মনোনিবেশ করিলে, সুখসম্মত হইলেও রূপারূপভব প্রবর্ত্তির নিত্য প্রতিপীড়নই পরিদৃষ্ট হয়, যোগীর সেই প্রবর্ত্তকে ভয় রূপে অনুভূত হয়।

অনাত্মরূপে মনোনিবেশ করিলে নিমিত্ত ও প্রবর্ত্তন দুইটি শূন্য গ্রাম তুল্য মরীচিকা ও গন্ধর্ব্ব নগরের ন্যায় রিক্ত, তুচ্ছ, শূন্য, অস্বামিক ও অপরিণায়-কবৎ পরিদৃষ্ট হয়। সে কারণে নিমিত্ত ও প্রবর্ত্তনকে যোগীর ভয়রূপে অনুভূত হয়।

এভাবে ভয়ানুভূতি জ্ঞানে পুনঃপুনঃ আসেবনে, ভাবনে, বহুলকরণে সর্ব্ব-ভবযোনি-গতি-স্থিতি ও সত্ত্বাবাসের মধ্যে ত্রাণের উপায়, ক্ষরা, গতি ও শরণের উপায় দেখা যায় না। তাহা হইলে ভব প্রভৃতির একটি সংস্কারকেও প্রার্থনা করিবার বা স্পর্শ করিবার মত কিছুই পাওয়া যায় না।

তখন যোগী বুঝিতে পারেন, এই যে আমার পঞ্চস্কন্ধ বা দেহ ভয়োৎপত্তির মূল ভিত্তি রচনা করিতেছে, ইহার উদয়-বিলয়ই ক্লেশ ভোগের একমাত্র কারণ। ভবান্তর রহস্য ইহাতেই লুক্কায়িত। দুঃখের কণ্টক শয্যা ইহাতেই প্রসারিত। সংস্কার-পুঞ্জের এই বিভীষিকা যোগী মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া ভয়-জ্ঞান উৎপাদন করিয়া থাকেন।

আদীনব জ্ঞান

সাধক এভাবে উত্তরোত্তর ভয় জ্ঞানকে বর্দ্ধিত করিয়া ত্রিভবের মধ্যে সুখের আশ্রয় আর দেখেন না। তখন কাম-রূপ-অরূপভবের একটি সংস্কারেও তাঁহার আসক্তি উৎপাদিত হয় না। ত্রিভবকে তাঁহার প্রজ্বলিত অঙ্গার পূর্ণ কূপের ন্যায় বোধ হয়। ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎকে আশীবিষ তুল্য, পঞ্চ-স্কন্ধকে উত্তোলিত অসিধারী ঘাতক সদৃশ, ষড়ায়তনকে গ্রামঘাতক তুল্য প্রতীয়মান হয়। সমস্ত জীবলোক কাম, দ্বেষ, মোহ, জন্ম, জরা, মরণ, শোক, বিলাপ, দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য ও উপায়াস এই ১১ প্রকার অগ্নি দ্বারা সতত প্রজ্বলিতবৎ মনে করেন।

সমস্ত সংস্কারগুলি যেন গণ্ড-রোগ-শূল সদৃশ, আস্বাদ বিহীন, নীরস ও মহা আদীনব রাশি বা বিবিধ উপদ্রব মূলক বলিয়া তাঁহার স্মৃতিতে উদিত হয়।

সুখে জীবন ধারণের আশায় আশান্বিত ভীরুজনের হিংস্র জন্তু সমাকীর্ণ রমণীয় গহণবন দর্শনের ন্যায়, শার্দ্দুলাধিকৃত গুহা দর্শনের ন্যায়, রাক্ষস পরিগৃহীত সরোবর দর্শনের ন্যায়, উৎক্ষিপ্ত অসিহস্ত শত্রু দর্শনের ন্যায়, বিষমিশ্রিত ভোজন দর্শনের ন্যায়, দস্যু অধিকৃত পথ দর্শনের ন্যায় এবং প্রজ্বলিত গৃহ দর্শনের ন্যায় সাধকের ত্রিলোক ভীষণাকারে পরিদৃষ্ট ও প্রতিভাত হয়। এভাবে যোগীও ভয়জ্ঞানের শ্রীবৃদ্ধি কারণে সর্ব্বদা ভীত, রোমাঞ্চিত ও উদ্বিগ্ন হইয়া চারিদিকে কেবল বিভীষিকাময় দোষ রাশিই দেখিতে পান। ইহার বিভীষিকা দর্শনে ভয়ের কারণ হইতে আদীনবজ্ঞান প্রাদুর্ভূত হয়। সেই কারণে বলা হইয়াছে—

তস্সেবং পস্সতো আদীনবঞাণং উপ্পন্নং হোতি।
কথং ভয়তুপট্ঠানে পঞ্ঞা আদীনবে ঞাণং ?"

ভয়ানুভূতির পর আদীনব জ্ঞানে প্রজ্ঞালাভটা কিরূপ? উৎপত্তি রূপে প্রবর্ত্তন, নিমিত্ত, সংস্কার, জন্ম, জরা, মরণ, শোক, বিলাপ প্রভৃতিকে ভয়রূপে দর্শনে, অনুৎপত্তি প্রভৃতি বিপরীত ভাবে গ্রহণ করিলে নির্ব্বাণ লাভের উপায় পরিজ্ঞাত হয়। ইহাই দোষ বা উপদ্রব দর্শনে আদীনব জ্ঞান উৎপাদনের পন্থা। তাই বিসুদ্ধিমগ্গে বলা হইয়াছে—

"উপ্পাদঞ্চ পবত্তঞ্চ নিমিত্তং দুক্খন্তি পস্সতি
আযূহনং পটিসন্ধিং ঞাণং আদীনবে ইদন্তি চ।
অনুপ্পাদং অপ্পবত্তং অনিমিত্তং সুখন্তি চ,
অনাযূহনা অপটিসন্ধিং ঞাণং সন্তিপদে ইদং।"

উৎপত্তি সামিষ তুল্য, অনুৎপত্তি নিরামিষ তুল্য, ইহাই শান্তিপদে জ্ঞান। তথা প্রবর্ত্ত প্রভৃতি।

উৎপত্তি সংস্কার, অনুৎপত্তি নির্ব্বাণ, ইহাই শান্তিপদে জ্ঞান। পূর্ব্ববৎ।

পুনঃ বলা হইয়াছে—যাবতীয় সংস্কার ধর্ম্মের উৎপত্তিক্ষণ দর্শনে, স্থিতিক্ষণ দর্শনে, ভঙ্গক্ষণ দর্শনে, চক্ষুদ্বার প্রভৃতিতে রূপাদি আলম্বনের সংযোগক্ষণ দর্শনে ও সর্ব্বদা নাম-রূপের উদয়-ব্যয় স্বভাব দর্শনে যোগী-মাত্রেরই আদীনব জ্ঞান সুপরিচিত হইয়া থাকে।

আদীনব জ্ঞানোৎপত্তি এই পঞ্চ বিধান যোগীর জ্ঞান-পরিসরে প্রতিভাত হইলে সংস্কারগুলির পরিণাম কতই যে ভয়াবহ, ইহাতে কতই পুঞ্জীভূত বাধা ও বর্ণনাতীত উপদ্রব প্রতি মুহূর্ত্তে সৃষ্টি হইতেছে তাহা তিনি অনুভব করিতে পারেন। কি অন্তর্জগতে, কি বহির্জগতে, কি স্কন্ধ-আয়তন-ধাতু প্রভৃতিতে নিরাপদ স্থান কোথায়ও নাই। যোগীর মধ্যে এভাবে নীরস স্বভাব সঞ্চারিত হওয়াই আদীনব জ্ঞানোৎপত্তির বৈশিষ্ট্য। তাই বলা হইয়াছে—

"ইদং আদীনবে ঞাণং পঞ্চট্ঠানেসু জাযতি।"

নির্ব্বেদ-জ্ঞান

পূর্ব্বোক্ত নিয়মে সমস্ত সংস্কার ধর্ম্মকে আদীনবরূপে দর্শনের ফলে যোগী ত্রিলোকের প্রতি উদাসীন হন ও উৎকণ্ঠিত হন। তাঁহার চিত্ত কোথাও রমিত হয় না। যেমন চিত্রকূট সরোবরে কেলিরত সুবর্ণ রাজহংস অশুচি-পূর্ণ চণ্ডাল গ্রামের ক্ষুদ্র জলাশয়ে রমিত হয় না, তেমন যোগীরূপ রাজহংস আদীনব জ্ঞানে সুপরিদৃষ্ট বিধায় অনিত্যমূলক ত্রিলোকগত সংস্কারধর্ম্মে আর রমিত হন না, কেবল বিদর্শন ভাবনাতেই আনন্দানুভব করিয়া থাকেন।

যেমন স্বাধীন মৃগরাজ সুবর্ণ পিঞ্জরে শান্তি পায় না, সুবিস্তৃত হিমালয়

পর্ব্বতেই শান্তি পায়, তেমন যোগীও কাম-রূপ ও অরূপলোকে শান্তি পান না, বিদর্শন ভাবনায় নিমগ্ন থাকিলেই তিনি শান্তি অনুভব করিয়া থাকেন।

তখন যোগীর স্বভাবতঃ পঞ্চস্কন্ধের প্রতি আর অনুরাগ থাকে না। দুঃখ-মুক্তির উপায় যে বৈরাগ্য, তাহা অনুভব করিয়া থাকেন। যেহেতু "নিব্বিন্দং বিরজ্জতি, বিরাগং বিমুচ্চতি" যোগীর পঞ্চস্কন্ধে উদাসীন ভাবই বিরাগ সূচনার কারণ। ইহাতে ষড়িন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়ে লোভ-দ্বেষ-মোহের সঞ্চার হয় না। কাজেই সংস্কার ধর্ম্মসমূহ অনুরাগের কারণ উৎপাদন করিতে পারে না।

তখন যোগী প্রতি মুহূর্ত্তে নাম-রূপের ভগ্নপ্রবণ অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া থাকেন এবং দেহখানি যে বত্রিশ প্রকার অশুচি পদার্থে পরিপূর্ণ তৎপ্রতি তাঁহার জ্ঞানোদয় হওয়ায় উহাতে আসক্তি উৎপাদনের মত কারণ প্রত্যক্ষ করেন না। কাজেই যোগীর নিরানন্দ ভাব জাগ্রত হয়। এই নিরানন্দ স্বভাবই নির্ব্বেদ বা উৎকণ্ঠার নামান্তর।

এখন বুঝা গেল, ত্রৈকালিক সংস্কারগুলি ত্রিলক্ষণ জ্ঞানে পরিচিত হওয়ায় বিশুদ্ধি লাভের পথ প্রজ্ঞানেত্রে পরিদৃষ্ট হইল।

মুক্তি-কাম্যতা জ্ঞান

সমস্ত সংস্কার ধর্ম্মকে ভয়ের দিক দিয়া দর্শন করিলে ভয়জ্ঞান, আদীনবের দিক দিয়া দর্শন করিলে আদীনব ও সংস্কার ধর্ম্মের প্রতি উদাসীনতা উৎপাদনে নির্ব্বেদজ্ঞান উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ একমাত্র ভয়জ্ঞানের এই তিনটি বিভাগ।

নির্ব্বেদ জ্ঞান লাভে অনাসক্ত যোগী বহির্জগতের কাম্যবস্তুতে মুগ্ধ হন না। তখন যাবতীয় সংস্কার হইতে মুক্ত হইবার জন্য তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া থাকে।

যেমন জালাবদ্ধ মৎস্য, সর্পমুখগত মণ্ডূক, পিঞ্জরাবদ্ধ বন-কুক্কুট ও শত্রু পরিবেষ্টিত পুরুষ বিপদ-মুক্ত হইবার জন্য অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠে, তেমন যোগীর চিত্তও সংস্কার হইতে মুক্ত হইবার জন্য অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠে। তখন সংস্কারে বীততৃষ্ণ ও মুক্তিকামী যোগী মুক্তি-কাম্যতা জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন।

কাজেই পরমার্থ রসে নিসিক্ত যোগীজন জীবন কামনার পঙ্কিলাবর্ত্তে আর শান্তি লাভ করেন না। সে কারণে কাম্যবস্তুতে বীতস্পৃহ যোগী কামনার দাবদাহ অতিক্রম করিতে অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠেন। নিত্য নব নব দুঃখাগমে সংস্কার-কাতর যোগী কি উপায়ে অব্যাহতি লাভ করিবেন তৎপ্রতি তাঁহার আগ্রহাতিশয্য এভাবে বর্দ্ধিত হয় যে, যত সত্বর প্রমুক্তি লাভ করিতে পারেন ততই আশু মঙ্গল বলিয়া ধারণা করেন। মুক্তিকামীর এই যে প্রবলেচ্ছা, তাহাই মুক্তিকাম্যতা জ্ঞান নামে অভিহিত।

সংস্কার গ্রন্থির সমুচ্ছেদ মানসে যোগীজন চিত্তের আকুল বেদনা চিরাবসান কল্পে মুক্তি-চঞ্চল হওয়া যে স্বাভাবিক, তাহা এই জ্ঞানে সুপরিস্ফুট।

প্রতিসংখ্যা জ্ঞান

যোগী ত্রিলোকান্তর্গত যাবতীয় সংস্কার হইতে মুক্ত হইবার জন্য মুক্তির উপায় উদ্ভাবন করিয়া থাকেন। সংস্কার সমূহ যে অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম, তাহা সর্ব্বদা জ্ঞানের সহিত বিচার করেন। যাহা নিত্য নহে, ক্ষণকাল মাত্র যাহার স্থায়িত্ব, যাহা উদয়-ব্যয় দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, সর্ব্বদা ধ্বংসশীল, যাহা চঞ্চল, অধ্রুব, ক্ষণভঙ্গুর এবং পরিবর্ত্তনশীল, তাহা নিশ্চয়ই অনিত্য। নিত্য যন্ত্রণা দেয় বলিয়া এই সংস্কার বড়ই দুঃসহ। ইহা দুঃখের নিবাস তুল্য। রোগ-গন্ড-শূল-উপদ্রব-ভয়প্রবণ। এ কারণে সংস্কার বিবিধ দুঃখের আকর, অতিশয় দুর্গন্ধ, কদাকার, বীভৎস, জুগুপ্সিত বলিয়া অশুভ প্রবণ। ইহা রিক্ত, স্বামিত্বহীন ও অবাধ্য, এই কারণে সংস্কার অনাত্ম।

যোগী মুক্তির উপায় সন্ধানে ত্রিলক্ষণে ইহা আরোপিত করিয়া বারংবার মনোনিবেশ করিয়া থাকেন।

উপমা দ্বারা বুঝিতে হইলে,—এক ব্যক্তি পলব লইয়া মৎস্য শিকার করিতে গিয়া, পলবটি জলে চাপিয়া মৎস্য জ্ঞানে এক বিষধর সর্পের গ্রীবা চাপিয়া ধরিল। ইহাতে সে সন্তুষ্ট হইয়া সেটাকে যেই উপরে তুলিল, দেখিল যে এক সর্প তাঁহার হস্ত বেষ্টন করিয়াছে। সর্পের ত্রিবক্র বেষ্টনী দর্শনে তাঁহার মৎস্যভ্রম দূরীভূত হইল। সে তৎপ্রতি উদাসীন হইয়া মুক্তির উপায় ঠিক করিল। তৎপর সর্পের বেষ্টনী খুলিয়া ও মস্তকটিতে দুই তিন বার আঘাত করিয়া তাহাকে দুর্ব্বল করিল এবং দূরে ফেলিয়া দিল। এ মহাবিপদ হইতে রক্ষা পাইয়া ঐদিকে তাকাইয়া রহিল।

মৎস্যভ্রমে সর্পের গ্রীবা ধরিয়া আনন্দ লাভের ন্যায় অশুচি দেহের পরিণতি না বুঝিয়া দেহের প্রতি আসক্ত হওয়া তুল্য যোগীর পঞ্চস্কন্ধকে গ্রহণ। সর্পের ত্রিবক্রাকৃতি লক্ষণ দর্শন তুল্য যোগীর অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম লক্ষণে জ্ঞান লাভ। সর্প দর্শনে ভয়োৎপাদনের ন্যায় পঞ্চস্কন্ধে 'ভয় জ্ঞান' সঞ্চার। সর্প যে দংশন করে, ইহাতে যে বিবিধ দুঃখ উৎপন্ন হয়, এমন কি মৃত্যুলাভও যে অবশ্যম্ভাবী, এই দোষ দর্শন তুল্য পঞ্চস্কন্ধে 'আদীনব-জ্ঞান।' সর্পের প্রতি উদাসীন ভাব তুল্য 'নির্ব্বেদ জ্ঞান।' সর্প ভয় হইতে মুক্তি কামনা তুল্য 'মুক্তি-কাম্যতাজ্ঞান।' সর্প হইতে মুক্তির উপায় নির্দ্ধারিণ তুল্য 'ত্রিলক্ষণ নির্দ্ধারিণ।' দুই তিন আঘাতে সর্পকে দুর্ব্বল করার তুল্য সংস্কার সমূহকে ত্রিলক্ষণদ্বারা আঘাত করা। সর্প যেন প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দংশনে অসমর্থ হয়, তেমন নিত্য, সুখ, শুচি, আত্মার আকারে স্মৃতি পথে যেন উদিত না হয়, তদুপায় অবলম্বনে নিজকে মুক্ত রাখা। যোগী এই উপায়ে সংস্কার সমূহ হইতে মুক্তির উপায় নির্দ্ধারিণ করিলেই 'প্রতিসংখ্যাজ্ঞান' উৎপন্ন হয়। সেই কারণে কথিত হইয়াছে ঃ—

"সভেদকেসু সংখারেসু একসংখারেপি চিত্তং ন সজ্জতি, ন লগ্‌গতি ন রজ্জতি।"

যোগীর নির্ব্বেদজ্ঞান সঞ্চারে পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণের প্রতি অনভিরতি বা উৎকণ্ঠা ভাব জাগ্রত হয়। তাই ভগ্নপরায়ণ সংস্কার সমূহের মধ্যে একটি সংস্কারের প্রতিও তাঁহার চিত্ত আসক্ত হয় না, লাগিয়া থাকিতে চাহে না ও আবদ্ধ থাকিতে নারাজ হয়। সে কারণে সমস্ত সংস্কারগত বিষয়বস্তু হইতে মুক্তীচ্ছা প্রবল হয়।

"অথস্‌স এবং সব্বসংখারেসু বিগতালযস্‌স সব্বস্মা সংখারগতা মুঞ্চিতুকামস্‌স উপ্‌পজ্জতি মুঞ্চিতুকাম্যতা ঞাণং।"

অতঃপর যোগীর সমস্ত সংস্কারের প্রতি আলয় বা বন্ধমূল তৃষ্ণা বিগত হয়। সে কারণে সংস্কারমুক্ত প্রতীতি প্রবল হওয়ায় মুক্তিকাম্যতা জ্ঞানের সঞ্চার হয়।

"এবং হি পস্‌সতানেন তিলক্‌খণং আরোপেত্বা সংখারা পরিগ্‌গহিতা নাম হোন্তি—পে—অনত্ততো মনসিকরোতো নিমিত্তঞ্চ পবত্তঞ্চ পাটিসংখা ঞাণং উপ্‌পজ্জতি।"

যোগী এভাবে ত্রিলক্ষণ আরোপিত করিতে পারিলেই সংস্কারের

প্রতিগ্রাহিতা নামে কথিত হয়। তদুপায়ে সংস্কারকে দুর্ব্বল করিয়া পুনরায় পঞ্চস্কন্ধটিকে নিত্য-সুখ-শুভ-আত্মা আকারে গ্রহণ করিতে অসমর্থ ভাব প্রাপ্ত হন। এখন যোগীর 'প্রতিসংখ্যাজ্ঞান' উৎপন্ন হইল। তাঁহার ত্রিলক্ষণে জ্ঞান বিকশিত সংস্কারনিমিত্ত ও সংস্কারপ্রবর্ত্ত বিরহিত এই জ্ঞানের উদয় হয়।

"সঙখারানং নিচ্চাদি আকারেন উপট্ঠাতুং অসমত্থতা অনিচ্চ-সঞ্‌ঞাদিভেদায বিপস্‌সনায সাতিসযং বলবভাবপ্পত্তিয়া।"

(পরমত্থমঞ্জুসা)

যোগী সংস্কার সমূহের পরিণতি দর্শনে উহাকে নিত্য-সুখ-আত্মার আকারে গ্রহণ করিতে না পারিয়া অনিত্য-দুঃখ-অনাত্মা সংজ্ঞা উপলব্ধি করেন। ইহাতে যোগীর বিদর্শন ভাবনার প্রতি বলবতী শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। এভাবে ত্রিলক্ষণে সুষ্ঠুভাবে জ্ঞানোদয় হইলে সংস্কার সমূহ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। পূর্ব্ব বর্ণিত জ্ঞানানুসারে।

"সব্বসো ভঙ্গঞ্চ পাপুণাতি" সর্ব্ব বিষয়ে ভগ্নাবস্থা প্রাপ্ত হন। সে কারণে 'প্রতিসংখ্যা' অর্থ জানিয়া অর্থাৎ "কুশল ধর্ম্মের প্রত্যয়ে কুশল ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়" এই হেতু-প্রত্যয় জানিয়া 'প্রতিসংখ্যাজ্ঞান' উৎপাদন করিতে হয়।

সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান

"সো এবং পটিসঙখানুপস্‌সনা ঞাণেন সব্বে সঙখারা সুঞ্‌ঞা'তি পরিগ্‌গহেত্বা, পুন সুঞ্‌ঞমিদং অত্তেন বা অত্তনিযেন বা'তি দ্বিকোটিকং সুঞ্‌ঞতং পরিগণ্‌হাতি।"

যোগী প্রতিসংখ্যানুদর্শন জ্ঞান দ্বারা সমস্ত সংস্কার যে শূন্য তাহা পরিগ্রহণ করিতে পারেন। পুনঃ ইহা শূন্য, ইহাতে কোন সার পদার্থ নাই; আত্মা বলিয়া বা আত্মবৎ বলিয়া গ্রহণের অভাব হেতু 'দ্বিকোটিক' দুই প্রান্তিক শূন্যতা পরিগ্রহণে সমর্থ হন।

যোগী তখন চিন্তা করেন যে, এই যে রূপস্কন্ধ বা সত্ত্ব, জীব, নর, নারী বা আত্মা কিছুই নহে। আমিও নহি, আমারও নহে এবং অন্যেরও নহে; কাজেই ইহা শূন্য। এ প্রকারে শূন্যের দিক দিয়া বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার-বিজ্ঞানকেও বিচার করিবেন। যখন সংস্কার সমূহ শূন্য, তখন সংস্কারে তাঁহার আনন্দ নাই, ভয় নাই, কাজেই উহাতে যোগী উদাসীন হন। আর

সংস্কারকে 'পরিত্যক্ত ভার্য্যার' ন্যায় আমি বা আমার বলিবার মত কোন কারণ বিদ্যমান নাই বলিয়া বুঝেন। ইহাতে কাম্যবস্তুর প্রতি অনাসক্তিভাব জাগ্রত হয়। তখন নিজের বস্তুর প্রতিও—

"নাহং ক্বচনি, কস্সচি কিঞ্চি ন তস্মিং, ন চ মম ক্বচনি, কিঞ্চি কিঞ্চনং নত্থী'তি যা তত্থ চতুকোটিকা সুঞ্ঞতা কথিতা, তং পরিগণ্হাতি।"

আমার কিছু নাই, তন্মধ্যে কাহারো কিছু নাই, তাহাতেও আমার নাই, চাওয়ার মত কাহারও কিছু নাই, এভাবে চর্তুপ্রান্তিক শূন্যতা কথিত হইয়াছে ; যোগী তাহাই পরিগ্রহণ করেন।

এ কারণ দর্শনে যোগীর ঔদাসীন্য প্রবল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত সংস্কারপুঞ্জমাত্র ইহা, ইহাতে নাই সুখ, নাই শান্তি, কেবল পুঞ্জীভূত দুঃখ-রাশি। তখন তাহার এ প্রকার দর্শনে 'সংস্কারোপেক্ষাজ্ঞান' উৎপন্ন হয়। এই জ্ঞান মুক্তিকাম্যতা, প্রতিসংখ্যা ও সংস্কারোপেক্ষা নামে ত্রিধা বিভক্ত।

সাধকের এই বিদর্শনা প্রজ্ঞা জ্ঞানশিখায় প্রদীপ্ত। উত্থানগামিনী এই বিদর্শনা প্রজ্ঞা সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞানের নামান্তর। ইহা বিদর্শন জ্ঞান লাভের চরম ও পরম। যাহা স্রোতাপত্তি মার্গগামিনী প্রজ্ঞা নামে অভিহিত।

যেমন পঞ্চশাখা সম্পন্ন মধুক বৃক্ষে একটি বাদুড় বসিয়া কোন শাখায় ফল লাভ না করিয়া, বৃক্ষাগ্র হইতে অন্য ফলবান বৃক্ষ দর্শনে চলিয়া গেল। তেমন বাদুড় তুল্য যোগী পঞ্চ শাখাতুল্য পঞ্চস্কন্ধে কোন ফল লাভ আশা না দেখিয়া বৃক্ষাগ্রে বাদুড়ের অবস্থানবৎ যোগীর 'অনুলোম জ্ঞান' সম্ভাবনা হইল। বাদুড়ের আকাশ যাত্রার ন্যায় যোগীর স্রোতাপত্তি মার্গ জ্ঞান-লাভ ও ফলবান বৃক্ষে বাদুড়ের ফল ভক্ষণ তুল্য স্রোতাপত্তি ফল জ্ঞান-লাভ।

সেই কারণে বলা হইয়াছে—

"এবং সুঞ্ঞতো দিস্বা তিলকখণং আরোপেত্বা—পে—ইচ্চস্স সংখারুপেক্খা ঞাণং নাম উপ্পন্নং হোতি।"

এইরূপে শূন্যময় সংস্কার সমূহ দেখিয়া ত্রিলক্ষণ আরোপণ পূর্ব্বক ভয়-নন্দী পরিত্যাগ করেন, সংস্কারের প্রতি উদাসীন হন এবং উপেক্ষার ভাব প্রদর্শন করেন। আমি বলিয়া বা আমার বলিয়া কিছুই গ্রহণ করেন না। ত্রিভবের প্রতি অনাসক্তিভাব উৎপন্ন হয়। ইহাতেই যোগীর সংস্কারোপেক্ষা ভাবের পরিচয় পরিস্ফুট।

অনুলোম জ্ঞান

"তস্স তং সঙ্খারুপেক্খা ঞাণং আসেবন্তস্স—পে—তথেব সঙ্খারে আরম্মণং কত্বা উপ্পজ্জতি ততিযং জবনচিত্তং যং অনুলোমন্তি বুচ্চতি।"

যোগীর সেই সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান আসেবন-ভাবন-বহুলী করণে বলবতী শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়, বীর্য্য সুগৃহীত হয়, স্মৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং চিত্ত সুসমাহিত হয়। তীক্ষ্ণতর সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান উৎপন্ন হয়। তখন যোগীর মনে হয় যে 'এখন আমার মার্গ উৎপন্ন হইবে।' এ প্রকারে সংস্কারের প্রতি উদাসীন হইয়া, ত্রিলক্ষণ দ্বারা উহাকে সংমর্শনে যোগী ভবাঙ্গ চিত্তে অবতরণ করেন। ভবাঙ্গ চিত্তের পর পূর্ব্বোক্ত নিয়মে সংস্কারে ত্রিলক্ষণ আলম্বন গ্রহণ করাতে, মনোদ্বারাবর্জ্জন চিত্ত উৎপন্ন হয়। তৎপর ভবাঙ্গে আবর্ত্তিত হইয়া উৎপন্ন ক্রিয়াচিত্তের পর তরঙ্গহীন চিত্তসন্ততিতে যে জবন চিত্ত উৎপন্ন হয়, তাহারই প্রথম স্তরে পরিকর্ম্ম চিত্ত, দ্বিতীয় স্তরে উপচার চিত্ত, তৃতীয় স্তরে অনুলোম চিত্ত উৎপন্ন হয়।

যাহা প্রথম জবন চিত্ত তাহাই পরিকর্ম্ম, যাহা দ্বিতীয় জবন চিত্ত তাহাই উপচার, যাহা তৃতীয় জবন চিত্ত তাহাই অনুলোম। তৎপর গোত্রভূ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, প্রত্যেকটি সমস্ত সংস্কারকে আলম্বন করিয়া জাত হয় বলিয়া বুঝিতে হইবে।

এখানে 'অনুলোম' অর্থ, যাহা পূর্ব্বাপর অনুরূপ বা অনুকূল। উদয়-ব্যয় জ্ঞান হইতে সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান পর্য্যন্ত স্ব স্ব কার্য্য সাধনে ৩৭টি বোধিপক্ষীয় ধর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করা অনুকূল বলিয়াই 'অনুলোম' জ্ঞান নামে কথিত হয়।

যেমন ধার্ম্মিক রাজা নিরপেক্ষভাবে মন্ত্রিগণের সুপরামর্শও শ্রবণ করেন, প্রাচীন রাজনীতি শাস্ত্রও দর্শন করেন, তৎপর উভয়ের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া স্বীয় অভিমত প্রকাশ করেন। তেমন এখানে রাজা সদৃশ 'অনুলোম জ্ঞান', অষ্ট মন্ত্রী সদৃশ 'অষ্টবিধ বিদর্শন জ্ঞান' এবং প্রাচীন রাজনীতি শাস্ত্র তুল্য 'সপ্তত্রিংশ বোধিপক্ষীয় ধর্ম্ম''। রাজা যেমন মন্ত্রীদেরও রাজনীতির অনুকূলে মত দেন এবং সামঞ্জস্য বিধান করেন, তেমন অনুলোম জ্ঞানও অষ্টবিধ বিদর্শন জ্ঞানের ও সপ্তত্রিংশ বোধিপক্ষীয় ধর্ম্মের অনুকূলে সামঞ্জস্য রক্ষা করে। এই 'অনুলোম জ্ঞান' সংস্কার ধর্ম্মকে আলম্বন স্বরূপ করিয়া উত্থিত বিদর্শন জ্ঞানের চরম

পরিণতি। সর্ব্ব প্রকারে গোত্রভূজ্ঞান উর্দ্ধগামী বিদর্শন জ্ঞানের পর্য্যবসান সূচিত করে।

"ইমেহি ঞাণেহি অনুক্কমেন আহিতবিসেসং অনুলোমঞাণং নিব্বানা-রম্মণস্স ঞাণস্স পচ্চযো ভবিতুং সমত্থং জাতং।"

এই জ্ঞানদ্বারা অনুক্রমে বিশেষ হিত বিধায়ক অনুলোম জ্ঞান নির্ব্বাণা-লম্বন জ্ঞানের প্রত্যয় হইতে সমর্থ।

জ্ঞান দর্শন বিশুদ্ধি

"তং মগ্গস্স আবজ্জনঠানিযত্তা—পে—অনুলোমাবসানং বিপস্সনং উপ্পাদেস্তেন কতমেব।"

অনুলোম জ্ঞান লাভের পরেই গোত্রভূ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ইহা প্রতিপদ জ্ঞান বিশুদ্ধির মধ্যে যেমন গণ্য নহে, তেমন জ্ঞান দর্শন বিশুদ্ধির মধ্যেও গণ্য নহে। ইহা উভয়ের মধ্যবর্ত্তী জ্ঞান বিশেষ। কেবল বিদর্শন স্রোতে পতিত বলিয়া বিদর্শন নামে অভিহিত। স্রোতাপত্তি-সকৃদাগামী অনাগামী-অর্হৎ এই চতুর্ব্বিধ মার্গে স্থিত জ্ঞানকে জ্ঞান দর্শন বিশুদ্ধি বলে। এই অনুলোম জ্ঞানের পরেই নির্ব্বাণকে আলম্বন করিয়া গোত্রভূ জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

যেমন উৎপত্তিক্ষণে গোত্রভূ জ্ঞান নিম্নতর সাধন স্তরকে অতিক্রম করে, তেমন আর্য্য সম্মত উন্নততর সাধন স্তরকে উৎপাদন করে। এই গোত্রভূ জ্ঞান লাভের পরেই স্রোতাপত্তি মার্গজ্ঞান উৎপন্ন হয়। ইহার উৎপত্তি ক্ষণে দুঃখসত্যকে সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। তৎপর যথাক্রমে দুঃখোৎপত্তির হেতু ত্যাগ, নিরোধ সাক্ষাৎকার ও ভাবনাবলে সমাধিবীথির ভিতর দিয়া আর্য্যমার্গে অবতরণ করা হয়। এ ভাবে আর্য্যসত্য চতুষ্টয়ের কাজ এক সঙ্গেই সম্পাদিত হয়।

স্রোতাপত্তি মার্গজ্ঞান লাভের পরক্ষণেই স্রোতাপত্তি ফলজ্ঞান লাভ হয়। তৎপর ভবাঙ্গ চিত্তপাত হয়।

এক চিত্তবীথিতে সপ্তম জবন চিত্তের প্রথম স্তরে পরিকর্ম্ম, দ্বিতীয় স্তরে উপচার, তৃতীয় স্তরে অনুলোম, চতুর্থ স্তরে গোত্রভূ, পঞ্চম স্তরে স্রোতাপত্তি মার্গ এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম স্তরে স্রোতাপত্তি ফলচিত্ত উৎপন্ন হয়। তৎপর ভবাঙ্গপাত হয়।

পুনরায় ভবাঙ্গ অবিচ্ছিন্ন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। পর্য্যবেক্ষণ জ্ঞান উৎপন্ন হইলে, যোগী অনুভব করিতে পারেন যে, রাগ-দ্বেষ-মোহাদি দশবিধ ক্লেশ তাঁহার কতটুকু উচ্ছিন্ন হইয়াছে, আর কতটুকু অবশিষ্ট আছে।

তবে যোগীর স্রোতাপত্তি মার্গজ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গেই ১৮ প্রকার শাশ্বত দৃষ্টি ও ৪৪ প্রকার উচ্ছেদ দৃষ্টি সমুচ্ছিন্ন হয়। তখন যেই ক্লেশান্ধকারে এত সুদীর্ঘদিন এই আর্য্যসত্য চতুষ্টয় আবৃত ছিল, এই অনুলোম জ্ঞান উহাকে অপসারণ করিল। কিন্তু নিব্বাণালম্বনকে যোগী গ্রহণ করিতে কখনও সমর্থ নহেন। কারণ ইহাকে গ্রহণ করিবার একমাত্র শক্তি আছে গোত্রভূ জ্ঞানের।

মনে করুন, একজন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি নক্ষত্রযোগ জানিবার উদ্দেশ্যে চন্দ্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, কিন্তু চন্দ্র মেঘাবৃত থাকাতে তাহার দৃষ্টিগোচর হইল না। তখন হঠাৎ প্রবল বায়ু প্রবাহে বৃহৎ মেঘ-পটল, নাতিপ্রবল বায়ু প্রবাহে মধ্যম মেঘ-পটল ও মৃদু বায়ু প্রবাহে ক্ষুদ্র মেঘ-পটল অপসৃত হইল। সেইক্ষণে নক্ষত্রাচার্য্য চন্দ্র দেখিতে পাইল।

এখানে তিন প্রকার মেঘতুল্য ত্রিবিধ ক্লেশান্ধকার। ত্রিবিধ বায়ু সদৃশ পরিকর্ম্ম, উপচার ও অনুলোম এই ত্রিবিধ জ্ঞান। চক্ষুষ্মান নক্ষত্রাচার্য্য সদৃশ গোত্রভূ জ্ঞান। সমুজ্জ্বল চন্দ্র কিরণ তুল্য নিব্বাণ। এক এক প্রকার বায়ুতে মেঘ-পটল অপসারণের ন্যায় এক একটি অনুলোম জ্ঞান দ্বারা সত্য প্রতিচ্ছাদক ক্লেশান্ধকার দূরীকরণ। নির্ম্মলাকাশে নক্ষত্রাচার্য্যের নির্ম্মল চন্দ্র-দর্শন তুল্য সত্য প্রতিচ্ছাদক ক্লেশান্ধকার দূরীকরণে গোত্রভূ জ্ঞানে নিব্বাণ দর্শন।

যেমন ত্রিবিধ বায়ু চন্দ্রাবৃত মেঘগুলি অপসারিত করিতে সমর্থ বটে, কিন্তু চন্দ্র দর্শনে অসমর্থ, তেমন ত্রিবিধ অনুলোম জ্ঞানও সত্যাবৃত কলুষ অপনোদন করিতে সমর্থ, কিন্তু নিব্বাণ দর্শনে অসমর্থ। সেইরূপ নক্ষত্রাচার্য্য চন্দ্র দেখিতে সমর্থ বটে, কিন্তু মেঘপটল অপসারিত করিতে অসমর্থ। তেমন গোত্রভূ জ্ঞানও নিব্বাণ দর্শনে সমর্থ বটে কিন্তু কলুষ বিদূরীত করিতে সমর্থ নহে। ইহাই কার্য্য-কারণ নীতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ।

"এবং উপ্পন্নং অনুলোমঞাণস্স—পে—সিখাপত্তং বিপস্সনায মুদ্ধভূতং অপুনরাবট্টকং উপ্পজ্জতি গোত্রভূঞাণং।"

এ প্রকারে ত্রিবিধ অনুলোম জ্ঞান দ্বারা নিজের সামর্থ্যানুরূপ স্থূল স্থূল সত্য প্রতিচ্ছাদক কলুষগুলি অন্তর্হিত করিলে 'পদ্মপত্রে জল অলগ্ন তুল্য' যাবতীয় সংস্কারগত বিষয়ে চিত্ত প্রধাবিত হয় না, তথায় সুস্থির থাকে না, উহাতে আবদ্ধ থাকে না, আসক্ত হয় না ও সংলগ্ন থাকে না। তখন সমস্ত নিমিত্তালম্বন ও প্রবর্ত্তি আলম্বনকে উপদ্রবমূলক বলিয়া যোগী বিবেচনা করেন। তখন যোগী অনুলোম জ্ঞানকে পুনঃপুনঃ আসেবনের ফলে সংস্কারবিহীন নিরোধ নির্বাণালম্বনকে গ্রহণ করেন এবং পৃথগ্‌জন গোত্রভূত সংস্কার-ভূমি অতিক্রম করিয়া থাকেন। তৎপর আর্য্য গোত্রভূত আর্য্যভূমিকে অবলম্বন করিয়া নির্ব্বাণালম্বনে প্রথমাবর্ত্তন স্বরূপ অনন্তর, সমনন্তর, আসেবন, উপনিশ্রয়, নাস্তি ও বিগত প্রত্যয় ভাব সম্পাদন পূর্ব্বক শিখাপ্রাপ্ত বিদর্শনের মস্তক স্বরূপ অপ্রত্যাবর্ত্তনভূত গোত্রভূজ্ঞান উৎপন্ন হয়।

যেমন বৃহৎ পরিখা লঙ্ঘন করিয়া পরতীরে গমনেচ্ছুক কোন পুরুষ সবেগে ধাবিত হইয়া পরতীরস্থ একটা বৃক্ষ শাখা ধরিল। ঐ শাখায় রজ্জু বা যষ্টি বন্ধন পূর্ব্বক উহা ধরিয়া এক দোলে পরতীরে উপনীত হইয়া শাখাটি ছাড়িয়া দিল। তৎপর সে কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল।

তেমন এই ভব-তীর হইতে পরতীরস্থ নির্বাণে গমনেচ্ছুক যোগী সংস্কার ধর্ম্মসমূহের উদয়-ব্যয়াদি দর্শনে ভীত হইয়া পড়েন। কাজেই সবেগে বৃক্ষশাখা ধরিয়া উল্লঙ্ঘনের ন্যায় রূপ-সংস্কার-বেদনা-সংজ্ঞাদিকে অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম লক্ষণের দ্বারা বিচার করেন। যোগী তাহা ত্যাগ না করিয়া প্রথম অনুলোম চিত্তদ্বারা পরতীরে উল্লঙ্ঘন তুল্য ঝুঁকিয়া পড়েন; দ্বিতীয় অনুলোম চিত্তদ্বারা পরতীর প্রাপ্ত তুল্য নির্ব্বাণমুখী হইয়া পড়েন; তৃতীয় অনুলোম চিত্তদ্বারা নির্বাণের আসন্ন হন; সেই চিত্তের নিরোধ দ্বারা পরতীর প্রাপ্ত তুল্য সংস্কারবিগত নির্ব্বাণে পতিত হন।

যেমন প্রদীপ একই সঙ্গে চারিটি কার্য্য করে; বর্ত্তিকা দগ্ধ করে, অন্ধকার তিরোহিত করে, আলোকে দীপ্ত করে ও তৈলকে নিঃশেষ করে। তেমন মার্গজ্ঞান একই সঙ্গে চারিটি সত্যকে উপলব্ধি করে। পরিজ্ঞাদ্বারা দুঃখ-সত্যকে, পরিত্যাগ দ্বারা সমুদয় সত্যকে, ভাবনাদ্বারা মার্গসত্যকে ও সাক্ষাৎ ক্রিয়াদ্বারা নিরোধ সত্যকে উপলব্ধি করে। সেরূপ যোগী নিরোধকে অবলম্বন করিয়া চারিটি সত্য-দর্শনও লাভ করিয়া থাকেন।

যেই 'রূপ' দর্শনের কারণে সুখ-সৌমনস্যভাব উৎপন্ন হয়, ইহাই রূপের

আস্বাদ। অথচ উহার ত্যাগ কারণে সমুদয় সত্যের উপলব্ধি। যেই 'রূপ' অনিত্য, দুঃখময়, বিপরীতধর্ম্মী তাহা সেই 'রূপের' দোষ বা আদীনব, উহার পরিজ্ঞাত কারণেই দুঃখসত্যের উপলব্ধি। 'রূপের' প্রতি যে ছন্দরাগ বা অত্যুগ্র লালসা বর্জ্জন, হইা 'রূপের' নিঃসরণ, ইহাতে নিরোধ সত্যের উপলব্ধি হয়। এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে সম্যকভাবে প্রত্যেক দৃষ্টি, সঙ্কল্প, বাক্য, কর্ম্মান্ত, আজীব, ব্যায়াম, স্মৃতি ও সমাধি ভাবনা উপলব্ধি হইলেই মার্গসত্যে জ্ঞান লাভ হয়। তদ্রূপ বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানকে বিচার পূর্ব্বক বুঝিতে হইবে।

"ন কেবলঞ্চেস মগ্গো লোভক্খন্ধাদীনং নিব্বিজ্ঝনমেব করোতি, অপিচ অনমতগ্গসংসারবট্টদুক্খসমুদ্দং সোসেতি। সব্ব অপাযদ্বারানি পিদহতি। সত্তন্নং অরিযধনানং সম্মুখীভাবং করোতি, অট্ঠঙ্গিকং মিচ্ছামগ্গং পজহতি, সব্ববেরভযানি বূপসমেতি, সম্মাসম্বুদ্ধস্স ওরসপুত্তভাবং উপনেতি, অঞ্ঞেসঞ্চ অনেকসতানং আনিসংসানং পটিলাভায সংবত্ততী'তি এবং অনেকানিসংসদাযকেন সোতাপত্তিমগ্গেন সম্পযুত্তং ঞাণং সোতাপত্তি মগ্গে ঞাণন্তি।"

এই মার্গসত্য যে কেবল লোভ প্রভৃতি নির্ব্বাপিত করে এমন নহে। অপিচ অনাদি-অনন্ত সংসারাবর্ত্তরূপ দুঃখময় সমুদ্রকে শোষণ করে। সমস্ত অপায়দ্বার বন্ধ করে। সপ্তবিধ আর্য্যধনের সম্মুখীন করে। অষ্টাঙ্গিক মিথ্যামার্গকে ত্যাগ করে। সমস্ত বৈর-ভয় উপশান্ত করে। সম্যক সম্বুদ্ধের ধর্ম্মৌরসজাত পুত্রভাবে উপনীত করে। অন্যান্য বহুবিধ ফল লাভার্থ নিয়োজিত করে। এইরূপ বহুফলদায়ক স্রোতাপত্তি মার্গদ্বারা সম্প্রযুক্ত জ্ঞানকে স্রোতাপত্তি মার্গজ্ঞানে অভিহিত করে।

"সোতাপত্তিমগ্গকক্খণে দস্সনট্ঠেন—পে—তপ্পযোগপটিপস্সদ্ধত্তা উপ্পজ্জতি সম্মাসমাধি মগ্গস্সেতং ফলং।"

স্রোতাপত্তি মার্গক্ষণে প্রত্যক্ষ দর্শন প্রভাবে মিথ্যাদৃষ্টির বিলয় হয়, সম্যকদৃষ্টি ঊর্দ্ধগামী হয়। তদনুবর্ত্তক ক্লেশ ও স্কন্ধ হইতেও উত্থিত হয়। মিথ্যাদৃষ্টি উপশান্ত হওয়ায় সম্যকদৃষ্টির প্রাদুর্ভাব হয়। তখনই মার্গলাভের পর ফলোদ্গম হয়। এ ভাবে সুবিশুদ্ধ অষ্ট মার্গগুণে বিক্ষিপ্ত চিত্তের উপশম হেতু, বাহ্যিক সমস্ত নিমিত্তের অবসান হয়। তৎপর চিত্ত একাগ্র হইয়া সম্যক সমাধিতে অবস্থিত হয়। ইহাতেই মার্গোৎপত্তির পর ফল লাভের সম্ভাবনা হয়।

"ফলপরিযোসানে পনস্স চিত্তং ভবঙ্গং ওতরতি—পে—সোতাপন্নস্স অরিযসাবকস্স পঞ্চপচ্চবেক্খণানি হোন্তি।"

ফললাভ পর্য্যাবসানে যোগীর চিত্ত ভবাঙ্গে অবতরণ করে। তৎপর ভবাঙ্গ উচ্ছিন্ন হইয়া মার্গ প্রত্যবেক্ষণার্থ মনোদ্বারাবর্ত্তন চিত্ত উৎপন্ন হয়। উহা নিরুদ্ধ হইলে পাটিপাটিক্রমে সপ্তমার্গ প্রত্যবেক্ষণ স্বরূপ জবন চিত্ত উৎপন্ন হয়। পুন উহা ভবাঙ্গে অবতরণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ফলাদি প্রত্যবেক্ষণের জন্য আবর্ত্তনাদি উৎপন্ন হয়। উহাদের উৎপত্তিতেই এই মার্গকে প্রত্যবেক্ষণ করে। প্রহীন বা বিদূরিত ক্লেশ সমূহ প্রত্যবেক্ষণ করে। অবশিষ্ট বিদূরিতব্য ক্লেশ যে ধ্বংস হইবে, তাহাও প্রত্যবেক্ষণ করে। ইহার পর নির্বাণকে প্রত্যবেক্ষণ করে। তখন যোগী বুঝিতে পারেন, নিশ্চয় তাঁহার মার্গফল লাভ হইয়াছে। স্রোতাপত্তি মার্গফল লাভের পর অবশিষ্ট যাহা ক্লেশ তাঁহার আছে, তাহা তাঁহার প্রত্যক্ষ হইতেছে। সেইগুলি যথাক্রমে সকৃদাগামী-অনাগামী ও অর্হৎ মার্গফলের পর নিঃশেষিত হইবে। তৎপর যোগী ভবিষ্যতের দিকে প্রত্যবেক্ষণ করিতে থাকেন। স্রোতাপন্ন আর্য্য-শ্রাবকের এ ভাবেই পঞ্চ প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। পঞ্চ প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞান এই মার্গলাভ, ফল উপভোগ, নির্বাণে উপলব্ধি, বিদূরিত ক্লেশ প্রত্যবেক্ষণ ও বিদূরিতব্য ক্লেশ প্রত্যবেক্ষণ।

প্রজ্ঞাপনা

অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, ৪০টি শমথ ভাবনা ও সপ্ত বিশুদ্ধির অন্তরালে দশবিধ বিদর্শন জ্ঞান উৎপাদন করিয়া সর্ব্বদুঃখ ও দুঃখের কারণকে সমূলে বিধ্বংস করিয়া কি উপায়ে নির্বাণে উপনীত হওয়া যায়। বুদ্ধ-প্রবর্ত্তিত সদ্ধর্ম্মে যাঁহাদের অচলা শ্রদ্ধা ও অটল বিশ্বাস আছে, তাঁহারা উর্দ্ধ সংখ্যা সাত বৎসর ও নিম্ন সংখ্যা সাত দিনের মধ্যে কোন পন্থাবলম্বনে মার্গ ও ফল লাভের অধিকারী হইবেন 'মহাসতিপট্ঠান সুত্তে' ইহার বিবৃতি দিয়াছেন।

(সতিপট্ঠান ভাবনা দ্রষ্টব্য)

"যদি কোন যোগী সপ্ত বর্ষ ভাবনা করেন, সত্য সত্যই তাঁহার অর্হত্ত্ব বা অনাগামী ফলের মধ্যে যে কোন একটা ফল লাভ ইহজন্মেই নিশ্চিত। সপ্ত বর্ষ কি কথা! যদি কাহারো পারমীবল থাকে ছয়বর্ষ, পঞ্চবর্ষ, চারিবর্ষ,

ত্রিবর্ষ, একবর্ষ মধ্যেও তাঁহার ফল লাভ নিশ্চিত। এক বর্ষ কি কথা! সাত মাস, ছয় মাস, পাঁচ মাস, যদি ততোধিক পারমীবল থাকে, চারি মাস, তিন মাস, দুই মাস, এক মাস ও অর্দ্ধ মাস ভাবনা করেন, তাঁহার অর্হত্ব কিম্বা অনাগামী ফল লাভ ইহজন্মেই নিশ্চিত। অর্দ্ধ মাস কি কথা! তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞালোক সম্পন্ন যোগী এমন কি এক সপ্তাহ যদি ভাবনা করেন, তাঁহার দুই ফলের অন্যতম ফল লাভ ইহজন্মেই নিশ্চিত।"

দেবপুত্র বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন—যদি কোন যোগী আজীবন সাধনা করিয়া মার্গফল লাভের অধিকারী না হন, তাঁহার কি গতি হইবে?

বুদ্ধ—মৃত্যুকালে মার্গফল লাভ করিবে।

দেবপুত্র—যদি মৃত্যুকালে মার্গফল লাভ না করেন?

বুদ্ধ—মৃত্যুর পর দেবপুত্র হইয়া মার্গফল লাভ করিবে।

দেবপুত্র—যদি দেবপুত্র হইয়া মার্গফল লাভ না করেন?

বুদ্ধ—ভবিষ্যতে পচ্চেকবুদ্ধ হইবে।

দেবপুত্র—যদি পচ্চেকবোধি জ্ঞান লাভ না করেন?

বুদ্ধ—তাহা হইলে যে কোন বুদ্ধ বা শ্রাবকের মুখে একটি গাথা বা ভাবনা সম্বন্ধীয় ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ মাত্রেই নিশ্চয় মার্গফল লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। (সল্কপঞ্ঞ্হসুত্তট্ঠকথা)

বুদ্ধ দেব-মনুষ্য সকলেরই দুঃখ-মুক্তি কামনা করিয়া নির্বাণ যাত্রার পথ খুলিয়া দিয়াছেন। নির্বাণধর্ম্ম কোন জাতির জন্য সীমাবদ্ধ নহে। যে কোন হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ মাত্রেরই দুঃখে ভীত হওয়া স্বাভাবিক। দুঃখ-ভোগী সকলের জন্য এই সদ্ধর্ম্মের দ্বার উন্মুক্ত।

এই সার্ব্বজনীন মানব-ধর্ম্ম কোন জাতি বা ব্যক্তি বিশেষের জন্য সংরক্ষিত নহে। দুঃখ-দাহ্য জনগণের পরিত্রাণার্থ বুদ্ধ কর্ত্তৃক এই মুক্তি পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে। যে কেহ দুঃখ-মুক্তি কামনা করিয়া নির্বাণ সুধাপানে অজর ও অমর হইতে চাহিলে, তাঁহাকে একমাত্র এই পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। মুক্তির আর দ্বিতীয় পথ নাই। কারণ—

"তণ্হায বিপ্পহানেন নিব্বানমি'তি বুচ্চতি।"

অর্থাৎ তৃষ্ণার পরিত্যাগই নির্বাণ নামে কথিত হয়। যাঁহারা অষ্টোত্তর[৪] শত তৃষ্ণার অধীন, তাঁহাদের মুক্তিলাভ কি সম্ভব? সেই কারণেই সাধনা অমর জীবন দান করে। অমৃত স্থান অমৃত সন্ধানী লাভ করিতে পারেন।

যে পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া বিষয়-বাসনার আবর্ত্তে নিমগ্ন হইবে, সে কি করিয়া দুঃখ-হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে।

বিষয় সুলভ বস্তু তৃষ্ণাপণ্যে ক্রয় করা যত সহজ, ততোধিক কঠিন তৃষ্ণা বর্জ্জন করিয়া চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন। সে কারণে মুক্ত জীবন বদ্ধ জীবন হইতে অতিশয় উচ্চে।

বিষয়-বিষ জর্জ্জরিত মানব নিজকে বলি দিয়া অপরের সাময়িক হিত সাধনে আমরণ আবদ্ধ থাকিলেও বিচারে নিজের ভুল হয়—পর্ব্বত প্রমাণ। কাজেই পর্ব্বত তুল্য নিরেট বাধাকে অতিক্রম করিয়া মুক্তি-পথের সন্ধানে অগ্রসর হওয়া সম্ভব কি না তাহা সকলেরই বিবেচ্য।

বিভিন্ন ধর্ম্মে যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে ও লৌকিক সাধন-ভজনে মুক্তিলাভের নির্দ্দেশ থাকিলেও অষ্ট আর্য্যমার্গ অবলম্বনে বিদর্শন সাধনার দিক দিয়া সমস্ত তৃষ্ণাকে ক্ষয় পূর্ব্বক নির্বাণ-মুক্তির সন্ধান অন্য শাস্ত্রে নাই।

সেই কারণে বুদ্ধ স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—

"এসেব মগ্‌গো নত্থঞ্ঞো দস্‌সনস্‌স বিসুদ্ধিযা।"

এই অষ্ট মার্গের দিক দিয়া বিশুদ্ধি বা নির্বাণ দর্শন সম্ভব, ইহার বাহিরে বিমুক্তি-লাভের অন্য কোন পথ নাই।

কোন কোন ধর্ম্মগ্রন্থে স্বর্গ লাভেই মুক্তির উপায় বর্ণিত হইয়াছে। কোন কোন ধর্ম্মগ্রন্থে ব্রহ্ম প্রাপ্তিতে মুক্তির উপায় বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু বুদ্ধ ছয় স্বর্গ, পনরটি ব্রহ্মলোক, মনুষ্যলোক ও তির্য্যক-প্রেত-অসুর-নিরয় লোক হইতে অকুশল ফলের হেতু থাকিলে পতন অনিবার্য্য বলিয়া ও তাঁহারা সকলে পুনর্জন্মাধীন বলিয়া ত্রিপিটক শাস্ত্রে এইগুলির বহুপ্রকার বিবৃতি দিয়াছেন। কেবল পাঁচটি শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোক হইতে পতন হয় না বলিয়াও বিবৃতি দিয়াছেন। যাঁহারা কাম-দ্বেষ-প্রতিঘ এই তিনটি রিপুর সমুচ্ছেদ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা অনাগামী বা সংসারাবর্ত্তে অপ্রত্যাবর্ত্তনকারী সাধক নামে পরিচিত। তাঁহাদের জন্যই পঞ্চ শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোক নির্দ্দিষ্ট। তথায় তাঁহারা অর্হত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিয়া যাবতীয় তৃষ্ণার সমুলোৎপাদন পূর্ব্বক নির্বাণ লাভ করিয়া থাকেন।

এই সর্ব্বদুঃখহর নির্বাণ কোন জাতি বা ধর্ম্মের উপর নির্ভর করে না। পাপপুণ্য উভয়ের হেতু বিধ্বংস করিয়াই নির্বাণ যাত্রা করিতে হয়। এখানে

বৌদ্ধ-অবৌদ্ধের বিচার নাই। যাঁহার তৃষ্ণার সম্যক নিবৃত্তি হইয়াছে, নির্বাণ তাঁহার আসন্নে অবস্থিত। এই নিবৃত্তিমূলক ধর্ম্মের অনুসরণ ব্যতীত তৃষ্ণা ক্ষয় করা সম্ভব নহে।

এখন প্রত্যেকে বিচার করুন, কাহার তৃষ্ণা কত পরিমাণ ক্ষয় হইয়াছে, লোভ-দ্বেষ-মোহের বন্ধন কাহার কত পরিমাণ সমুচ্ছিন্ন হইয়াছে। যদি এমন কাহারো হৃদয়ে আশা জাগ্রত হয় যে—"আমার সর্ব্বাসক্তির মূল উৎপাটিত হইয়াছে" তাহা হইলে তাঁহার নির্বাণ লাভ সুনিশ্চিত।

কিন্তু ধর্ম্মের দোহাই দিয়া, কূটতর্কে বাগ্মিতার পরিচয় দিয়া ও প্রবঞ্চনা সুলভ মনোভাব পোষণ করিয়া মুক্তির সন্ধান মিলে না। পরিচয় তৃষ্ণা ক্ষয়ে।—

"তৃষ্ণায় বিপ্রহানেন নির্বাণমি'তি উচ্যতে।"

পাদটীকা

* ব্রহ্মদেশের (বর্তমান নাম মায়ানমার) রাজধানী রেঙ্গুনে (যাঙ্গোন) অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ বিশ্ব বৌদ্ধ সঙ্গীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন সাধক-প্রবর কর্মবীর অগ্গমহাপণ্ডিত শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির। সারাজীবন ধ্যানচর্চা করিয়া সফলকাম শ্রীমৎ মহাস্থবির বুদ্ধের যোগনীতির সম্যক্ পরিচয় দিয়াছেন যে নীতি অনুসরণ করিলে মুক্তিকামী নির্বাণধর্মের সাক্ষাৎকার করিতে পারেন। তাঁহার মত আলোচনা অন্য কাহারও পক্ষে করা সম্ভব নহে, তাই জিজ্ঞাসু এবং মুক্তিপিপাসু ব্যক্তিদের কল্যাণার্থে এখানে আমরা তৎকর্তৃক বিশদীকৃত বুদ্ধের যোগনীতি উদ্ধৃত করিলাম। এত প্রাঞ্জলভাষায় বর্ণনা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। পাঠক এবং যোগী উভয়েই ইহার দ্বারা উপকৃত হইবেন—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই —গ্রন্থকার

* ইহ-পরলোকে সত্ত্বদিগকে উপক্লিষ্ট, উপতপ্ত ও বিধাবিত করে বলিয়া কিলেস বা কলুষ। (পটিসম্ভিদা-অট্ঠকথা)

১। কায়ানুদর্শন, বেদনানুদর্শন ও ধর্মানুদর্শন।

২। উৎপন্ন পাপ ত্যাগ-চেষ্টা, অনুৎপন্ন পাপ হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা, অনুৎপন্ন কুশল উৎপাদনের চেষ্টা ও উৎপন্ন কুশল বৃদ্ধি করার চেষ্টা।

৩। কামরাগ, ভবরাগ, প্রতিঘ, মান, দৃষ্টি, বিচিকিৎসা ও অবিদ্যা।

৪। কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা ও বিভবতৃষ্ণা এই তিনটি বাহ্য ও অধ্যাত্মভেদে ৬ প্রকার। চক্ষু-শ্রোত্র-ঘ্রাণ-জিহ্বা-কায়-মন এই ৬টি আয়তন দিয়া গুণন করিলে ৩৬টি। বর্তমান তৃষ্ণা, অতীত তৃষ্ণা ও ভবিষ্যৎ তৃষ্ণা তৃষ্ণা দ্বারা গুণন করিলে ৩৬ × ৩ = ১০৮টি তৃষ্ণা।

———

গৌতম বুদ্ধের পরবর্তীকালীন বৌদ্ধ দর্শন

গৌতম বুদ্ধের পরবর্তীকালীন বৌদ্ধ দর্শন*

বৌদ্ধ দর্শন ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। কারণ বৌদ্ধ দর্শনের ইতিহাস দুই এক বছরের ইতিহাস নহে। প্রায় দুই হাজার বৎসরের ইতিহাস। এই সুদীর্ঘকালে বৌদ্ধ দর্শনের যে অসাধারণ ক্রমবিকাশ হইয়াছে তাহার যথার্থ বিবরণ স্বল্প পরিসরে দেওয়া সম্ভব নহে। তথাপি ভূমিকাস্বরূপ সংক্ষেপে ইহার কিছু পরিচয় দেওয়াই এখানে উদ্দেশ্য।

খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে গোতম বুদ্ধের আবির্ভাব। অতএব ঐ সময় হইতে আরম্ভ করিয়া খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বৌদ্ধ দর্শনের ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছে। এখন প্রশ্ন হইতেছে খৃষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বুদ্ধ যে দর্শন প্রচার করিয়াছেন তাহা কিসের উপর ভিত্তি করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ইহাতে বুদ্ধের নিজস্ব অবদান কতটুকু। উত্তরে বলা যায় যে প্রাক্ বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারার যে ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছে তাহারই এক সফল পরিণতিরূপে বুদ্ধের দর্শন আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। ভারতীয় দর্শনের মধ্যে যে অপূর্ণতা ছিল তাহা বুদ্ধ অনেকাংশে সম্পূর্ণ করিয়াছেন। অনেকাংশে বলার উদ্দেশ্য এই যে যদি বুদ্ধের দর্শনেই ভারতীয় দর্শনের পরিপূর্ণতা লাভ হইয়াছে বলা যায় তাহা হইলে বুদ্ধোত্তর যুগের ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারা ও মতবাদ নিরর্থক ও তুচ্ছ বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু তাহা হয় নাই। বুদ্ধোত্তর যুগের ভারতীয় দর্শন তথা বৌদ্ধ দর্শনের গুরুত্ব কোন অংশেই কম নহে।

সমাজ, ধর্ম ও দর্শন একে অন্যের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সমাজের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অন্য দুইটিরও প্রগতি হওয়াই স্বাভাবিক। আবার সমাজের নৈতিক অবনতির সঙ্গে সঙ্গে এইগুলিরও অবনতি হওয়া অস্বাভাবিক নহে এবং যুগে যুগে যে ইহা হইয়াছে ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। আবার ইহাও দেখা গিয়াছে যে যুগে যুগে ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা ধর্ম ও শাসনের নামে নিদারুণ শোষণ ও পীড়ন চালাইয়াছেন সমাজের উপর। স্বার্থের জন্য মানুষ মানুষের সঙ্গে কত যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইয়াছে। সমাজের কোন শ্রেণীর লোকই এই স্বার্থ হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই—এমন কি তথা-

কথিত কুলীন ও উচ্চবর্ণের বলিয়া যাঁহারা নিজেদের দাবি করিয়া সমাজের উপর প্রভুত্ব করিয়াছেন তাঁহারাও এই স্বার্থ হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। তাহা ছাড়া প্রকৃতির শাশ্বত নিয়মকেও আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। উত্থান, বৃদ্ধি, ক্ষয় ও ধ্বংস —প্রকৃতির এই নীতিকে আমরা অস্বীকার করিতে পারি কি? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাহা কিছু সবই এই নীতির বশে বশীভূত। কাজেই সমাজ, মানুষ, ধর্ম ও দর্শন কোনটাই ইহার অমোঘ প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারে না, কখনও পারে নাই। অতএব যাহাকে আমরা 'প্রগতি' আখ্যা দিয়া থাকি তাহাও প্রকৃতির এই নিয়মে নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। 'প্রগতি' যদি শাশ্বত হইত তাহা হইলে 'প্রগতি' শব্দটার উৎপত্তিই নিরর্থক হইত। প্রগতি কাহাকে বলে? অতীত ও বর্তমানকে অন্ধ বিশ্বাসে গ্রহণ না করিয়া গ্রহণযোগ্যকে গ্রহণ, বর্জনীয়কে বর্জন করিয়া নূতনভাবে কিছু প্রবর্ত্তন করার নামই প্রগতি (আজকাল অবশ্য কেহ কেহ অন্ধ অনুকরণকেই প্রগতিরূপে গ্রহণ করতঃ তাহাকেই অবলম্বন করিয়া চলার চেষ্টা করিয়া থাকেন—ইহা কিন্তু প্রগতি নহে)। এই প্রগতি কিন্তু মানুষের পক্ষে, সমাজের পক্ষে কল্যাণকর। তবে অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে রাজদণ্ডের প্রভাবে এবং স্বার্থ ও লোভের বশে বশীভূত হইয়া মানুষ প্রগতির নামে এমন অনেক কিছু সমাজে চালাইয়াছেন যাহা ইহার পক্ষে ক্ষতিকর হইয়াছে। সমসাময়িক দর্শনের উপরও ইহার প্রভাব পড়িয়াছে। তাই বুদ্ধোত্তর যুগে বিশেষতঃ অশোকোত্তর যুগে কোন কোন ক্ষেত্রে ভারতীয় দর্শনের প্রগতি হইয়াছে বটে, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার অবনতিও ঘটিয়াছে। যেখানে হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থে ব্যাঘাতজনিত উষ্মা ও আধিপত্য বিস্তারের তৃষ্ণা মানুষকে বশীভূত করিয়াছে সেখানে প্রগতির নামে দর্শনের অধোগতিই হইয়াছে। একদিকে কিন্তু লাভও হইয়াছে। দর্শনের অধোগতি হইলেও সমসাময়িক সাহিত্যের প্রগতি ঘটিয়াছে। কারণ একে অন্যকে পরাভূত ও পর্যুদস্ত করিবার জন্য যুগে যুগে পণ্ডিতমণ্ডলী গ্রন্থের পর গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহাদের অজস্র টীকা-টিপ্পনী ও ভাষ্য রচিত হইয়াছে। টীকার টীকা তস্য টীকা, ভাষ্যের ভাষ্য তস্য ভাষ্য বিরচিত হইয়াছে। ইহার ফলে তৎকালীন ভারতীয় সাহিত্য বিশেষতঃ সংস্কৃত সাহিত্যের অভাবনীয় উন্নতি হইয়াছে। অলমতিবিস্তরেণ। এখন আমরা আমাদের মূল বক্তব্যে ফিরিয়া আসি।

খৃষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর কোন এক বৈশাখী পূর্ণিমা দিবসের পুণ্য উষালগ্নে সিদ্ধার্থ গয়ার বোধিবৃক্ষমূলে দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া সম্যক্‌সম্বুদ্ধ হইলেন। তিনি এই সত্য উপলব্ধি করিলেন যে নিখিল বিশ্বের সমস্ত কিছুই হেতু-প্রত্যয়জাত। প্রত্যেক কার্য্যেরই কারণ আছে। কারণের নিরোধ হইলে কার্য্যও নিরুদ্ধ হইবে। এই জাগতিক নিয়মের নাম প্রতীত্যসমুৎপাদনীতি। তিনি নিজের মধ্যে বার বার তাঁহার উপলব্ধ সত্যকে যাচাই করিয়া দেখিলেন অনুলোমপ্রতিলোমভাবে। একই উত্তর তিনি পাইলেন—ইমস্মিং সতি ইদং হোতি। ইমস্‌স উপ্‌পাদা ইদং উপ্পজ্জতি। ইমস্মিং অসতি ইদং ন হোতি। ইমস্‌স নিরোধা ইদং নিরুজ্‌ঝতি। জগতে দুঃখ আছে। ইহা প্রত্যক্ষগোচর। জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, অপ্রিয়সংযোগ, প্রিয়বিচ্ছেদ, ঈপ্সিত বস্তুর অপ্রাপ্তি সবই দুঃই এবং সবই প্রত্যক্ষগোচর। এই দুঃখ অকারণসম্ভূত নহে। ইহার কারণ হইতেছে তৃষ্ণা (কাম-তৃষ্ণা, ভব-তৃষ্ণা, বিভবতৃষ্ণা)। যাহা কিছু উৎপন্ন হয় তাহার নিরোধও হইবে—কারণ সংস্কৃত (constituted) ধর্মসমূহ বিপরিণামধর্মী, ক্ষণভঙ্গুর এবং অনিত্য। অতএব জাগতিক দুঃখ সমূহেরও নিরোধ সম্ভব। বার বার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া, জরাগ্রস্ত হইয়া, ব্যাধির কবলে পতিত হইয়া এবং পরে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া মানুষ অশেষ দুঃখ বরণ করিয়া থাকে। কিন্তু এই দুঃখও শাশ্বত নহে। ইহারও নিবৃত্তি আছে। সেই নিবৃত্তির যে উপায় তাহাও বুদ্ধ নির্দেশ করিয়াছেন। সেই জন্য বুদ্ধের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

যে ধর্মা হেতুপ্রভবা হেতুং তেষাং তথাগতো হ্যবদৎ।
তেষাং চ যো নিরোধ এবংবাদী মহাশ্রমণঃ ॥

—যে সকল ধর্ম (বস্তু, ঘটনাদি) হেতুপ্রভব অর্থাৎ কারণসঞ্জাত তাহাদের হেতু বা কারণ কি তথাগত তাহা বলিয়াছেন এবং ইহাদের যে নিরোধ বা নিবৃত্তি আছে তাহাও তিনি নির্দেশ করিয়াছেন—মহাশ্রমণ (গৌতম) ঈদৃশবাদী।

দুঃখ নিবৃত্তির উপায় সম্বন্ধে বুদ্ধ অষ্টাঙ্গিক মার্গ নির্দেশ করিয়াছেন—সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্‌ক বাক্য, সম্যক্ কর্ম, সম্যক্ জীবিকা, সম্যক্ প্রচেষ্টা, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি। এই অষ্টাঙ্গিক মার্গকে তিনি মধ্যম পন্থা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কারণ তিনি নিজের জীবনে প্রায় ছয় বৎসর কঠোর হইতে কঠোরতম তপশ্চর্য্যা করিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন যে

ইহার দ্বারা মানুষ মুক্ত হইতে পারে না, শুধু শরীরই ধ্বংস হয় মাত্র। আবার শুধুমাত্র কামসুখ ভোগ করিয়া সাংসারিক ভোগ-বিলাসে মত্ত হইয়া থাকিলে মুক্তির ত প্রশ্নই উঠে না। অতএব এই দুই চরম পন্থা বর্জন করিয়া তিনি স্বয়ং মধ্যম পন্থা অবলম্বন করিয়া বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছেন। ইহা তাঁহার প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বিষয়, তাই তিনি দুঃখমুক্তিকামী সকলকে ঐ পন্থাই অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন।

মানুষ ভালমন্দ কাজ করে তিনটি দ্বারের মাধ্যমে—কায়দ্বার, বাক্যদ্বার এবং মনোদ্বার। বুদ্ধের মতে মুক্তিকামী ব্যক্তিকে প্রথমে কায়দ্বার ও বাক্য-দ্বারকে সংযত করিতে হইবে। কায়দ্বারকে কিভাবে সংযত করা যায় ? সজ্ঞানে প্রাণীহত্যাদি হিংসা পরিত্যাগ করিতে হইবে—নিজেও করিবে না, অন্যকে দিয়াও করাইবে না বা অন্যকে ঐ পাপকর্ম করিবার জন্য উৎসাহিত করিবে না। সজ্ঞানে অদত্ত দ্রব্য গ্রহণ করিবে না—নিজেও করিবে না, অন্যকে দিয়াও করাইবে না বা অন্যকে ঐ পাপকর্ম করিবার জন্য উৎসাহিত করিবে না। সজ্ঞানে অবৈধ কামসুখ ভোগ করিবে না, অন্যকে দিয়াও করাইবে না বা অন্যকে ঐ পাপ বিষয়ে উৎসাহিত করিবে না। ইহাই সম্যক্ কর্ম। সজ্ঞানে মিথ্যা, পিশুন (ভেদ), কটু ও বৃথা বাক্য বলা হইতে বিরত থাকিতে হইবে। ইহাই সম্যক্ বাক্য। মিথ্যা জীবিকা পরিত্যাগ করিয়া সৎ জীবিকার দ্বারা জীবন নির্বাহ করিতে হইবে। অস্ত্র, প্রাণী, মাদক দ্রব্য, বিষ ইত্যাদির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ বন্ধ করিতে হইবে। ইহাই সম্যক্ জীবিকা। এই যে ত্রিবিধ সম্যক্ মার্গ ইহাদিগকে এক কথায় 'শীল' বলা হইয়াছে। মুক্তিকামীকে প্রথমে শীলে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। অবশ্য বুদ্ধ এই কথা বলেন নাই যে শীলবান হইতে হইলে সকলকে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে হইবে। তাঁহার মতে গৃহী থাকিয়াও জ্ঞানবান ব্যক্তি শীলবান হইতে পারেন। এইভাবে শীলবান হইয়া অর্থাৎ কায়দ্বার ও বাক্যদ্বারকে সংযত করিয়া মুক্তিকামীকে মনোদ্বার সংযত করিতে হইবে। অবশ্য মনোদ্বারকে সংযম করা অত্যন্ত কঠিন। কারণ মন অত্যন্ত চঞ্চল, চপল, দুরক্ষ্য এবং দুর্নিবার। এইজন্য বুদ্ধ বলিয়াছেন—মনোপুব্বঙ্গমা ধম্মা। মনই সমস্ত কিছুর পূর্বগামী। মনকে সংযত করিতে পারিলে ক্রমশঃ সবই সম্ভব হইবে। মনে উৎপন্ন পাপ-চিন্তাদি পরিত্যাগ করিতে হইবে; যে পাপ-চিন্তাদি উৎপন্ন হয় নাই সেইগুলি যাহাতে আর উৎপন্ন না হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে;

অনুৎপন্ন সৎ-চিন্তাদি মনে উৎপাদন করিতে হইবে ; এবং উৎপন্ন সৎ-চিন্তাদির স্থিতি ও বৃদ্ধির জন্য যত্নবান হইতে হইবে। ইহাই **সম্যক্ প্রচেষ্টা**। মনে কায়ানুস্মৃতি, বেদনানুস্মৃতি, চিত্তানুস্মৃতি এবং ধর্মানুস্মৃতির অনুশীলন করিতে হইবে। কায়ানুস্মৃতি কি ? মনে করিতে হইবে যে এই কায় হইতেছে কেশ-লোমাদি বত্রিশ প্রকার অশুচিদ্রব্যে পরিপূর্ণ—শুচিদ্রব্য এখানে কিছুই নাই। অতএব কিসের জন্য 'আমি' 'আমার' এই অহংকার। ইহাই **কায়ানুস্মৃতি**। মনে সুখ, দুঃখ, এবং অদুঃখ-অসুখাদি ত্রিবিধ বেদনা বা অনুভূতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেইগুলি যথাযথভাবে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। ইহাই **বেদনানুস্মৃতি**। চিত্তানুস্মৃতি কি ? মনোদ্বার দিয়া নানাবিধ চিত্তের ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। কুশল, অকুশল, বিপাক, ক্রিয়া এবং ধ্যানভেদে এইরূপ চিত্তের সংখ্যা একশত কুড়ি। কোনটা কুশল চিত্ত, কোনটা অকুশল চিত্ত ইহা বিচার করিয়া অকুশল পরিত্যাগ করিয়া কুশল চিত্তের অনুশীলন করা ইত্যাদি হইতেছে **চিত্তানুস্মৃতি**। ধর্মানুস্মৃতি কি ? চিত্তে উৎপন্ন বাহান্ন প্রকার কুশলাকুশল চৈত্ত বা চৈতসিকসমূহকে ধর্ম বলা হয়। এই চৈতসিকগুলির কুশলাকুশল, সাবদ্যানবদ্য, হীনপ্রণীত, কৃষ্ণ-শুক্লাদি গুণাগুণ বিচার করিয়া গ্রহণীয়গুলিকে গ্রহণ এবং বর্জনীয়গুলিকে বর্জন করাই **ধর্মানুস্মৃতি**। স্মৃতিকে এইভাবে কার্যে পরিণত করার নামই **সম্যক্ স্মৃতি**। মনোদ্বার দিয়া সম্পন্ন হয় আর একটি মানসিক ক্রিয়া—তাহা হইতেছে **সম্যক্ সমাধি**। সমাধি কি ? চিত্তের একাগ্রতাই সমাধি। চিত্তের একাগ্রতা সুকর্মের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, দুষ্কর্মের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সেই জন্য বুদ্ধ সম্যক্ সমাধির কথা বলিয়াছেন ; অর্থাৎ কুশলাদি বিষয়ে চিত্তকে একাগ্র করিতে হইবে। অবশ্য ইহার জন্য যৌগিক ধ্যানাদির প্রয়োজন আছে। এই জন্য সমাধির অপর নাম ধ্যান। সম্যক্ সমাধির দ্বারা মুক্তিকামী ব্যক্তি নিজের দুর্নিবার চিত্তকে দান্ত করিয়া ইহাকে ভাল কাজে নিয়োগ করিতে পারেন। অতএব মোক্ষলাভের পক্ষে সম্যক্ সমাধি এক অপরিহার্য অঙ্গ।—এই সম্যক্ প্রচেষ্টা, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধিকে এক কথায় বৌদ্ধ দর্শনে **চিত্ত** বা সমাধি বলা হইয়াছে কারণ ইহারা সকলেই চিত্তসম্বন্ধীয়। ইহা ছাড়া আরও দুইটি মার্গাঙ্গের অনুশীলন প্রয়োজন—ইহারা হইল সম্যক্ দৃষ্টি ও সম্যক্ সংকল্প। কায়-বাক্য-মনোদ্বারসমূহের মধ্য দিয়া সম্পাদ্য এবং করণীয়, এবং মনোদ্বারে উৎপন্ন

কুশলাকুশলাদি ধর্মসমূহের যথার্থ প্রবিচয়কে **সম্যক্ দৃষ্টি** বলে। তাহা ছাড়া দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখের নিরোধ, দুঃখ নিরোধের উপায় এবং বিশ্বজগত সৃষ্টির পশ্চাতে যে কার্যকারণ-তত্ত্ব রহিয়াছে সেই বিষয়ে সম্যক্ অভিজ্ঞতাকেও সম্যক্ দৃষ্টি বলা যায়। সেই জন্যই বুদ্ধ বলিয়াছেন যে দৃষ্টি যাহার বিশুদ্ধ হইয়াছে সেই ব্যক্তি ইহা স্বয়ং উপলব্ধি করিবে যে জগতে সমস্ত কিছুই অনিত্য এবং অনাত্মক। দুঃখই সত্য, সুখ সত্য নহে, কারণ ইহা মরীচিকাসদৃশ। সম্যক্ সঙ্কল্প কি? সৎ সঙ্কল্পই সম্যক্ সঙ্কল্প। রাগ, দ্বেষ ও মোহহীন যে সঙ্কল্প, যে সঙ্কল্প মানুষকে নির্বাণমুখী করে, মোক্ষ লাভের জন্য উদ্দীপ্ত করে তাহাই **সম্যক্ সঙ্কল্প**। এই সম্যক্ দৃষ্টি ও সম্যক্ সঙ্কল্প প্রজ্ঞানের অন্তর্গত বলিয়া ইহাদিগকে সংক্ষেপে **প্রজ্ঞা** বলা হইয়াছে। এই জন্য বুদ্ধোপদিষ্ট অষ্টাঙ্গিক মার্গকে সংক্ষেপে শীল-চিত্ত-প্রজ্ঞা বলা হইয়াছে। এই অষ্টাঙ্গিক মার্গের অনুসরণ করিলে মানুষ দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে, এমন কি পরিশেষে নির্বাণসুখ উপভোগ করাও তাহার পক্ষে সম্ভব। চেষ্টা থাকিলে ইহজন্মেই তাহা সম্ভব—ইহা বুদ্ধের পরীক্ষিত সত্য।

উপরিউক্ত আলোচনা হইতে বুদ্ধের দর্শনকে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিশেষ ভাগে ভাগ করা যায়—

১। অনিত্যবাদ বা ক্ষণিকবাদ—বুদ্ধ বলিয়াছেন পঞ্চস্কন্ধ বিনির্মুক্ত ধর্ম নাই। মানুষের দেহ বিশ্লেষণ করিলে শুধু পাঁচটি স্কন্ধই খুঁজিয়া পাওয়া যায়[১]—রূপ (ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, বায়ু)—এই চারি মহাভূত এবং এই গুলি হইতে উৎপন্ন সব কিছু, বেদনা (সুখ-দুঃখাদি অনুভূতি), সংজ্ঞা (জন্মান্ধ ব্যক্তির হস্তী দর্শনের ন্যায় সুখ-দুঃখাদি অনুভূতির পর মানুষের মনে যে প্রাথমিক জ্ঞান উৎপন্ন হয়), সংস্কার (বেদনা-অনুভূতি প্রভৃতির দ্বারা চিত্তপটে সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ফলে যে মানসিক ক্রিয়া উৎপন্ন হয়) এবং বিজ্ঞান (সজ্ঞানতা, সচেতনতা—যাহা বর্তমান থাকিলে ষড়িন্দ্রিয়ের নিজ নিজ বিষয়োপলব্ধি হয়)। এই পঞ্চস্কন্ধকে সংক্ষেপে নাম-রূপ বলা হইয়াছে। পঞ্চস্কন্ধের মধ্যে যাহা দৃশ্যমান এবং প্রত্যক্ষগোচর অর্থাৎ রূপকেই রূপ বলা হইয়াছে। অবশিষ্ট চারি আভ্যন্তরীণ স্কন্ধকে নাম বলা হইয়াছে।

বিশ্বের যাবতীয় সংস্কৃত (constituted) বস্তুকে[২] স্কন্ধ ব্যতীত দ্বাদশ আয়তন এবং অষ্টাদশ ধাতুতেও ভাগ করা যায়। যেমন দ্বাদশ আয়তন

হইতেছে ষড়িন্দ্রিয় (চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় এবং মন) এবং ষড়িন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় (রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পষ্টব্য এবং ধর্ম)। ইহাদের মধ্যে মন বাদে পঞ্চেন্দ্রিয় এবং ধর্ম বাদে পঞ্চেন্দ্রিয়বিষয় **রূপের** অন্তর্গত। মন হইতেছে **বিজ্ঞানের** অন্তর্গত এবং ধর্মায়তন হইতেছে **বেদনা, সংজ্ঞা** ও **সংস্কারের** অন্তর্গত।

তেমনই অষ্টাদশ ধাতু হইতেছে উক্ত ষড়িন্দ্রিয়, ষড়িন্দ্রিয়ের ছয় বিষয় এবং ষড়িন্দ্রিয়ের ছয় বিজ্ঞান (চক্ষু-বিজ্ঞান, শ্রোত্র-বিজ্ঞান ইত্যাদি)। ইহাদের মধ্যে মন, ধর্ম এবং ষড়্বিজ্ঞান ব্যতীত অবশিষ্ট দশটি ধাতু **রূপের** অন্তর্গত। মন এবং ষড়্বিজ্ঞান **বিজ্ঞানের** অন্তর্গত এবং ধর্মধাতু হইতেছে **বেদনা, সংজ্ঞা** ও **সংস্কারের** অন্তর্গত। অতএব দেখা যাইতেছে যে দ্বাদশ আয়তন এবং অষ্টাদশ ধাতুকে বিশ্লেষণ করিলে সেই পঞ্চস্কন্ধই পাওয়া যায়। অতএব বুদ্ধের এই উক্তি যথার্থ যে পঞ্চক্খন্ধ-বিনিম্মুত্তো ধম্মো নাম নত্থি (পঞ্চস্কন্ধ-বিনির্মুক্ত ধর্ম নাই)।

এই পঞ্চস্কন্ধ বা নামরূপ, দ্বাদশ আয়তন এবং অষ্টাদশ ধাতু সমস্তই সংস্কৃত (constituted), প্রতীত্যসমুৎপন্ন (of dependent origination), ক্ষয়ধর্মী, ব্যয়ধর্মী এবং নিরোধধর্মী বলিয়া অনিত্য, অস্থায়ী, অশাশ্বত এবং ক্ষণভঙ্গুর। প্রতি মুহূর্তেই ইহাদের বিকার হইতেছে অর্থাৎ উৎপত্তি ও বলয় ঘটিতেছে।[৩]

২। অনাত্মবাদ বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে ভারতীয় দর্শনে বিশেষতঃ উপনিষদে আত্মবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—'এই যে আমার আত্মা তাহাই অনুভবকর্ত্তা, অনুভবের বিষয় এবং তত্র তত্র স্বীয় ভালমন্দ কর্মের বিষয়কে অনুভব করে। আমার সেই আত্মা নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্তনশীল এবং অনন্তকালব্যাপী জন্ম-জন্মান্তরে ইহা একই রূপে অবস্থিত থাকিবে।' কিন্তু পঞ্চস্কন্ধবাদী বুদ্ধ পঞ্চস্কন্ধের মধ্যে কুত্রাপি 'আত্মা' নামক কিছুই খুঁজিয়া পান নাই। রূপ আত্মা নহে, বেদনা আত্মা নহে, সংজ্ঞা আত্মা নহে, সংস্কার আত্মা নহে এবং বিজ্ঞানও আত্মা নহে। অতএব আত্মার অস্তিত্বই যেখানে নাই সেখানে আত্মা নিত্য কি অনিত্য, শাশ্বত কি অশাশ্বত তাহার প্রশ্নই অবান্তর। নির্বাণ এবং আকাশ ব্যতীত বিশ্বের যাবতীয় ধর্মই (পঞ্চস্কন্ধ সহ) সংস্কৃত, হেতু-প্রত্যয়োৎপন্ন, কার্য-কারণ-সম্বন্ধযুক্ত। ইহা প্রমাণ করিবার জন্য বুদ্ধ প্রতীত্যসমুৎপাদনীতি (Law of Dependent Origi-

nation) প্রচার করিয়াছেন।[8] এই প্রতীত্যসমুৎপাদ জগতের কার্যকারণ শৃঙ্খলার বিচ্ছিন্ন প্রবাহের নামান্তর মাত্র এবং ইহাকেই ভিত্তি করিয়া পরবর্তীকালে বিখ্যাত দার্শনিক নাগার্জুন স্বীয় 'শূন্যবাদ' প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

৩। অনীশ্বরবাদ—প্রতীত্যসমুৎপাদনীতিকে যদি মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বর বলিয়া কাহাকেও স্বীকার করা যায় না। আর ঈশ্বর যদি সৃষ্টিকর্তা হইয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি অবশ্যই 'সৎ' হইবেন। আর 'সৎ' হইলে তিনি নিজেও অনিত্য হইবেন। অতএব ঈশ্বর যদি স্বয়ং অনিত্য হইয়া থাকেন তাহা হইলে অনাদি অনন্তকাল হইতে তিনিই এত জীবের সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন, ভবিষ্যতেও অনন্তকাল ধরিয়া সৃষ্টি করিয়া যাইবেন ইহা কি করিয়া সম্ভব ? অতএব এই তর্কের মীমাংসা নাই। মীমাংসিত হইলেও সকলের নিকট ইহা গ্রহণ-যোগ্য নাও হইতে পারে। তাই বুদ্ধ বলিয়াছেন—আত্মা আছে কি নাই, ঈশ্বর আছেন কি নাই, কে জগত সৃষ্টি করিল—ইত্যাদি অনন্ত জিজ্ঞাসার জালে আবদ্ধ হইয়া জীবনের অমূল্য সময় নষ্ট করিয়া মানুষের লাভ কি ? তাহার চাইতে মুক্তিকামী ব্যক্তিদের উচিত সংযতেন্দ্রিয় হইয়া সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের প্রদর্শিত পথে চলিয়া জন্ম-জন্মান্তরে ভোগ্য অনন্ত সংসার-দুঃখ হইতে নিজেকে মুক্ত করার জন্য যত্নবান হওয়া। মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে স্বকৃত কর্মের দ্বারা। মানুষ নিজেই নিজেকে ভবদুঃখ হইতে চিরতরে মুক্ত করিতে পারে। মধ্যস্থ কোন অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন শক্তিও তাহাকে মুক্ত করিতে পারে না। তাই বুদ্ধ বলিয়াছেন—'তুম্‌হেহি কিচ্চং আতপ্পং অক্‌খাতারো তথাগতা।'—উদ্যম তোমাদিগকেই করিতে হইবে ; (সত্যদ্রষ্টা) তথাগতগণ পথপ্রদর্শকমাত্র। তাঁহাদের উপদিষ্ট ধর্মকে ভেলারূপে ব্যবহার করিয়া ভবসাগর তরণেচ্ছু ব্যক্তিকে স্বয়ং এই ভবসাগর হইতে মুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।

বুদ্ধের পরিনির্বাণের (খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দী) পরবর্তী একশত বৎসরের মধ্যে স্থবিরবাদ (পালি থেরবাদ) ও মহাসাংঘিক নামে দুই সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল। পরবর্তী একশত বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ সম্রাট অশোকের রাজত্ব-কালের প্রথম ভাগের মধ্যে (খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দী) উক্ত স্থবিরবাদ হইতে দ্বাদশ সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়, যেমন, স্থবিরবাদ, মহীশাসক, বৃজিপুত্রক (বাৎসীপুত্রীয়), ধর্মোত্তরীয়, ভদ্রযানিক, ছন্নাগারিক (ষাণ্ণাগারিক), সম্মিতীয়,

সর্বাস্তিবাদ, কাশ্যপীয়, সাংক্রান্তিক, সৌত্রান্তিক এবং ধর্মগুপ্তিক। তদ্রূপ মহাসাংঘিক হইতে ছয়টি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়, যেমন, মহাসাংঘিক, গোকুলিক, একব্যবহারিক, প্রজ্ঞপ্তিবাদ, বাহুলিক (বাহুশ্রুতিক) এবং চৈত্যবাদী। কিন্তু ইহা মনে করা অযৌক্তিক হইবে না যে সম্রাট অশোকের রাজত্বের শেষের দিকে আরও আটটি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছিল, যেমন, অন্ধ্রক, অপরশৈলীয়, পূর্বশৈলীয়, রাজগিরিক, সিদ্ধার্থক, বৈপুল্যবাদ, উত্তরাপথক এবং হেতুবাদ। কারণ পালি অভিধম্মপিটকের অন্তর্গত 'কথাবত্থু' নামক গ্রন্থে (ইহা অশোকের গুরু মোগ্‌গলিপুত্ত তিস্‌সের রচনা বলিয়া অভিহিত) শেষোক্ত আট সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে অন্ধ্রক (অন্ধ্র প্রদেশে জাত) শাখার উৎপত্তি হয় স্থবিরবাদীদের **সম্মিতীয়**[৫] এবং মহাসাংঘিকদের **চৈত্যবাদী**[৬] শাখা হইতে। এই অন্ধ্রক শাখা হইতে ক্রমে বৈপুল্য, পূর্বশৈলীয়, অপরশৈলীয়, রাজগিরিক এবং সিদ্ধার্থক শাখার উদ্ভব হইয়াছিল।

ইতিমধ্যে অর্থাৎ খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকের শেষার্ধে সুপণ্ডিত নাগসেনের আবির্ভাব হয়। তিনি গ্রীকরাজ মিলিন্দের (মিনান্দার) সহিত তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া অত্যন্ত সরল ভাষায় উপমা-সহকারে বুদ্ধের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্বসমূহের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই সকল ব্যাখ্যা মিলিন্দপ্রশ্ন[৭] (পালি মিলিন্দপঞ্‌হ) নামক গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে। মিলিন্দ ও নাগসেনের প্রশ্নোত্তর হইতে ইহাই অনুমিত হয় যে খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষার্ধে গৌতম বুদ্ধের দর্শন পশ্চিম ভারতে এমন কি গ্রীকদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল এবং সম্রাট অশোকের প্রচারের দ্বারাই তাহা যে সম্ভব হইয়াছিল—ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। যাহা হউক, আমাদের বক্তব্য হইতেছে এই যে নাগসেন-মিলিন্দের সময় পর্যন্ত আর্যাবর্তে বিশেষতঃ ভারতের পশ্চিমাংশে গৌতম বুদ্ধের দর্শনের কোন বিকৃতি ঘটে নাই। অবশ্য উত্তর-পূর্ব ভারতে (তৎকালীন মগধ-অঞ্চলে) ইহার কি অবস্থা হইয়াছিল তাহা বলা কঠিন। কারণ একদিকে অশোকের রাজত্বকালেই বৌদ্ধধর্ম আঠারটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বৌদ্ধ শাসন কলুষিত হইতেছে দেখিয়া অশোক মোগ্‌গলিপুত্ত তিস্‌সের সহায়তায় পাটলিপুত্রে তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতি আহ্বান করিয়া ষাট হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষুকে সঙ্ঘ হইতে বিতাড়িত করেন, কারণ তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ছিলেন গৌতম বুদ্ধের যথার্থ ধর্ম হইতে

অনেকাংশে ভ্রষ্ট, আবার অন্য কেহ কেহ ছিলেন যাঁহারা লাভ-সংকারের আশায় নিজেরাই মুণ্ডিতমস্তক হইয়া কাষায়বস্ত্র পরিধান করিয়া সঙ্ঘে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বিতাড়িত ভিক্ষুগণের মধ্যে কেহ কেহ দাক্ষিণাত্যাভিমুখে, আবার কেহ কেহ পশ্চিমাভিমুখে রওনা হইয়া নিজেদেরকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করেন। অন্যদিকে অশোকের মৃত্যুর পর শুঙ্গরা মগধের সিংহাসন অধিকার করায় মগধাঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পায় এবং রক্ষণশীল বৌদ্ধরাও নিজেদের পীঠস্থান পরিত্যাগ করিয়া যত্রতত্র পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা ও স্বধর্মরক্ষার চেষ্টা করেন। অতএব একদিকে স্বধর্মীদের বিরোধিতা অন্যদিকে বিধর্মীদের অত্যাচার—এই উভয়মুখী চাপে পড়িয়া তাঁহারা গোতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শনকে যথাযথভাবে রক্ষা করিতে পারেন নাই। ইতিহাস যাহা সাক্ষ্য প্রদান করে তাহা হইতে ইহা স্পষ্ট যে বৌদ্ধরা প্রয়োজনের তাগিদে নিজেদেরকে সঙ্ঘবদ্ধ করার চেষ্টা করেন। যাঁহারা পশ্চিমদিকে গিয়াছেন তাঁহারা সর্বাস্তিবাদ এবং সৌত্রান্তিক এই দুই বিশেষ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইলেন। অবশ্য এই দুইটি শাখা স্থবিরবাদ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। কুষাণরাজ কণিষ্কের সময় হইতে সর্বাস্তিবাদীরা বৈভাষিক নামেই সুপরিচিত হইলেন। কারণ কথিত আছে যে কণিষ্ক কাশ্মীরগন্ধার অঞ্চলে বৌদ্ধদের একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। ইহাতে সর্বাস্তিবাদীরাই মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁহারা উক্ত সম্মেলনে তখন অবধি রক্ষিত বুদ্ধ-বাণীসমূহের ভাষ্য রচনা করিয়া ইহার নাম দেন 'বিভাষা' এবং এই 'বিভাষাই' যথার্থ বুদ্ধবাণীরূপে গ্রাহ্য হইবে বলিয়া ঘোষণা করেন। ইহার পর হইতে সর্বাস্তিবাদীরা **বৈভাষিক** নামে অভিহিত হইলেন। **সৌত্রান্তিকরা** (যাঁহারা কেবল সূত্রের প্রামাণ্যে বিশ্বাসী) কিন্তু বিভাষাকে সমর্থন না করিয়া নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতে থাকেন। এই বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিকরা কিন্তু স্থবিরবাদীদের দর্শন হইতে বেশী দূরে সরিয়া যান নাই। অর্থাৎ তাঁহাদের দর্শন গোতম বুদ্ধের দর্শনেরই অনুগামী—তবে যে কয়েকটি অতি সাধারণ বিষয়ে ইঁহাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তাহার উল্লেখ এই স্থলে নিষ্প্রয়োজন বলিয়াই মনে করি।

গণ্ডগোল বাধাইয়াছেন যাঁহারা দাক্ষিণাত্যাভিমুখে চলিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের অধিকাংশ। তাঁহারা গোতম বুদ্ধোপদিষ্ট কয়েকটি দর্শন তত্ত্বের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া মূল হইতে অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছেন।

ক্রমে ক্রমে তাঁহারাও আবার দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়েন—মাধ্যমিক এবং যোগাচার। এই দুইটির সম্মিলিত নাম হইয়াছে মহাযান। এই নূতন সংজ্ঞা তাঁহাদের নিজেদেরই সৃষ্টি এবং তাঁহারাই স্থবিরবাদীদের উপর বলপূর্বক 'হীনযান' সংজ্ঞা আরোপ করিয়াছেন (অদ্যাবধি সারা বিশ্বে স্থবিরবাদীরা হীনযানী এবং অন্যান্য সকলে মহাযানী নামে পরিচিত)। অনেকের ভ্রান্ত ধারণা আছে যে পূর্বতন মহাসাংঘিক এবং তজ্জাত ষট্ নিকায় (গোকুলিক, একব্যবহারিক ইত্যাদি) হইতেই কালান্তরে মহাযানের উৎপত্তি হইয়াছে। কারণ মহাসাংঘিক বিনয়গ্রন্থ "মহাবস্তু অবদান" অধ্যয়ন করিলে দেখা যায় যে বর্তমান মহাযান অপেক্ষা স্থবিরবাদীদের সহিতই মহাসাংঘিকদের সাদৃশ্য বেশী। অতএব কোন এক নির্দিষ্ট নিকায় হইতে মহাযানের উৎপত্তি হয় নাই। বস্তুত বিদর্ভ (বেরার) দেশজাত আচার্য নাগার্জুনই মহাযানের প্রবর্তক। তিনিই মাধ্যমিককারিকা রচনা করিয়া 'মাধ্যমিক' সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন। মধ্যম পন্থাকে প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের নাম হয় 'মাধ্যমিক'। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যম পন্থা বুদ্ধোপদিষ্ট মধ্যম পন্থা হইতে ভিন্ন। তাঁহাদের মধ্যম পন্থা হইতেছে সৎ অসৎ, শাশ্বত অশাশ্বত, আত্ম অনাত্ম ইত্যাদি কোন মতবাদকেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ না করা। নাগার্জুন ইহারই নাম দিয়াছেন শূন্যবাদ। তিনি স্বয়ং বুদ্ধোপদিষ্ট প্রতীত্যসমুৎপাদনীতিতে (অর্থাৎ সৃষ্টির মূলে যে কার্য-কারণ সম্বন্ধ রহিয়াছে) বিশ্বাসী বলিয়া প্রতীত্যসমুৎপাদনীতি হইতেই শূন্যবাদের প্রবর্তন করিয়াছেন। তিনি বলেন বিশ্ব এবং ইহার সকল জড়-চেতন পদার্থ পরস্পর কার্য-কারণ সম্পর্কের দ্বারা যুক্ত। ইহারা কোনও প্রকার স্থির, শাশ্বত, নিত্য (ঈশ্বর, আত্মা ইত্যাদি) অবস্থা হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত বা শূন্য।

জগতের জড়-অজড় ধর্মসমূহের স্বভাব বলিয়া কিছুই নাই। ইহাদের স্বভাব বা উৎপত্তি ইহাদের নিজেদের দ্বারাও হয় না, অন্যের দ্বারাও হয় না, বা উভয়ের সংযোগের দ্বারাও হয় না। আবার ইহারা অহেতুকও নহে। ইহারা কার্য-কারণ সম্বন্ধের বিচ্ছিন্ন প্রবাহমাত্র। নাগার্জুন বলেন যে, ধর্মসমূহের স্বভাবই যদি থাকিয়া থাকে তাহা হইলে হেতু-প্রত্যয়ের অবর্তমানেও ত সেই স্বভাব থাকিয়া যাইবে এবং সৃষ্টির কারণ হইবে। অতএব যাহার স্বভাবই নাই তাহার নিরোধের প্রশ্নও অবান্তর। ইহাই

নাগার্জুনের শূন্যবাদের মূলকথা। খৃষ্ট্মাস্ হাম্ফে্রজ কিন্তু নাগার্জুনের শূন্যতাকে যথার্থই বৌদ্ধ অনাত্মবাদের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যারূপে অভিহিত করিয়াছেন। পালি গ্রন্থাবলীতে কোন যুক্তি না দেখাইয়া শুধু বলা হইয়াছে যে স্কন্ধসমূহের সহিত আত্মার কোন সম্বন্ধ নাই, আবার আত্মা স্কন্ধ হইতে ভিন্নও নহে। নাগার্জুন কিন্তু যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখাইয়া বলিয়াছেন যে আত্মার সঙ্গে পঞ্চস্কন্ধের সাদৃশ্য বা পার্থক্যের প্রশ্নই অবাস্তর। কারণ পঞ্চস্কন্ধ যদি আত্মা হয় তাহা হইলে আত্মা উৎপত্তি ও বিলয়ধর্মী হইত; আবার আত্মা যদি পঞ্চস্কন্ধ হইতে ভিন্ন হইত তাহা হইলে ইহার মধ্যে পঞ্চস্কন্ধের লক্ষণসমূহ বিদ্যমান থাকিত না। অতএব আত্মার মধ্যেও পঞ্চস্কন্ধ নাই এবং পঞ্চস্কন্ধের মধ্যেও আত্মা নাই।[৮] অথচ জীবদেহ পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে বিশেলষণ করিলে আমরা পঞ্চস্কন্ধ ব্যতিরেকে কিছুই পাই না। তাহা হইলে আত্মা কোথায়? কাজেই যেখানে আত্মার কোন অস্তিত্বই নাই সেখানে পঞ্চস্কন্ধের সঙ্গে আত্মার সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্যের কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। আত্মা হইতেছে শুধু ব্যবহার-বচনমাত্র, সংজ্ঞামাত্র, নামমাত্র, এবং প্রজ্ঞপ্তিমাত্র—অন্য কিছু নহে।[৯]

এখন দেখিতে হইবে—যে পঞ্চস্কন্ধকে আমরা বাস্তব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি বস্তুতঃপক্ষে সেইগুলি কি। সেইগুলি সারযুক্ত কি নিঃসার। নাগার্জুনের মতে সেইগুলিও নিঃসার এবং শূন্য। জলবুদ্বুদ, মরীচিকাদি যেমন অন্তঃসাররহিত, অশাশ্বত এবং শূন্য, ঠিক তদ্রূপ পঞ্চস্কন্ধ অন্তঃসাররহিত, অবাস্তব, অশাশ্বত, অনাত্ম, অনাত্মনীয়, অনিত্য, শূন্য এবং বিপরিণামধর্মী। চক্ষুরাদি দ্বাদশ আয়তন এবং অষ্টাদশ ধাতু প্রভৃতিও তদ্রূপ। এইভাবে জগতের যাবতীয় আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক ধর্মসমূহ অনিত্য, শূন্য ও অসার-মাত্র। কারণ ইহারা কার্যকারণসম্বন্ধযুক্ত এবং একে অন্যের উপর নির্ভর-শীল। অতএব ইহাদিগকে শূন্য আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। কারণ যাহা কার্য-কারণ সম্বন্ধে আবদ্ধ তাহা অবাস্তব এবং স্ব-ভাবশূন্য। কিন্তু নির্বাণকে কি করিয়া শূন্য বলা যায়? নির্বাণ ত কার্য-কারণ সম্বন্ধের অতীত এবং কাহারও উপর নির্ভরশীল নয়! ইহার উত্তরে নাগার্জুন বলিয়াছেন যে 'নির্বাণ' ও 'সংসার' অন্যোন্যসাপেক্ষ। কারণ সংসার আছে বলিয়াই আমরা নির্বাণের অস্তিত্ব কল্পনা করিতে পারি। অতএব নির্বাণ সংসারের উপর নির্ভরশীল বলিয়া ইহার 'শূন্য' আখ্যা অযৌক্তিক নহে। নাগার্জুন

কিন্তু এইখানেই ক্ষান্ত হইলেন না, তিনি আরও প্রমাণ করিলেন যে নির্বাণ এবং সংসার উভয়ই সমান। কিন্তু আমাদের স্বাভাবিক জিজ্ঞাসা হইতেছে এই যে সংস্কৃতধর্ম এবং অসংস্কৃত ধর্ম উভয়ে কি করিয়া সমান হইতে পারে। নাগার্জুন উত্তর দিলেন—সংসারও শূন্য, নির্বাণও শূন্য, অতএব সংসার নির্বাণের সমান। ক ও খ উভয়েই যদি গ-এর সমান হয়, তাহা হইলে 'ক' অবশ্যই 'খ'-এর সমান হইবে। তাঁহার মতে সংসার, নির্বাণ, শূন্যতা, প্রজ্ঞা, বুদ্ধ ইত্যাদি হইতেছে সংজ্ঞা বা নামমাত্র। বস্তুতপক্ষে ইহাদের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নাই। ইহাদের কোন স্বতন্ত্র এবং বাস্তব অস্তিত্ব না থাকিলেও ইহারা শূন্যতারই প্রতিশব্দ মাত্র। গভীর সাধনার দ্বারা আমরা যখন ইহা উপলব্ধি করিব তখনই আমরা বলিতে পারিব যে, আমরা সংসারকে জানিয়াছি, শূন্যতাকে উপলব্ধি করিয়াছি, প্রজ্ঞা লাভ করিয়াছি, নির্বাণ সাক্ষাৎ করিয়াছি এবং বুদ্ধকে দেখিয়াছি।[১০]

শূন্যতা এবং নির্বাণের মধ্যে যে কোন পার্থক্য নাই এই বিষয়ে যদি ভবিষ্যতে কাহারও কোন সন্দেহ উৎপন্ন হয়, সেই সন্দেহ নিরসনকল্পে নাগার্জুন নির্বাণের নূতন ব্যাখ্যা কবিয়া বলিয়াছেন যে নির্বাণ কোন কিছুর প্রহীণ নয়, কোন কিছুর প্রাপ্তিও নয়। ইহা উচ্ছেদ নহে, শাশ্বতও নহে। ইহা নিরুদ্ধ নহে, উৎপন্নও নহে।[১১] নির্বাণে সমস্ত চিত্তবৃত্তি প্রদীপের ন্যায় নির্বাপিত হয়। নির্বাণ সৎও নহে অসৎও নহে। ইহা আকাশের দ্বারা কৃত গ্রন্থির ন্যায় এবং আকাশের দ্বারাই আবার গ্রন্থিমুক্ত হয়।[১২]

নাগার্জুন কেন যে শূন্যবাদ প্রচার করিয়াছেন তাহার স্বপক্ষে যুক্তি দেখাইয়া তিনি বলিয়াছেন যে সকল প্রপঞ্চের (মায়া, মোহ) ধ্বংস সাধন করার জন্যই তিনি 'শূন্যতা' প্রচার করিয়াছেন। সমস্ত ধর্ম ও ক্লেশের প্রহাণের দ্বারা যে মোক্ষ বা নির্বাণ লাভ করা যায় এই মতবাদকে তিনি অস্বীকার করিয়াছেন। ইহা অবশ্য সত্য যে বস্তুসমূহের স্বভাবধর্ম সম্বন্ধে আমাদের যথার্থ জ্ঞান নাই। বস্তুসমূহ রূপ গ্রহণ করে এবং ইহার ফলে লোভ, দ্বেষ, মোহ ইত্যাদি ক্লেশের সৃষ্টি হয়। অতএব ক্লেশসমূহের মূলে রহিয়াছে সংকল্প (imagination)। কর্ম ও ক্লেশের যথার্থ কোন অস্তিত্ব নাই। ইহারা সংকল্পসঞ্জাতমাত্র। প্রপঞ্চ হইতেছে ইহাদের উৎপত্তির কারণ। এই প্রপঞ্চ অনন্তকাল ধরিয়া লাভ-ক্ষতি, সুখ-দুঃখ, নিন্দা-প্রশংসা, যশঃ-অযশঃ, কর্ম্ম-কর্তা, জ্ঞান-জ্ঞাতা ইত্যাদি লোকধর্মসমূহের চক্রাবর্তনে

আবর্তিত জনগণের চিত্তকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। এই প্রপঞ্চসমূহ নিরুদ্ধ হয় যখন কোন ব্যক্তি জাগতিক ধর্মসমূহের অনস্তিত্ববিষয়ক জ্ঞান লাভ করে। কোন ব্যক্তি যেমন বন্ধ্যাসুতা বা শশবিষাণ সম্বন্ধে কোন ধারণা পোষণ করিতে পারে না এবং তাহাকে অবলম্বন করিয়া কোন কল্পনাজাল সৃষ্টি করিতে পারে না, ঠিক তদ্রূপ কোন মহাযানী 'আমি' 'আমার' ইত্যাদি আত্মবাদ ও ক্লেশোৎপত্তির কারণবিষয়ক ভাবের দ্বারা উত্যক্ত হয় না। শূন্যতায় প্রতিষ্ঠিত যোগিগণ স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু ইত্যাদির ধারণা হইতে ঊর্ধ্বে চলিয়া যান এবং ফলতঃ তাঁহাদের মধ্যে কোন প্রপঞ্চ, বিকল্প, সৎকায়দৃষ্টি (আত্মবাদ), ক্লেশ, কর্ম অথবা জন্ম-মৃত্যুবিষয়ক ধারণা আসিতে পারে না। এইভাবে শূন্যতার যথার্থ উপলব্ধির দ্বারা প্রপঞ্চসমূহের নিরবশেষ নিবৃত্তি ঘটে। এইজন্যই বলা হইয়াছে যে শূন্যতার উপলব্ধি ও নির্বাণের উপলব্ধি এক ও অভিন্ন। তাই শূন্যতার মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে যাইয়া নাগার্জুন মাধ্যমিক-কারিকার একসপ্ততিতম কারিকাতে বলিয়াছেন—

"প্রভবতি চ শূন্যতেয়ং যস্য প্রভবন্তি তস্য সর্বার্থাঃ।
প্রভবতি ন তস্য কিঞ্চিন্ন ভবতি শূন্যতা যস্য।"

—যিনি শূন্যতাকে উপলব্ধি করেন তিনি সর্ববিধ অর্থ (যাহা কিছু হিতকর এবং আত্মোন্নতি ও দুঃখমুক্তির পক্ষে সহায়ক) হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। কিন্তু যিনি শূন্যতা উপলব্ধি করিতে না পারেন তাঁহার কিছুই বোধগম্য হয় না। 'বিগ্রহব্যাবর্তনী' গ্রন্থের শেষে নাগার্জুন বুদ্ধকে এই-ভাবে প্রণাম জানাইয়াছেন—

"যঃ শূন্যতাং প্রতীত্যসমুৎপাদং মধ্যমাং প্রতিপদমনেকার্থাং নিজগাদ প্রণমামি তমপ্রতিমসম্বুদ্ধম্।"—যিনি শূন্যতা, প্রতীত্য-সমুৎপাদ ও অনেকার্থ বিশিষ্ট মধ্যমা প্রতিপদার (বা মার্গের) উপদেশ করিয়াছেন, সেই অপ্রতিম সম্বুদ্ধকে প্রণাম করি।

নাগার্জুনের পর মাধ্যমিক মতবাদ তথা শূন্যবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন যথাক্রমে আর্যদেব (৩য় শতাব্দী), বুদ্ধপালিত (৫ম শতাব্দী), ভাববিবেক বা ভাব্য (৫ম শতাব্দী), চন্দ্রকীর্তি (৬ষ্ঠ শতাব্দী) এবং শান্তিদেব (৭ম শতাব্দী)।

নাগার্জুন[১৩] ও আর্যদেবের[১৪] মত সুমহান ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহাপুরুষদের একনিষ্ঠ সাধনা ও আত্মোৎসর্গের দ্বারা যখন মাধ্যমিক তথা শূন্যবাদের

বিজয়পতাকা ভারতের অনেক স্থানে বিশেষতঃ সমগ্র দাক্ষিণাত্যে উড্ডীন ছিল, ঠিক তাহার কিছুকাল পরে মৈত্রেয়ের[১৫] আবির্ভাব হয় (খৃঃ ৪র্থ শতক)। তিনি নাগার্জুন ও আর্যদেব-বিরচিত গ্রন্থাবলীর সার সঙ্কলন করিয়া মাধ্যমিক মতবাদকে আরও প্রগতিশীল করার মানসে একটি নূতন দিক্ সূচনা করার চেষ্টা করেন। তিনি প্রচার করিলেন বিজ্ঞানবাদ। তাঁহার এক একটি মতবাদ ব্যক্ত করার জন্য এক একটি গ্রন্থ তিনি সঙ্কলিত করেন। কিন্তু ছন্দোবদ্ধ থাকাতে সাধারণের পক্ষে সেইগুলির ভাবরস আস্বাদন করার উপায় ছিল না। তখন তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য পণ্ডিতপ্রবর অসঙ্গ[১৬] (৪র্থ শতক) গুরুদায়িত্ব নিলেন মৈত্রেয়নাথের ছন্দোবদ্ধ বাণীকে সাধারণের নিকট প্রচার করার উপযোগী করার। তিনি মৈত্রেয়-বিরচিত কারিকাগুলির প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করিয়া বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করেন। তিনি এই নূতন দর্শনের নাম দিলেন যোগাচার। যোগের (ধ্যানের) আচরণ অর্থাৎ ধ্যান-সাধনার মাধ্যমেই বোধি বা পরমার্থ সত্যের উপলব্ধি সম্ভব। বোধি লাভ করার পূর্বে বোধিসত্ত্ব অবস্থায় সমস্ত দশভূমি[১৭] অতিক্রম করিয়া আসিতে হইবে এবং একমাত্র যোগ-সাধনার দ্বারাই ইহা সম্ভব—ইহাই যোগাচারের মূল কথা। এই যোগাচার সম্প্রদায়ের নামান্তর হইতেছে বিজ্ঞানবাদ। কারণ ইহার মতে বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাই হইতেছে একমাত্র পরমার্থ সত্য। অর্থাৎ বিজ্ঞান ব্যতীত সত্য কিছু নাই। যে পরমাণু সৃষ্টির কারণ তাহাও বিজ্ঞপ্তিমাত্র। কারণ জড়-চেতন যে কোন পদার্থকে এমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশে ভাগ করা যায় যে ইহা আমাদের দৃষ্টি, চিন্তা, ধারণা ও অনুভূতির অগোচরে চলিয়া যায়। এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরমাণু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। ইহা অদৃষ্ট ও অস্পৃষ্ট —কেবলমাত্র বুদ্ধিগ্রাহ্য। অতএব বিজ্ঞান ব্যতীত জগতে কোন সত্য নাই—ইহাই বিজ্ঞানবাদ। এই 'বিজ্ঞানবাদ' নামকরণ করিয়াছেন অসঙ্গের ভ্রাতা বসুবন্ধু।[১৮] যোগাচারী বিজ্ঞানবাদীরা পুদ্‌গলনৈরাত্ম্য (আত্মার অনস্তিত্ব) এবং ধর্মনৈরাত্ম্যে (বস্তুর অনস্তিত্বে) বিশ্বাসী—প্রথমটি লাভ করা যায় ক্লেশাবরণ (Passions) দূরীকরণের দ্বারা এবং দ্বিতীয়টি লাভ করা যায় জ্ঞেয়াবরণ দূরীকরণের দ্বারা। মাধ্যমিক দর্শনে নাগার্জুন দুই প্রকার সত্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন—সংবৃতি সত্য (Conventional truth) এবং পরমার্থ সত্য (Transcendental truth)। কিন্তু যোগাচার বিজ্ঞানবাদীরা তিন প্রকার সত্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন—পরিকল্পিত (illusory), পরতন্ত্র (empirical)

এবং পরিনিষ্পন্ন (absolute)। পরিকল্পিত সত্য হইতেছে কার্য-কারণ-সমুদ্ভূত কোন আধ্যাত্মিক বা বাহ্য বস্তুধর্ম সম্বন্ধে কাল্পনিক ধারণা। পরতন্ত্র সত্য হইতেছে কার্য-কারণ-সমুদ্ভূত কোন বস্তুধর্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাপ্রসূত ও পরীক্ষিত জ্ঞান বা ধারণা। পরিনিষ্পন্ন সত্য হইতেছে পরমার্থ সত্য বা তথতা।[১৯] অতএব, দেখা যাইতেছে যে যোগাচার বিজ্ঞানবাদীদের প্রথম দুইটি সত্য মাধ্যমিক সংবৃতি সত্যের সমতুল এবং তৃতীয়টি মাধ্যমিক পরমার্থ সত্যের সমতুল। অতএব মাধ্যমিক ও যোগাচারের মধ্যে মূলগত পার্থক্য হইতেছে এই যে মাধ্যমিকদের মতে শূন্যতাই হইতেছে পরমার্থ সত্য, অপরপক্ষে যোগাচারীদের মতে বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাই (Mere Consciousness) হইতেছে তথতা।

বিজ্ঞানবাদ সম্বন্ধে মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের একটি উক্তি অনুধাবনযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন—বৌদ্ধদের বিজ্ঞানবাদের নিকট শঙ্করাচার্য ও তাঁহার অগ্রজ গুরু গৌড়পাদ কতদূর ঋণী ছিলেন গৌড়পাদীয়কারিকা-সমূহই তাহার প্রমাণ। বস্তুতপক্ষে গৌড়পাদীয়কারিকা প্রচ্ছন্নরূপে এক বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদী গ্রন্থ।

অসঙ্গের পরে বিজ্ঞানবাদের যাঁহারা পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন তাঁহারা হইলেন—বসুবন্ধু (৫ম শতাব্দী), দিঙ্‌নাগ (৫ম শতাব্দী), ধর্মকীর্তি (৬ষ্ঠ শতাব্দী) এবং শান্তরক্ষিত (৭ম শতাব্দী)। তাঁহার বিংশতিকা ও ত্রিংশিকাতে বসুবন্ধু বিজ্ঞানবাদের গূঢ়ার্থ বিস্তৃতভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন।[২০] অসঙ্গ অপেক্ষা তদীয় অনুজ বসুবন্ধুর প্রতিভা যে আরও অধিকতর বহুমুখী ও প্রখর ছিল তাহার প্রমাণ হইতেছে এই বিংশতিকা ও ত্রিংশিকা এবং বাদবিধান নামক অপর একটি গ্রন্থ। তিনি একদিকে স্বীয় জ্যেষ্ঠভ্রাতার কার্যকে সুব্যবস্থিত করিয়া বিজ্ঞানবাদকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। অপরদিকে নাগার্জুন-বিরচিত গ্রন্থ পাঠ করিয়া এবং তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি ভারতীয় ন্যায়শাস্ত্রকে অধিকতর শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছেন। 'বাদবিধান' নামক গ্রন্থই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ইহার অপর একটি প্রমাণ হইতেছে এই যে ভারতের মধ্যযুগীয় ন্যায়শাস্ত্রের জনককে তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন।[২১] প্রমাণসমুচ্চয়াদি দিঙ্‌নাগের প্রামাণ্য গ্রন্থাবলী। তিনি কি উদ্দেশ্যে 'প্রমাণসমুচ্চয়' রচনা করিয়াছেন তাহা তিনি উক্ত গ্রন্থের প্রথম শ্লোকেই ব্যক্ত করিয়াছেন—

"প্রমাণভূতায় জগদ্ধিতৈষিণে প্রণম্য শাস্ত্রে সুগতায় তায়িনে।
প্রমাণসিদ্ধ্যৈ স্বমতাৎ সমুচ্চয়ঃ করিষ্যতে বিপ্রসিতাদিহৈককঃ ॥"

—জগদ্ধিতৈষী প্রমাণভূত উপদেষ্টা ও ত্রাতা সুগত (বুদ্ধ)কে প্রণাম করিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত স্বমতাদি (বৌদ্ধ মতাদি) প্রমাণসিদ্ধির নিমিত্ত একস্থানে সমুচ্চয় করা হইতেছে।—বিরুদ্ধবাদীদের বৌদ্ধবিরোধী মতবাদ সমূহকে খণ্ডন করিয়া প্রমাণের দ্বারা বৌদ্ধ মতগুলিকে সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যেই দিঙ্‌নাগ তাঁহার গ্রন্থসমূহ রচনা করিয়াছেন। তিনি অপর দর্শন সমূহ এবং বাৎস্যায়নের ন্যায়ভাষ্যের এমন যুক্তিসঙ্গত সমালোচনা করিয়াছেন যে, ইহার উত্তর দিবার জন্য পশুপতাচার্য উদ্যোতকর ভরদ্বাজকে (খৃঃ ৫৫০) বাৎস্যায়ন ভাষ্যের উপর 'ন্যায়বার্ত্তিক' শীর্ষক গ্রন্থ লিখিতে হইয়াছে। ধর্মকীর্তির 'প্রমাণবার্ত্তিক' বস্ততুপক্ষে দিঙ্‌নাগেরই প্রধান গ্রন্থ প্রমাণসমুচ্চয়ের ব্যাখ্যামাত্র। অতএব প্রমাণবার্ত্তিক হইতেই দিঙ্‌নাগের মতবাদ সম্বন্ধে সম্যক্ অবহিত হওয়া যায়। এই দিক দিয়া বিচার করিলে ধর্মকীর্তির প্রমাণবার্ত্তিকের গুরুত্ব অনেক। ভারতীয় কাণ্টরূপে অভিহিত ধর্মকীর্তি স্বীয় যুক্তিজালের দ্বারা উদ্যোতকরের ন্যায়বার্ত্তিককে এমনভাবে খণ্ডন করিয়াছেন যে বাচস্পতি মিশ্র (৮৪২ খৃঃ) 'ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্যাটীকা' রচনা করিয়া উদ্যোতকরকে তর্কপঙ্ক হইতে উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছেন। শুধু বাচস্পতি মিশ্রই নহেন ১০০০ খৃষ্টাব্দে জয়ন্তভট্ট ধর্মকীর্তির সমালোচনা করিয়া 'ন্যায়মঞ্জরী' রচনা করিয়াছেন। কিন্তু সমালোচনা করিতে যাইয়াও তিনি ধর্মকীর্তিকে "সুনিপুণবুদ্ধিলক্ষণযুক্ত" এবং তাঁহার চেষ্টাকে "জগদাতিভবধীর" বলিয়া পরোক্ষে তাঁহারই প্রশংসা করিয়াছেন।[২২] এমন কি ১১৯২ খৃষ্টাব্দে কবি ও দার্শনিক শ্রীহর্ষও তাঁহার 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্য' শীর্ষক গ্রন্থে ধর্মকীর্তির তর্কপথকে 'দুরাবাধ' বলিয়া তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন।[২৩]

ধর্মকীর্তি দিঙ্‌নাগের ন্যায় অসঙ্গের যোগাচার বিজ্ঞানবাদকে স্বীকার করিতেন। তবে ধর্মকীর্তিকে শুদ্ধযোগাচারীও ঠিক বলা যায় না, তাঁহাকে সৌত্রান্তিক-যোগাচারী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সৌত্রান্তিকরা বহির্জগতের সত্তাকেই মূলতত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করিতেন, কিন্তু যোগাচারীরা বিজ্ঞান (মন, চিত্ত) ব্যতীত অন্য কিছুকে স্বীকার করিতেন না। কিন্তু ধর্মকীর্তি বহির্জগতের প্রবাহরূপী ক্ষণিক বাস্তবিকতাকে অস্বীকার করিতে যাইয়া

বিজ্ঞানের মূলতত্ত্বকে মান্য করিয়াছেন। সংক্ষেপে ধর্মকীর্তির মতবাদকে মাত্র কয়েকটি কথায় প্রকাশ করা যায়—'জড় (ভৌতিক) তত্ত্ব বিজ্ঞানেরই বাস্তবিক গুণাত্মক পরিবর্তন।' এখন প্রশ্ন হইতেছেঃ যদি বাহ্য পদার্থসমূহের বস্তুসত্তাকে অস্বীকার করা যায় তাহা হইলে ঘট-পটাদির জ্ঞানসমূহের ভেদ কিরূপে হইবে ?—ধর্মকীর্তি বলিয়াছেনঃ

"যে কোন (ঘটাদি আকারযুক্ত জ্ঞানের) কোন (এক জ্ঞান) আছে যাহা চিত্তের আভ্যন্তরিক বাসনাকে (পূর্ব সংস্কার) জাগ্রত করে, তদ্দ্বারা (বাসনা জাগ্রত হইলে) জ্ঞান সমূহের (ভিন্নতার) নিয়ম দেখা যায়, বাহ্যিক পদার্থের অপেক্ষায় নহে। কারণ বাহ্যিক পদার্থের অনুভব আমাদের হয় না। এইজন্য একই বিজ্ঞান (=আভ্যন্তরিক জ্ঞান, বাহিরের বিষয়) রূপযুক্ত (দেখা যায়), এবং উভয়রূপে স্মরণও করা যায়। ইহার (একই বিজ্ঞানের ভিতর-বাহির উভয় আকারের হইবার) পরিণাম হইল স্ব-সংবেদন (নিজের ভিতর জ্ঞানের সাক্ষাৎকার)।"[২৪]

গোতম বুদ্ধের অনিত্যবাদ বা ক্ষণিকবাদকেও স্বীকার করিয়া ধর্মকীর্তি বলিয়াছেন—যাহা কিছু উৎপত্তি-স্বভাববিশিষ্ট, তাহাই ধ্বংস-স্বভাব-বিশিষ্ট।[২৫] আবার বহুকারণত্ববাদ স্বীকার করিতে যাইয়া তিনি বলিয়াছেনঃ

"কোনও এক (বস্তু) এক (কারণ) হইতে উৎপন্ন হয় না, বরঞ্চ সামগ্রী (অনেক কারণসমূহের একত্রিত হওয়া) হইতেই (এক বা অনেক) কার্যের উৎপত্তি হয়।"[২৬]

"মাটি, চাকা, কুম্ভকার পৃথক পৃথক অবস্থায় (কোন ঘটের ন্যায় ভিন্নরূপ) কার্য সম্পাদনে অসমর্থ ; কিন্তু ইহাদের (একত্র সম্মেলন) হইলে কার্য সম্পাদিত হয় ; ইহার দ্বারা অনুমিত হয় যে, সংহত (একত্র) হওয়ায় উহাদের (ক্ষণিক বস্তুসমূহের) মধ্যে হেতুত্ব বিদ্যমান, ঈশ্বরাদিতে নহে, কারণ (ঈশ্বরাদিতে ক্ষণিকতা না থাকিলে) অভেদ (একরসতা) থাকে।"[২৭]

অতএব দেখা যাইতেছে গোতম বুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া ধর্মকীর্তি পর্যন্ত এই সুদীর্ঘকালে বৌদ্ধ দর্শনের নানা বিবর্তন হইলেও মূল কিন্তু একেবারে বিনষ্ট হয় নাই। হীনযান এবং মহাযান এই দুই প্রধান সম্প্রদায়ে বৌদ্ধধর্ম বিভক্ত হইলেও যদি মূলতত্ত্বের অনুসন্ধান করা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে উভয়ের মধ্যে বৈসাদৃশ্য অপেক্ষা

সাদৃশ্যই বেশী। কিন্তু বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিকতা প্রবেশ করিয়া ইহাকে বিপথে চালিত করিয়াছে। যাঁহারা সর্ব প্রথম বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিকতা আনয়ন করিয়াছিলেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য অবশ্য মহৎই ছিল। কিন্তু তাঁহাদের উত্তর-সূরীদের অযোগ্যতাহেতু সমস্তই বিনষ্ট হইয়াছে। তান্ত্রিক যোগসাধনার গূঢ়ার্থকে সম্যক্ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাঁহারা ধর্মের নামে ইন্দ্রিয়-সুখানুভূতিকেই পরমার্থরূপে গ্রহণ করিয়া উৎপত্তিস্থল ভারত হইতে বৌদ্ধ-ধর্মের বিলুপ্তির পথ সুগম করিয়াছেন। অতএব পরবর্তীকালের তান্ত্রিক বৌদ্ধ-ধর্মকে বাদ দিয়া যদি বর্তমানে সুপরিচিত বৌদ্ধধর্মের দুই শাখা হীনযান ও মহাযানের মূলগ্রন্থগুলিকে (যাহা অদ্যাবধি প্রাপ্ত হইয়াছে) নিরপেক্ষভাবে অধ্যয়ন করিয়া মূলতত্ত্বের অনুসন্ধান করা যায় তাহা হইলে প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের স্বরূপ অবশ্যই জানা যাইবে।

বৌদ্ধদের মূল চারি সম্প্রদায়ঃ

(খৃঃ পূঃ ১ম হইতে খৃঃ ৫ম শতাব্দী)

গোতম বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পরে পাঁচশত বৎসরের মধ্যে তাঁহার ধর্ম বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু শেষের দিকে অনেক সম্প্রদায় লুপ্ত হইয়া চারিটি প্রধান সম্প্রদায় বর্তমান থাকে। তাহার মধ্যে দুইটি হইতেছে বর্তমান মহাযানের অন্তর্গত, যেমন মাধ্যমিক এবং যোগাচার। অপর দুইটি বর্তমান হীনযান (=থেরবাদী) সম্প্রদায়ের অন্তর্গত, যেমন সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক। মূলতঃ দুইটি সমস্যা হইতে ইহাদের উৎপত্তি— (১) সৎ (বস্তুসৎ বা চিৎসৎ) আছে কিনা? (২) বাহ্যজগৎ কিভাবে জ্ঞাতব্য? ইহার মধ্যে প্রথমটি বিষয়ে তিন প্রকার উত্তর পাওয়া যায়। (ক) মাধ্যমিক শূন্যবাদীরা মনে করেন সৎ (বস্তুসৎ বা চিৎসৎ) বলিয়া কিছুই নাই, সকলই শূন্য। (খ) যোগাচারী বিজ্ঞানবাদীরা মনে করেন যে শুধুমাত্র চিৎ-সৎ আছে, বস্তুসৎ বা বাহ্যজগৎ বলিয়া কিছুই নাই। (গ) সর্বাস্তিবাদীরা মনে করেন বস্তুসৎও আছে, চিৎসৎও আছে। দ্বিতীয় সমস্যা বিষয়ে দুইটি উত্তর পাওয়া যায়। (ক) সৌত্রান্তিকগণ মনে করেন যে, বাহ্যজগৎ বলিয়া কিছুই নাই, শুধু অনুমান করা যায় মাত্র। এইজন্য তাঁহাদিগকে বলা হয় **বাহ্যানুমেয়বাদী**। (খ) বৈভাষিকগণ মনে করেন যে, বাহ্যজগৎ প্রত্যক্ষভাবে জানা যায়। এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে,

সর্বাস্তিবাদ হইতেই সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। যাহা হউক আমরা নিম্নে চারিটি সম্প্রদায় সম্বন্ধে যথাসম্ভব স্পষ্টাকারে বর্ণনা করিতেছি :

১। মাধ্যমিকদের শূন্যবাদ

'শূন্যবাদ' শব্দটাই বিভ্রান্তিকর। আচার্য নাগার্জুন (খৃঃ ২য় শতাব্দী) তাঁহার দর্শনে শূন্যবাদ বলিতে যাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিলে অবশ্য 'শূন্যবাদ' সম্বন্ধীয় বিভ্রান্তি দূর হইতে পারে। তিনি প্রতীত্যসমুৎপাদকেই শূন্যতা বলিয়াছেন। এই শূন্যতাকে তিনি আরও দুইটি নামে অভিহিত করিয়াছেন—**উপাদায় প্রজ্ঞপ্তি** এবং **মধ্যমা প্রতিপদ্**। উপাদায় প্রজ্ঞপ্তিকে অন্য কোন প্রতিশব্দ দ্বারা অভিহিত করা কঠিন। ইহার অর্থ হইতেছে প্রত্যেক প্রজ্ঞপ্তি (=ব্যবহার) এককভাবে উৎপন্ন হইতে পারে না। যেমন 'রথ' একটি প্রজ্ঞপ্তি। কিন্তু ঈশাদণ্ড, অক্ষ, চক্র, রথপঞ্জর, রথদণ্ড, রথযুগ, রথরজ্জু, চাবুক ইত্যাদির সমবায়ে 'রথ' প্রজ্ঞপ্তি হইয়াছে। তদ্রূপ সমস্ত প্রজ্ঞপ্তিই এককভাবে উৎপন্ন হয় নাই, অনেক কিছুর সমবায়েই উৎপন্ন হইয়াছে। প্রজ্ঞপ্তি নিজমধ্যে স্বতন্ত্র বা নিরপেক্ষ না হইয়া সাপেক্ষ বা অন্যান্য উপাদান লইয়া গঠিত হয় বলিয়া ইহাকে **উপাদায় প্রজ্ঞপ্তি** বলা হইয়াছে। ভাব এবং অভাবের মধ্যবর্তী অবস্থা এবং শাশ্বত ও উচ্ছেদের মধ্যবর্তী অবস্থার নামই **মধ্যমা প্রতিপদ্**। নাগার্জুনের ভাষায়—

> "যঃ প্রতীত্যসমুৎপাদঃ শূন্যতাং তাং প্রচক্ষ্মহে।
> সা প্রজ্ঞপ্তিরুপাদায় প্রতিপৎসৈব মধ্যমা ॥"

—মাধ্যমিক কারিকা, ২৪।১৮

অর্থাৎ যাহা প্রতীত্যসমুৎপাদ তাহাকেই আমি শূন্যতা বলি। ইহা (দ্বিবিধ): উপাদায়-প্রজ্ঞপ্তি এবং মধ্যমা প্রতিপদ্‌। এইভাবে শূন্যতার সাহায্যে তিনি সত্তার (=পদার্থসমূহের অস্তিত্ব) সাপেক্ষবাদ প্রতিপাদন করিয়াছেন : কর্ম কর্তা-ব্যতিরেকে সম্পাদিত হইতে পারে না। কর্ম সম্পাদিত হইতে কর্তা অবশ্যই থাকিবে। অতএব কর্ম এবং কর্তা নিজ নিজ সিদ্ধির জন্য পরস্পর-সাপেক্ষ। প্রত্যেক সত্তার (অস্তিত্বের) ইহাই অবস্থা. সকলের সিদ্ধিই সাপেক্ষ। সত্তার সিদ্ধি সর্বদাই সাপেক্ষ, নিরপেক্ষ নহে।[২৮]

ইহারই নাম শূন্যবাদ। শূন্যবাদ নিরপেক্ষ সত্তার সিদ্ধি স্বীকার করে না। ইহাকেই শংকর বলিয়াছেন 'সর্বপ্রমাণবিপ্রতিষিদ্ধ'।[২৯] এই শূন্যবাদের বিকাশ প্রতীত্যসমুৎপাদের উপরই নির্ভরশীল। প্রতীত্যসমুৎপাদ অশাশ্বত এবং অনুচ্ছেদবাদের স্থাপনা করিয়াছে যাহাকে ললিতবিস্তরে[৩০] এইভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে ঃ বীজ থাকিলে অংকুর হইবে, কিন্তু বীজই অংকুর নহে। আবার বীজ হইতে ভিন্ন কোন বস্তুও অংকুর নহে। অতএব বীজ শাশ্বত, স্থির বা নিত্য নহে, কারণ অংকুররূপে ইহার পরিবর্তন দৃষ্ট হয়। আবার ইহা উচ্ছিন্ন বা বিনষ্টও হয় না, কারণ অংকুর ত বীজেরই রূপান্তর।

"বীজস্য সতো যথাঙ্কুরো
ন চ যো বীজু স চৈব অংকুরো।
ন চ অন্যু ততো ন চৈব
তদেবমনুচ্ছেদ অশাশ্বত ধর্মতা।"

প্রত্যেক বস্তুই কারণসম্ভূত, কার্য কারণ হইতে অন্য বা ভিন্ন নহে, আবার অনন্য বা অভিন্নও নহে। কার্য কারণ হইতে ভিন্ন হইলে কারণের উচ্ছেদকে স্বীকার করিতে হয়, আর কার্য অনন্য বা অভিন্ন হইলে ইহাকে শাশ্বত বা নিত্য বলিয়া মানিতে হয়। কিন্তু কোনটাই যথার্থ নহে বলিয়া শাশ্বত বলিয়াও কিছু নাই, আর কোন কিছুর উচ্ছেদও হয় না। এই অশাশ্বতানুচ্ছেদবাদ সকারণতা এবং পরিবর্তনশীলতার নিয়মের আধারে বিকশিত হয়।

যে অশাশ্বতানুচ্ছেদবাদের চর্চা বৌদ্ধদর্শনের সর্বত্রই দৃষ্ট হয়, ইহার পূর্বপক্ষরূপে কুত্রাপি ব্রাহ্মণ্য বা জৈন দর্শন স্পর্শ করে নাই। ইহা বাস্তবিকই আশ্চর্যজনক। যেখানেই বৌদ্ধদর্শনের আলোচনা হইয়াছে, সর্বত্রই ইহাকে উচ্ছেদবাদী দর্শন বলা হইয়াছে, অভাববাদী বলা হইয়াছে। শংকর ত স্পষ্টতই বলিয়াছেন যে বৌদ্ধদর্শন যথার্থ নহে, কারণ ইহা কোন কারণকে স্থির বলিয়া স্বীকার করে না যাহার মতে অভাব হইতেই ভাবের উৎপত্তি হয়।[৩১] বৌদ্ধদর্শনকে শংকর 'বৈনাশিক'ও বলিয়াছেন। কিন্তু বৌদ্ধশাস্ত্রের কুত্রাপি ইহা দৃষ্ট হয় না যদ্দ্বারা স্বীকার করিতে হয় বৌদ্ধরা নিজেদের বৈনাশিক বা বিনাশবাদী বলিয়াছেন। তবে একথা ঠিক যে, বৌদ্ধদর্শনে যাহা নাই তাহা অন্যরা ইহার উপর আরোপ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আর, এইভাবে আরোপিত করা অসম্ভবও ছিলনা। কারণ

ন্যায়দর্শনে ছলেবলে এবং বাক্‌বিতণ্ডার দ্বারা অন্যদের মৌন করিয়া দিবার প্রবৃত্তি তত্ত্বরক্ষার সাধনরূপে মানিয়া লওয়া হইয়াছে।[৩২] এই মনোবৃত্তির কারণে বৌদ্ধরা যেভাবে নিজেদের দার্শনিক সিদ্ধান্তকে স্থাপিত করিয়াছেন, সেইভাবে উপস্থাপিত করিয়া ইহার আলোচনা করা হয় নাই।

ধরা যাউক, অশাশ্বতানুচ্ছেদবাদ এই বৌদ্ধদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত। অশাশ্বত এবং অনুচ্ছিন্ন অর্থাৎ পরিবর্তনশীল সত্তাতে যে সত্তার প্রতীতি হয় তাহাও নিরপেক্ষ নহে, কারণ কার্যের সত্তা কারণের সত্তার সাপেক্ষ। চন্দ্রকীর্তি সেইজন্য প্রতীত্যসমুৎপাদের অর্থ করিয়াছেনঃ "হেতুপ্রত্যয়-সাপেক্ষো ভাবানামুৎপাদঃ।"[৩৩] তিনি ইহার দ্বারা সত্তার সিদ্ধিকে সাপেক্ষ মানিয়া নিরপেক্ষ সত্তার খণ্ডন করিয়াছেন। এই খণ্ডন প্রণালী বড়ই বিচিত্র। করা না হইলে কোন কার্য হয় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোন ব্যক্তি রোটী বানাইবার সংকল্প করিয়াছে। একজন কারক না হইলে রোটী বানানো যাইবে না। আর রোটী, যাহা বানানো হইবে, তাহা হইতেছে কার্য বা কর্ম। কিন্তু শুধু বসিয়া থাকিলেই রোটী হইয়া যাইবে না। ইহার জন্য উদ্যোগের প্রয়োজন। আটার প্রয়োজন, অগ্নির উত্তাপ চাই, জল চাই, লবণাদি চাই, হস্তের প্রয়োগ চাই। ইত্যাদিকে বলা হইয়াছে (কারণ)। অতএব রোটীর কারণ হইতেছে আটা এবং রোটী ইহার কার্য। কিন্তু হস্তের প্রয়োগ না করিলে রোটী তৈয়ারীর কার্য সম্পন্ন হইবে না, অতএব 'হস্ত' ইহার কারণ। এই কর্তা, কর্ম, হেতু বা কারণ কার্যের সিদ্ধি ইত্যাদির ক্ষেত্রে নাগার্জুন-ব্যবহৃত শব্দাবলীকে বিবেচনা করিতে হইবে।

যদি কর্মকে স্বভাবতঃ (=নিরপেক্ষতঃ) 'সৎ' মানা হয়, তাহা হইলে কর্মের জন্য কর্তার প্রয়োজন হইবে না এবং কর্তাও নিষ্কর্মা হইয়া যাইবে, কেন না তাহার করার যোগ্য কর্ম ত **স্বভাবসৎ** আছেই, ইহাকে 'করার' প্রশ্ন ত অবান্তর। যদি ইহা মানা যায় যে কর্ম স্বভাবত **অসৎ** এবং ইহাকে অসৎ কর্তার দ্বারা করানো হয়, তাহা হইলে বড়ই বিপদের সম্ভাবনা। কারণ, ইহাতে 'কর্ম' বিনা কারণেই কৃত হইবে এবং কর্তাকেও নির্হেতুক হইতে হইবে। যখন হেতুই না থাকিল, তখন কার্য-কারণের প্রশ্নই উঠে না। কার্য-কারণের ব্যবস্থাই যদি না থাকে, তাহা হইলে কোন কার্য সম্পন্ন হইবার কথাই উঠে না এবং কর্তা, করণাদি কোন বস্তু থাকে না। এই

প্রকারে যদি কোন কিছুর করা-ধরার কথাই না থাকিল, তাহা হইলে ধর্ম এবং অধর্মের চর্চা করা বেকার।[৩৪]

অতএব, স্বভাবতঃ বা নিরপেক্ষতঃ সত্তা নাই, ইহার অভাবও নাই। বরং কার্যের জন্য যেমন কর্তা বা কারকের অপেক্ষা থাকে তদ্রূপ কর্তারও কার্য বা কর্মের অপেক্ষা থাকে। উভয় ব্যতিরেকে সাপেক্ষসিদ্ধি হইতে পারে না। সত্তার সাপেক্ষসিদ্ধি স্বীকার করিলেও ব্যবহারে বিরোধ আসে না, কেন না তত্ত্বচিন্তকও ব্যবহার-সময়ে লোক-প্রমাণের উপরেই চলে। এই লোক-প্রমাণক সত্যকেই 'সংবৃতি সত্য' বলা হয়। সংবৃতি সত্য অনুসারে সত্তাকে নিরপেক্ষ বলা দোষ নহে, কিন্তু পরমার্থ সত্য অনুসারে ইহার সিদ্ধি সাপেক্ষ, নিরপেক্ষ নহে। এই সাপেক্ষতা, সকারণতা এবং পরিবর্তনের নিয়মই নাগার্জুনের মতে 'প্রতীত্যসমুৎপাদ'। প্রতীত্যসমুৎপাদকেই তিনি শূন্যবাদ বলিয়াছেন ঃ "যঃ প্রতীত্যসমুৎপাদঃ শূন্যতাং তাং প্রচক্ষ্মহে।" শূন্যবাদ এত স্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও লোকে যদি ইহাকে ভুল বুঝে ইহাতে শূন্যবাদের প্রবর্তকের দোষ কোথায়? 'ন হ্যেষঃ স্থাণোরপরাধঃ, যদেনমন্ধো ন পশ্যতি, পুরুষাপরাধঃ স ভবতি।'

শূন্যতা বা সাপেক্ষতাবাদের পরে প্রয়োজন হইতেছে সকল প্রকার দৃষ্টিকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চিন্তা করা এবং ইহা বুঝিতে হইবে যে, কিভাবে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত অন্যোন্যসাপেক্ষ। সংসারে কোন কিছুই নিরপেক্ষ নহে এবং নিরপেক্ষ হইতে পারে না। যদি এই কথা সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করা যায় তাহা হইলে মানুষ অনেকানেক সমস্যার সমাধান খুঁজিয়া পাইবে। সকল সমস্যার একমাত্র ঔষধ এবং সাধনা হইতেছে 'শূন্যতা'। ইহাই একমাত্র কষ্টিপাথর যদ্‌দ্বারা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণকে বিচার করা যায়। ইহা স্বতঃ কোন দৃষ্টি নহে। যদি কেহ শূন্যতাকেই 'দৃষ্টি' মানিয়া ইহার চক্করে ফাঁসিয়া যায় তাহা হইলে সে কখনও সত্যের সন্ধান করিতে পারিবে না। উপমা দ্বারা বুঝাইতে হইলে বলা যায় যে, শূন্যতা হইতেছে দাঁড়িপাল্লাসদৃশ যাহার দ্বারা সমস্ত বিচারকে মাপা যায়। দাঁড়িপাল্লার দাঁড়ির উঠা-নামা হইতে বস্তুর লঘুত্ব বা গুরুত্ব নির্ণয় করা যায়। তদ্রূপ শূন্যতা হইতেছে বিচার এবং সিদ্ধান্তসমূহের গুরুত্ব-লঘুত্ব নির্ণায়ক। তাই বুদ্ধগণ (মিথ্যা) দৃষ্টিসমূহের নিঃসরণের জন্য শূন্যতা-সিদ্ধান্তের ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু যে ব্যক্তি শূন্যতাকেই দৃষ্টি মনে করিয়া দৃষ্টিজালে আবদ্ধ হয়, তাহার চিকিৎসা সম্ভব নহে। তাই নাগার্জুন বলিয়াছেন—

"শূন্যতা সর্বদৃষ্টীনাং প্রোক্তা নিস্সরণং জিনৈঃ।
যেষাং তু শূন্যতা দৃষ্টিস্তানসাধ্যান্ বভাষিরে ॥"[৩৫]

বাস্তবিক যদি শূন্যতাকে স্বীকার না করা হয়, তাহা হইলে বাস্তব জগতের ব্যবহারসমূহকে মানিয়া লওয়া কঠিন হইবে। মানুষ মুহূর্তের জন্যও নিষ্ক্রিয় থাকে না। যেখানে ক্রিয়া আছে সেখানে পরিবর্তনও না হইয়া পারে না। পরিবর্তনবাদেরই ত নামান্তর হইতেছে শূন্যতাবাদ। শূন্যতাকে স্বীকার না করিলে সব চাইতে মজার কথা হইবে যে মানুষের কোন কিছু করার প্রয়োজন থাকিবেনা। সংসারে কোন কিছুর উৎপত্তিও হইবে না, কোন কিছুর নিরোধও হইবে না। সংসারে যে বিভিন্ন প্রকার বৈচিত্র্য আছে তাহা আর থাকিবে না। প্রত্যেক পদার্থকে 'স্বাভাবিক' বলিয়া মানিয়া লইলে অর্থাৎ কোন হেতু এবং প্রত্যয় ব্যতিরেকে ইহাদের উৎপত্তি হইয়াছে মানিয়া লইলে সংসার 'কূটস্থ' হইয়া যাইবে। তাই বলা হইয়াছে—

"ন কর্তব্যং ভবেৎ কিঞ্চিৎ অনারব্ধা ক্রিয়া ভবেৎ।
কারকঃ স্যাদকুর্বাণঃ শূন্যতাং প্রতিবাধতঃ ॥
অজাতমনিরুদ্ধং চ কূটস্থং চ ভবিষ্যতি।
বিচিত্রাভিরবস্থাভিঃ স্বভাবে রহিতং জগৎ ॥"[৩৬]

কিন্তু এইরূপ কূটস্থাবস্থাকে মানুষ চিন্তাও করিতে পারে না। নিয়ত পরিবর্তনশীল সংসারে শূন্যতাই একমাত্র সিদ্ধান্ত যাহা সংসারের বিভিন্ন ঘটনাবলীর যথার্থ ব্যাখ্যা করিতে পারে এবং মানুষের নিরাশার মধ্যেও আশার সঞ্চার করিতে পারে। শূন্যতা-সিদ্ধান্তের সাহায্যে ইহা সহজে উপলব্ধি করা যায় যে, সংসারের প্রত্যেক ঘটনা কারণসম্ভূত। সংসারে কোন কিছুই আদিকাল হইতে চলিয়া আসে নাই, বরং বিভিন্ন পরিস্থিতি ইহার নির্মাণ করিয়াছে। প্রত্যেক লৌকিক ও পারলৌকিক সিদ্ধান্ত বিশ্বাস, সামাজিক জীবনের নিয়মাদি বিভিন্ন দেশে নিজ নিজ পরিস্থিতিতে সৃষ্ট হইয়াছে। সংসারের সমস্ত ভাল এবং মন্দ মানুষের নিজ কর্মফলের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে এবং মানুষের সর্বদা এই অধিকার আছে যে, সে যখন চাইবে তখন এইগুলিকে (ভালমন্দ) ইচ্ছানুরূপ পরিবর্তিত করিতে পারিবে। কোন কিছুকে এইজন্য শ্রেয়ঃ বলিয়া মানিয়া লওয়া উচিত নহে যেহেতু ইহা অতীতে কোন ঋষি, মুনি বা মহাত্মা বলিয়া গিয়াছেন। কারণ ঋষি, মুনি বা মহাত্মা স্বয়ংই ত পরিস্থিতির পরিণাম। যাহারা এই সকল মহাত্মার

মধ্যে লোকোত্তরতার আরোপ করিয়া তাহারই দোহাই দিয়া থাকে তাহারা বাস্তবিকই অন্ধ। মহাত্মা ব্যক্তিও সংসার হইতে পৃথক নহেন। বুদ্ধের মধ্যে লোকোত্তরতা আরোপ করিয়া যাহারা তাঁহাকে আকাশে তুলিয়াছেন (অর্থাৎ তাঁহাকে দেব, মহাদেব, ভগবান আখ্যা দিয়াছেন) তাঁহাদের লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে যে, তথাগত হইতেছেন নিঃস্বভাব অর্থাৎ তিনি এক বিশেষ পরিস্থিতির সৃষ্টিমাত্র এবং এই সংসারও তাঁহার ন্যায় নিঃস্বভাব অর্থাৎ বিশেষ পরিস্থিতির সৃষ্টি। তথাগতের যে স্বভাব, জগতেরও সেই স্বভাব। তথাগত নিঃস্বভাব হইলে, জগতও নিঃস্বভাব। যাঁহারা তথাগতকে প্রপঞ্চাতীত লোকাতীত বলিয়া থাকেন তাঁহারা স্বয়ং প্রপঞ্চহত—অর্থাৎ সংসার তাঁহাদের বড় আঘাত দিয়াছে। হয়তঃ সেই আঘাতে বিমূঢ় হইয়া ভয়বিহ্বল হইয়া সংসার হইতে পলায়ন করিতেছে, কিন্তু পলায়ন করিয়া কোথায় যাইবে? তাঁহাদের (জ্ঞান) চক্ষু নাই যদ্‌দ্বারা তাঁহারা তথাগতকে দেখিতে পারেন। নাগার্জুন বলিতেছেন—

> "তথাগতো যৎস্বভাবস্তৎস্বভাবমিদং জগৎ।
> তথাগতো নিঃস্বভাবো নিঃস্বভাবমিদং জগৎ॥
> প্রপঞ্চয়ন্তি যে বুদ্ধং প্রপঞ্চাতীতমব্যয়ম্‌।
> তে প্রপঞ্চহতাঃ সর্বে ন পশ্যন্তি তথাগতম্‌॥"[৩৭]

শূন্যতার সাহায্যে এই কথা স্পষ্ট হয় যে, সংসার এক পরিবর্তনের প্রবাহ। ইহাতে নিরন্তর পরিবর্তন হইতেই থাকিবে। ইহার একইরূপে বর্তমান থাকা বা সর্বথা নষ্ট হইয়া যাইবার কল্পনা বুদ্ধিবাদীদের নিকট গ্রাহ্য নহে। একটি উদাহরণ দ্বারা ইহাকে বুঝানো যাইতে পারে। জগতের পরিবর্তনকে প্রদীপশিখার পরিবর্তনের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। পঞ্চস্কন্ধ প্রদীপের শিখার মত পরিবর্তিত হইতেছে। ঐ পরিবর্তনের প্রবাহে কোথাও অন্ত বা অনন্ত নাই। কয়েকটি বিন্দুর দ্বারা সৃষ্ট বৃত্তে যেমন প্রত্যেক বিন্দু ইহার সম্মুখবর্তী বিন্দু অপেক্ষা সান্ত (অন্তযুক্ত) এবং ইহার পশ্চাদবর্তী বিন্দু অপেক্ষা অনন্ত ঠিক তদ্রূপ সংসারের পরিবর্তনের গোল চক্র দৃষ্টির দ্বারাই সান্ত বা অনন্ত বলিয়া প্রতিভাত হয়। বস্তুতপক্ষে ইহা অন্তযুক্তও নহে, অন্তহীনও নহে। যদি পঞ্চস্কন্ধ পরস্পরের প্রত্যয় দ্বারা প্রথম অবস্থা ত্যাগ বা ভঙ্গ করিয়া দ্বিতীয় অবস্থায় উৎপন্ন না হয়, তাহা হইলে জীব অন্তযুক্ত হইতে পারে। যদি ইহাদের ভঙ্গ বা উৎপত্তি না হয়, তাহা হইলে ইহা অনন্ত হইতে পারে। নাগার্জুনের ভাষায়—

"স্কন্ধানামেষ সন্তানো যস্মাদ্দীপার্চিষামিব।
প্রবর্ততে তস্মান্নান্তানন্তবত্বং চ যুজ্যতে ॥
পূর্বে যদি চ ভজ্যেরন্নুৎপদ্যেরন্নচাপ্যমী।
স্কন্ধাঃ স্কন্ধান্ প্রতীত্যেমানথ লোকোঽন্তবান ভবেৎ ॥
পূর্বে যদি ন ভজ্যেরন্নুৎপদ্যেরন্নচাপ্যমী।
স্কন্ধাঃ স্কন্ধান্ প্রতীত্যেমান্ লোকোঽনন্তো ভবেদথ।"[৩৮]

যাহাই হউক না কেন, সংসারের জন্য শূন্যতার সিদ্ধান্ত খুবই যথার্থ। ইহা বোধগম্যও বটে, ব্যবহারিকও বটে। কিন্তু বোধগম্য না হইলে ইহার দ্বারা যথেষ্ট ক্ষতির সম্ভাবনা। আক্ষরিক অর্থে শূন্যতা শব্দকে দেখিয়া এবং ইহার অর্থ সম্যক্ উপলব্ধি না করিয়া যাহারা শঙ্কিত হইয়া উঠেন এবং ইহা মনে করিয়া বসেন যে জগতের জন্য বিপদ আসন্ন তাহাদের শংকা দূরীভূত হইতে পারে যদি শূন্যতাকে যথার্থতঃ উপলব্ধি করিতে পারেন। শংকরের মত বিদ্বান এবং তাঁহার অনুগামীরাও এই শূন্যতা সিদ্ধান্তের ব্যাপারে যথেষ্ট শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ব্রহ্মসূত্রে[৩৯] শংকর বলিতেছেন—

"বাহ্যার্থ, বিজ্ঞান এবং শূন্যতা এই তিনটি পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া সুগত যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা স্বীয় অসম্বন্ধ প্রলাপকে প্রকটিত করে। 'বিরুদ্ধ অর্থের জ্ঞানের দ্বারা প্রজাগণ মূঢ় হইয়া যাউক' এই ভাবের দ্বারা (পরস্পর বিরুদ্ধ উপদেশ) দিয়া তিনি প্রজাগণের প্রতি নিজ দ্বেষকেই প্রকট করিয়াছেন। অতএব, নিজের মঙ্গলকামী ব্যক্তি অবশ্যই সুগতমতকে গ্রহণ করিবেন না।' এইরকম আক্ষেপের জন্য অবশ্য শংকরকে ততটা দোষী করা যায় না, কারণ তৎকালীন দার্শনিক চিন্তাধারাই ছিল অবৈজ্ঞানিক। শংকর হয়ত জানিতেন না যে বুদ্ধের পরবর্তী সময় হইতে সুরু করিয়া শংকরের আবির্ভাব সময়ের মধ্যে বহু দার্শনিক বিকাশ হইয়াছে। বুদ্ধবচন হইতে কত প্রকারেরই না দার্শনিক মতবাদের বিকাশ হইয়াছে। বাহ্যার্থাস্তিত্ববাদ, বিজ্ঞানবাদ এবং শূন্যবাদ এই ক্রমে কিন্তু বিকশিত হয় নাই। বিজ্ঞানবাদ হইতে শূন্যবাদ অধিক প্রাচীন। শূন্যবাদের সিদ্ধান্ত এবং স্বরূপ সম্বন্ধে শংকরের কোন ধারণাই ছিল না। তাই তিনি কোথাও ইহাকে উদ্ধৃত করেন নাই। ইহাকে শুধু "সর্বপ্রমাণবিপ্রতিষিদ্ধ" বলিয়া আত্মরক্ষার প্রয়াস পাইয়াছেন। যদি শূন্যতার যুক্তিতর্কসমূহের সমীক্ষা করিতেন তাহা

হইলে হয়ত তাঁহার কথাকে অনেক মাহাত্ম্য দেওয়া হইত। কিন্তু তিনি হয়ত তাহার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। যাহা হউক, প্রাচীন লোকেরা যদি কিছু ভুলিয়াও থাকেন, বা ইচ্ছা করিয়া চাপা দিয়া থাকেন, চিন্তার কারণ নাই। কারণ সত্য একদিন প্রকটিত হইবেই। এখন একথা বুঝা কঠিন নহে যে, শূন্যতা 'সর্বপ্রমাণবিপ্রতিষিদ্ধ' নহে, বরং ইহা সকারণতা ও পরিবর্তনের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সকারণতা ও পরিবর্তনের নিয়মের নামই শূন্যতা। তাহার জন্য বলা হইয়াছে—'যিনি শূন্যতাকে যুক্তির দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন তাঁহার নিকট শূন্যতাবিষয়ক সকল কথাই যুক্তিযুক্ত। যিনি যুক্তির দ্বারা শূন্যতাকে উপলব্ধি করেন নাই, তাঁহার নিকট শূন্যতার সকল কথাই অযুক্ত। প্রতীত্যসমুৎপাদ অর্থাৎ সকারণতা এবং পরিবর্তনের নিয়মাবলী শূন্যতার যে বিরোধ করে বলিয়া মনে হয় তাহা সমস্তই লৌকিক ব্যবহার-সমূহেরই বিরোধ করে। দুর্গৃহীত সর্প এবং দুষ্প্রসাধিত বিদ্যা যেমন আত্মবিনাশের কারণ হয়, তদ্রূপ যথার্থভাবে অজ্ঞাত শূন্যতাও মূর্খের বিনাশ সাধন করিয়া থাকে। নাগার্জুন বলিতেছেন—

"সর্বং চ যুজ্যতে যস্য শূন্যতা যস্য যুজ্যতে।
সর্বং ন যুজ্যতে তস্য শূন্যতা যস্য ন যুজ্যতে ॥
সর্বসংব্যবহারাংশ্চ লৌকিকান্ প্রতিবাধসে।
যৎপ্রতীত্যসমুৎপাদশূন্যতাং প্রতিবাধসে ॥
বিনাশয়তি দুর্দৃষ্টা শূন্যতা মন্দমেধসম্।
সর্পো যথা দুর্গৃহীতো বিদ্যা বা দুষ্প্রসাধিতা ॥"

সাংসারিক ব্যবহারের জন্য শূন্যতার উপলব্ধি যতটা প্রয়োজন, পারলৌকিক ব্যবহারের জন্যও ততটা প্রয়োজন। নাগার্জুনের পূর্বে শ্রমণব্রাহ্মণগণ মোক্ষের উপর বেশী জোর দিতেন। মোক্ষলাভের জন্য তৃষ্ণাকে নিরুদ্ধ করিতে তাঁহারা শিক্ষা দিতেন। নাগার্জুন ঐ শিক্ষা এবং তাহা হইতে প্রচলিত প্রবৃত্তিসমূহকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। তিনি দেখিয়াছেন যে, মুক্তি লাভেচ্ছুগণ সংসার ত্যাগ করিয়াও তৃষ্ণামুক্ত হইতে পারেন নাই। সংসারী ব্যক্তি তৃষ্ণার বশবর্তী হইয়া অনেক কর্ম করিয়া থাকে যাহা ক্ষতিকর, কিন্তু মুক্তিলাভের জন্য যাহাদের তৃষ্ণা আছে তাহারা আরও বেশী কিছু করিয়া থাকে যাহা অত্যধিক ক্ষতিকর। এই বিষয়ে সন্দেহের নিরসন হইবে যদি আমরা মুক্তির বিষয়ে প্রাচীন লোকদের

উক্তি বিচার করি "মুক্তিতে শুধু আনন্দ আর আনন্দ, আর এই আনন্দ সংসারের আনন্দ অপেক্ষা অনেক গুণ বেশী।" মোক্ষে যাহারা পরম সুখের কল্পনা করে তাহাদের উদ্দেশ্যে বাৎস্যায়ন (খৃঃ ৪র্থ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ) বলিয়াছেন ঃ "সংসারের অনিত্য সুখকে ত্যাগ করিয়া যেমন মুক্তির নিত্য সুখের কথা কল্পনা করিয়া থাক তেমন দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি যাহা ইহলোকে অনিত্য সেইগুলিকেও মুক্তিতে নিত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লও। তাহা হইলে বৈদান্তিকদের ঐকাত্ম্য তোমাতেও সিদ্ধ হইবে।"[৪০] কিন্তু বাৎস্যায়নের বহু পূর্বে নাগার্জুন বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি মনে করেন 'উপাদান-রহিত হইয়া নির্বাণ লাভ করিব'—তিনি বাস্তবিকপক্ষে আরও বড় উপাদান গ্রহণ করিয়া থাকেন—

> "নির্বাস্যাম্যনুপাদানো নির্বাণং মে ভবিষ্যতি।
> ইতি যেষাং গ্রহস্তেষামুপাদানমহাগ্রহঃ ॥[৪১]

এইভাবে নাগার্জুন লোক হইতে পরলোক পর্যন্ত সমস্ত প্রজ্ঞপ্তিকে গুরুত্ব সহকারে পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন এবং দেখিয়াছেন যে ব্যবহারিক সত্তাসমূহ পরস্পরসাপেক্ষ। যাহার ব্যবহার হয় তাহার সমস্তই সাপেক্ষ সৎ, কিন্তু তত্ত্ব ব্যবহারের ঊর্ধ্বে, কেন না ধর্মমাত্র বস্তুতঃ না উৎপন্ন হয়, না নিরুদ্ধ হয়। উৎপাদন এবং নিরোধ শুধুমাত্র ব্যবহার-সত্তার জন্য। বস্তুতঃ একই বস্তু যখন পরিবর্তন প্রবাহে অন্যরূপ ধারণ করে, তখন যদি ঐ রূপ আমাদের উপযোগী হয়, আমরা বলিয়া থাকি যে 'রূপ উৎপন্ন হইয়াছে।' আর যদি আমাদের অনুপযোগী হয় তখন বলিয়া থাকি যে 'রূপের বিনাশ হইয়াছে।' উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ভুজিয়াওয়ালা প্রতিদিন মন মন ধান ভাজিয়া খই-মুড়ি তৈয়ার করে। লোকেরা ঘরের ধান ভাজাইয়া ভুজিয়া-ওয়ালা হইতে ক্রয় করিয়া খই-মুড়ি খাইয়া থাকে। কিন্তু কখনও একথা ভাবে না যে ভুজিয়াওয়ালা ধানকে রূপান্তরিত করিয়া নষ্ট করিয়াছে। সকলেই মনে করে যে ভুজিয়াওয়ালা খই-মুড়ি বানাইয়াছে। আনন্দের সঙ্গে তাহা খাইয়া থাকে। কিন্তু ক্ষেতে বোনার জন্য ঘরে রাখা ধান যদি এইভাবে ভাজিয়া খই-মুড়ি করা হয়, তখন লোকে বলে বীজধানের সর্বনাশ হইয়া গেল। এই দুই প্রকার উদাহরণের মধ্যে ধানের রূপান্তর একই হইলেও ব্যবহারের দিক হইতে ভেদ আছে। তদ্রূপ গভীরভাবে চিন্তা করিলে বুঝা যাইবে যে উৎপাদ এবং নিরোধের মধ্যে আসলে কোন সম্বন্ধ নাই।

পরিবর্তনের প্রবাহে আমরা ইচ্ছানুসারে কখনও উৎপাদের ব্যবহার করি, কখনও নিরোধের ব্যবহার করি। যদি আমাদের ইচ্ছা না থাকে, তৃষ্ণা না থাকে, তাহা হইলে ঐ জাতীয় ব্যবহারেরও প্রয়োজন থাকিবে না। এই জন্যই বলা হইয়াছে—"যদি চিত্তগোচর কিছু না থাকে, তাহা হইলে ত আর কথাই নাই। কারণ ধর্মতা নির্বাণের ন্যায় উৎপন্নও হয় না, নিরুদ্ধও হয় না। এইরূপ উৎপাদ-নিরোধহীন অবস্থায় চিত্ত-প্রবৃত্তিই বা কি করিয়া সম্ভব? যদি চিত্তপ্রবৃত্তিই না থাকে তাহা হইলে ত আর বলিবার কিছুই থাকে না। নাগার্জুনের ভাষায়—

"নিবৃত্তমভিধাতব্যং নিবৃত্তে চিত্তগোচরে।
অনুৎপন্নানিরুদ্ধা হি নির্বাণমিব ধর্মতা।"[৪২]

শূন্যতা বা পরিবর্তনের তেজপ্রবাহ ব্যবহারের ঊর্ধ্বে, কারণ ইহা নির্বিকল্প; আবার পরিবর্তনের প্রবাহ অনানার্থ; কিন্তু এই তত্ত্ব অনির্বচনীয়, অথচ বুদ্ধিগ্রাহ্য। তত্ত্বের বাস্তবিক স্বরূপ ইহাই। তথাপি যদি ইহা বোধগম্য না হয় তাহা হইলে প্রতীত্যসমুৎপাদের সাহায্যে ইহা বুঝালে সম্ভব যে, যে বস্তু হেতু-প্রত্যয়োৎপন্ন ইহা হেতু-প্রত্যয় হইতে সর্বথা ভিন্নও নহে, আবার অভিন্নও নহে। যেমন বীজ হইতে অংকুর ভিন্নও নহে, অভিন্নও নহে। এইজন্য কোন বস্তু শাশ্বতও নহে, আর কোন কিছুর উচ্ছেদও হয় না। অতএব, অশাশ্বতানুচ্ছেদ স্বরূপদ্বয়কে সম্মিলিত করিলে বলা যায় যে, তত্ত্ব হইতেছে অনেকার্থ, অনানার্থ, অনুচ্ছেদ এবং অশাশ্বত এবং ইহাই লোকনাথ বুদ্ধগণের শাসনামৃত:

"অপরপ্রত্যয়ং শান্তং প্রপঞ্চৈরপ্রপঞ্চিতম্।
নির্বিকল্পমনানার্থমেতত্তত্ত্বস্য লক্ষণম্॥
প্রতীত্য যদ্‌যদ্ ভবতি নহি তাবত্তদেব তৎ।
ন চান্যদপি তত্তস্মান্নোচ্ছিন্নং নাপি শাশ্বতম্॥
অনেকার্থমনানার্থমনুচ্ছেদমশাশ্বতম্।
এতত্তল্লোকনাথানাং বুদ্ধানাং শাসনামৃতম্॥"[৪৩]

শূন্যতার স্বরূপের দ্বারা তত্ত্বসম্বন্ধীয় এত কিছু উপলব্ধি করিলে ব্যবহারের সমস্ত বিষমতা ও বিরোধ উপলব্ধ হয় এবং ইহাদের সংগতি উৎপন্ন হয়। আর ইহাও উপলব্ধি করা সহজ হইবে যে, বুদ্ধের নিজ অভিপ্রায় কি ছিল এবং তাঁহার উপদেশের মধ্যে লৌকিক কথা কতটা ছিল। বুদ্ধের

অভিপ্রায় ছিল যে, শূন্যতাই হইতেছে পরমার্থ সত্য। শূন্যতার সাহায্যে আমরা দেখিয়াছি যে, ব্যবহারিক সমস্ত কিছুই পরস্পরসাপেক্ষ। সাধারণ লোকের নিকট যাহা তথ্য ব্যবহারদশায় তত্ত্বজ্ঞের নিকটও তাহাই তথ্য। সাধারণ লোক যখন তত্ত্বের দিকে ঝুঁকিতে শুরু করে, তখন পূর্বে যাহাকে সে তথ্য বলিয়া জানিত এখন তাহাই অতথ্যরূপে তাহার নিকট প্রকটিত হয়। কিছু বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইহাও জানে যে, তত্ত্বজ্ঞের হিসাবে কোন বস্তু অতথ্য এবং সাধারণ লোকের হিসাবে কোন বস্তু তথ্য। কিন্তু যাঁহারা বহুকাল ধরিয়া তত্ত্বচিন্তা করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে, অতথ্য বলিয়াও কিছু নাই, তথ্য বলিয়াও কিছু নাই। একটি উদাহরণ সহযোগে ইহাকে বুঝানো যাইতে পারে। আচার্য্য আর্যদেব বলিয়াছেন ঃ যে হীন ব্যক্তি পাপরত থাকে মহাত্মাগণ তাহার নিকট আত্মার সদ্‌গতি ও দুর্গতির কথা জানাইয়া তাহাকে পাপকর্ম হইতে নিবৃত্ত হইবার উপদেশ দিয়া থাকেন। আর যাঁহারা স্বর্গকামী হইয়া পুণ্যকর্মরত থাকেন তাঁহারা তাঁহাদের নিকট অনাত্মবাদের উপদেশ দিয়া স্বর্গাদির আসক্তি হইতে তাঁহাদের মুক্ত করেন। কিন্তু যে ব্যক্তি এই উভয় প্রকার ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান তাঁহাকে মহাত্মাগণ আত্মা এবং অনাত্মা উভয় প্রপঞ্চ হইতে মুক্ত থাকিবার উপদেশ দিয়া থাকেন। যেমন,

"বারণং প্রাগপুণ্যস্য মধ্যে কারণমাত্মনঃ।
সর্বস্য করণং পশ্চাদ্‌যো জানীতে স বুদ্ধিমান্‌ ॥"[৪৪]

অল্পপ্রাজ্ঞ লোকদের কথা চিন্তা করিয়া বুদ্ধ পরলোকের চর্চা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, ইহজীবনে মৃত্যুর পরেই জীবনের শেষ হয় না। কিন্তু যাহারা ভ্রমবশতঃ কোন নিত্যলোকের প্রাপ্তির আশায় কুশলাভ্যাসে রত, তাঁহাদের সেই ভ্রম দূরীকরণার্থ বুদ্ধ অনাত্মবাদের উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা অধিক জ্ঞানী তাঁহাদের জন্য আত্মা বা অনাত্মা কোনটারই বিষয়ে উপদেশ দেন নাই। নাগার্জুনের ভাষায়—

"আত্মেত্যপি প্রজ্ঞপিতং অনাত্মেত্যপি দেশিতম্‌।
বুদ্ধৈর্নাত্মা ন চানাত্মা কশ্চিদিত্যপি দেশিতম্‌ ॥"[৪৫]

এইভাবে সংসারের ব্যবহারের সকল অসংগতি শূন্যতার সাহায্যে সঙ্গত হইয়া যায়। বুদ্ধ যে প্রতীত্যসমুৎপাদের উপদেশ দিয়াছেন তাহাকেই 'শূন্যতা' শব্দ দ্বারা নাগার্জুন বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই শূন্যতাকে উপলব্ধি করা কঠিন নহে। বুদ্ধ নিজেও জানিতেন যে, প্রতীত্যসমুৎপাদ সম্পূর্ণরূপে

লোকদের বুঝাইয়া দেওয়া অসম্ভব। কারণ ইহা অতর্কাবচর। তর্কের দ্বারা বুদ্ধবাণী হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন, কারণ, বুদ্ধবাণী ব্যক্তিগতভাবে উপলব্ধির বিষয়। বিনয়পিটকে বলা হইয়াছে—"বুদ্ধত্ব লাভের পরে বুদ্ধের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—আমি ধর্মোপদেশ করিব, অথচ লোকে বুঝিবে না ইহা আমার নিকট বেদনাদায়ক হইবে। সেই সময় ব্রহ্মা বুদ্ধের মনের কথা জানিতে পারিয়া চিন্তা করিলেন—আরে, জগতের সর্বনাশ হইয়া যাইবে যদি বুদ্ধের চিত্ত ধর্মদেশনার প্রতি নমিত না হয়। ইহা চিন্তা করিয়া ব্রহ্মা বুদ্ধের নিকট আসিলেন এবং প্রার্থনা করিলেন—ভগবান্ ধর্মদেশনা করুন। হে সুগত ধর্মদেশনা করুন। আপনার ধর্ম শ্রবণ না করিলে প্রাণীদের অনেক হানি হইবে।" ব্রহ্মার প্রার্থনাতে বুদ্ধ ধর্মপ্রচার করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। এই ঘটনা হইতে ইহা বুঝা যায় যে, বুদ্ধ জানিতেন তাঁহার ধর্মপ্রচারকালে তাঁহাকে অনেক বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হইবে, কারণ তখনকার সমাজ বুদ্ধবাণী উপলব্ধি করার উপযুক্ত ছিল না। নাগার্জুন ইহারই পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিয়াছেন যে, যথার্থভাবে গৃহীত না হইলে শূন্যতা মূর্খের সর্বনাশ সাধন করিবে, যেমন দুর্গৃহীত সর্প এবং যথার্থতঃ অসিদ্ধ বিদ্যা গ্রহীতার সর্বনাশ করে। এইজন্যই বুদ্ধের মন ধর্মদেশনার প্রতি প্রথমে নমিত হয় নাই, কারণ তিনি জানিতেন যে মন্দবুদ্ধি লোকেরা সহজে তাঁহার ধর্মোপদেশ উপলব্ধি করিতে পারিবে না। নাগার্জুন বলিতেছেন—

"বিনাশয়তি দুর্দৃষ্টা শূন্যতা মন্দমেধসাম্।
সর্পো যথা দুর্গৃহীতো বিদ্যা বা দুষ্প্রসাধিতা ॥
অতশ্চ প্রত্যুদাবৃত্তং চিত্তং দেশয়িতুং মুনেঃ।
ধর্মং মত্বাস্য ধর্মস্য মন্দৈর্দুরবগাহতাম্ ॥"[৪৬]

শূন্যবাদের দার্শনিক দৃষ্টি ধার্মিক সাধনার ক্ষেত্রে অনেক উপযোগী। ভারতীয় তত্ত্বচিন্তকগণ এই বিষয়ে একমত যে, মানুষের তৃষ্ণাই তাহার দুঃখের কারণ। তৃষ্ণা কেন হয়? বুদ্ধের বিচারে তৃষ্ণার কারণ হইতেছে আত্মদৃষ্টি। আত্মদৃষ্টির অভিপ্রায় হইতেছে দেহাভ্যন্তরে একটি নিত্য আত্মাকে স্বীকার করা। নিত্য শব্দের অভিপ্রায় হইতেছে অপরিবর্তনশীল। যে বস্তুর প্রতি আমার বিশ্বাস আছে যে ইহা চিরস্থায়ী তাহার প্রতি আমার রাগ (=আসক্তি) হওয়া স্বাভাবিক। শুধু আত্মা কেন, আমাদের দার্শনিকগণ আরও অনেক

কিছুকে নিত্য বলিয়া মানিয়াছেন। চার্বাক একেবারেই অধ্যাত্মবাদী ছিলেন না। খাও দাও, আনন্দফূর্তি কর—ইহাই ছিল তাঁহার দর্শন। কিন্তু ইহার দ্বারা এ কথা মনে করা ঠিক হইবে না যে চার্বাক দর্শনের প্রবর্তক বৃহস্পতি অনাচারের প্রচার করিয়াছেন। অবশ্য একথা ঠিক যে তাঁহারা ভৌতিকবাদী ছিলেন এবং এতই ভৌতিকবাদী যে ইন্দ্রিয়জন্য সুখই তাঁহারা সারবস্তু বলিয়া মনে করিতেন। চার্বাক দর্শনে বলা হইয়াছে—

> "ত্যাজ্যং সুখং বিষয়সংগমজন্ম পুংসাং
> দুঃখোপসৃষ্টমিতি মূর্খবিচারণৈষা।
> ব্রীহীন্ জিহাসতি সিতোত্তমতণ্ডুলাঢ্যান্
> কো নাম ভোস্তুষকণোপহিতান্ হিতার্থী॥"

বিষয়ভোগের দ্বারা উৎপন্ন সুখ এইজন্যই ত্যাজ্য যে তাহা দুঃখানুবদ্ধ এই কথা মূর্খরাই চিন্তা করিয়া থাকে। হিতার্থী এমন কে আছে যে শ্বেত ও উত্তম তণ্ডুলযুক্ত ধান্যকে ত্যাগ করে, যেহেতু তাহা কণোপহিত (ভূসী-যুক্ত)?

এইরকম উগ্র ভৌতিকবাদীও তত্ত্ববাদকে নিত্যদৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। ক্ষিতি, অপ্, তেজ্, এবং বায়ু—এই চারিটাই মাত্র তত্ত্ব যাহার দ্বারা চার্বাক মনে করেন যে বিশ্বের বিকাশ হইয়াছে, এবং এই তত্ত্বসমূহের পরমাণু তাঁহার দৃষ্টিতে নিত্য। তীর্থংকর মহাবীরের (বুদ্ধের সমকালীন) মতে জৈনরা ঈশ্বরকে স্বীকার করে না, কিন্তু নিত্য আত্মাকে স্বীকার করে। কপিলেরও একই অবস্থা। তাঁহার মতে পুরুষ এবং প্রকৃতি উভয়ই নিত্য। কণাদের (খৃঃ ২য় শতাব্দী) মতে জীব, ঈশ্বর, ক্ষিতি, অপ্, তেজ্, এবং বায়ুর পরমাণু, আকাশ, কাল, দিক্ এবং মন নিত্য। মীমাংসক (=যাজ্ঞিক) বেদ এবং জগৎকে নিত্য বলিয়া মানেন। উপনিষদের দার্শনিক ব্রহ্ম বা আত্মাকে নিত্য বলিয়া মানেন। বুদ্ধের পূর্বেও নিত্যবাদী মত ছিল, পরেও নিত্যবাদী মত রহিয়াছে। কিন্তু বুদ্ধ এবং তাঁহার অনুগামীরা কেবল আত্মাই নহে, কোন বস্তুকেই নিত্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই। পুনর্জন্ম, কর্মফল, স্বর্গ-নরক, মোক্ষ ইত্যাদিকে বৌদ্ধরা অস্বীকার করেন নাই, কিন্তু কেন অস্বীকার করেন নাই তাহার যুক্তি যত্রতত্র দিয়াছেন; কিন্তু আত্মার নিত্যত্ব বিষয়ে তাঁহারা কোন প্রকার আপোষ করেন নাই। তাঁহারা পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, নিত্য আত্মা বলিয়া কিছু নাই। কিন্তু

বুদ্ধ কেন নিত্য ও অপরিবর্তনশীল আত্মাকে অস্বীকার করিয়াছেন? পালি মজ্ঝিমনিকায়ের 'সব্বাসব সুত্তন্তে' ইহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে : মানুষ নিজের জীবন সম্বন্ধে কতই না মিথ্যা কল্পনা করিয়া থাকে। বর্তমান জীবন সম্বন্ধে সে ভাবে—আমি কি? আমি কিরূপ? প্রাণিকুল কোথা হইতে আসিয়াছে? কোথায় যাইবে?—নিজের অতীত জন্ম সম্বন্ধেও সে চিন্তা করে—আমি পূর্বে ছিলাম, কি ছিলাম না? কি ছিলাম? কেমন ছিলাম? কি হইয়া কি হইয়াছি?—ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও সে চিন্তা করে—আমি ভবিষ্যতে হইব, কি হইব না? কি হইব? কেমন হইব? কি হইয়া কি হইব? —ইত্যাদি প্রকার জল্পনা-কল্পনা হইতে দেখা যায় যে নিম্নলিখিত ছয় প্রকার মিথ্যাদৃষ্টির কোন না কোন একটি তাহাদের নিকট উৎপন্ন হয় :—

১। আমার আত্মা আছে।

২। আমার ভিতরে আত্মা নাই।

৩। আত্মাই ত আত্মা।

৪। আত্মাই অনাত্মা।

৫। অনাত্মাই আত্মা।

৬। আত্মা অবিপরিণামধর্মী, অনন্তকাল ধরিয়া অপরিবর্তিত থাকিবে।

উক্তপ্রকার জল্পনা-কল্পনার ফলে মানুষের মধ্যে তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, ভবতৃষ্ণা উৎপন্ন হয় এবং অবিদ্যাতৃষ্ণা উৎপন্ন হয়। আমার আত্মা আছে কি নাই, এই জল্পনা হইতে সমস্ত প্রকার কামনা জাগিয়া উঠে। আত্মার অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব বিষয়ক জল্পনা হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারিলে সব সমস্যার সমাধান হইয়া যায়। তৃষ্ণার জন্য ত আলম্বন চাই, যাহার উপর ভিত্তি করিয়া তৃষ্ণা টিকিয়া থাকে। যদি আলম্বনই না থাকে, তাহা হইলে তৃষ্ণা টিকিবে কি করিয়া? আচার্য্য শান্তিদেব বলিয়াছেন—

> "যদা ন ভাবো নাভাবো মতেঃ সন্তিষ্ঠতে পুরঃ।
> তদান্যগত্যভাবেন নিরালম্বা প্রশাম্যতি ॥"[৪৭]

যদি বুদ্ধির সামনে ভাবও না থাকে অভাবও না থাকে, তখন অনন্যোপায় তথা আলম্বনরহিত হওয়াতে বুদ্ধি শান্তিলাভ করে।

যথার্থ সত্যানুভূতির বলে এই কথা বলা হইয়াছে। আমাদের মনে বিক্ষোভ উভয় অবস্থাতেই হইয়া থাকে। কোন বস্তুর অভাব হইলে তাহার জন্য আমাদের চিন্তা থাকে, হয়রানি হয়, দুশ্চিন্তা হয়। তদ্রূপ যাহা

আমাদের নিকট আছে অর্থাৎ যাহার অভাব নাই, তাহার জন্যও আমাদের চিন্তার অবধি থাকে না। আত্মা আছে এবং আত্মা থাকিবে ইহা চিন্তা করিয়া আমাদের মনে নানা রকম চিন্তার উদ্রেক হয়। আত্মা বলিয়া কিছুই নাই, 'আমি থাকিবনা' এই চিন্তা হইতেও আমাদের শান্তিভঙ্গ হয়। শান্তি তখনই পাওয়া যাইতে পারে যদি আমরা 'আত্মা আছে' এবং 'আত্মা নাই' এই উভয় চিন্তা হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিতে পারি। অতএব, ভাববাদ, অভাববাদ, শাশ্বতবাদ এবং উচ্ছেদবাদ হইতে মুক্ত হইয়া প্রতীত্যসমুৎপাদরূপী শূন্যবাদে যতক্ষণ না স্থিত হইতে পারা যায়, ততক্ষণ নানা প্রকার বিভ্রান্তি হইতে মুক্তি পাওয়া কঠিন। অতএব শান্তি কোথায় ?

'প্রতীত্যসমুৎপাদ' হইতেছে সকারণতা এবং পরিবর্তনশীলতার নিয়ম। এই বিষয়ে অনেক অনেক চর্চা হইয়াছে। এখানে তাদৃশ একটি চর্চার উল্লেখ করিলে অসংগত হইবে না আশা করি। (ক) ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীলতার নিয়মানুসারে যে আত্মা কর্ম করে তাহা ফলভোগ কালে অন্যরূপ ধারণ করে, একই রকম থাকে না। এবং যে কর্ম করিয়াছে সে ত থাকে না, বরং যে কর্ম করে নাই সেই ফলভোগ করে। এই আপত্তিকে বলা হইয়াছে কৃতহানি এবং অকৃতাভ্যাগম। ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল আত্মা বিষয়ে এই আপত্তি করা হইয়াছে। (খ) এখন, নিত্য বা কূটস্থ অথবা অপরিবর্তনশীল আত্মা বিষয়ে তর্কের অবতারণা করা যাইতে পারে। এই তর্কের মর্ম হইতেছে —যে কর্ম করে, সে ফলভোগ করে। কিন্তু নিত্য আত্মা ত কূটস্থ এবং অপরিবর্তনশীল। ক্রিয়া ত পরিবর্তনশীলতারই ধর্ম। যাহার মধ্যে ক্রিয়া আছে তাহাতে পরিবর্তন না হইয়া পারে না। কিন্তু আত্মাকে নিষ্ক্রিয় মানিয়াও তাহাকে কর্তা ও ভোক্তারূপে স্বীকার করা হইয়াছে। তাহা কিভাবে ? আত্মা ত কর্তা নহে, শরীরই কর্তা। কিন্তু যে শরীর কর্ম করার সময় বর্তমান থাকে, ফলভোগ করার সময় তাহা আর থাকে না। ফলতঃ নিষ্ক্রিয় আত্মা যে শরীরকে কর্তা করিয়া কর্ম করায় তাহাকে কর্মের ফলভোক্তা করায় না। ফলে এই স্থলেও আপত্তি হয়, যাহা অনাত্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এখানেও কৃতহানি ও অকৃতাভ্যাগম দোষ হইয়া থাকে। অনাত্মবাদের উপর কৃত আপত্তিকে স্বীকার করিয়া শান্তিদেব বলিয়াছেন ঃ অনাত্মবাদের দৃষ্টিতে কর্তাই ভোক্তা হয় না। একথা সত্য তথাপি অন্যদিকে বিচার করিলে উভয়কে (কর্তা ও ভোক্তা) এক বলিয়া মানা যাইতে পারে।

প্রতিক্ষণে পরিবর্তনশীল আত্মভাবের পরম্পরা চলিতেই থাকে এবং এই পরম্পরার কারণে তাহাতে একত্বের চিন্তা করা হইয়া থাকে। কোন প্রকারে যদি ইহারা এক হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহাদিগকে কর্তা এবং ভোক্তা বলিয়া মানিয়া লইতে বাধা থাকে না। শান্তিদেব বলিতেছেন—

"হেতুমান্ ফলযোগীতি দৃশ্যতে নৈষ সম্ভবঃ।
সন্তানস্যৈক্যমাশ্রিত্য কর্তাভোক্তেতি দেশিতম্ ।।"[৪৮]

যাহা হউক, ইহা ত হইল দার্শনিকদের তর্কবাদ। বিচার করিয়া দেখিলে ইহা ঠিকও হইতে পারে, আবার ইহাতে কিছু গলদও দেখা যাইতে পারে। কিন্তু দেখিতে হইবে যে, এই নৈরাত্ম্যবাদ হইতে আমাদের জীবনে কি সহায়তা পাওয়া যাইতে পারে। আত্মবাদের নিষেধের জন্যই নৈরাত্ম্যবাদের প্রয়োজন। কিন্তু আত্মবাদ সম্বন্ধে বুদ্ধ বা তাঁহার অনুগামীদের ত কোন বিদ্বেষ ছিলনা, তাহা হইলে তাঁহারা ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিবেন কেন! তাঁহারা প্রত্যাখ্যান করেন নাই, নিষ্প্রয়োজন বলিয়া অনাদর করিয়াছেন। এখন দেখিতে হইবে কেন তাঁহারা 'আত্মবাদকে' অনাদর করিয়াছেন। বুদ্ধ বলিয়াছেন—

"পুত্তামথি ধনমথি ইতি বালো বিহঞ্‌ঞতি।
অত্তা হি অত্তনো নত্থি কুতো পুত্তা কুতো ধনং ।।[৪৯]

'আমার পুত্র', 'আমার ধন', এই বলিয়া সোচনা করিয়া অজ্ঞানী ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়। নিজেই নিজের নহে ; পুত্র বা ধন কি করিয়া নিজের হইবে? আত্মবাদে যে দোষ আছে তাহা বুঝাইতে নাগার্জুন বলিয়াছেন—

"আত্মনি সতি পরসংজ্ঞা স্বপরবিভাগাৎ পরিগ্রহদ্বেষৌ।
অনয়োঃ সম্প্রতিবদ্ধা সর্বে দোষাঃ প্রজায়ন্তে ।।"[৫০]

আত্মা বা আত্মনীয়তা হইলেই পরভাব উৎপন্ন হয়। আবার নিজপর ভেদ হইলে, একজনকে আমাদের ভাল লাগে, অন্যজনকে ভাল লাগে না, একজনকে চাই, অন্যজনকে চাই না। অর্থাৎ কাহারও প্রতি আমাদের রাগ বা আসক্তি জন্মায়, কাহারও প্রতি বিদ্বেষ বা ঘৃণা। এই উভয় কারণ সমস্ত অনিষ্টের মূল। বুদ্ধ এই আত্মবাদের দৃষ্টিকে কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা ও অবিদ্যাতৃষ্ণার উৎপাদক বলিয়াছেন। অতএব, একথা স্পষ্ট যে, তিনি আধ্যাত্মিক জীবনে সহায়তা দানের জন্যই অনাত্মবাদের প্রতিবেদন করিয়াছেন। অনাত্মবাদের সাহায্যে তিনি জীবনে ঐ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছেন যাহাতে রাগ বা আসক্তির কারণে সংকট উৎপন্ন না হয় অন্যদিকে

দ্বেষ এবং মোহের কারণে সংঘর্ষ উৎপন্ন হয় না। শূন্যবাদের স্বরূপ এবং প্রয়োজন সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা হইয়াছে। এখন ঐ যুক্তিগুলি বিচার্য্য যদ্দ্বারা শূন্যবাদকে প্রত্যাখ্যান বা সমর্থন করা হইয়াছে। এই বিষয়ে "বিগ্রহব্যাবর্তনীতে প্রদত্ত প্রশ্নোত্তরের অবতারণা করা হইতেছে ঃ—

প্রশ্ন ঃ শূন্যতা ঠিক নহে, কেননা যে শব্দনিচয়ের দ্বারা তোমরা যুক্তি প্রদর্শন করিতেছ, সেইগুলি নিজেরাই শূন্য। ইহাদের দ্বারা কোন কিছু সিদ্ধ হইতে পারে না।

উত্তর ঃ হেতুপ্রত্যয়ের দ্বারা উৎপন্ন সমস্ত বস্তুই শূন্য। নিঃস্বভাব। আমার কথাও তদ্রূপ নিঃস্বভাব হওয়াতে শূন্য। ইহা হইতেই প্রকট হয় যে শূন্যতা যথার্থতঃ ঠিক।

প্রশ্ন ঃ শূন্যতাকে সিদ্ধ করার জন্য কোন প্রমাণ নাই।

উত্তর ঃ প্রমাণ যদি কোন বস্তু হইত তাহা হইলে তাহার দ্বারা শূন্যতা সিদ্ধির কথা উঠিত, কিন্তু প্রমাণ স্বয়ংই নিজমধ্যে অসিদ্ধ। যদি প্রমাণকে দ্বিতীয় কোন প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ করা যায় তাহা হইলে তাহা আর প্রমাণ থাকিবে না, 'প্রমেয়' হইয়া যাইবে। উহাকে প্রমেয় দ্বারাও সিদ্ধ করা যায় না, কেননা প্রমেয়ও স্বয়ং অসিদ্ধ।

অবশ্য 'প্রমাণ' সম্বন্ধে নাগার্জুনের যে সংশয় ও জিজ্ঞাসা অক্ষপাদ (খৃঃ তৃতীয় শতাব্দীর পূর্বার্ধ) তাহার সমাধান করিয়াছেন। অক্ষপাদের বক্তব্য—তুলাদণ্ড দ্বারা যখন কোন বস্তুর ওজন করা হয়, তখন তুলাদণ্ড হয় 'প্রমাণ'। আবার সেহ তুলাদণ্ডকে যখন অন্য তুলাদণ্ড বা ঐ ওজনের অন্য দ্রব্য দ্বারা মাপা যায় তখন পূর্বের তুলাদণ্ড হইয়া যায় 'প্রমেয়'। অতএব একই দ্রব্যের মধ্যে প্রমাণ ও প্রমেয় উভয়ই সিদ্ধ হইতে পারে। "প্রমেয়া তুলা প্রামাণ্যবৎ।" অক্ষপাদ শূন্যবাদ-সিদ্ধান্ত অনুসারেই উত্তর দিয়াছেন। অপেক্ষা দৃষ্টিতে কোন দ্রব্য কখনও প্রমাণ এবং কখনও প্রমেয় হইতে পারে এই বিষয়ে নাগার্জুনের দ্বিমত নাই। কিন্তু নাগার্জুনের আক্ষেপের অভিপ্রায় হইতেছে এই যে, স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ বলিয়া কোন বস্তু নাই এবং ইহাকে অন্য কোন বস্তুর দ্বারাও সিদ্ধ করা যায় না, কেন না যখন কোন স্বতঃসিদ্ধ বস্তু থাকে তখনই তাহা সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু তাদৃশ কোন বস্তু ত নাই। এখন প্রশ্ন হইতেছে অপেক্ষা দৃষ্টিতে কি করিয়া প্রমাণসমূহকে সিদ্ধ করা যায়। নাগার্জুনেরও ত তাহাই অভিপ্রায়।

প্রশ্ন : মানুষ কোন কথাকে ভাল বলে, কোন কথাকে মন্দ। সেই ভালত্ব এবং মন্দত্ব স্বভাবতই বর্তমান আছে। ইহাদের শূন্যতা সিদ্ধ করা যায় না।

উত্তর : শূন্যতা ভালত্ব ও মন্দত্বের বিরোধ করে না, বরং যদি শূন্যতা না থাকিত তাহা হইলে ভালত্ব এবং মন্দত্বের ভেদ কল্পনা করাও কঠিন হইয়া যাইত। যদি ভাল এবং মন্দের ভেদ শূন্য হইত অর্থাৎ প্রতীত্যসমুৎপন্ন বা হেতুপ্রত্যয়জাত না হইয়া স্বভাবজাত হইত, তাহা হইলে তাহাতে কোন অদলবদলই হইত না। ব্রহ্মচর্যাদি ধার্মিক অনুষ্ঠান সমূহের কোন প্রয়োজনই থাকিত না কেননা ভাল-মন্দ বা কুশল এবং অকুশল হইতে কুশল (=ভাল)-কে বাড়ানো সম্ভব হইত না। আবার অকুশল (=মন্দ)কে দূর করাও যাইত না।

মাধ্যমিক-কারিকাতে আরও স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে : "যদি এই সমস্ত কিছু অশূন্য নয়, প্রতীত্যসমুৎপন্ন না হয়, তাহা হইলে উদয়-ব্যয় (নিরোধ)ও নাই। তাহা হইলে আপনাদের মতে চারি আর্যসত্যই বা কি করিয়া হইতে পারে? ভগবান বুদ্ধ দুঃখকে প্রতীত্যসমুৎপন্ন (অনিত্য) বলিয়াছেন এবং যদি সমস্ত কিছু স্বভাবজাত হয়, তাহা হইলে তাহার উৎপত্তি, নিবৃত্তি এবং নিবৃত্তির দিকে লইয়া যাইবার মার্গও থাকে না। এইরূপ হইলেও যদি মার্গ ভাবনার কথা বল তাহা হইলে তাহাকেও স্বভাবজাত না বলিলে ঠিক হইবে না।"[৫১] "অশূন্যবাদের হিসাবে, নিত্যবাদের হিসাবে যে দ্রব্য প্রাপ্ত নহে, তাহার প্রাপ্তি হইতে পারে না, কেন না অপ্রাপ্তি স্বাভাবিক এবং নিত্য। নিত্যবাদ অনুসারে দুঃখের অন্ত সাধন করাও সম্ভব নহে, কেননা যে দুঃখের অন্ত হয় নাই তাহার অন্ত না হওয়াই স্বাভাবিক এবং নিত্য। এইজন্য যিনি প্রতীত্যসমুৎপাদে বিশ্বাসী, শূন্যতায় বিশ্বাসী, তিনি দুঃখ, সমুদয় (=কারণ), নিরোধ (=নিবৃত্তি) ও দুঃখনিরোধগামী মার্গেও বিশ্বাসী।"

"অসম্প্রাপ্তস্য চ প্রাপ্তির্দুঃখপর্যন্তকর্ম চ।
সর্বক্লেশপ্রহাণং চ যদ্যশূন্যং ন বিদ্যতে ॥
যঃ প্রতীত্যসমুৎপাদং পশ্যতীদং স পশ্যতি।
দুঃখং সমুদয়ং চৈব নিরোধং মার্গমেব চ ॥"[৫২]

অতএব একথা স্পষ্ট যে, প্রতীত্যসমুৎপাদরূপী শূন্যবাদকে না মানিলে

চারি আর্যসত্যকে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নহে। এই চারি সত্যই বৌদ্ধধর্মের প্রাণ। ইহাদের প্রতিষ্ঠার জন্য সকল বৌদ্ধ সম্প্রদায় প্রতীত্যসমুৎপাদকে স্বীকার করেন। কিন্তু ইহাকে স্বীকার করিলেও নিজেদেরকে শূন্যবাদী বলেন না। বলাতে অসুবিধাও আছে, কারণ শূন্যবাদের প্রবর্তক প্রতীত্য-সমুৎপাদের আধারে এই মহত্ত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, সমস্ত পদার্থের সত্তাই সাপেক্ষ। এইজন্য ইহা স্বভাবজাত হইতেই পারে না। স্বভাবত সত্তা নাই এই কথা দুর্বোধ্যপ্রায় এবং অন্যান্য বৌদ্ধ সম্প্রদায়ও ইহাকে ঐভাবে বোঝার চেষ্টা করেন নাই যেভাবে নাগার্জুন ইহাকে উপস্থাপিত করিয়াছেন; অন্য সম্প্রদায়ের কথাই বা কি? শূন্যবাদের সারকথা হইল এই যে, পদার্থ প্রতীত্যসমুৎপন্ন হওয়াতে সাপেক্ষসৎ, নিরপেক্ষসৎ নহে। নিরপেক্ষ সত্তাকে অস্বীকার করার নামই শূন্যবাদ।

সংক্ষিপ্তাকারে মাধ্যমিক দর্শন :

মাধ্যমিক দর্শন বস্তু-সত্তার পরমার্থরূপের উপর বিচার করিতে যাইয়া বলিয়াছেন :

> "সৎ নহে, অসৎ নহে, সদসৎ দুই-ই নহে, সদসৎ দুই নহেও নয়।"
>
> "কর্তা আছে, উহার কর্মের নিমিত্ত (প্রত্যয়) হইতে; কর্ম আছে, ইহা কর্তার নিমিত্ত (প্রত্যয়) হইতে বলা যাইতে পারে। ইহা ব্যতীত অপর (সত্তার) সিদ্ধির কারণ আমরা দেখিতেছি না।"

এই প্রকারে কর্তা ও কর্মের সত্যতা পরস্পরাশ্রিত, অর্থাৎ স্বতন্ত্ররূপে উভয়ের মধ্যে একেরও সত্তা সিদ্ধ হয় না। পুনশ্চ স্বয়ং অসিদ্ধ বস্তু অপরকে কিরূপে সিদ্ধ করিবে? এই যুক্তি অনুসারে নাগার্জুন বলিয়াছেন, কাহারও সত্তা সিদ্ধ করা সম্ভব নহে—সত্তা এবং অসত্তা এইরূপে একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। এইজন্য ইহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ দুই বা উভয়রূপে সিদ্ধ করা সম্ভব নহে।

> কর্তা ও কর্মের নিষেধ করিতে যাইয়া নাগার্জুন বলিতেছেন :
>
> "সৎরূপ কারক সৎরূপ কর্মকে সম্পাদন করে না, কেন না সৎরূপের দ্বারা ক্রিয়া হয় না। অতএব **কর্মের** জন্য **কর্তার** প্রয়োজন নাই। সদ্রূপের নিমিত্ত ক্রিয়া নাই, অতএব **কর্তার** জন্য **কর্মের** প্রয়োজন নাই।"

এই প্রকার পরস্পরাশ্রিত সত্তাবান বস্তুসমূহের মধ্যে কর্তা, কর্ম, কারণ ও ক্রিয়াকে সিদ্ধ করা যায় না।

"কোথাও কোন সত্তা স্বতঃ নহে, পরতঃ নহে। স্বতঃ পরতঃ উভয় নহে এবং হেতু ব্যতীতও হয় নাই।"

(সৎ) কার্যকারণ সম্বন্ধের খণ্ডন করিতে যাইয়া নাগার্জুন বলিয়াছেন:

> "যদি পদার্থ সৎ হয়, তবে উহার নিমিত্ত প্রত্যয়ের (=কারণ) প্রয়োজন হয় না। যদি অসৎ হয়, তথাপি উহার নিমিত্ত প্রত্যয়ের প্রয়োজন নাই।"

"(গন্দর্ভশৃঙ্গবৎ) অসৎ পদার্থের নিমিত্ত প্রত্যয়ের কি প্রয়োজন? সৎ পদার্থের (আপন সত্তার জন্য) প্রত্যয়ের কি প্রয়োজন?" উৎপত্তি, স্থিতি ও শকে সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত কার্যকারণ, সত্তা, অসত্তা আদির বিচারে পড়িয়া অবশেষে আমাদের ইহাই প্রতীত হইতেছে যে, উহারা পরস্পরাশ্রিত; এই অবস্থায় উহাদিগকে সিদ্ধ করা যায় না। বৌদ্ধদর্শনে পদার্থসমূহকে সংস্কৃত (কৃত) ও অসংস্কৃত (অ-কৃত) দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে এবং নিখিল সত্তারাশিকে সংস্কৃত আর নির্বাণকে অসংস্কৃত বলা হইয়াছে। নাগার্জুন এই অসংস্কৃত-সংস্কৃত বিভাগের উপর আঘাত করিতে গিয়া বলিয়াছেন:

> "উৎপত্তি-স্থিতি-বিনাশের সিদ্ধ হইলে সংস্কৃত সিদ্ধ হইবে না। সংস্কৃতের সিদ্ধ হওয়া ব্যতীত অসংস্কৃত কি প্রকারে সিদ্ধ হইবে?"

জগৎ ও উহার পদার্থসমূহকে মরুমরীচিকা বলিতে যাইয়া নাগার্জুন বলিয়াছেন:

> "(মরুভূমির) মরীচিলহরীকে যদি কেহ জল বলিয়া ভ্রম করে এবং তথায় যাইয়া বুঝিতে পারে 'ইহা জল নহে' তবুও সে মূর্খ। সেই প্রকার মরীচি সদৃশ এই সংসার 'আছে' এবং 'নাই' উভয়বিধ ধারণাকারীর ইহা মোহ, এই মোহও যুক্তিযুক্ত নহে।"

যেমন পরাশ্রিত উৎপাদ (=প্রতীত্যসমুৎপাদ) হইলে কোন বস্তুকে সিদ্ধ, অসিদ্ধ, সিদ্ধ-অসিদ্ধ, ন-সিদ্ধ-ন-অসিদ্ধ করা যায় না, তদ্রূপ প্রতীত্যসমুৎপাদের অর্থ "বিচ্ছিন্নপ্রবাহরূপে উৎপাদ" গ্রহণ করিলে তথায়ও কার্য, কারণ, কর্ম, কর্তা প্রভৃতির ব্যবস্থা হইতে পারে না, কেন না উহা হইতে এক বস্তুর সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হইলেও অপর বস্তুর অস্তিত্ব সূচিত হয়।

শূন্যবাদের প্রবক্তাগণ :

১। নাগার্জুন (খৃঃ ১৫০—২৫০)
২। আর্যদেব (খৃঃ ১৭০—২৭০)
৩। রাহুলভদ্র (খৃঃ ২০০—৩০০)
৪। বুদ্ধপালিত (খৃঃ ৪৭০—৫৪০)—প্রাসঙ্গিক সম্প্রদায়ের স্রষ্টা
৫। ভব্য (খৃঃ ৪৯০—৫৭০)—স্বাতন্ত্রিক সম্প্রদায়ের স্রষ্টা
৬। চন্দ্রকীর্তি (খৃঃ ৭ম শতক)
৭। জ্ঞানপ্রভ (ঐ)
৮। শান্তিদেব (খৃঃ ৬৫০—৭৫০)

২। যোগাচারীদের বিজ্ঞানবাদ :

বুদ্ধের পূর্বে প্রায় সকল ভারতীয় তত্ত্বচিন্তক পরিবর্তনের পশ্চাতে কোন অপরিবর্তনশীল সত্তায় বিশ্বাস করিতেন। বুদ্ধের অনিত্যবাদের দ্বারা তাঁহাদের চিন্তাধারা হঠাৎ যেন বাধাপ্রাপ্ত হইল। বুদ্ধের প্রায় ছয় শত বৎসর পরে নাগার্জুন যখন শূন্যবাদ প্রতিষ্ঠা করিলেন তখন তাঁহারা দ্বিতীয়বার ধাক্কা খাইলেন। শূন্যবাদের হিসাবে যখন সমস্ত কিছুই সাপেক্ষ-সৎ হইয়া গেল, নিরপেক্ষ সত্তার কোন অস্তিত্ব থাকিল না, তখন অন্যান্যরা নিরপেক্ষ সত্তার প্রতিষ্ঠার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। তখন কেহ কেহ এই বিষয়ের উপর বেশী গুরুত্ব দিয়াছিলেন যে অনুশ্রবকে (=বেদকে) অন্ধভক্তিতে মানা উচিত নহে, কেননা অনুশ্রব ঠিকও হইতে পারে, গলদও হইতে পারে। কিন্তু সকলেই ত আর বুদ্ধের মত কোমল প্রকৃতির ছিলেন না! লোকায়তগণ শ্রুতির নিন্দা করিয়াছেন। জৈনরাও শ্রুতিকে স্বীকার করিতেন না, তবে তাঁহারা শ্রোত্রিয়দের নিত্যদৃষ্টিকে মানিতেন। সাংখ্য এবং যোগ বেদের বিরোধী না হইলেও শ্রোত্রিয়দের মার্গকে "অবিশুদ্ধ-ক্ষয়াতিশয়যুক্ত" বলিতেন। তবে নিত্যদৃষ্টিকে স্বীকার করিতেন। শ্রোত্রিয়দের লক্ষ্য ছিল দুইটি—(১) শ্রুতিপ্রামাণ্য স্থাপিত করা এবং (২) তাঁহাদের দার্শনিক চিন্তা এমনভাবে স্থাপিত করা যাহাতে নিত্যদৃষ্টি রক্ষা পাইতে পারে। তাই দেখা যায় যে, নাগার্জুনের পরে দার্শনিকগণ এই দুইটি বিষয়ে ব্যগ্র থাকিতেন—(১) অনিত্য এবং অভাব (ক্ষণিক এবং

শূন্য) বাদসমূহের খণ্ডন করা এবং (২) যে কোন প্রকারে শ্রুতিপ্রামাণ্যকে স্থাপিত করা।

কণাদ কার্যের জন্য কারণের আবশ্যকতাকে স্বীকার করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে কারণের গুণ কার্যের গুণসমূহের আরম্ভক।[৫৩] কারণ-কার্যের কণাদ-সিদ্ধান্তে কার্যের গুণ কারণ হইতে উৎপন্ন হইলেও কার্য কারণ হইতে অভিন্ন হইতে পারে না। কপিল যেখানে কার্যকে নিজ কারণাবস্থাতে সৎ বলিয়া জানিতেন, সেখানে কণাদ কার্যকে নিজের উৎপত্তির পূর্বে অসৎ (=প্রাগভাব) বলিয়া মানিতেন। অভিপ্রায় হইতেছে এই যে, কণাদ কার্য-কারণের অভিন্নতার দ্বারা নিজের নিত্যদৃষ্টিকে সিদ্ধ করিতে চাহেন নাই। এই বিষয়ে তাঁহারা নিজ প্রক্রিয়া ছিল যাহা পূর্বের দার্শনিকদের মধ্যে ছিল না। তিনি দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ এবং সমবায় এই ছয় পদার্থের মধ্যে সত্তার বর্গীকরণ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে 'সামান্য'কে কণাদ তাঁহার নিত্যদৃষ্টি সিদ্ধির সাধনরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। সামান্য কাহাকে বলে? মানুষ পরস্পর ভিন্ন হইলেও তাহাদের মধ্যে যে 'অভেদ' দেখা যায় তাহাই 'সামান্য'। রাম, কৃষ্ণ, দেবদত্ত, যজ্ঞদত্ত, সকলেই ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু সকলকে 'মনুষ্য' এই শব্দের দ্বারা সংজ্ঞিত করা যায়। যে কারণে ভিন্ন ভিন্ন রাম, কৃষ্ণ, দেবদত্ত, যজ্ঞদত্ত প্রভৃতিকে মনুষ্য বলা হয়। সেই 'মনুষ্যত্বই' 'সাগান্য'। ইহা নিত্য কেননা দেবদত্তাদি না থাকিলেও এই 'সামান্য' গুণ নষ্ট হইবে না। ইহা ব্যাপকও বটে যেহেতু কোন ব্যক্তি ইহা হইতে ব্যতিরিক্ত নহে। এইভাবে দ্রব্য, গুণ, কর্ম এই তিনটিতে 'ইদং সৎ' (ইহা আছে) ইহার প্রতীতি হয়। এই সৎ-এর প্রতীতি হইতে সত্তার সিদ্ধি হয়।[৫৪] 'সামান্যের' বলে সিদ্ধ এই সত্তা একেবারে নূতনভাবে নিত্যবাদের স্থাপনা করে।

বাদরায়ণ (খৃঃ ৩য় শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ) নিজের পূর্বেকার দার্শনিক মতবাদসমূহের সিংহাবলোকন করিতে যাইয়া শ্রুতিগুলির দার্শনিক পদ্ধতিকে এক ব্যবস্থিতরূপে উপস্থিত করিয়াছেন। স্বীয় দার্শনিক প্রক্রিয়াকে পরিণামের সাহায্যে স্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহার পরিণামবাদ পূর্বের পরিণামবাদ অপেক্ষা কিছুটা ভিন্ন। কেননা, অতীতের পরিণামবাদে অনেক কিছু পরি-ণামের অন্তর্গত হইত না। কপিল জীবকে, পতঞ্জলি জীব এবং ঈশ্বরকে, কণাদ জীব এবং ঈশ্বর ব্যতিরেকে মন, কাল, দিক্, আকাশ ইত্যাদিকে পরি-

ণামের বাহিরে রাখিয়াছেন। বাদরায়ণ অনেক তত্ত্বকে অস্বীকার করিয়া কেবল ব্রহ্মকেই তত্ত্ব বলিয়া মানিয়াছেন। ব্রহ্মকে তিনি 'সৎ'-ও বলিয়াছেন, 'চিৎ'-ও বলিয়াছেন। এবং এই ব্রহ্মের পরিণামে যে নানা রূপের সৃষ্টি হয় তাহা উপনিষদের আধারে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার হিসাবে জগৎ ব্রহ্ম হইতে অনন্য।

বৌদ্ধ দার্শনিকগণ পাঁচ স্কন্ধকে (রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান) পরিণাম (=প্রতীত্যসমুৎপন্নত্ব) বলিয়া স্বীকার করিতেন। সেইগুলিকে সৎ এবং ক্ষণিক বলিয়াছেন। বিজ্ঞান স্কন্ধ যাহা অন্য দার্শনিকদের আত্মার সমকক্ষ তাহা প্রতীত্যসমুৎপন্ন বলিয়া পরিণামের বাহিরে ছিল না। এদিকে বাদরায়ণও সৎ চিৎ ব্রহ্মকে পরিণাম বলিয়া স্বীকার করাতে বৌদ্ধ দার্শনিকদের প্রতীত্যসমুৎপাদ এবং বাদরায়ণের পরিণামবাদ এক হইয়া যায়, তথাপি ভেদ থাকিয়াই যায়। এই ভেদ দুই প্রকারের—(১) বৌদ্ধরা বিজ্ঞানস্কন্ধ এবং অন্যান্য স্কন্ধকে এক বলিয়া স্বীকার করেন নাই কিন্তু ব্রহ্ম হইতেছে বিজ্ঞান (=চিৎ) এবং অচিৎ-এর একত্বের নাম। (২) বৌদ্ধরা অনিত্যদৃষ্টির ব্যবস্থাপক কিন্তু ব্রহ্মবাদ নিত্যদৃষ্টির ব্যবস্থাপক। এই ব্রহ্মবাদের বিরোধী দুইটি দৃষ্টি আছে—এক হইতেছে বৌদ্ধদের নিত্য বিরোধী দৃষ্টি, দ্বিতীয় হইতেছে আত্মাকে পরিণাম হইতে পৃথক্ রাখার দৃষ্টি। বাদরায়ণ উভয়কে নিরাকরণের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন।

বাদরায়ণের সম্মুখে সর্বাস্তিবাদী এবং মাধ্যমিকদের নিত্যবিরোধী দৃষ্টি-সমূহ বর্তমান ছিল। ঐ দৃষ্টিগুলিকে সম্মুখে রাখিয়া তিনি ইহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, কোন নিত্য বা স্থির বস্তু বিনা পরিণাম সম্ভব নহে। কারণ এবং কার্যের পূর্বাপর ভেদ হইয়া থাকে। কারণ পূর্বে এবং কার্য পরে। কার্যের উৎপত্তিক্ষণে কারণ নিরুদ্ধ হয়। অতএব কার্যোৎপত্তির পূর্বক্ষণে যখন কারণ নিরুদ্ধ হয়, তখন কার্যের প্রতি ইহার হেতুভাব থাকে না। যদি স্বীকারও করা যায় যে, কার্যোৎপত্তির মুহূর্ত পর্যন্ত কারণ বর্তমান থাকে, তাহা হইতে একে ত কারণ এবং কার্য্যের পূর্বাপর ভেদ থাকে না, দ্বিতীয়তঃ সমস্ত কিছু ক্ষণিক এই কথা আর খাটে না।[২৫]

ইহা ত হইল সর্বাস্তিবাদীদের কথা। বাকি রহিল মাধ্যমিকদের কথা, কিন্তু তাঁহাদের কথা ত খুবই জটিল। ভাব এবং অভাব কোনটার সহিতই তাঁহাদের সম্বন্ধ ছিল না। তাঁহাদের মতে ভাববাদ এবং অভাববাদের সহিত

বিবাদাপন্ন হওয়া স্বপ্নে দৃষ্ট লক্ষ্মীর জন্য বিবাদ করা মাত্র। বাদরায়ণ তাঁহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে সমস্ত দিক দিয়া বিচার করিলেও আপনাদের মত কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা আমার বুদ্ধির অগোচর, কিন্তু চোখ দিয়া দেখিলে মনে হয় আপনাদের মতবাদে বিরোধ আছে। সত্তার উপলব্ধি ত হইয়াই রহিয়াছে, তথাপি ভাব এবং অভাবের দৃষ্টিতে সত্তাকে না দেখার অর্থ, সত্তাকে স্বীকার না করা যাহা বুদ্ধির অগোচর।[৫৬]

বাদরায়ণ পরিণামবাদ স্বীকার করিতেন, কিন্তু যথার্থ পরিণামবাদ ত নাগার্জুনই প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলেন। নিত্যদৃষ্টির সহিত পরিণামবাদের কোন সামঞ্জস্য নাই, কেননা নিত্যতার অর্থ হইতেছে কূটস্থতা বা পরিণাম-না-হওয়া। পরে শংকর ইহাকে বুঝিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন যে, পরিণামবাদ স্বীকার করিলে নিত্যতার সিদ্ধি অসম্ভব হইয়া পড়ে, অতএব তিনি পরিণাম-বাদকে বিবর্তবাদে পরিণত করিয়াছেন। পরিণামকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করাই বিবর্তবাদের উদ্দেশ্য। যখন পরিণামই মিথ্যা হইয়া গেল তখন নিত্যতার আর কোন ভয় রহিল না। সত্তার অনিত্যদৃষ্টির সঙ্গেও পরিণামবাদের সঙ্গতি হয়না, কেননা অনিত্যের অর্থ হইতেছে সত্তার বিনাশ বা উচ্ছেদ। যখন সত্তাই উচ্ছিন্ন হইয়া গেল তখন পরিণাম কাহার হইবে, কি করিয়া হইবে? এবং পরিণাম শাশ্বতবাদ বা উচ্ছেদবাদ কাহারও সহিত সম্বন্ধ রাখেনা, বরং ইহা হইতেছে অশাশ্বত-অনুচ্ছেদবাদ, ভাবাভাববিনির্মুক্ত শূন্যবাদ।

কপিল (খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ—৫ম শতক) প্রকৃতির পরিণাম স্বীকার করিতেন। তাঁহার মতে প্রকৃতি অচেতন। সর্বাস্তিবাদী দার্শনিকগণ পরমাণুসমূহের পরিণাম স্বীকার করিতেন ; এই পরমাণুও অচেতন। সর্বাস্তিবাদীদের ন্যায় কণাদও পরমাণুকে 'চেতন' বলিয়া স্বীকার করেন নাই, কিন্তু কপিলের 'প্রকৃতির' ন্যায় পরমাণুকে নিত্য বলিয়াছেন, যেহেতু বৌদ্ধরা পরমাণুকে ক্ষণিক বলিয়াছেন। বাদরায়ণের ব্রহ্ম কেবল 'সৎ' ছিল না, 'চিৎ'ও ছিল। যেহেতু পরমাণু এবং প্রকৃতি কেবল 'সৎ' ছিল অতএব বাদরায়ণের চেতন সত্তার পরিণাম সিদ্ধ করার জন্য যাঁহারা কেবল সত্তার পরিণাম মানিতেন তাঁহাদের নিরাকরণ করারও উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া মনে হয়। কণাদ পরমাণুর সংযোগ এবং বিয়োগের দ্বারা উৎপত্তি ও লয় স্বীকার করিতেন। সংযোগ এবং বিয়োগ উভয়ই কর্মসাপেক্ষ। ক্রিয়া ব্যতীত পরমাণুর সংযোগ-বিয়োগ অসম্ভব। এবং কর্মের জন্য কোন **দৃষ্ট** কারণ না থাকিলে **অদৃষ্টকেই** কারণ

মানিতে হইবে। কিন্তু যেহেতু **অদৃষ্ট** অচেতন তাহাতে এই সামর্থ্য নাই যে তাহা পরমাণুর মধ্যে ক্রিয়া উৎপন্ন করিতে পারে।[৫৭] কপিলের প্রকৃতিও অচেতন, কিন্তু ইহার প্রতি বাদরায়ণ নিজের এই তর্ক উপস্থাপিত করিতে পারেন নাই, যেহেতু কপিলের মতে প্রকৃতি **সর্ববীজ** অর্থাৎ সমস্ত কিছুর উপাদান কারণ এবং প্রবৃত্তি-স্বভাবযুক্ত। অতএব বাদরায়ণ এই তর্ক উপস্থিত করিয়াছেন যে, প্রবৃত্তি অচেতনের ধর্ম নহে। প্রকৃতি অচেতন, অতএব তাহার মধ্যে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। প্রবৃত্তি না হইলে পরিণামও হইতে পারে না।[৫৮]

বসুবন্ধুর (খৃঃ ৩২০—৪০০) পূর্ববর্তী দর্শন এই জাতীয় তর্ক-বিতর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। লোকায়তিকগণ 'সৎ' হইতেই নশ্বর 'চিৎ'-এর উৎপত্তি বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। কপিল 'সৎ' এবং 'চিৎ'কে পৃথক বলিয়া মানাতে 'সৎ'-এর পরিণাম এবং 'চিৎ'-এর অপরিণাম মানিয়াছেন। বৌদ্ধ দার্শনিকগণ 'সৎ' এবং 'চিৎ' রূপে দ্রব্যের বিভাগ করেন নাই, কিন্তু অন্যান্য দার্শনিকেরা যাহাকে 'চিৎ' বলিয়াছেন বৌদ্ধরা মোটামুটি তাহাকেই **বিজ্ঞানস্কন্ধ** বলিয়াছেন।

অন্যান্যরা যাহাকে 'সৎ' বলিয়াছেন তাহাই বৌদ্ধদের বাকী চারি স্কন্ধ (যথা—রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা এবং সংস্কারস্কন্ধ)। বৌদ্ধদের নিকট এই পাঁচ স্কন্ধই পরিণামী। বাদরায়ণ সৎ এবং চিৎ উভয়কে 'ব্রহ্ম' শব্দের দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন। অন্যান্য দার্শনিকদের ন্যায় তিনিও পরিণামকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই।

বসুবন্ধু এই সব দার্শনিক গতিবিধি নিরীক্ষণ করিয়া একটি নূতন কথা বলিয়াছেন। তাঁহার মতে কেবল বিজ্ঞান (যাহা অন্যান্য দার্শনিকদের ভাষায় চিৎ, আত্মা, ব্রহ্ম) দ্বারাও কাজ চলিতে পারে। তিনি বলিয়াছেন যে, বিশ্ব হইতেছে বিজ্ঞানেরই পরিণাম, বিজ্ঞান-ব্যতিরেকে আর কোন কিছু নাই। তাঁহার 'বিংশতিকা' ও 'ত্রিংশিকা'র কারিকাসমূহে বসুবন্ধু তাঁহার এই মতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

বিজ্ঞান তিন প্রকার: আলয়, মন এবং প্রবৃত্তি। কপিলের প্রকৃতি যেমন সর্ববীজ, সম্পূর্ণ জগতের উপাদান, বাদরায়ণের ব্রহ্ম যেমন সর্ববীজ, তদ্রূপ বসুবন্ধুর এই বিজ্ঞানও সর্ববীজ। 'সর্ববীজ' বলিয়াই এই মূল বিজ্ঞানকে আলয়বিজ্ঞান বলা হইয়াছে। সমস্ত ধর্মের (=সত্তার, বস্তুর)

ইহাই কারণরূপে আলয় (=স্থান বা আশ্রয়) হওয়াতে মূল বিজ্ঞানকে **আলয়-বিজ্ঞান** বলা হইয়াছে। আলয়বিজ্ঞানের সন্তানের দ্বারা প্রবৃত্ত বিজ্ঞানান্তর যাহা সৎকায়দৃষ্টি (=আত্মদৃষ্টি), মান, মোহ এবং রাগের (=আসক্তির) সহিত যুক্ত হইয়া বন্ধের (Bond) কারণ হয়, তাহাকেই বলে '**মন**'। রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ এবং ধর্ম (সমস্ত চৈতসিক) এই ছয় বিষয়ের যে প্রতীতি তাহাই হইতেছে **প্রবৃত্তি বিজ্ঞান**। যেমন পবনাদিবিক্ষোভবশতঃ জলে তরঙ্গ উৎপন্ন হইতেই থাকে, তদ্রূপ এই বিজ্ঞানও হেতুপ্রত্যয়বশতঃ সমস্তই একত্রে বা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আলয়বিজ্ঞানে উৎপন্ন হইতে থাকে।[৫৯] উক্ত তিন প্রকার বিজ্ঞানের মধ্যে প্রবৃত্তিবিজ্ঞানের কারণে বাহ্যার্থসত্তাকে স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু বসুবন্ধুর মতে ইহাও বাহ্যার্থসাপেক্ষ নহে। রূপাদি বস্তুতঃ আছে, এইজন্য ঐ ঐ প্রতীতি হইয়া থাকে—এই কথা মিথ্যা। যেমন তিমিররোগবশতঃ কোন ব্যক্তির কেশ, জাল ইত্যাদির প্রতীতি হয় যদিও সেইগুলি বাস্তবিক তাহার সম্মুখে নাই, তদ্রূপ অর্থসত্তা না থাকিলেও রূপাদি প্রতীতি হইয়া থাকে। অতএব, বিজ্ঞানের অতিরিক্ত আর কোন বাহ্য সত্তা নাই।[৬০]

কিন্তু বিজ্ঞানের অতিরিক্ত কোন বাহ্য সত্তাকে স্বীকার না করিলে অনেক প্রকার আপত্তি উঠিতে পারে। বিজ্ঞানের অতিরিক্ত বাহ্যার্থসত্তা যদি বাস্তবিকই না হইত তাহা হইলে দেশ, কাল, সন্তান, এবং কৃত্যক্রিয়ার নিয়ম হইত না, কিন্তু চারি প্রকার নিয়ম দেখা যায় ঃ—

(১) দেশনিয়ম—যেস্থানে রূপাদি পদার্থ থাকে, সেখানে রূপাদি বিজ্ঞানও দেখা যায়। যেখানে রূপাদি পদার্থ থাকে না, সেখানে রূপাদি বিজ্ঞানের উৎপত্তিও দেখা যায় না। অতএব ,এই দেশ বা স্থানের নিয়ম তখনই টিকিতে পারে, যদি রূপাদি বাহ্য পদার্থ থাকে। যদি বাহ্য পদার্থই স্বীকার না করা হয় তাহা হইলে সর্বত্রই রূপাদির প্রতীতি হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা হয় না। অতএব দেশের বা স্থানের নিয়ম হইলে বাহ্যার্থসত্তার অপলাপ করা যায় না।

(২) কালনিয়ম—যে সময় বিশেষে রূপাদি পদার্থ কোথাও হইয়া থাকে, সেই সময়বিশেষে রূপাদি বিজ্ঞানও উৎপন্ন হয়। সর্বদা সকল সময়ে উৎপন্ন হয় না। অতএব জানা গেল যে, রূপাদি বাহ্যার্থসত্তা বিনা রূপাদি বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় না। এই প্রকারে বিজ্ঞানোৎপত্তির সঙ্গে কালনিয়ম হইলে বাহ্যার্থ-সত্তার অপলাপ করা যায় না।

(৩) সন্তাননিয়ম—যেখানে যে সময়ে রূপাদি বাহ্যার্থ হয়, সেখানে সকল অবিকলেন্দ্রিয় ব্যক্তিরই ইহাদের প্রতীতি হইবে, এমন নহে যে, কাহারও হইল, কাহারও বা হইল না। যেমন তিমিররোগগ্রস্ত ব্যক্তিই কেবল মিথ্যা কেশ-জালাদি দেখিতে পায়, সকলে দেখে না। যদি রূপাদি বাহ্যার্থব্যতিরেকেই বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইত, তাহা হইলে তৈমিরিকের অসদর্থ প্রতীতির ন্যায় কাহারও হইত, কাহারও হইত না। কিন্তু রূপাদি বাহ্য অর্থ যখন যেখানে হয়, সকলেরই ইহাদের প্রতীতি হয়। অতএব বিজ্ঞানোৎপত্তিতে সকলের সঙ্গে সন্তাননিয়ম (=প্রতীতির ক্রম) হইলে বাহ্যার্থ সত্তার অপলাপ করা যায় না।

(৪) কৃত্যক্রিয়ানিয়ম—রূপাদি বাহ্য অর্থের দ্বারাই কিন্তু শারীরিক কৃত্য সম্পন্ন হইতে পারে। স্বপ্নে দৃষ্ট অন্ন জলের দ্বারা কাহারও ক্ষুধা তৃষ্ণা মেটে না। অতএব কেবল বিজ্ঞানমাত্র দ্বারা দুনিয়ার কাজ চলিতে পারে না। দুনিয়ার কৃত্যক্রিয়ার জন্য রূপাদি অর্থ অপেক্ষিত। এই প্রকারেও বাহ্যার্থসত্তার অপলাপ করা যায় না।

উক্ত চারি নিয়মের অনুসন্ধান এবং বিচার করিলে দেখা যায় যে, বিজ্ঞানের অতিরিক্ত বাহ্যার্থসত্তা আছে।[৬১]

আচার্য বসুবন্ধু উক্ত চারি প্রকার আক্ষেপ বা সমালোচনার উত্তরে বলিয়াছেন যে, বাহ্য পদার্থের অভাবেও দেশ, কাল, সন্তান ও কৃত্যক্রিয়ার নিয়ম দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ স্বপ্নের কথা বলা যাইতে পারে। স্বপ্নে বাহ্য অর্থ ব্যতিরেকেই কোন স্থানবিশেষে (সর্বত্র নহে) বাগান-উদ্যান, নদী, পুষ্করিণী, সুন্দরীদের দেখা যায়; তবে সব সময়ে নহে। স্বপ্নে কৃত্যক্রিয়াও সম্ভব। বাহ্য পদার্থের প্রতীতি সকল অবিকলেন্দ্রিয় ব্যক্তির হইয়া থাকে, কিন্তু বাহ্যার্থ বিনা তিমির রোগীর যে পদার্থের প্রতীতি হয়, তাহা সকলের হয় না; অতএব বাহ্যার্থ সিদ্ধ হইল না। তবে এই যুক্তিও নিষ্প্রাণ। প্রেতরা মল, মূত্র, পূযাদির দ্বারা পরিপূর্ণ নদী দেখিতে পায়, যদিও ইহা হয় না। নরকের প্রাণীদের এইরূপ ভয়ঙ্কর দৃশ্য দৃষ্ট হয়। তাঁহারা নরকিংকরদেরও দেখিতে পায় এবং তাহাদের দ্বারা দণ্ডও লাভ করে, যদিও বস্তুতঃ ঐসব হয় না।[৬২] এই আগমমূলক দৃষ্টান্তগুলিকে যদি আমরা বাদ দিই, তাহা হইলে স্বপ্নের উদাহরণ কার্যকরী হইতে পারে, কেন না বাহ্য পদার্থ বিনা সকলেই স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নকালে বাহ্যপদার্থ ব্যতিরেকেই

সকলের তাদৃশ প্রতীতি হয়, এমন নহে যে, কাহারও হয়, অন্য কাহারও হয় না। এবং বাহ্যার্থ সত্তা বিনাই দেশ, কাল, সন্তান এবং কৃত্যক্রিয়ার নিয়ম স্থাপিত হইতে পারে। অতএব, উক্ত চারি নিয়মের জন্য বাহ্যার্থ সত্তাকে স্বীকার করার আবশ্যকতা নাই।

সর্বাস্তিবাদী বাহ্যার্থসত্তার উপর অনেক জোর দিতেন, কণাদ এবং অক্ষপাদও ইহা স্বীকার করিতেন। তিনজনই পরমাণুকে মানিতেন। বাহ্য পদার্থ পরমাণুসমূহের সংযোগেই উৎপন্ন হয়। পরমাণুরূপী অবয়বসমূহের দ্বারা সৃষ্ট পদার্থ পরমাণুর সমূহমাত্রই শুধু নহে। বরং ঐ অবয়বসমূহের দ্বারা বিলক্ষণ উহা এক 'স্বতন্ত্র' পদার্থ যাহাকে বলা হয় অবয়বী। পরমাণুসমূহের সংযোগ তথা অবয়বীকে কণাদ এবং অক্ষপাদ উভয়েই স্বীকার করিতেন। পরমাণুসমূহের সংযোগের দ্বারা এক বিলক্ষণ অবয়বী সৃষ্ট হয়। সর্বাস্তিবাদী অবশ্য ইহা মানিতেন না। তাঁহাদের মতে পরমাণুপুঞ্জই পদার্থ। যাহাই হউক না কেন ইঁহাদের সকলের মতে পরমাণু নিরবয়ব। বসুবন্ধু পরমাণুসমূহের বলে বাহ্যার্থ সিদ্ধকারী এই দার্শনিকদের সমীক্ষা করিতে যাইয়া বলিয়াছেনঃ সংযোগ সাবয়বকে দেখা যায়। পরমাণু-সমূহকে একদিকে নিরবয়ব বলিয়া মানা, অন্যদিকে ইহাদের সংযোগ স্বীকার করা কি করিয়া সম্ভব? পরমাণু সাবয়ব হইতে পারে না এবং নিরবয়বের সংযোগ হইতে পারে না। আবার সংযোগ ব্যতিরেকে অবয়বসমূহের দ্বারা অবয়বী সৃষ্ট হইতে পারে না। অতএব কণাদ এবং অক্ষপাদের বাহ্যার্থসত্তা যাহা অবয়বীর সিদ্ধির উপর নির্ভর করে, তাহা পরাস্ত হইয়া গেল।

অক্ষপাদ অবয়বীকে সিদ্ধ করার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হইয়াছেন। কেননা, ভারতে দার্শনিক ভাবের প্রয়োজন কেবল মনুষ্যজীবনের সহায়তার জন্যই, এবং চেষ্টা করা উচিত যাহাতে মনুষ্য অধিক হইতে অধিক নিজকে দোষমুক্ত করিতে পারে। অক্ষপাদ জানিতেন যে, বাহ্যার্থের (রূপ প্রভৃতি) সংকল্প করিলে রাগ, দ্বেষ, মোহরূপী দোষ উৎপন্ন হয়।[৬৩] এবং এই দোষ উৎপন্ন হয় অবয়বীর অভিমানের জন্য। অবয়বীকে তথ্য বলিয়া মানা এবং ইহার অভিমান হইতে বাঁচার জন্য আবার অবয়বসমূহের ভাবনায় পৌঁছানো অক্ষপাদের ক্ষেত্রে একেবারে দ্রাবিড় প্রাণায়াম। যাহা হউক, সাধনার ক্ষেত্রে তাঁহার অবয়বী একেবারে বেকার। অবয়বীর খেয়াল করিলে কি প্রকার

রাগ উৎপন্ন হয় ? বাচস্পতি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, স্ত্রীকে নিমিত্ত করিয়া অবয়বীর ধারণবশে অনুব্যঞ্জনসমূহের (=আকার প্রকারসমূহের) চিন্তন করার সময় যেরকম রাগ উৎপন্ন হয় ; স্ত্রীর এই প্রকার ধ্যান করিলে, যেমন দ্রবীভূত স্বর্ণসদৃশ নির্মলদ্যুতি, অনঙ্গলীলার একমাত্র রঙ্গভূমি, মাতঙ্গের গণ্ডস্থলসদৃশ বিভ্রমযুক্ত স্তনভারে অলসাঙ্গী, সিদ্ধ সঞ্জীবনীর ন্যায় প্রিয়াকে যদি আলিঙ্গন করার জন্য না পাওয়া যায়, তাহা হইলে কামবাণের ব্যথাকে কিভাবে ভুলা যাইতে পারে !—এইরূপ রাগ (=আসক্তি) হইতে মুক্তির জন্য সাধক শরীরের কেশ, লোম, মাংস, শোণিত, অস্থি, স্নায়ু, শিরা, কফ, পিত্ত, মল, মূত্ররূপী অবয়বের সমূহ ব্যতীত আর কিছুই নহে ইহা মনে করিয়া ভাবনা করেন।

অতএব ধার্মিক সাধনার ক্ষেত্রে অবয়বিবাদের দ্বারা কাজ চলে না।

বসুবন্ধু বাহ্যার্থসত্তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য যে প্রয়াস করিয়াছেন, তাহার ফলে পরবর্তী দার্শনিকগণ বিশেষভাবে উপকৃত হইয়াছেন। গৌড়পাদ বিজ্ঞানবাদের সিদ্ধির জন্য কৃত বাহ্যসত্তার নিরাকরণকে অদ্বৈতবাদের ক্ষেত্রে বহু উপকারক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।[৬৪] বিজ্ঞানবাদী এবং অদ্বৈতবাদী-দের মধ্যে অনেক সমতা আছে। নাগার্জুন সেখানে সমস্ত কিছুকে, এমনকি বিজ্ঞানস্কন্ধকেও সাপেক্ষসৎ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সেখানে বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ বিজ্ঞানাদ্বৈতবাদীরা বিজ্ঞানকে নিরপেক্ষ সৎ বলিতে সুরু করিয়াছেন। একজন বলিলেন '**বিজ্ঞান**', অন্যজন বলিলেন '**ব্রহ্ম**' উভয়েই তদতিরিক্ত বাহ্যার্থ সত্তাকে 'মিথ্যা' বলিয়াছেন। উভয়েই ইহাকে অনুচ্ছিন্ন বা অবিনাশী বলিয়াছেন, কিন্তু তথাপি একটু পার্থক্য থাকিয়া গিয়াছে। বিজ্ঞান ছিল পরিবর্তনশীল, যেহেতু ইহা প্রতীত্যসমুৎপন্ন। কিন্তু ব্রহ্ম ছিল কূটস্থ, যদ্যপি বাদরায়ণ ইহাকে পরিণামশীল বলিয়াছেন (আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ— ব্রহ্মসূত্র, ১।৪।২৩)। অতএব ব্রহ্মের এই পরিণামকে নূতনভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছিল। নাগার্জুন পরিণামবাদের (=প্রতীত্য-সমুৎপন্ন) আধারে সমস্ত কিছুকে অশাশ্বত এবং অনুচ্ছিন্ন বলিয়াছেন। তাঁহার 'অনুচ্ছেদ' অংশের সঙ্গে অদ্বৈতবাদীর সহমত ছিল, কিন্তু তাঁহার 'অশাশ্বত' অংশটি তাঁহাদের নিত্যদৃষ্টির পরিপন্থী। অতএব, প্রতীত্য-সমুৎপাদ বা পরিণামবাদ যাহা কারণ-কার্যের নিয়ম ছিল এবং যাহাকে সকলেই যথার্থ এবং বাস্তবিক বলিয়া মনে করিতেন, তাহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন

করা হইয়াছে। ইহা কেবল 'সংবৃতিসত্য' থাকিয়া গেল। কিন্তু পরিণাম বা প্রতীত্যসমুৎপাদকে বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদীরা 'পরমার্থ সত্য' রূপে স্বীকার করিয়াছেন, ফলে তাঁহাদের বিজ্ঞানকে ক্ষণিক বা পরিবর্তনশীল বলিয়া মানিতে হইয়াছে। ব্রহ্মবাদীরা ইহাকে 'মিথ্যা' বলাতে তাঁহাদের 'ব্রহ্ম' পরিণামের দ্বারা অস্পৃষ্ট এবং কূটস্থ থাকিয়া গেল। এই দৃষ্টিভেদের কারণেই 'বিজ্ঞান' এবং 'ব্রহ্ম' এক হইতে যাইয়াও পৃথক্ হইয়া গেল। কিন্তু পৃথক হইলেও অদ্বৈত-বাদের উপর বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের যে ছাপ পড়িয়াছে তাহাকে অস্বীকার করার উপায় ছিল না।

বিজ্ঞানবাদীরা বিজ্ঞানের অতিরিক্ত বাহ্যসত্তাকে ত নিষেধ করিলেন, কিন্তু ব্যবহার ব্যতিরেকে বাহ্যসত্তার চল থাকিতে পারে না। অতএব তাঁহারা বিজ্ঞানের অতিরিক্ত যাবন্মাত্র 'ব্যবহার'কে ঔপচারিক মানিয়াছেন। অন্ধকে যদি কেহ 'পদ্মলোচন' বলে, মূর্খকে যদি কেহ 'বৃহস্পতি' বলে, আনাড়ীকে কেহ 'গাধা' বলে তাহা হইলে এই সকল প্রয়োগকে ঔপচারিক বলিতে হইবে। কেননা অন্ধের মধ্যে পদ্মলোচনত্বাদি ধর্ম নাই এবং যাহা যেখানে নাই সেখানে তাহার প্রয়োগ করিলে তাহাকে 'উপচার' বলে। আত্মা (=নিজত্ব, আত্মনীয়ত্ব, আমিত্ব, মমত্ব) তথা ধর্ম (=নিজ হইতে পৃথক সমস্ত পদার্থ) উভয়ের সত্তা ঔপচারিক, যেহেতু বিজ্ঞানের অতিরিক্ত উভয়ের কোন অস্তিত্ব নাই। বিজ্ঞানের অতিরিক্ত এবং 'সমস্ত কিছু' মিথ্যা এবং এই মিথ্যার ব্যবহার-সিদ্ধির জন্য অন্য মিথ্যান্তর হইতেছে 'উপচার' যাহাকে পরবর্তীকালে শংকর 'অভ্যাস', 'অবিদ্যা' এবং 'মায়া' বলিয়াছেন। বিজ্ঞানৈকত্ববাদ সিদ্ধ করার জন্য যে জগৎকে বসুবন্ধু মিথ্যা বলিয়াছেন তাহাকেই বসুবন্ধুর অবিদ্যা (=উপচার)তে ফেলিয়া শংকর নিজের সিদ্ধি সাধন করিয়াছেন। বসুবন্ধুর পরে প্রায় সকল দার্শনিক জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিতে যাইয়া, রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় ইহাকে ভ্রমমাত্র মনে করিয়া অবিদ্যাতেই থাকিয়া গেলেন। কেহই ইহার বাহিরে আসিয়া ধরিত্রীকে সত্য এবং সারবান্‌রূপে প্রতিপন্ন করার প্রয়াস করেন নাই।

বিজ্ঞানবাদের সার-সংক্ষেপ ঃ[৬৬]

যোগাচার বিজ্ঞানবাদের আবির্ভাবকাল খৃঃ পঞ্চম শতাব্দী। অসঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া শান্তরক্ষিত (খৃঃ অষ্টম শতাব্দী) পর্যন্ত বৌদ্ধজগতে বিজ্ঞান-

বাদের যুগ চলিয়াছে। ইহার পরেই বৌদ্ধ দর্শন ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হইয়া যায়। কারণ একেবারে 'নেতিপন্থী' ধর্ম বা দর্শন দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে না। সাধারণ মানুষ অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়াই আশায় বুক বাঁধিয়া যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট স্বীকার করে। অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়াই মানুষ ফল-ফুলের গাছ রোপণ করে, যত্ন করে, বড় করে—একদিন ইহারা ফল দেবে, ফুল দেবে এই আশায়। তাহা না হইলে কিসের আশায় লোক জীবনধারণ করিবে? অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করা যায় কি, যতই তর্ক-বিতর্ক হউক না কেন? একটি গরু দেখিয়া যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে সেটা কি জীব, তাহাকে এই কথা বলিয়া সন্তুষ্ট করা যাইবে না যে, ইহা ঘোড়া নহে, গর্দ্দভ নহে। গরু কি নহে তাহা জানিয়া কেহ সন্তুষ্ট হইবে না। সকলেই জানিতে চাহিবে গরু আসলে কি, যদিও সে প্রশ্নের সর্বসম্মত একটি উত্তর দেওয়া দার্শনিকের পক্ষে অসম্ভব। কত যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিবে? একসময় যুক্তিপ্রয়োগেও ক্লান্তি আসে, তখন মানুষ যুক্তির কথা না ভাবিয়া প্রাণ খুলিয়া বিশ্বাস করিতে চায়। এইজন্যই ঐযুগে কুমারিলের প্রচারিত মীমাংসা-দর্শন এত প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল এবং বৌদ্ধদর্শনের উপর আস্থা লোকের হ্রাস পাইয়াছিল।

গ্রাহ্য (object) ও গ্রাহকের (subject) সংঘর্ষের ফলেই বস্তু সম্বন্ধে অনুভূতি জন্মে। গ্রাহক ব্যতিরেকে যে গ্রাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব নাই তাহা শূন্যবাদীই প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। এখন প্রশ্ন হইতেছে গ্রাহ্য বস্তুর অভাবে গ্রাহকের অস্তিত্ব সম্ভব কিনা। বিজ্ঞানবাদীরা প্রকারান্তরে ইহারই উত্তরে বলিয়াছেন যে, তাহা সম্ভব। ইহাই হইল বিজ্ঞানবাদের মূল কথা। বিজ্ঞানবাদী বলেন যে, বস্তু সম্বন্ধে অনুভূতি কেবল সেই অনুভূয়মান বস্তুটির উপর নির্ভর করে না, অনুভাবকের (subject) উপরও সমপরিমাণে নির্ভর করে। তখন, বস্তুর সত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা প্রযুজ্য, বস্তুর অসত্ত্ব সম্বন্ধেও তাহাই প্রয়োগ করিতে হইবে,—যে অসত্ত্ব শূন্যবাদীগণ প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু শূন্যতাই যদি হয় গ্রাহ্য (object) তবে তাহার গ্রাহক (subject) কে? এই শূন্যতার গ্রাহক হইল বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা (consciousness only)। এই বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা বিজ্ঞান যে সর্বসত্ত্বনিরপেক্ষ তাহা সুস্পষ্ট, কারণ ইহার গ্রাহ্য বিষয় শূন্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। এবং সর্বসত্ত্বনিরপেক্ষ হওয়ায় এই বিজ্ঞানের বিশেষ কোন রূপও নাই, এমন কি গ্রাহ্য-গ্রাহক ভেদও নাই।

কমলশীল স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন ঃ "যেষাং তু বিজ্ঞানবাদিনাং মতং সর্বমেব জ্ঞানং গ্রাহ্যগ্রাহকবৈধুর্যাৎ স্বয়মেব প্রকাশতে, ন তু জ্ঞানান্তরেণ বেদ্যত ইতি।" এই বিজ্ঞানের উপরেই মায়াময় বিশ্বপ্রপঞ্চ অধ্যস্ত হইয়া থাকে। বেদান্তের ব্রহ্মবাদ যে এই বিজ্ঞানবাদেরই নামান্তর ইহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। বেদান্তমতেও ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞেয়স্বরূপ নহে। পার্থক্য কেবল এই যে, বৌদ্ধরা কোন দিনই প্রত্যক্ষভাবে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। বৌদ্ধদর্শন চিরদিনই অনাত্মবাদ নামেই বিখ্যাত। বিজ্ঞানবাদের মধ্যে কিন্তু আত্মার অস্তিত্বও পরোক্ষভাবে স্বীকার করা হইয়াছিল। কারণ বিজ্ঞানবাদের প্রথম অবস্থাতেই (লংকাবতার সূত্রে) আলয়বিজ্ঞানের উল্লেখ পাওয়া যায়। জন্মজন্মান্তর হইতে বিভিন্ন বিজ্ঞানস্রোত প্রবাহিত হইয়া এই আলয়বিজ্ঞানে সম্মিলিত হইতেছে, এবং তাহা হইতে পুনরায় বিচ্ছুরিত হইয়া জীবের ক্রিয়া, বুদ্ধি প্রভৃতিকে প্রভাবিত করিতেছে। এই আলয়বিজ্ঞান (অর্থাৎ বিজ্ঞানের আলয়, abode of consciousness) হইতে চৈতন্যস্বরূপ আত্মার পার্থক্য মারাত্মক নহে।

আলয়বিজ্ঞানে যে সমস্ত বিজ্ঞানস্রোত আসিয়া সম্মিলিত হইতেছে তাহারা কিন্তু নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হইতেছে না। বিজ্ঞানস্রোত না বলিয়া আসলে বলা উচিত 'বিজ্ঞানক্ষণপরম্পরা।' কারণ প্রত্যেক বিজ্ঞানস্রোত একটি পরিকল্পিত বিষয় হইতে প্রবাহিত, এবং সেই পরিকল্পিত বিষয়ও আবার কতকগুলি পরম্পরাগত বিজ্ঞানক্ষণের কল্পনা। পরিকল্পিত বস্তু ও তাহার বিজ্ঞান—দুইই ক্ষণিক। বস্তু সর্বত্রই পরিকল্পিত হইলে তাহারই বা অভিব্যক্তি হয় কিরূপে? পরিকল্পিত বস্তুবৃত্ত স্বভাব চলত্ব বা নিয়ত-পরিবর্তনশীলতা। কোন বস্তুই অবিচলিত থাকিতে পারে না, অথচ পরিবর্তন স্বীকার করিলে পূর্ব মুহূর্তের বস্তুকে আর পর মুহূর্তে সেই বস্তু বলা চলিবে না। এই উভয় সংকট হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য বৌদ্ধ দার্শনিকগণ 'ক্ষণিকবাদের' আশ্রয় লইয়াছেন। তাঁহারা বলেন না যে একই অবিচলিত বস্তুর নিরবচ্ছিন্ন বিজ্ঞানস্রোত আলয়বিজ্ঞানে পুঞ্জীভূত হইতেছে। তাঁহাদের মতে প্রত্যেক পরিকল্পিত বস্তু প্রতি মুহূর্তে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া পরমুহূর্তে পুনরায় উদ্ভূত হইতেছে। প্রদীপশ্রেণীর এক একটি পরপর প্রজ্বলিত ও তৎক্ষণাৎ নির্বাপিত হইলে যেমন মনে হইতে পারে যে, একই প্রদীপশিখা এক-প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত পরিভ্রমণ করিতেছে, প্রতি বস্তুর জীবনেও

নিরন্তর তাহাই ঘটিতেছে। এইরূপ কষ্টকল্পনা অসার্থক নহে, কারণ এতদ্ দ্বারা বস্তুর চলত্ব ও (আপাতদৃষ্টিতে) অনন্যত্ব এই দুই বিরুদ্ধ প্রশ্নই প্রশান্ত হইল। অপর দিক হইতে বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে, সেই সুপ্রাচীন **প্রতীত্যসমুৎপাদবাদ** বিজ্ঞানবাদীদের হস্তে এই অতি জটিলাকার ধারণ করিয়াছে। অতি স্থূল পুদ্‌গলবাদ হইতে ক্রমে ক্রমে এই অতি সূক্ষ্ম ক্ষণিক-বাদের উদ্ভব বাস্তবিকই বিস্ময়ের বিষয়।

ইহাই হইল সংক্ষেপে বিজ্ঞানবাদের উদ্ভবের ইতিহাস। বেদান্ত যদি মায়াবাদ হয়, তবে বলিতে হইবে যে বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদ ত্রিবর্গ মায়াবাদ। কারণ ইহাতে গ্রাহ্যও কল্পনা, গ্রাহকও কল্পনা এবং গ্রাহ্যগ্রাহক সম্বন্ধও কল্পনা। তবে বিজ্ঞানবাদের গৌরবের বিষয় এই যে, ইহাতে যুক্তি পরাস্ত হইয়া কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করে নাই, আপন পথে অসঙ্কোচে অগ্রসর হইতে হইতেই অজ্ঞাতসারে মায়াবাদে আসিয়া পড়িয়াছিল। বিজ্ঞানবাদের বিরুদ্ধে কিন্তু এখনও একটি কথা বলা যাইতে পারে: 'সবই যদি বিজ্ঞানময় হয় তবে আর মায়ার অবকাশ কোথায়।' ইহার উত্তর দিয়াছেন শান্তিদেব:[৬৬]

"চিত্তমেব যদা মায়া তদা কিং কেন দৃশ্যতে।
উক্তং চ লোকনাথেন চিত্তং চিত্তং ন পশ্যতি।
ন চ্ছিনত্তি যথাত্মানমসিধারা তথা মনঃ॥"

—অর্থাৎ চিত্তই যদি মায়া হয় তাহা হইলে দৃশ্য কে, আর দ্রষ্টাই বা কে? ইহার উত্তরে বুদ্ধ বলিয়াছেন—"চিত্ত (বিজ্ঞান) সমস্তই সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারে, কিন্তু আপনাকে পারে না, যেমন অসিধারা সকল বস্তুই ছেদন করিতে পারে, কিন্তু আপনাকে ছেদন করিতে পারে না।" প্রজ্ঞাকরমতি (খৃঃ ১০ম শতক) তাহার "পঞ্জিকায়" এই সম্পর্কে আরও বলিয়াছেন যে, "অঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া সমস্তই স্পর্শ করা যায়, কিন্তু আপনাকে স্পর্শ করা তাহার সাধ্যাতীত।" সুতরাং সর্বচৈতন্যময় হওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞানে মায়ার অবকাশ রহিয়াছে। চৈতন্য দ্বারা বিশ্বজগৎ উদ্ভাসিত, কিন্তু তথাপি চৈতন্য আপনার স্বরূপ প্রকাশ করে না, দীপ যেমন অন্ধকারাবৃত স্থানে চতুর্দিক আলোকিত করিয়া দিয়াও স্বয়ং অজ্ঞেয়ই থাকিয়া যায়। নিজেকে প্রকাশ করার কোন প্রয়োজন দীপের নাই, কারণ দীপ ত আর তমসাবৃত নহে!

"আত্মভাবং যথা দীপঃ সংপ্রকাশয়তীতি চেৎ।
নৈব প্রকাশ্যতে দীপো যস্মান্ন তমসাবৃতঃ॥"[৬৭]

বিজ্ঞানবাদের প্রবক্তাগণ ঃ

১। মৈত্রেয়নাথ (খৃঃ ২৭০—৩৫০)
২। অসঙ্গ (খৃঃ ৩১০—৩৯০)
৩। বসুবন্ধু (খৃঃ ৩২০—৪০০)
৪। দিঙ্‌নাগ (খৃঃ ৪০০—৪৮০)
৫। গুণমতি (খৃঃ ৪২০—৫০০)
৬। স্থিরমতি (খৃঃ ৪৭০—৫৫০)
৭। ধর্মকীর্ত্তি (খৃঃ ৫৩০—৬০০)
৮। শীলভদ্র (খৃঃ ৬২৯—৬৪৫)
৯। শুভগুপ্ত (খৃঃ ৬৫০—৭৫০)
১০। শান্তরক্ষিত (খৃঃ ৬৮০—৭৪০)
১১। ধর্মোত্তর (খৃঃ ৭৩০—৮০০)
১২। কমলশীল (খৃঃ ৭০০—৭৫০)
১৩। হরিগর্ভ (খৃঃ ৮ম শতক)
১৪। জ্ঞানগর্ভ (খৃঃ ৭০০—৭৬০)

৩। বৈভাষিক এবং সর্বাস্তিবাদ ঃ

প্রাচীন হীনযান (Early Buddhism) সম্প্রদায়ের যে বৃহৎ শাখা উত্তর-পশ্চিম ভারত এবং মধ্য এশিয়ায় প্রচারিত হইয়াছিল তাহার নাম সর্বাস্তিবাদ। এই সর্বাস্তিবাদ হইতেই বৈভাষিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে খৃষ্টীয় ১ম-২য় শতকে। তবে সকল সর্বাস্তিবাদীরা বৈভাষিক ছিলেন না। সর্বাস্তিবাদ মথুরা, কাশ্মীর, গান্ধার প্রভৃতি অঞ্চলে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। স্থবিরবাদীদের সঙ্গে তাঁহাদের অনেকাংশে মিল ছিল। তাঁহাদের শাস্ত্রসমূহ সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইয়াছিল। স্থবিরবাদীদের ন্যায় তাঁহাদেরও ত্রিপিটক ছিল। সূত্রপিটক ও বিনয়পিটকের ক্ষেত্রে উভয়েরই সাদৃশ্য আছে অনেক, কিন্তু অভিধর্মপিটক সম্পূর্ণ আলাদা। অর্থাৎ স্থবিরবাদীদের পালি অভিধম্মপিটকের সহিত সর্বাস্তিবাদীদের সংস্কৃত অভিধর্মপিটকের বিশেষ কোন মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মূল পালি ত্রিপিটক শ্রীলংকায় অক্ষতাবস্থায় রক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া পরবর্তীকালে ইহার বহু পঠনপাঠন ও প্রচার সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু সংস্কৃত ত্রিপিটক অক্ষতাবস্থায় ভারতে রক্ষিত

হয় নাই। তবে ইহার প্রামাণ্য গ্রন্থাদি চীনা ও তিব্বতী অনুবাদে পাওয়া যায়। গিলগিট (বর্তমান পাকিস্তানে) হইতে এই সংস্কৃত ত্রিপিটকের কিছু কিছু মূল আবিষ্কৃত হইয়াছে।

সম্রাট কণিষ্ক এই সর্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি জনৈক বৌদ্ধ ভিক্ষুর নিকট বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কিন্তু বিভিন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মত শুনিয়া হতবুদ্ধি হন। এই মতবাদগুলির সমন্বয় সাধনের জন্য তিনি একটি বৌদ্ধ সম্মেলনের আহ্বান করেন। বৌদ্ধ ইতিহাসে ইহা চতুর্থ বৌদ্ধ সঙ্গীতি নামে পরিচিত। আচার্য বসুমিত্রের অধ্যক্ষতায় এবং কবি ও দার্শনিক অশ্বঘোষের উপাধ্যক্ষতায় এই সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সঙ্গীতির ফলস্বরূপ তাঁহারা তিন লক্ষ শ্লোকের একটি বৃহৎ টীকাগ্রন্থ সংকলন করিয়া নাম দিয়াছিলেন 'বিভাষা' বা 'মহাবিভাষাশাস্ত্র'। সর্বাস্তিবাদীদের মধ্যে যাঁহারা 'বিভাষা' শাস্ত্রের প্রমাণবত্তায় বিশ্বাসী ছিলেন তাঁহারা 'বৈভাষিক' নামে পরিচিত হইতে থাকেন। পরবর্তীকালে বৈভাষিক সম্প্রদায় দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছিলেন। কাশ্মীর অঞ্চলের বৈভাষিকদের বলা হইত কাশ্মীর-বৈভাষিক এবং মথুরা-গন্ধার অঞ্চলের বৈভাষিকদের বলা হইত পাশ্চাত্য বৈভাষিক। অবশ্য তাঁহারা নিজেদেরকে শুদ্ধ-বৈভাষিক বলিয়া দাবী করিতেন। সর্বাস্তিবাদ হইতে উৎপন্ন হওয়ায় বৈভাষিকগণ ছিলেন **বাহ্যপ্রত্যক্ষবাদী**। আচার্য বসুবন্ধু মূলতঃ কাশ্মীর-বৈভাষিকদের শাস্ত্রাবলম্বনে তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'অভিধর্মকোশ' এবং 'অভিধর্মকোশভাষ্য' রচনা করিয়াছিলেন। অদ্যাপি এই অভিধর্মকোশ সকল আভিধর্মিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নিকট একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। চীনে এবং জাপানে এই 'অভিধর্মকোশ'কে অবলম্বন করিয়া পৃথক্ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে।

সর্বাস্তিবাদ বা বৈভাষিকদের মূল দর্শন :

অভিধর্মকোশের টীকাকার যশোমিত্র সর্বাস্তিবাদের মূল দর্শন-তত্ত্ব সম্বন্ধে বলিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে, যাঁহারা অতীত, অনাগত, প্রত্যুৎপন্ন (=বর্তমান), আকাশ, প্রতিসংখ্যানিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যানিরোধ—ইহাদের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন তাঁহারাই ছিলেন সর্বাস্তিবাদী। সর্বাস্তিবাদীরা আগম ও যুক্তি দ্বারা অতীত ও অনাগতের অস্তিত্বকে সিদ্ধ করিয়াছেন।

সংযুক্তাগমে (৩।১৪) বলা হইয়াছে—"রূপমনিত্যমতীতমনাগতম্ ।" সর্বাস্তি-বাদী আগম-বচন উদ্ধৃত করিয়া যুক্তি দিয়াছেন। আলম্বন (বস্তু) হইলেই বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। আলম্বন না থাকিলে বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় না। যদি অতীত এবং অনাগত বস্তু না হইত, তাহা হইলে আলম্বন ব্যতিরেকেই বিজ্ঞান হইত। অতএব, আলম্বনের অভাবে বিজ্ঞান হইবে না। যদি অতীত না থাকে, তাহা হইলে শুভকর্ম এবং অশুভকর্ম ভবিষ্যতে কিভাবে ফল দান করে? ভগবান বলিয়াছেন—"অতীতং চেৎ ভিক্ষবো রূপং ন ভবিষ্যৎ ন শ্রুতবানার্যশ্রাবকোঽতীতে রূপেঽনপেক্ষোঽভবিষ্যৎ। যস্মাত্তর্হি অস্তি অতীতং রূপং তস্মাৎ শ্রুতবানার্যশ্রাবকোঽতীতে রূপেঽনপেক্ষা ভবতি। অনাগতং চেৎ রূপং নাভবিষ্যৎ ন শ্রুতবানার্যশ্রাবকোঽনাগতং রূপং নাভ্য-নন্দিষ্যৎ। যস্মাত্তর্হি অস্তি অনাগতং রূপং তস্মাৎ শ্রুতবানার্যশ্রাবকোঽনাগতং রূপং নাভিনন্দিষ্যতি।" ইতি বিস্তরঃ। অতএব যাঁহারা অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ এই ত্রিকাল আছে বলিতেন তাঁহাদেরকেই সর্বাস্তিবাদী বলা হইত।

এই সর্বাস্তিবাদীদের মধ্যে আবার চারি প্রকার ভেদ দেখা যায়, যথা—ভাবান্যথিক, লক্ষণান্যথিক, অবস্থান্যথিক এবং অন্যথান্যথিক।

(১) ভাবান্যথাত্ববাদী—ভদন্ত ধর্মত্রাত এই মতের প্রবর্তক। তাঁহার মতে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ তিনকালেই ভাবের অন্যথাত্ব হয়। যখন এক ধর্ম (বস্তু) এক কাল হইতে কালান্তরে গমন করে, তখন তাহার দ্রব্যের অন্যথাত্ব হয় না, ভাবেরই অন্যথাত্ব হয়। যেমন সুবর্ণপাত্রকে গলানো হইলে সংস্থানের অন্যথাত্ব হয়, কিন্তু বর্ণের অন্যথাত্ব হয় না। দুগ্ধ দধিতে পরিণত হইলে দুগ্ধের রসবীর্যবিপাকের অন্যথাত্ব হয়, বর্ণের অন্যথাত্ব হয় না। তদ্রূপ যখন অনাগত ধর্ম অনাগত হইতে বর্তমান অধ্বে (=কালে) প্রতিপদ্যমান হয়, তখন ইহা অনাগত ভাব পরিত্যাগ করে এবং বর্তমান ভাবের প্রতিলাভ করে; কিন্তু দ্রব্যের অনন্যত্ব থাকিয়াই যায়। যখন ইহা বর্তমান হইতে অতীতে প্রতিপদ্যমান হয়, তাহা হইলে বর্তমান ভাবের ত্যাগ এবং অতীতভাবের প্রতি লাভ হয়, কিন্তু দ্রব্য অনন্যই থাকিয়া যায়।

(২) লক্ষণান্যথাত্ববাদী—ভদন্ত ঘোষক ইহার প্রবর্তক। তাঁহার মতে বস্তুধর্মসমূহ অধ্বে (=কালে) প্রবর্তন করে। যখন ইহা অতীত হয়, তখন অতীতের লক্ষণ দ্বারা যুক্ত হয়। কিন্তু ইহা অনাগত এবং বর্তমান লক্ষণ-

সমূহের সহিত অবিযুক্ত থাকে। যদি ইহা অনাগত হয়, তখন ইহা অনাগত লক্ষণের সহিত যুক্ত হয়, কিন্তু ইহা অতীত এবং বর্তমান লক্ষণসমূহের সহিত অবিযুক্ত থাকে। যেমন, এক স্ত্রীতে অনুরক্ত পুরুষ অন্যান্য স্ত্রীতে অবিরক্ত থাকে (অর্থাৎ এক স্ত্রীতে তাহার রাগাধ্যবসান হইলে অন্যদের প্রতি রাগপ্রাপ্তি হইলেও, সমুদাচার হয় না)।

(৩) অবস্থান্যথাত্ববাদী—ভদন্ত বসুমিত্র ইহার প্রবর্তক। তাঁহার মতে অবস্থার অন্যথাত্বের দ্বারা কালেরও অন্যথাত্ব হয়। বস্তুধর্ম কালে প্রবর্তমান হইয়া অবস্থা-অবস্থাকে প্রাপ্ত করতঃ অবস্থান্তর দ্বারা (দ্রব্যান্তর দ্বারা নহে) অন্য-অন্য নির্দিষ্ট করে। যথা—একটি গুলিকা একাঙ্কে নিক্ষিপ্ত হইল 'এক', শতাঙ্কে নিক্ষিপ্ত হইলে 'শত' এবং সহস্রাঙ্কে নিক্ষিপ্ত হইলে 'সহস্র' বলা হয়।

(৪) অন্যথান্যথাত্ববাদ—ভদন্ত বুদ্ধদেব ইহার প্রবর্তক। তাঁহার মতে কাল অপেক্ষাবশে ব্যবস্থিত হয়। (বস্তু) ধর্ম কালে প্রবর্তমান হইয়া অপেক্ষাবশে সংজ্ঞান্তর গ্রহণ করে ; অর্থাৎ ইহাকে পূর্বাপর অপেক্ষাবশতঃ অতীত, অনাগত এবং বর্তমান বলা হয়। যথা—একই নারী কন্যাও হয়, মাতাও হয়।

উপরিউক্ত মত চতুষ্টয়ের মধ্যে বসুবন্ধুর মতে প্রথম মতটি পরিণামবাদ ছাড়া কিছুই নয়, অতএব ইহাকে সাংখ্যপক্ষে নিক্ষেপ করিয়া পরিত্যাগ করা উচিত। দ্বিতীয় মতটি কালশাংকর্যদোষে দুষ্ট, কেননা, ইহাতে তিন লক্ষণের যোগ হইয়া থাকে। পুনঃ এখানে সাম্যই বা কোথায় ? যেমন কোন পুরুষের একটি নারীর প্রতি রাগ-সমুদাচার হইতে পারে, অন্য নারীদের প্রতি কেবল রাগ-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। অতএব, সাম্য কোথায় ? অতএব ইহাও পরিত্যাজ্য। চতুর্থটিও গ্রহণযোগ্য নহে, কারণ ইহাতে তিন কালই একই কালে প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ একই অতীত কালে পূর্বাপর ক্ষণের ব্যবস্থা হইয়াছে। যেমন, পূর্বক্ষণ অতীত, পশ্চিম বা পরক্ষণ অনাগত, মধ্যম বা বর্তমান ক্ষণ প্রতিপন্ন। অতএব, বসুবন্ধুর মতে তৃতীয় মতটিই গ্রহণযোগ্য। কারণ বসুমিত্রের এই মতানুসারে কারিত্রবশে কাল এবং অবস্থা ব্যবস্থাপিত হয়। যখন ধর্ম স্বীয় কার্য করে না, তখন সে অনাগত, যখন সে স্বীয় কার্য করে তখন সে বর্তমান, আর যখন সে কার্য হইতে উপরত হইয়া গিয়াছে, তখন সে অতীত।

সর্বাস্তিবাদী বা বৈভাষিকগণ স্থবিরবাদীদের ন্যায় বাস্তববাদী বা যথার্থবাদী

ছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা ছিলেন স্বভাববাদী তথা বহুধর্মবাদীও, কিন্তু কোন প্রকার শাশ্বত দ্রব্য তাঁহারা স্বীকার করেন না। কেননা তাঁহাদের মতে দ্রব্যসমূহ 'সৎ' হইলেও 'ক্ষণস্থায়ী'। দ্রব্যসমূহের অস্তিত্ব শুধু বর্তমানে নয়, অতীত ও অনাগতেও বিদ্যমান। অতীত, অনাগত এবং বর্তমান একই পরম্পরাতে বিধৃত। ত্রিকালাস্তিত্ববাদী বলিয়াই তাঁহাদের সর্বাস্তিবাদী বলা হয়। বসুবন্ধুর ভাষায় 'তদাস্তিবাদাৎ সর্বাস্তিবাদা ইষ্টাঃ'—(অভিধর্মকোশ, ৫।২৫)।

বৈভাষিক বা সর্বাস্তিবাদীরা যদিও বস্তুসমূহের স্থায়ী বাস্তবিকতায় বিশ্বাসী, তথাপি তাঁহারা অনাত্মবাদী ছিলেন। শাশ্বত কোন 'আত্মা'কে তাঁহারা স্বীকার করিতেন না। স্থবিরবাদ হইতে উদ্ভূত বলিয়া তাঁহারাও তত্ত্বসমূহের অনেকত্বে বিশ্বাসী। তাঁহাদের মতে তত্ত্বসমূহ ৭৫ প্রকার—৭২ প্রকার সংস্কৃত (Constituted), অতএব অনিত্য ; অবশিষ্ট ৩ প্রকার অসংস্কৃত (Unconstituted), অতএব নিত্য। ৩ প্রকার অসংস্কৃত ধর্ম হইতেছে, আকাশ, প্রতিসংখ্যানিরোধ এবং অপ্রতিসংখ্যানিরোধ। ৭২ প্রকার সংস্কৃত ধর্মকে চারিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, যেমন—রূপ ১১ প্রকার (তাঁহারা অতিরিক্ত একটি রূপের কল্পনা করিয়াছেন যাহার নাম 'অবিজ্ঞপ্তি'), চিত্ত-সম্প্রযুক্ত ধর্ম ৪৬ প্রকার এবং চিত্ত-বিপ্রযুক্ত ধর্ম ১৪ প্রকার। শেষে একটি নূতন তত্ত্ব তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন যাহা মানসিকও নহে ভৌতিকও নহে।

বৈভাষিক বা সর্বাস্তিবাদের প্রবক্তাগণ ঃ

১। বসুমিত্র
২। ঘোষক
৩। বুদ্ধদেব
৪। ধর্মত্রাত
৫। ভদন্ত
৬। সঙ্ঘভদ্র
৭। দীপকার (অভিধর্মদীপের গ্রন্থকার)

৪। সৌত্রান্তিক ঃ

এই সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়ের উৎপত্তি বৈভাষিক সম্প্রদায়ের কিছু পরে। ইহার প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কুমারলাত ও তাঁহার শিষ্য হরিবর্মন (খৃঃ ২য়

শতক)। হরিবর্মনের **সত্যসিদ্ধিশাস্ত্র** এই সম্প্রদায়ের প্রামাণ্য গ্রন্থ। সৌত্রান্তিকগণ বুদ্ধের সূত্রকেই প্রমাণরূপে মান্যতা দিতেন। কাত্যায়নী-পুত্রাদি দ্বারা রচিত জ্ঞানপ্রস্থানাদি শাস্ত্রকে তাঁহারা প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে স্বীকার করিতেন। "যে সূত্রপ্রমাণিকা ন তু শাস্ত্রপ্রমাণিকা।" সৌত্রান্তিকদিগের সাহিত্য প্রায় সব নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তবে বসুবন্ধুর 'অভিধর্মকোশভাষ্য' এবং যশোমিত্রের "স্ফুটার্থাভিধর্মকোশব্যাখ্যা"তে সৌত্রান্তিকদের মতবাদ সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যায়। "তত্ত্বসংগ্রহের" রচয়িতা শান্তরক্ষিত ও "পঞ্জিকা"কার কমলশীল নিজেদের সৌত্রান্তিক বলিয়া প্রচার করিতেন। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাঁহারা ছিলেন বিজ্ঞানবাদী, তথাপি নিজেদের সৌত্রান্তিক বলার তাৎপর্য এই যে, এমন এক সময় ভারতে আসিয়াছিল যখন হীনযান ও মহাযান মিশিয়া এক শংকর সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল। যেমন—সৌত্রান্তিক-বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক-যোগাচার এবং সৌত্রান্তিক-মাধ্যমিক। অভিধর্মকোশশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আচার্য বসুবন্ধু যোগাচার বিজ্ঞানবাদে দীক্ষিত হইবার পূর্বে সৌত্রান্তিক ছিলেন। অভিধর্মকোশ মূলতঃ কাশ্মীর-বৈভাষিক নয়ের প্রতিপাদক, তথাপি যেখানে সৌত্রান্তিকদের সঙ্গে বিরোধ সেখানে বসুবন্ধু সৌত্রান্তিক দৃষ্টিকোণ লইয়া বিচার করিয়াছেন। যশোমিত্র স্বয়ং সৌত্রান্তিক ছিলেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। বিভাষাশাস্ত্রে দার্ষ্টান্তিক শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। যশোমিত্রের মতে দার্ষ্টান্তিক ও সৌত্রান্তিক এক। তিব্বতী পরম্পরা হইতেও জানা যায় যে, তাঁহারা এক ও অভিন্ন।

সৌত্রান্তিকগণ মন ও বাহ্যবস্তু উভয়কে সত্য বলিয়া স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে বাহ্যবস্তুকে প্রমাণরূপে গ্রহণ না করিলে বাহ্যবস্তুর পরি-কল্পিত অবস্থাকেও ব্যাখ্যা করা যাইবে না। যদি বাহ্যবস্তু সম্বন্ধে কাহারও জ্ঞান না থাকে, তাহা হইলে বিজ্ঞানবাদীদের ন্যায় তাঁহার বলা উচিত নহে যে, মায়ার মাধ্যমে বিজ্ঞান বাহ্যবস্তুবৎ উদ্ভূত হয়। 'বাহ্যবস্তুবৎ' কথাটা বন্ধ্যাসুত বা শশবিষাণের মত অর্থহীন, কারণ বিজ্ঞানবাদীদের মতে বাহ্যবস্তু সম্পূর্ণ অসৎ এবং অপ্রত্যক্ষজ্ঞেয়। যখনই আমাদের ঘটাদি বস্তু বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়, তখন ঘট হয় বাহ্যানুমেয় এবং ইহার বিজ্ঞান হয় মানসিক। অতএব সৃষ্টির আদি হইতেই বাহ্যবস্তুকে বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন এবং বিজ্ঞানের অসদৃশ বলা হইয়াছে। যদি গ্রাহ্য বস্তু ঘট গ্রাহকের (subject) সদৃশ হয় তাহা হইলে গ্রাহক বলিতেন 'আমিই ঘট'। অধিকন্তু, যদি বাহ্যবস্তু না থাকে তাহা হইলে

ঘটবিজ্ঞান এবং পটবিজ্ঞানের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাহা ব্যাখ্যা করা অসম্ভব হইত। কারণ বিজ্ঞান হিসাবে উভয়েই সমসম বা সদৃশ। শুধু বস্তু হিসাবেই তাহারা ভিন্ন।

অতএব বিজ্ঞানের বাহিরেও বাহ্যবস্তুকে আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে। এই বাহ্যবস্তুগুলিই বিজ্ঞানের বিভিন্ন অবস্থাকে রূপদান করিয়া থাকে। মনের মধ্যে এই সমস্ত বস্তুর আকার হইতেই আমরা ইহাদের কারণসমূহের অস্তিত্ব অর্থাৎ মনবহির্ভূত দ্রব্যের অস্তিত্ব অনুমান করিতে পারি। আমরা কেন যে কোন বস্তুকে যেকোন স্থানে এবং যেকোন সময়ে প্রত্যক্ষ করিতে পারি না? তাহার কারণ হইতেছে এই যে, প্রত্যক্ষজ্ঞান চারিটি প্রত্যয়ের উপর নির্ভর করে (যেমন—আলম্বন প্রত্যয়, সমনন্তর প্রত্যয়, অধিপতি প্রত্যয় এবং সহকারী প্রত্যয়), শুধুমাত্র মনের উপর নহে। অর্থাৎ বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞানের জন্য প্রয়োজন আলম্বনের বা বস্তুর, সচেতন মনের, বিজ্ঞানের প্রকার জানিবার মত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের (অর্থাৎ সেই বিজ্ঞান কি দর্শনগোচর হইবে, না স্পর্শনগোচর হইবে, না অন্য প্রকার) এবং সহকারী প্রত্যয় যেমন—আলো, অনুকূল অবস্থা এবং গ্রহণযোগ্য মাত্রা। এই সকল প্রত্যয়-সমবায়ে বস্তুর উপলব্ধি হইতে পারে। অতএব, দেখা যাইতেছে যে বস্তুর রূপ (আকার, আয়তন ইত্যাদি) মনেই উৎপন্ন হয়। কাজেই রূপ 'সৎ' নহে, মন বা বিজ্ঞানই 'সৎ'। তাই সৌত্রান্তিকদের মতবাদকে বলা হইয়াছে 'বাহ্যানুমেয়বাদ'। সংক্ষেপে বলিতে হইলে বলা যায় যে, সৌত্রান্তিকদের মতে 'সর্বং সংস্কৃতম্ ক্ষণিকম্'—অর্থাৎ যেইক্ষণে উৎপত্তি সেইক্ষণেই বিনাশ, এই বিনাশ কিন্তু সহেতুক নহে, নির্হেতুক। তাঁহাদের মতে আত্মা, সত্ত্ব, জীব, পুদ্গল নামক কোন বস্তুসৎ স্বভাবসিদ্ধ নহে। ইহারা বিজ্ঞান-সন্তান মাত্র। এই সন্তানপ্রবন্ধও অন্যান্য দর্শনের ন্যায় অবিচ্ছিন্ন নহে, বিচ্ছিন্ন প্রবাহ মাত্র। বলা হইয়াছে 'পিপীলিকা-পংক্তিবৎ'। ইহা হেতু-ফল-পরম্পরা মাত্র। ইহার মধ্যে বাস্তবিক কোন স্থিতি বিদ্যমান নাই। ধর্মসমূহের উৎপাদ এবং বিনাশ এক অন্য হইতে পৃথক। যেহেতু উৎপাদ বিনাশান্তরই হইয়া থাকে, ইহার মধ্যে কোন স্থিতি নাই। তাঁহারা নির্বাণকেও কোন ভাবরূপ মনে করেন না। তাঁহাদের মতে পূর্বজন্মের কর্মসমূহ প্রতিসন্ধিক্ষণে (মাতৃগর্ভে নূতন জন্মক্ষণে) ব্যক্তিতে আহিত হয় (আহিত-কর্মবাসনা)। বৈভাষিকদের ন্যায় সৌত্রান্তিকগণ স্বভাববাদী, কিন্তু বৈভাষিকদের ন্যায় ধর্মসমূহের অস্তিত্ব

স্বীকার করেন না। তাঁহারা বাহ্য জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাসী, কিন্তু তাহার জ্ঞান প্রত্যক্ষগম্য নহে, অনুমানগম্য।

সৌত্রান্তিকের প্রবক্তাগণ :

১। কুমারলাত
২। হরিবর্মণ
৩। বসুবন্ধু
৪। যশোমিত্র
৫। পরমার্থ
৬। স্থিরমতি

বৌদ্ধধর্মে ত্রিযান :

প্রাচীন বৌদ্ধধর্মে মুক্তিকামীদের নিকট তিনপ্রকার আদর্শ প্রধানরূপে প্রচলিত ছিল—শ্রাবকযান, প্রত্যেকবুদ্ধযান এবং সম্যক্‌সম্বুদ্ধযান। পূর্বাপেক্ষা পরেরটি শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ শ্রাবকযান হইতে প্রত্যেকবুদ্ধযান শ্রেষ্ঠ, আবার প্রত্যেকবুদ্ধযান হইতে সম্যক্‌সম্বুদ্ধযান শ্রেষ্ঠ। শ্রাবকের আদর্শ অপেক্ষাকৃত ন্যূন হইলেও পৃথগ্‌জন হইতে উৎকৃষ্ট। যদিও শ্রাবক এবং পৃথগ্‌জন উভয়ের লক্ষ্য সমান অর্থাৎ ব্যক্তিগত দুঃখনিবৃত্তি, তথাপি পৃথগ্‌জনের উপায়জ্ঞান ছিল না। কিন্তু শ্রাবক উপায়জ্ঞ ছিলেন। শ্রাবক দুঃখনিবৃত্তির মার্গের সহিত পরিচিত। এই মার্গ হইতেছে চারি আর্যসত্যের মধ্যে মার্গ-আর্যসত্য (অর্থাৎ অষ্টাঙ্গিক মার্গ)। বোধি বা জ্ঞান তাঁহার মধ্যে স্বতঃ প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব ছিলনা, এই জ্ঞানোদয়ের জন্য বুদ্ধাদি শাস্তার উপদেশ অপেক্ষিত ছিল। এইজন্য ইহাকে ঔপদেশিক জ্ঞান বলে। বুদ্ধাদি শাস্তার উপদেশ শুনিয়া অন্যরা ইহার সাক্ষাৎকার করিতে পারে এইজন্য তাঁহাদের যান (যাহার দ্বারা যাওয়া যায় যেমন, রথাদি) বা রাস্তা শ্রাবকযান অর্থাৎ **শুনিয়া গমনশীলদের রাস্তা**। পৃথগ্‌জন ধর্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গের সিদ্ধিতে ব্যাপৃত থাকে, কিন্তু শ্রাবক ইহার অতীত। শ্রাবকদের মধ্যে কাহারও কাহারও দুঃখনিবৃত্তি পুদ্‌গলনৈরাত্ম্যের জ্ঞানের দ্বারা হইয়া থাকে, কাহারও বা প্রতীত্যসমুৎপাদের জ্ঞানের দ্বারা। ধর্মনৈরাত্ম্যজ্ঞান কোন শ্রাবকের হয় না। এইজন্য তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ নির্বাণলাভ হয়না। তথাপি এই কথা ত ঠিক যে,

তাঁহারা অধঃপাতের আশঙ্কা হইতে মুক্ত হইয়া যান। কেননা, জ্ঞানাগ্নি দ্বারা তাঁহাদের ক্লেশ বা অশুদ্ধ বাসনাত্মক আবরণ দগ্ধ হইয়া যায়। এইজন্য ত্রিধাতুতে (অর্থাৎ কাম, রূপ ও অরূপধাতু) তাঁহাদের জন্ম লইবার সম্ভাবনা থাকে না। তাঁহারা জন্মমৃত্যুর প্রবাহরূপ প্রেত্যভাব হইতে মুক্ত হইয়া যান।

প্রত্যেকবুদ্ধের আদর্শ শ্রাবক হইতে শ্রেষ্ঠ। যদ্যপি ইঁহাদের সাধন-জীবন বৈয়ক্তিক-স্বার্থপ্রেরিত, তথাপি আধার অধিক শুদ্ধ। আধার শুদ্ধিহেতু তাঁহার স্বদুঃখনিবৃত্তির জ্ঞান বা উপায়ের জন্য অন্য কাহারও হইতে উপদেশের প্রয়োজন হয় না। তাঁহারা পূর্বশ্রুত অভিসংস্কারের দ্বারা স্বয়ংই বোধিলাভ করেন। বোধির লাভই বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি। প্রত্যেকবুদ্ধ নিজের বুদ্ধত্বের জন্য প্রার্থী হন, ইহা লাভও করেন, কিন্তু সকলের বুদ্ধত্ব লাভের জন্য তাঁহাদের কোন প্রার্থনা থাকে না।

শ্রাবক এবং প্রত্যেকবুদ্ধের জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য আছে। শ্রাবকদের জ্ঞান পুদ্‌গলনৈরাত্ম্যের অববোধস্বরূপ, অতএব ইহা পুদ্‌গলবাদীদের অগোচর। প্রত্যেকবুদ্ধের জ্ঞান মৃদু-ইন্দ্রিয়, অতএব ইহা শ্রাবকদের অগোচর। শ্রাবকদের ক্লেশাবরণ থাকেনা, এইজন্য তাঁহাদের জ্ঞান সূক্ষ্ম। প্রত্যেকবুদ্ধে জ্ঞেয়াবরণের একদেশ অর্থাৎ গ্রাহ্যাবরণও থাকেনা। এইজন্য ইহা আরও সূক্ষ্ম। শ্রাবকের জ্ঞান পরোপদেশহেতুক, অতএব ষোড়শাকার দ্বারা প্রভাবিত, এইজন্য ইহা গভীর। কিন্তু প্রত্যেকবুদ্ধের জ্ঞান স্বয়ংবোধরূপ এবং তন্ময়তামাত্র হইতে উদ্ভূত। অতএব ইহা পূর্বাপেক্ষা অধিক গভীর।

তৃতীয় হইতেছে সম্যক্‌সম্বুদ্ধের যান বা আদর্শ। ইহা শ্রেষ্ঠ আদর্শ, ইহারও প্রকারভেদ আছে। সম্যক্‌সম্বুদ্ধকেই ভগবান বুদ্ধ বলা হয়। তিনি অনুত্তর সম্যক্‌সম্বোধিপ্রাপ্ত। তাঁহার লক্ষ্য অত্যন্ত উদার। কোটি কোটি জন্মের তপস্যা এবং অশেষ বিশ্বের কল্যাণভাবনা তাঁহার মূলাধার। ক্লেশাবরণ এবং জ্ঞেয়াবরণের নিবৃত্তি হইলেই বুদ্ধত্বলাভ হইয়া যায়না। একথা ঠিক যে, শ্রাবকের দ্বৈতবোধ দূর হয় না এবং প্রত্যেকবুদ্ধেরও সম্পূর্ণরূপে দ্বৈতবোধ দূরীভূত হয়না ; কেবল সম্যক্‌সম্বুদ্ধই অদ্বয়ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হন এবং দ্বৈতভাব হইতে নিবৃত্ত হন। ইহাও ঠিক যে জ্ঞেয়াবরণের নিবৃত্তি না হইলে অদ্বৈতভাবের উদয় হয় না। পতঞ্জলিও বলিয়াছেন—"জ্ঞানস্যানন্ত্যাজ্‌ জ্ঞেয়মল্পম্‌"—জ্ঞান অনন্ত হইলে জ্ঞেয় অল্প। বুদ্ধাবস্থা অনন্ত জ্ঞানের

অবস্থা, এইজন্য আচার্যগণ এই জ্ঞানকে বোধি না বলিয়া মহাবোধি বলিয়াছেন। এই অনন্ত জ্ঞানের সঙ্গে অনন্ত করুণাও থাকে। সত্ত্বার্থক্রিয়া বা পরার্থাপাদনের ভাব, ইহাই বুদ্ধগণের বীজ। ইহাই বুদ্ধত্বলাভের প্রধান কারণ। নির্বাণ বা স্বদুঃখনিবৃত্তিতে লীন না হইয়া নিরন্তর জীবসেবায় নিরত থাকা বোধিসত্ত্বের জীবনের আদর্শ। এই আদর্শকে লইয়া বোধিসত্ত্ব বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া থাকেন। এবং বুদ্ধত্বলাভ করিয়া বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় ধর্মপ্রচার করিয়া থাকেন। এই বহুজনহিত ও বহুজনসুখের জন্য প্রযত্ন করার ভাবনা অনেক কথাসাহিত্যের জন্ম দিয়াছে। জাতক ও অবদানকাহিনীসমূহের মূলমন্ত্র কোন না কোন উপায়ে পরোপকার সাধন। পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনীর সঙ্গে এই সকল কাহিনীর অনেক মিল আছে। এই সকল পরোপ-কারের কাহিনী ও হিতোপদেশকে ভারতের সকল ধর্মসম্প্রদায় নিজেদের রঙে রঞ্জিত করিয়া সাহিত্যের অন্তর্গত করিয়া অমরত্ব প্রদান করিয়াছেন। হাজার হাজার কাহিনী হীনযানের ত্রিপিটকের অন্তর্ভুক্ত দেখিয়া ইহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে, সাধনার লক্ষ্য ব্যক্তিগত উন্নতি হইলেও বহুজনহিত ও বহুজন-সুখের দিকেই ইহার প্রবৃত্তি ছিল।

পরহিত ও পরসুখের ভাবনা অথবা বহুজনহিত ও বহুজনসুখের ভাবনার সহিত ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত কাহিনীসমূহ কালের প্রভাবে ধীরে ধীরে বুদ্ধের পূর্ব পূর্ব জন্মের কাহিনীতে রূপান্তরিত হইয়াছে এবং ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে জন্মজন্মান্তর ধরিয়া প্রাণিহিতের জন্য অনেক প্রকার ত্যাগ এবং প্রযত্ন করিতে করিতে অবশেষে তিনি বুদ্ধ হইয়াছেন। বুদ্ধের জীবদ্দশাতেই তাঁহার স্থান এক শাস্তা বা ধর্মগুরুরূপে অনেক উচ্চে ছিল, কিন্তু পরে যখন এই সকল কাহিনী তাঁহার জীবনের সঙ্গে যুক্ত হইল, তখন তিনি 'কল্পনাতীত' হইয়া উঠিলেন। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, বুদ্ধের জীবনের সঙ্গে এই সকল কাহিনীকে কেন যুক্ত করা হইয়াছিল? তৎকালীন ভারতবর্ষে মহাত্মাগণের মধ্যে অনেক কিছু লোকোত্তরতার ভাবের কথা জনসাধারণ বিশ্বাস করিতেন। অতীতে কেন, বর্তমানেও জনসাধারণের মধ্যে এই বিশ্বাস অটুট। নানা প্রকারের সিদ্ধি, পূর্বজন্ম, পরজন্মের কথা বলিয়া দেওয়া, ভূত ভবিষ্যৎ বলিয়া দেওয়া এই সকল মহাত্মাগণের বাঁ হাতের খেলা ছিল। ফলতঃ বুদ্ধের বিষয়েও এই জাতীয় খেয়াল হওয়া স্বাভাবিক ছিল। বুদ্ধের জীবদ্দশাতেই তাঁহার অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে অনেক কথা-সংলাপ উঠিয়াছিল।

বুদ্ধ তীব্রভাষায় ইহার বিরোধিতা করিয়া বলিয়াছিলেন—"আমার সম্বন্ধে এইরূপ চিন্তাভাবনা করার অর্থ আমার নিন্দা করা।" (মজ্ঝিমনিকায়, তেবিজ্জসুত্ত, নং ৭১)। কিন্তু বুদ্ধ বিরোধিতা করিলেও তাঁহার অনুগামীগণ তাঁহার মধ্যে লোকোত্তরতা আরোপ করিয়া তাঁহার মুখ দিয়া অনেক অনেক পূর্বজন্মকাহিনী বলাইয়াছেন এবং ইহার ফলে তাঁহাকে এতই লোকোত্তর বানাইয়া দিয়াছেন যে, তিনি সাধারণ লোকের বুদ্ধির অগম্য হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের বক্তব্য ছিল—"ঐ সময়কার মানুষ চমৎকারিত্বে বিশ্বাস করিত, অতএব বুদ্ধকে চমৎকারিত্বের ঢঙে পেশ না করিলে তাঁহাকে কে মানিবে ?"

যখন বুদ্ধের সম্বন্ধে খেয়াল হইল যে, তিনি অনেক জন্ম ধরিয়া ত্যাগ ও সাধনা করিতে করিতে এইজন্মে বুদ্ধ হইয়াছেন, তখন তাঁহার ঐসকল ত্যাগ ও সাধনার ধীরে ধীরে বর্গীকরণ সুরু হইল। এই বর্গীকরণের নামই 'পারমিতা।' অনেক জন্ম ধরিয়া প্রাণিহিতের জন্য তিনি যে সকল প্রযত্ন করিয়াছেন তাহাকে এক কথায় বলা হইল 'পারমিতা'। তাঁহার ঐ সকল ত্যাগ ও সাধনা একপ্রকারের ছিলনা। তাই পারমিতাও একপ্রকার না হইয়া বহুপ্রকার হইল (কোথাও বা ছয় প্রকার, কোথাও বা দশ প্রকার)। পারমিতায় অন্যদের হিতের জন্য, এইজন্য পরে ইহা বুঝানো হইল যে, পারমিতার চর্চার দ্বারাও বুদ্ধ হওয়া যায়। এইভাবে বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি ধার্মিক-ত্যাগ-তপ-উৎসর্গের পরম লক্ষ্য হইয়া গেল। ফলতঃ প্রাচীন নীতি অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ, মোহ দূর করাকে অনেকে উত্তম মার্গ বলিয়া ধারণা করিতে পারিল না ; ফলতঃ বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি এবং তৃষ্ণানিরোধের মার্গের মধ্যে বিরোধ দেখা যাইতে লাগিল। এই বিরোধকে টিকাইয়া রাখার প্রযত্নও হইয়াছে, কিন্তু সফল হয় নাই (দ্রঃ সদ্ধর্মপুণ্ডরীকসূত্র, উপায়কৌশল্য পরিবর্ত)। আর বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির সাধনাভূত পারমিতার চর্চাকে মহাযান এবং বুদ্ধযান আখ্যা দিয়া তৃষ্ণা-নিরোধের লক্ষ্যভূত সাধনার অনুসরণকারীদের শুধুমাত্র শ্রাবকযান এবং প্রত্যেকবুদ্ধযানই বলেন নাই, হীনযান আখ্যা দিয়া অনেক বিদ্রূপও করিয়াছেন। অষ্টসাহস্রিকাতে বলা হইয়াছে ঃ "কুকুর যেমন মালিকের দেওয়া পিণ্ড প্রত্যাখ্যান করিয়া চাকরের দেওয়া উচ্ছিষ্টের সন্ধানে রত থাকে, তদ্রূপ কত লোক সর্বজ্ঞ জ্ঞানের মূল প্রজ্ঞাপারমিতাকে ত্যাগ করিয়া শাখা-পত্র-পলাল সদৃশ শ্রাবকযান ও প্রত্যেকবুদ্ধযানের অনুগামী হইয়া থাকে।" আরও বলা হইয়াছে—"যে সকল সূত্রে বোধিসত্ত্বযানের বর্ণনা নাই, কেবল

আত্মদমশমক (নিজেই নিজেকে দমনশমনকারী) পরিনির্বাণের বর্ণনা আছে তাহা শ্রাবক ও প্রত্যেক বুদ্ধের সাধনার প্রবক্তা। বোধিসত্ত্বের উচিত ঐ সকল সূত্রের প্রতি কোন গুরুত্ব না দেওয়া।" এখানে দুইটি কথার প্রতি ধ্যান দেওয়া উচিত। সুরুতে যদিও 'আত্মদমশমক নির্বাণের' উপর অনেক গুরুত্ব দেওয়া হইত, কিন্তু ধর্মের সাধক বাহ্যজগতের প্রতি একেবারে উদাসীন ছিলেন না। বহুজনহিত ও বহুজনসুখের জন্য উপদেশ দিতেন বটে কিন্তু ঐ সকল উপদেশের ধ্বনিতে ছিল কেবল ব্যক্তিগত জীবনের বিকাশ। যাহারা পরলোকে বিশ্বাসী তাহারা ব্যক্তিগত জীবনকে সুখময় করার জন্য দানাদি পুণ্যার্থ অনুষ্ঠান করিত। কিন্তু যখন বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি তাহাদের লক্ষ্য হইল তখন ধর্মকর্ম, দানপুণ্য সমস্তই প্রাণিহিতের দৃষ্টিতে করার বিচার তাহাদের মধ্যে জাগ্রত হইল, কিন্তু তথাপি ব্যক্তিগত হিতের চিন্তা তাহাদের মন হইতে একেবারে মুছিয়া যায় নাই। পারমিতার চর্চা করিয়াও নিজেই নিজেকে বুদ্ধ বানাইবার ভাবও ব্যক্তির বিকাশেরই প্রতীক। দ্বিতীয় কথা হইল যে, সাধনার বিষয় নিজ নিজ শরীরের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া সমাজের শরীরে সংক্রামিত হইল। অন্যের হিত করার জন্য নিজের হিত ভুলিয়া যাইবার খেয়াল উৎপন্ন হইল। যদিও ব্যবহারে এই কথা টিকিল না, সম্ভবও ছিলনা। তৎকালীন ভারতের সমাজ-ব্যবস্থা এমন ছিল না যে, লোকে নিজের কথা ভুলিয়া গিয়া শুধু সমাজের কথা চিন্তা করিবে। কিন্তু সিদ্ধান্ততয়া এই কথাকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। সিদ্ধান্তের রূপেও যাঁহারা এই কথাকে মান্য করিতেন ধার্মিক লোকেরা তাঁহাদের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। এই প্রশংসার বর্ণনার পূর্বে এখানে বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির জন্য পক্ষপাতযুক্ত সাধকদের দুই বিভাগ সম্বন্ধে জানিরা লওয়া বিশেষ প্রয়োজন। এই পক্ষপাতীদের মধ্যে এক শ্রেণী হইতেছেন যাঁহারা বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির সংকল্প বা ইচ্ছা ঘোষণা করিতেন, কিন্তু তাহার জন্য কোন প্রযত্ন করিতেন না। দ্বিতীয় শ্রেণী হইতেছে যাঁহারা সংকল্পের সঙ্গে সঙ্গে প্রযত্নও করিতেন। তবে দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক (যাঁহারা পরহিতের জন্য নিজের হিত ভুলিয়া পারমিতার চর্চা করিতে থাকেন) সংখ্যায় খুব অল্পই। প্রথম শ্রেণীর লোকের সংখ্যা বেশী। আর ইহার সঙ্গে যদি ধর্মীয় নেতা এই বাণীর ইন্‌জেকশান্ দিয়া থাকেন যে ইচ্ছা বা সংকল্প করিলেই অনেক পুণ্য হয়, তাহা হইলে সেই ইচ্ছা বা সংকল্পকে ত্যাগ করার ইচ্ছা কাহারও হইবে না। তাহাই হইল। এক রাজার প্রতি সম্বোধন করিয়া

বলা হইয়াছে—"সম্যক্ সম্বোধি বা বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির জন্য উৎপন্ন সংকল্পের পুণ্যফলের দ্বারা কত শতবার আপনি দেবলোকে জন্ম নিয়াছেন, কত শতবার মনুষ্যলোকে জন্ম নিয়াছেন। দেবলোক এবং মনুষ্যলোক সর্বত্রই আপনি আধিপত্যই করিয়াছেন।" বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির সংকল্প মাত্রের দ্বারাই যদি দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে আধিপত্য লাভ করা যায়, তাহা হইলে কেই বা তাহা পাওয়ার জন্য লালায়িত না হইবে? এইভাবে যখন বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইল এবং ঐ লক্ষ্যের দিকে গমনশীলদের জন্য 'বোধিসত্ত্ব' শব্দ ব্যবহৃত হইতে লাগিল অর্থাৎ বুদ্ধজীবনের সঙ্গে তাঁহার পূর্ব পূর্ব জন্মের বোধিসত্ত্ব-অবস্থার কাহিনীসমূহ প্রচলিত হইল, তখন কল্পনা আরও এক ধাপ আগাইয়া গেল। তখন একজন বোধিসত্ত্ব বা একজন বুদ্ধে তাহাদের তৃপ্তি হইল না। অনেক অতীত বুদ্ধের কল্পনা হইল যাহাদের সংগ্রহ পালি 'বুদ্ধবংসে' আছে এবং বর্তমান বুদ্ধ গৌতম বা শাক্যমুনির সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টাও করা হইল। শুধু বুদ্ধ কেন অনেক বোধিসত্ত্বেরও কল্পনা করা হইল। কেবলমাত্র অতীত নহে, অনাগতকেও ইহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত করা হইল। যেমন বিষ্ণুর সম্বন্ধে বলা হয় যে তাঁহার ভবিষ্যৎ অবতার 'কল্কি' আবির্ভূত হইবেন। তেমন বৌদ্ধরাও বলিতে লাগিলেন যে, বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয় এখন তুষিত দেবলোকে আছেন, তিনিই ভবিষ্যতে বুদ্ধ হইবেন।

বৌদ্ধ সাধনা তিন প্রকার রূপ (শ্রাবকযান, প্রত্যেক বুদ্ধযান এবং সম্যক্ সম্বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্বযান) অল্পদিনের মধ্যে ধারণ করে নাই। প্রথম প্রথম ইহারা বহুদিন যাবত পৃথক পৃথক রূপ ধারণ করিতে পারে নাই। কিন্তু যখন হইতে মহাযান-সমর্থক সাহিত্য রচিত হইতে লাগিল, তখন হইতে ইহাদের মধ্যে পরস্পর ভেদ তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে। বুদ্ধের পরিনির্বাণের পরে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর অন্ত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ইহারা বিশেষ রূপ গ্রহণ করিয়াছে।

বৌদ্ধধর্মে ত্রিকায়বাদ

পালিতে ত্রিকায়বাদ নাই বটে, কিন্তু ইহাতে বুদ্ধের তিন প্রকার বিশেষ কায়ের কথা আছে—চাতুর্মহাভৌতিক কায়, মনোময় কায় এবং ধর্মকায়। প্রথমটি পূতিকায়, ইহা জরায়ুজ, শাক্যমুনি বুদ্ধ মাতৃকুক্ষিতে এই কায় ধারণ করিয়াছিলেন। পালিতে বুদ্ধের নির্মাণকায়ের উল্লেখও আছে (অথসালিনী,

ধম্মসংগণি অট্ঠকথা)। যখন বুদ্ধ তাঁহার মাতাকে মুক্ত করিবার জন্য তাবতিংস স্বর্গে তিনমাস অবস্থান করিয়াছিলেন, তখন প্রত্যহ পূর্বাহ্নে তিনি পিণ্ডপাতের জন্য পৃথিবীতে চলিয়া আসিতেন। দেবলোকে তাঁহার অবর্তমানে তিনি তাঁহার 'নির্মাণকায়' প্রস্তুত করিয়া আসিতেন, যে নির্মাণকায় অবিকল তাঁহার মত ধর্মোপদেশ দানে রত থাকিতেন। দেবতাদের মধ্যে যাঁহারা প্রজ্ঞাবান শুধু তাঁহারাই জানিতেন যে আসল বুদ্ধ নাই, তাঁহার নির্মাণকায়ই ধর্মোপদেশ রত আছেন। পালিতে চাতুর্মহাভৌতিক কায়ের ন্যায় মনোময় কায়ের উল্লেখ আছে (সংযুক্ত, পৃঃ ২৮২; দীঘ, ২য়, পৃঃ ১০৯)। সর্বাস্তিবাদের পরিভাষাতে বুদ্ধের মধ্যে নৈর্মাণিকী ও পারিণামিকী ঋদ্ধি ছিল। এই ঋদ্ধির দ্বারা তিনি নিজ সদৃশ অন্যরূপ নির্মাণ করিতে পারিতেন। যথা ব্রহ্মার কায় অধর দেবগণের অসদৃশ। তিনি অভিনির্মিত শরীর দ্বারা তাঁহাদের দর্শন দিতেন (দীঘ, ২য়, পৃঃ ২১২; কোশ, ৩, পৃঃ ২৬৯)। এইজন্য অবতংসক সূত্রে বুদ্ধের সঙ্গে ব্রহ্মার তুলনা করা হইয়াছে। পালি নিকায়ে রূপী দেবকে মনোময় বলা হইয়াছে। কোলিয়পুত্র মৃত্যুর পরে মনোময় কায়ে উৎপন্ন হইয়াছে (মজ্ঝিম ১ম, পৃঃ ৪১০, বিনয় ২য়, পৃঃ ১৮৫)। বাহ্য প্রত্যয় ব্যতিরেকে মনঃনিষ্পন্ন নির্বৃত কায় মনোময় কায়। বিশুদ্ধিমার্গ অনুসারে (পৃঃ ৪০৫) এই অধিষ্ঠান মন দ্বারা নির্মিত হয়। ইহা অরূপীর সংজ্ঞামর কায় নহে। সর্বাস্তিবাদীও মনোময় কায়ের দেবতাদের রূপাবচর বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সৌত্রান্তিক মতানুসারে ইহা রূপাবচর ও অরূপাবচর উভয়ই। অন্তরাভবও মনোময় কায়সম্পন্ন, কেননা ইহা কেবল মনের দ্বারা নির্মিত এবং শুক্র-শোণিতাদি কিঞ্চিৎ বাহ্য উপাদানের দ্বারা উৎপন্ন হয় না। যোগাচার মতানুসারে অষ্টম ভূমিতে কায় মনোময় হয়। ইহা মনের ন্যায় দ্রুতগতিসম্পন্ন হয় এবং ইহার গতি অপ্রতিহত থাকে। মনোময় কায় ১০ প্রকার। কাহারও মতে এই কায় মনঃস্বভাবযুক্ত, অন্য কাহারও মতে এই কায়ের উৎপত্তি ইচ্ছানুসারে হইয়া থাকে। ইহা পূর্বকায়ের পরিণামমাত্র। অভিনব কায়ের উৎপত্তি হয় না।

বুদ্ধের কায় যথার্থ রূপকায় নহে, যাঁহার ধাতুগর্ভের পূজা-উপাসনা করা হইয়া থাকে। কিন্তু ধর্ম (=ধর্মবিনয়) যথার্থকায়। ধর্মকায় হইতেছে প্রবচনকায়। শাক্যপুত্রীয় ভিক্ষুগণ এই ধর্মকায় হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকেন, তাই তাঁহারা বলিয়া থাকেন—"আমি ভগবানের ঔরসপুত্র, ধর্ম (কায়) হইতে

উৎপন্ন এবং ধর্মের উত্তরাধিকারী (দীঘ, ৩, পৃঃ ৮৪; ইতিবৃত্তক, পৃঃ ১০১)। দ্বিতীয় কারণ হইতেছে যে, ভগবান ধর্মভূত, ব্রহ্মভূত এবং ধর্মকায়ও (দীঘ, ৩, পৃঃ ৮৪; মজ্ঝিম, ৩, পৃঃ ১৯৫)। এই প্রকারেই বলা হইয়া থাকে যে, প্রজ্ঞাপারমিতা ধর্মকায় তথাগতকায়। যিনি প্রতীত্য-সমুৎপাদ দর্শন করেন তিনি ধর্মকায় দর্শন করেন। প্রজ্ঞাপারমিতাস্তোত্রে নাগার্জুন বলিতেছেন—"যে তোমাকে ভাবের দ্বারা দেখে, সে তথাগতকে দেখে।" শান্তিদেব তাঁহার বোধিচর্যাবতারের প্রারম্ভে সুগতাত্মজ এবং ধর্মকায়ের বন্দনা করিয়াছেন।

বুদ্ধের ধর্মকায় অচিন্ত্য এবং সকল তথাগতের দ্বারা সমানরূপে গৃহীত। অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা (পৃঃ ৯৪) অনুসারে বাস্তবে বুদ্ধের ইহাই কায়। রূপকায় সৎকায় নহে। ধর্মশরীরই ভূতার্থিক শরীর। আর্যশালিস্তম্বসূত্রের মতে ধর্মশরীর অনুত্তর। বজ্রচ্ছেদিকার বক্তব্য হইতেছে যে, বুদ্ধের জ্ঞান ধর্মের দ্বারাই হয়, কেননা বুদ্ধ ধর্মকায়, কিন্তু ধর্মতা অবিজ্ঞেয়। ধর্ম কি? আর্যশালিস্তম্বসূত্রানুসারে প্রতীত্যসমুৎপাদই ধর্ম। যিনি এই প্রতীত্যসমুৎ-পাদকে যথাবৎ এবং অবিপরীতভাবে দেখেন এবং জানেন যে ইহা অজাত, অব্যুপশম-স্বভাব, তিনিই ধর্মকে দেখেন। এই প্রতীত্যসমুৎপাদ বুদ্ধের মধ্যম মার্গের সার। ভগবান ইহাকে গভীর-নয় বলিয়াছেন। 'তত্ত্বজ্ঞান'-অধিগম ধর্মের কারণেই বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি হইয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞানকে 'ধর্ম' ও 'প্রজ্ঞা' দুই-ই বলা হইয়াছে। এইজন্য ইহা আশ্চর্যের কথা নহে যে, বুদ্ধ-স্বভাবকে 'ধর্ম' এবং 'প্রজ্ঞা' বলা হইয়াছে। অষ্টসাহস্রিকাতে প্রজ্ঞাপার-মিতাকে বুদ্ধের ধর্মকায় বলা হইয়াছে। প্রজ্ঞাকে একস্থানে তথাগতগণের মাতাও বলা হইয়াছে। এই ধর্মকায় সর্বপ্রপঞ্চ-ব্যতিরিক্ত শুদ্ধকায়, কেননা ইহা প্রপঞ্চ বা আবরণরহিত এবং প্রভাস্বর। ইহাকে 'স্বভাবকায়'ও বলা হইয়াছে। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারাই নির্বাণের অধিগম হয়। এইজন্য কোথাও কোথাও ধর্মকায়কে 'সমাধিকায়' বলা হইয়াছে। এই তত্ত্বজ্ঞান বা বোধিই পরমার্থসত্য। সংবৃতিসত্যের দৃষ্টিতে ইহাকে শূন্যতা, তথতা, ভূতকোটি এবং ধর্মধাতু বলা হয়। সকল পদার্থ নিঃস্বভাব, অর্থাৎ শূন্য, ইহার উৎপত্তিও নাই, নিরোধও নাই। ইহাই পরমার্থসত্য। নাগার্জুন মাধ্যমিকসূত্রে বলিয়াছেন—

> "অপ্রতীত্যসমুৎপন্নো ধর্মঃ কশ্চিন্ন বিদ্যতে।
> যস্মাত্তস্মাদশূন্যো হি ধর্মঃ কশ্চিন্ন বিদ্যতে॥"
>
> (২৪।১৯)

অর্থাৎ এমন কোন ধর্ম নাই, যাহার উৎপাদ হেতুপ্রত্যয়বশ নহে। এইজন্য অশূন্য ধর্ম কিছুই নাই। সকল ধর্ম শূন্য, নিঃস্বভাব, কেননা যদি ভাব-সমূহের উৎপত্তি স্বভাব হইতে হয়, তাহা হইলে স্বভাব হেতু-প্রত্যয় নিরপেক্ষ হওয়াতে ইহার উৎপত্তিও হয়না, উচ্ছেদও হয়না। যদি ভাবসমূহের উৎপত্তি হেতুপ্রত্যয়বশ হয়, তাহা হইলে ইহাদের স্বভাব হইত না। এইজন্য স্বভাবের কল্পনায় অহেতুকত্বের আগম হয়, এবং ইহার দ্বারা কার্য, কারণ, কর্তা, করণ, ক্রিয়া, উৎপাদ, নিরোধ এবং ফলের বাধা হয়। কিন্তু যাহারা স্বভাবশূন্যতাবাদী তাঁহাদের জন্য কোন কার্যে বাধা উৎপন্ন হয়না, কেন না যাহা প্রতীত্যসমুৎপাদ, তাহাই শূন্যতা অর্থাৎ স্বভাবের দ্বারা ভাবসমূহের অনুৎপাদ হয়। ভগবান বলিয়াছেন—

"যঃ প্রত্যয়ৈর্জায়তি সহ্যজাতো ন তস্য উৎপাদু স্বভাবতোঽস্তি।
যঃ প্রত্যয়াধীনু স শূন্য উক্তো যঃ শূন্যতো জানাতি সোঽপ্রমত্তঃ॥"

(মধ্যমকবৃত্তি, পৃঃ ৫০৪)

অর্থাৎ যাহার উৎপত্তি প্রত্যয়বশ, তাহা অজাত, ইহার উৎপাদ স্বভাবের দ্বারা নহে। যাহা প্রত্যয়াধীন, তাহা শূন্য। যে শূন্যতাকে জানে, সে প্রমাদগ্রস্ত হয় না।

মাধ্যমিক সূত্রের অষ্টাদশ প্রকরণে নাগার্জুন বলিয়াছেন যে, শূন্যতা অর্থাৎ ধর্মতা চিত্ত এবং বাণীর বিষয় নহে। ইহা নির্বাণসদৃশ অনুৎপন্ন এবং অনিরুদ্ধ। শূন্যতা হইতেছে একপ্রকার সকল দৃষ্টির নিঃসরণ। মাধ্যমিকের কোন প্রতিজ্ঞা নাই। যিনি শূন্যতার প্রতি দৃষ্টি রাখেন অর্থাৎ যাঁহার শূন্যতায় অভিনিবেশ আছে, তাঁহাকে বুদ্ধ 'অসাধ্য' বলিয়াছেন।

এখন শূন্যতাবাদীর দৃষ্টিতে বুদ্ধকায়কে পরীক্ষা করিতে হইবে। মাধ্য-মিকসূত্রে 'তথাগত পরীক্ষা' নামে এক অধ্যায় আছে। নাগার্জুন বলিতেছেন যে, নিষ্প্রপঞ্চ তথাগতের সম্বন্ধে কোন প্রকার কল্পনা সম্ভব নহে। তথাগত শূন্যও নহেন, অশূন্যও নহেন, উভয়ও নহেন, ন-উভয়ও নহেন। যে ব্যক্তি প্রপঞ্চাতীত তথাগত সম্বন্ধে বিবিধ প্রকার পরিকল্পনা করে, সেই মূঢ় ব্যক্তি তথাগতকে জানে না, অর্থাৎ তথাগতের গুণ-সমৃদ্ধির অত্যন্ত পরোক্ষবর্তী। জন্মান্ধ ব্যক্তি যেমন সূর্যকে দেখিতে পায় না, ঐ ব্যক্তিও তেমন বুদ্ধকে দেখিতে পায় না। নাগার্জুন আরও বলিয়াছেন যে, তথাগতের যে স্বভাব, এই জগতেরও সেই স্বভাব। তথাগত যেমন নিঃস্বভাব, জগৎও নিঃস্বভাব।

প্রজ্ঞাপারমিতায় উক্ত হইয়াছে যে, সকল ধর্ম মায়োপম, সম্যক্‌সম্বুদ্ধও মায়োপম, নির্বাণও মায়োপম এবং নির্বাণ হইতেও বিশিষ্টতরও যদি কিছু থাকে, তাহাও মায়োপম। মায়া এবং নির্বাণ অদ্বয়। বলা হইয়াছে তথাগত হইতেছেন অনাস্রব কুশলধর্মের প্রতিবিম্ব, সেখানে তথতাও নাই, তথাগতও নাই; সর্বলোকে বিম্বই শুধু দৃশ্যমান। অতএব, মূল বক্তব্য হইতেছে এই যে, শূন্যতাবাদীর মতে বুদ্ধ নিঃস্বভাব অর্থাৎ বস্তুনিবন্ধন হইতে মুক্ত এবং পরমার্থ সত্যের দৃষ্টিতে তথাগত এবং জগতের ইহাই যথার্থ রূপ।

এখন দেখা যাউক, বুদ্ধকায় সম্বন্ধে বিজ্ঞানবাদীরা কি বলেন। বিজ্ঞানবাদীর বক্তব্য হইতেছে—শূন্যতা হইতেছে লক্ষণসমূহের অভাব এবং তত্ত্বতঃ ইহা এক অলক্ষণ 'বস্তু'। কেননা শূন্যতার সম্ভাবনার জন্য দুইটি কথা স্বীকার করা আবশ্যক—(১) সেই আশ্রয়ের অস্তিত্ব, যাহা শূন্য এবং (২) কোন বস্তুর অভাব, যাহার কারণে আমরা বলিতে পারি যে, 'ইহা শূন্য'। কিন্তু এই উভয়ের অস্তিত্ব যদি না মানা হয়, তাহা হইলে শূন্যতা অসম্ভব হইয়া যাইবে। শূন্যতাকে বিজ্ঞানবাদী 'বস্তুমাত্র' বলিয়া স্বীকার করেন এবং এই বস্তুমাত্র হইতেছে 'চিত্তবিজ্ঞান' বা আলয়বিজ্ঞান, যাহাতে সকল সাস্রব এবং অনাস্রব বীজের সংগ্রহ থাকে। সাস্রব-বীজ প্রবৃত্তি-ধর্মসমূহের এবং অনাস্রব-বীজ নিবৃত্তি-ধর্মসমূহের কারণ। যাহা কিছু আছে তাহা চিত্তেরই আকার। জগৎ চিত্তমাত্র। চিত্ত-ব্যতিরিক্ত অন্যের অভ্যুপগম বিজ্ঞানবাদীরা স্বীকার করেন না। সংসার এবং নির্বাণ উভয়ই চিত্তের ধর্ম। পরমার্থতঃ চিত্তের স্বভাব প্রভাস্বর এবং অদ্বয় তথা বহু আগন্তুক দোষ হইতে মুক্ত। কিন্তু রাগাদি মলের দ্বারা আবৃত হওয়ার কারণে চিত্ত সংক্লিষ্ট হইয়া যায়, যদ্দ্বারা আগন্তুক ধর্মসমূহের প্রবর্তন হয় এবং সংসারের উৎপত্তি হয়। ইহাকেই প্রবৃত্তিধর্ম বা বিজ্ঞানের সংক্লেশ-সংসার বলে এবং বিজ্ঞানের ব্যবদানই নির্বাণ। ইহাই শূন্যতা। বিজ্ঞানবাদী অনুসারে ইহাই তথতা, ভূততথতা, ধর্মকায় এবং সত্যস্বভাব। প্রত্যেক বস্তুর স্বভাব শাশ্বত এবং লক্ষণরহিত। যখন লক্ষণযুক্ত হইয়া যায় তখন তাহাকে মায়া বলে এবং অলক্ষণ হইলে তাহাকে শূন্যের সমান বলা হয়। বুদ্ধত্বই ধর্মকায়। কেননা বুদ্ধত্ব হইতেছে বিজ্ঞানের পরিশুদ্ধি এবং যদি বিজ্ঞান বাস্তবে সংক্লিষ্ট হয়, তাহা হইলে ইহা শুদ্ধ হইতে পারে না। এই দৃষ্টিতে বুদ্ধত্ব হইতেছে প্রত্যেক বস্তুর শাশ্বত এবং অপরিবর্তিত স্বভাব। 'ত্রিকায়স্তব' নামে ১৬ শ্লোকের একটি ছোট স্তোত্রগ্রন্থে ধর্ম-

কায়ের সুন্দর ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। অনেকের ধারণা এই 'ত্রিকায়স্তব' নাগার্জুনেরই রচনা।—

"যো নৈকো নাথনেকো স্বপরহিতমহাসম্পদাধারভূতো
নৈবাভাবো ন ভাবঃ খমিব সমরসো নির্বিভাবস্বভাবঃ।
নির্লেপং নির্বিকারং শিবমসমসমং ব্যাপিনং নিষ্প্রপঞ্চং
বন্দে প্রত্যাত্মবেদ্যং তমহমনুপমং ধর্মকায়ং জিনানাম্ ॥"

অর্থাৎ ধর্মকায় এক নহে; কেন না ইহা সমস্ত কিছুকে ব্যাপ্ত করে। এবং ইহা সকলের আশ্রয়। ধর্মকায় অনেকও নহে। ইহা স্বপরহিতমহাসম্পদের অর্থাৎ বুদ্ধত্বের আধারভূত। ইহার ভাবও নাই, অভাবও নাই। আকাশবৎ ইহা একরস। ইহার স্বভাব অব্যক্ত। ইহা নির্লেপ, নির্বিকার, অতুল্য, সর্বব্যাপী এবং প্রপঞ্চরহিত। ইহা স্বসংবেদ্য। বুদ্ধগণের এইরকম ধর্মকায় অনুপম।

তান্ত্রিক গ্রন্থাবলীতে ধর্মকায়কে বৈরোচন, বজ্রসত্ত্ব এবং আদিবুদ্ধ বলা হইয়াছে। এই ধর্মকায় বুদ্ধের সর্বশ্রেষ্ঠ কায়।

রূপকায় বা নির্মাণকায়ঃ

ভগবান গৌতম বুদ্ধের জন্ম লুম্বিনী উদ্যানে হইয়াছিল। তিনি মাতৃগর্ভজাত, ঔপপাদিক নহেন। তিনি মাতৃগর্ভে সম্প্রজন্য (=সম্যক্ স্মৃতি) সহকারে অবস্থান করেন এবং সম্প্রজন্য সহকারে মাতৃগর্ভ হইতে বহির্গত হন। ঔপপাদুক সত্ত্ব মৃত্যুর পরে অর্চিবৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ হইলে ভক্তগণ ধাতুগর্ভের পূজা করা হইতে বঞ্চিত হন। সেইজন্য বোধিসত্ত্ব জরায়ুজ যোনি পছন্দ করিতেন। অবশ্য মহাবস্তুর মতে বোধিসত্ত্বের গর্ভাবক্রান্তি হইলেও আসলে তিনি ঔপপাদুক।

সর্বাস্তিবাদীদের মতে রূপকায় সাস্রব, কিন্তু মহাসাংঘিক ও সৌত্রান্তিক মতে বুদ্ধের রূপকায় অনাস্রব। বিভাষা মতে বুদ্ধের রূপকায় সাস্রব। যদি অনাস্রব হইত তাহা হইলে অনুপমার মধ্যে বুদ্ধের প্রতি কামরাগ উৎপন্ন হইত না, অঙ্গুলিমালের মধ্যে তাঁহার প্রতি দ্বেষভাব উৎপন্ন হইত না। ইত্যাদি। কিন্তু নিঃসন্দেহে বুদ্ধের রূপকায় অনাস্রব, কারণ অষ্ট লোকধর্মের দ্বারা ইহা প্রভাবিত হয় না।

বুদ্ধের রূপকায়কে নির্মাণকায় বা নির্মিতকায় বলে। সুবর্ণপ্রভাসসূত্রে

বলা হইয়াছে যে, ভগবানের কায় কৃত্রিমও নহে। উৎপন্নও নহে। কেবল সত্ত্বগণের হিতার্থে তিনি নির্মাণকায় প্রদর্শন করিয়া থাকেন। অস্থি এবং রক্তশূন্য কায়ে ধাতুর (=অস্থির) সম্ভাবনা কোথায়? ভগবানের মধ্যে সর্ষপমাত্রও ধাতু ছিল না। কেবল সত্ত্বগণের হিতার্থে তিনি উপায়কৌশল্য দ্বারা ধাতুর নির্মাণ করিয়াছিলেন। বৈতুল্যকবাদীদের মতে বুদ্ধ সংসারে জন্ম-পরিগ্রহই করেন না, তিনি সর্বদা তুষিতদেবলোকে অবস্থান করেন, কিন্তু সংসারের হিতের জন্য নির্মিত রূপমাত্র পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়া থাকেন। সদ্ধর্মপুণ্ডরীকসূত্রের এক জায়গায় আছে যে, তথাগত মৈত্রেয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন—এই অসংখ্য বোধিসত্ত্বের সমুদ্‌গম কোথা হইতে হইয়া থাকে? সেই সময় অসংখ্য লোকধাতু হইতে আগত সম্যক্‌সম্বুদ্ধগণ শাক্যমুনির চতুর্দিকে পর্যংকোবদ্ধাবস্থায় আসনোপবিষ্ট ছিলেন। এখানে অন্য লোকধাতুসমূহ হইতে আগত তথাগতগণকে শাক্যমুনির দ্বারা নির্মিত নির্মিতবুদ্ধ বলা হইয়াছে, অর্থাৎ তাঁহারা ছিলেন শাক্যমুনির লীলা বা মায়ামাত্র। 'কথাবত্থু'তেও এই মতের উল্লেখ পাওয়া যায়। দিব্যাবদানে আমরা 'বুদ্ধ-নির্মাণ' এবং নির্মিত বুদ্ধের প্রয়োগ পাই। প্রাতিহার্য-সূত্রাবদানে ইহা বর্ণিত হইয়াছে—

'একসময় ভগবান্‌ রাজগৃহে বিচরণ করিতেছিলেন, সেই সময় পূরণ কাশ্যপাদি ছয়জন তীর্থিক রাজগৃহে একত্র হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'এখন পৃথিবীতে শ্রমণ গৌতমের জন্ম হইয়াছে, এখন আমাদের লাভসৎকায় সর্বথা সমুচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। আমরা ঋদ্ধিমান্‌ এবং জ্ঞানবাদী, শ্রমণ গৌতমও নিজেকে তদ্রূপ মনে করেন। তাঁহার উচিত আমাদের নিকট তাঁহার ঋদ্ধি-প্রাতিহার্য প্রদর্শন করা। তিনি যত দেখাইবেন, আমরা তাহার দ্বিগুণ দেখাইব।' বুদ্ধ তখন চিন্তা করিলেন—অতীতের বুদ্ধগণ প্রাণিগণের হিতের জন্য কোথায় ঋদ্ধিপ্রাতিহার্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার জানা হইল শ্রাবস্তীতে। তখন তিনি ভিক্ষুসংঘ লইয়া শ্রাবস্তীতে গেলেন। তীর্থিকগণ রাজা প্রসেনজিতকে বলিলেন—'আপনি শ্রমণ গৌতমকে বলুন তাঁহার ঋদ্ধি প্রদর্শন করিতে।' রাজা বুদ্ধকে অনুরোধ করিলেন, বুদ্ধ বলিলেন—অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে আমি সর্বসমক্ষে ঋদ্ধিপ্রাতিহার্য প্রদর্শন করিব। শ্রাবস্তীর জেতবনে এই উপলক্ষে একটি মণ্ডপ প্রস্তুত করা হইল এবং তীর্থিকদের খবর দেওয়া হইল। সপ্তম দিবসে তীর্থিকগণ একত্রিত হইলেন। ভগবান মণ্ডপে

আসিলেন। ভগবানের শরীর হইতে রশ্মি নির্গত হইয়া সমস্ত মণ্ডপকে উদ্‌ভাসিত করিল। ভগবান অনেক প্রাতিহার্য দেখাইয়া শেষে মহাপ্রাতিহার্য দেখাইলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ ভগবানকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া ভগবানের দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন, শক্রাদি দেবগণ আসিয়া তদ্রূপ ভগবানকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া ভগবানের বামপার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। নন্দ, উপনন্দ প্রভৃতি নাগরাজাগণ শকটচক্রের পরিমাপের সহস্রদল স্বর্ণকমল নির্মাণ করিলেন। ভগবান পদ্মকর্ণিকাতে পর্যংকাবদ্ধ হইয়া উপবেশন করিলেন এবং পদ্মের উপর অন্য পদ্ম নির্মাণ করিলেন। ভগবান তাহার উপরও উপবেশন করিলেন। এইভাবে একের উপর এক পদ্ম অকনিষ্ঠভবন (=সর্বোচ্চ স্বর্গ) পর্যন্ত নির্মাণ করিয়া নির্মিত বুদ্ধগণকে তদুপরি উপবেশন করাইলেন। এই সকল নির্মিত বুদ্ধের মধ্যে কেহ বা ছিলেন শয্যাসীন, কেহ বা দণ্ডায়মান, কেহ বা প্রাতিহার্য প্রদর্শন করিতেছিলেন, অন্য কেহ বা ধর্মোপদেশ দিতেছিলেন। রাজা প্রসেনজিত তখন তীর্থিকদের বলিলেন—আপনারাও ঋদ্ধি প্রদর্শন করুন। কিন্তু সকলেই চুপচাপ হইয়া গেলেন এবং একে অন্যকে বলিতে লাগিলেন—চল, উঠ। কিন্তু কেহই উঠিতে পারিলেন না। পূরণ কশ্যপ এতই অপমানিত বোধ করিলেন যে, তিনি গলায় কলসী বাঁধিয়া শীত-পুষ্করিণীতে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিলেন। এই ঘটনা হইতে প্রমাণিত হয় যে বুদ্ধ প্রাতিহার্য দ্বারা অনেক বুদ্ধ নির্মাণ করিতে পারিতেন। এই সকল বুদ্ধকে বুদ্ধের 'নির্মাণ-কায়' বলা যাইতে পারে। বুদ্ধ যখন তিনমাস তাবতিংশ স্বর্গে ছিলেন তাঁহার মাতাকে ধর্মোপদেশ প্রদানের জন্য, প্রত্যেকদিন তিনি তাঁহার 'নির্মাণকায়' নির্মিত করিয়া দেবগণের সম্মুখে ধর্মোপদেশপ্রদানরত অবস্থায় উপবেশন করাইয়া স্বয়ং ভিক্ষান্ন সংগ্রহের জন্য পৃথিবীতে অবতরণ করিতেন প্রত্যহ। ইতিপূর্বে আমরা ইহা বলিয়াছি। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে বুদ্ধের 'নির্মাণকায়' সর্বত্রগ। বিজ্ঞানবাদীদের মতে বুদ্ধের অনেক নির্মিত রূপই তাঁহার 'নির্মাণকায়' নহে, কিন্তু সমস্ত জগৎকেই বুদ্ধের নির্মাণ-কায় বলা যাইতে পারে। শূন্য এবং প্রকৃতি-প্রভাস্বর বিজ্ঞানই ধর্মকায়। নির্মাণ-কায় এই ধর্মকায়েরই অসৎ-রূপ। বিজ্ঞান-বাসনার দ্বারা সংশ্লিষ্ট হইলেই তিনি এই রূপলোক ও কামলোক নির্মাণ করিয়া থাকেন।

সম্ভোগকায়ঃ

সম্ভোগকায়কে বিপাককায়ও বলা হয়। স্থবিরবাদীদের গ্রন্থে এই সম্ভোগ-

কায়ের উল্লেখ পাওয়া যায় না। সৌত্রান্তিক ধর্মকায় ও সম্ভোগকায় উভয়কেই স্বীকার করিতেন। সম্ভোগকায় হইতেছে—তাহা যাহা বুদ্ধ জগতের কল্যাণের জন্য বোধিসত্ত্বরূপে নিজের পুণ্যসম্ভারের ফলস্বরূপ ততদিন ধারণ করেন, যতদিন তিনি মহাপরিনির্বাণে প্রবেশ না করেন। মহাযান গ্রন্থানুসারে বুদ্ধত্ব হইতেছে জ্ঞানসম্ভার ও পুণ্যসম্ভারের ফলশ্রুতি। তাহাতে আরও অনেক বুদ্ধের উল্লেখ পাওয়া যায় যাঁহারা শূন্যতায় প্রবেশ করেন না, যাঁহারা অন্য সকলের কল্যাণকামী এবং যাঁহারা সকলকে সুখী করার জন্যই বুদ্ধত্ব আকাঙ্ক্ষা করেন। তাঁহারা উৎকৃষ্ট প্রণিধান রচনা করেন যাহা শেষে ফলদান করে। ইহার ফলস্বরূপ তাঁহাদের প্রত্যেকে এক এক বুদ্ধক্ষেত্রের অধিকারী হইয়া নানাপ্রকার দিব্য সম্পদ্ ভোগ করিয়া থাকেন। তাঁহারা সপার্ষদ্ ঐসকল বুদ্ধক্ষেত্রে দিব্যসুখ উপভোগ করেন। মহাযান সুখাবতী-ব্যূহে বর্ণিত হইয়াছে যে, ধর্মাকার ভিক্ষু এইরূপ প্রণিধান করাতে সুখাবতী-লোক তাঁহার বুদ্ধক্ষেত্র হইয়াছিল। সেখানে অমিতাভ বুদ্ধ অবস্থান করেন। ভগবান বুদ্ধের মুখে ধর্মাকার ভিক্ষুর উক্ত প্রণিধানের কথা শুনিয়া স্থবির আনন্দ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"ভন্তে ভগবন্, ধর্মাকার ভিক্ষু কি সম্যক্ সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়া পরিনির্বাণে প্রবেশ করিয়াছেন অথবা এখনও সম্বোধি প্রাপ্ত হন নাই, অথবা এখনও বর্তমান আছেন এবং ধর্মোপদেশ দান করিতেছেন?" ভগবান বলিলেন—"আনন্দ, তিনি অতীতও নহেন, অনাগতও নহেন, তিনি এখনও বর্তমান। সুখাবতী-লোকধাতুতে অমিতাভ নামক তথাগত ধর্মদেশনারত আছেন। তাঁহার বুদ্ধক্ষেত্রের পরিধি অনন্ত। তাঁহার অমিত প্রতিভা, অপ্রমেয় প্রতিভা। অনেক বোধিসত্ত্ব অমিতাভ বুদ্ধকে দর্শন করিতে, তাঁহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে তথা সেখানকার বোধিসত্ত্বগণ এবং বুদ্ধক্ষেত্রের গুণালংকার-ব্যূহ দর্শনের জন্য সুখাবতীতে গমন করিয়া থাকেন। সেখানে বুদ্ধ অমিতাভ স্বীয় পুণ্যরাশির দ্বারা সুশোভিত। অমিতাভের পার্ষদ্ অবলোকিতেশ্বর এবং মহাস্থান-প্রাপ্ত, অমিতাভের নাম শ্রবণের দ্বারাই সকলের চিত্তপ্রসাদ উৎপন্ন হয়, শ্রদ্ধাবান হন এবং কাহারও মধ্যে সংশয় এবং বিচিকিৎসা থাকে না। যিনি অমিতাভের নাম-কীর্তন করেন, তিনি সুখাবতী স্বর্গে জন্মগ্রহণ করেন। অমিতাভ বুদ্ধের কায় সম্ভোগকায়।

ভগবান এই সম্ভোগকায়ের দ্বারা নিজের বিভূতি প্রকট করেন। ধর্মকায়ের অসদৃশ এই কায় রূপবান্। কিন্তু এই রূপ অপার্থিব। চন্দ্রকীর্তি সম্ভোগ-

কায়ের স্থলে রূপকায় শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন এবং ধর্মকায়ের সহিত ইহার তুলনা করিয়াছেন। বোধিচর্যাবতারে সম্ভোগকায়কে 'লোকোত্তর-কায়' বলা হইয়াছে।

চীনা বৌদ্ধ সাহিত্যেও ত্রিকায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সাহিত্যানুসারে 'ত্রিকায়' বুদ্ধের তিন রূপের সূচক ঃ—

১। শাক্যমুনি (মানুষী বুদ্ধ), এই মর্ত্যলোকে যাঁহার জন্ম হইয়াছে। তিনি এই কামধাতুতে অবস্থান করেন, ইহাই বুদ্ধের নির্মাণকায়।

২। লোচন (ধ্যানী বোধিসত্ত্ব)। তিনি রূপধাতুতে অবস্থান করেন। ইহা বুদ্ধের সম্ভোগকায়।

৩। বৈরোচন (ধ্যানী বুদ্ধ)। তিনি অরূপধাতুতে অবস্থান করেন। ইহা বুদ্ধের ধর্মকায়।

ধ্যানীবুদ্ধের স্থিতিতে তিনি চতুর্থ বুদ্ধক্ষেত্রের আধিপত্য করেন। এই বুদ্ধক্ষেত্রে সকল সত্ত্বগণ শাশ্বত শান্তি এবং প্রকাশের অবস্থায় থাকেন।

ধ্যানী বোধিসত্ত্বের স্থিতিতে তিনি তৃতীয় বুদ্ধক্ষেত্রের অধিকারী হন। এখানে ভগবানের ধর্ম সহজভাবে স্বীকৃত হয় এবং এই ধর্মানুসারে সত্ত্বগণ এখানে অনায়াসে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হন।

মানুষী বুদ্ধের স্থিতিদ্বারা তিনি দ্বিতীয় এবং প্রথম বুদ্ধক্ষেত্রের অধিকারী হন। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অকুশল নাই, এখানকার সত্ত্বগণ শ্রাবক এবং অনাগামী অবস্থা প্রাপ্ত হন। প্রথম ক্ষেত্রে শুভ-অশুভ, কুশল-অকুশল উভয়ই বর্তমান।

সংক্ষেপে বুদ্ধত্বের দৃষ্টিতে 'ত্রিকায়ের' ব্যাখ্যা এইরূপ হইবে ঃ বুদ্ধের স্বভাব বোধি বা প্রজ্ঞাপারমিতা বা ধর্ম, ইহাই পরমার্থ শত্য, এই জ্ঞানসম্ভার লাভের দ্বারা নির্বাণ-অধিগম হয়। এইজন্য **ধর্মকায়** হইতেছে নির্বাণ-স্থিত বা নির্বাণ-সদৃশ সমাধির অবস্থাতে স্থিত বুদ্ধ। বুদ্ধ যতদিন নির্বাণে প্রবেশ না করেন, ততদিন লোককল্যাণের জন্য তিনি পুণ্যসম্ভারের ফলস্বরূপ নিজ দিব্যরূপ সুখাবতী বা তুষিতলোকে বোধিসত্ত্বগণের নিকট প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ইহা **সম্ভোগকায়**। মানুষী বুদ্ধ হইতেছে তাঁহার নির্মাণ-কায়, যিনি সময় সময় পৃথিবীতে আসেন ধর্মপ্রতিষ্ঠার জন্য।

দার্শনিক দৃষ্টিতে ধর্মকায় হইতেছে শূন্যতা বা অক্ষণ-বিজ্ঞান। সম্ভোগকায় ধর্মকায়ের সৎ, চিৎ, আনন্দ বা করুণার রূপে বিকাশমাত্র। এই

চিৎ যখন দূষিত হইয়া পৃথগ্‌জনের রূপে বিকশিত হয়, তখন তাহাকে নির্মাণ-কায় বলা হয়।

ত্রিকায়ের কল্পনা হিন্দুধর্মে দেখা যায় না। কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, বেদান্তের পরব্রহ্ম, বিষ্ণু এবং বিষ্ণুর মানুষী অবতার (যেমন রাম, পরশুরাম, কৃষ্ণ ইত্যাদি) যথাক্রমে বৌদ্ধদের ধর্মকায়, সম্ভোগকায় এবং নির্মাণকায়ের সমান। বৌদ্ধগ্রন্থে যেমন ধর্মকায়কে নির্লেপ, নির্বিকার, অতুল্য, সর্বব্যাপী এবং প্রপঞ্চরহিত বলা হইয়াছে, তদ্রূপ উপনিষদে ব্রহ্মকে অগ্রাহ্য, অলক্ষণ, অচিন্ত্য, শান্ত, শিব, প্রপঞ্চোপশম, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, সূক্ষ্ম, নির্বিকল্প এবং নিরঞ্জন বলা হইয়াছে। উভয়ই অবাঙ্‌মনসগোচর এবং উভয়েরই স্বরূপ নিরূপণ করা যায় না। যেমন বিষ্ণু করুণার রূপ, বুদ্ধও করুণার অবতার। পুরাণে এবং শ্রীরামানুজাচার্য-রচিত 'শ্রীবৈকুণ্ঠগদ্যে' বিষ্ণুলোকের যে বর্ণনা আছে, তাহার সহিত সুখাবতী লোকের বর্ণনার মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায়। বিষ্ণুলোক এবং সুখাবতী দিব্য এবং প্রচুর দিব্য সম্পত্তি সমন্বাগত। উভয়ত্র ইচ্ছামাত্রই সব কিছু লাভ করা যায়। উভয় লোকের তেজ অনন্ত। বিষ্ণু এবং অমিতাভ সর্বদা পরিজন দ্বারা পরিবৃত। উভয়লোকে উৎপন্ন জীব সুখপদ লাভ করিয়া তাহা হইতে প্রত্যাগমন করে না। অনন্য ভক্তির দ্বারাই উভয়লোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। উভয়ই বিশুদ্ধসত্ত্বনির্মিত। এইজন্য উভয়ই জ্ঞান ও আনন্দের বর্ধক। বিষ্ণু এবং অমিতাভের প্রভায় সমস্ত জগৎ উদ্‌ভাসিত হয়। বৌদ্ধাগমে যেমন পাওয়া যায় আদিবুদ্ধের নাম উপনিষদে তেমনই পাওয়া যায় আদি-নারায়ণের নাম। যেমন মানুষী বুদ্ধ সম্ভোগকায়ের নির্মাণকায়, তদ্রূপ রাম, কৃষ্ণ আদি বিষ্ণুর অবতার। ধর্মসংস্থাপনের জন্য এই সকল অবতার যুগে যুগে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন।

খৃষ্টধর্মেও তদনুরূপ কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়। কোন কোন মতে যীশুর পার্থিব শরীর ছিল না। তিনি মাতৃগর্ভ হইতে উৎপন্ন হন নাই। দর্শনে মনুষ্যাকৃতির হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহা ছিল তাঁহার মায়া-নির্মিত শরীর। যীশুর পৃথিবীতে আগমন এবং ক্রুশবিদ্ধ হইয়া মৃত্যুর ঘটনা তাঁহারা স্বীকার করেন না। অনেকে আবার যীশুর শরীরের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও বলেন যে তাহা অপার্থিব এবং দিব্য। তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, যীশু জাগতিক সুখ-দুঃখের অধীন নহেন। এই রকম বিচারধারাকে বলা হইয়াছে Docetism.

পারসীদের অবেস্তাতে যে চারিপ্রকার স্বর্গের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে একটি হইতেছে 'অনন্তপ্রভাযুক্ত', ইহা হইতে Eliot সাহেব অনুমান করেন যে অমিতাভ বুদ্ধের পূজা বহির্দেশ হইতে ভারতে আসিয়াছে। জৈনদের 'সংপুর' এর সঙ্গে সুখাবতীস্বর্গের সাদৃশ্য আছে।

বোধিসত্ত্বচর্যা বা পারমিতা

গৌতম বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া যে সমস্ত সৎকর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন তাহাকে এক কথায় পারমিতা (পারম্+ই+তা)। দুঃখমুক্তির **পারে** উত্তীর্ণ হইবার ('ই' ধাতু গমনে) যে চর্যা, যে সাধনা, যে সৎকর্মাদির অনুষ্ঠান তাহাকেই বলে পারমিতা (পালিতে 'পারমী')। পালি জাতকের কাহিনীসমূহ পারমিতা সিদ্ধান্তের উপরই আধারিত। বৌদ্ধধর্মের প্রাথমিক অবস্থায় ১০ প্রকার পারমিতার উল্লেখ পাওয়া যায়। পালি বুদ্ধবংসে ১০ প্রকার এবং চরিয়াপিটকে ৭ প্রকার পারমিতার উল্লেখ আছে। কিন্তু মহাযান গ্রন্থাদিতে ৬ প্রকার পারমিতার উল্লেখ পাওয়া যায়। উক্ত দুই প্রকার পারমিতা-বিভাগকে এইভাবে তুলনা করা যাইতে পারে :—

বুদ্ধবংসে উল্লিখিত পারমিতা-সমূহ	পালিতে	মহাযান-সম্মত পারমিতা-সমূহ
১। দান	১। দান	১। দান
২। শীল	২। শীল	২। শীল
৩। নৈষ্কাম্য	৩। নেক্খম্ম	
৪। সত্য	৪। সচ্চ	
৫। ক্ষান্তি	৫। খন্তি	৩। ক্ষান্তি
৬। বীর্য	৬। বিরিয়	৪। বীর্য
৭। অধিষ্ঠান	৭। অধিট্ঠান	
৮। মৈত্রী	৮। মেত্তা	৫। ধ্যান
৯। উপেক্ষা	৯। উপেক্খা	
১০। প্রজ্ঞা	১০। পঞ্ঞা	৬। প্রজ্ঞা

বিঃ দ্রঃ সংখ্যা ৫, ৬ এবং ১০ পালি চরিয়াপিটকে নাই।

বুদ্ধবংসের ১০ পারমিতা গভীরভাবে পর্যালোচনা করিলে তাহাদিগকে মহাযানে ৬ পারমিতার অন্তর্ভুক্ত করা যায়। নৈষ্কাম্য (নং ৩) অর্থাৎ কাম-ভোগের প্রতি চিত্তকে নমিত না করা, সত্য (নং ৪) এবং শীলের (নং ২) অতিরিক্ত কিছু নহে। অতএব তিনটাকেই মহাযানের শীল পারমিতার (নং ২) অন্তর্ভুক্ত করা যায়। মৈত্রী (নং ৮) এবং উপেক্ষা (নং ৯) ধ্যান ব্যতীত কিছু নহে, কাজেই ঐ দুইটিকে মহাযানের ধ্যান পারমিতার (নং ৫) অন্তর্ভুক্ত করা যায়। অধিষ্ঠান (নং ৭) বা দৃঢ় সংকল্পকে বীর্যের (নং ৪) অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

উক্ত ৬ পারমিতার অতিরিক্ত উপায়, প্রণিধান, বল এবং জ্ঞান পারমিতার চর্চাও মহাযানে দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে জ্ঞানকে প্রজ্ঞা-পারমিতার (নং ৬) অন্তর্ভুক্ত করা যায়। উপায়, প্রণিধান (সংকল্প) এবং বলও বীর্যের (নং ৪) অতিরিক্ত নহে।

আর্য অসঙ্গ তাঁহার মহাযানসূত্রালংকারে (১৬/১৩) ৬ প্রকার পারমিতার মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যেমন, দান পারমিতা দারিদ্র্য দূর করে। শীল-পারমিতা বিষয়নিমিত্তক ক্লেশরূপী অগ্নিকে শীতল করে। ক্ষান্তি-পারমিতা ক্রোধ ও বিদ্বেষকে ক্ষয় করে। বীর্য-পারমিতা শ্রেষ্ঠ বা কুশল ধর্মের সহিত চিত্তকে যুক্ত করে। ধ্যান-পারমিতা চিত্তকে ধারণ বা সংযত করিতে সাহায্য করে। প্রজ্ঞা-পারমিতার দ্বারা পারমার্থিক জ্ঞান লাভ হয়।

নিম্নে সংক্ষেপে পারমিতা সমূহের বর্ণনা দেওয়া হইতেছে ঃ—

১। দান-পারমিতা—সর্বপ্রাণীর হিতের জন্য নিজের সর্বস্ব দান করা, এমনকি নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা সমস্ত শরীর নিঃস্বার্থভাবে দান করা এবং দানের ফলও পরিত্যাগ করাই দান পারমিতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বোধিসত্ত্ব জন্মে জন্মে নানাভাবে এই দান-পারমিতা পূর্ণ করিয়াছিলেন। দানের পর যদি ফলের আকাঙ্ক্ষা থাকে তাহা হইলে সেই দান শুদ্ধ হয় না, বন্ধনের কারক হয় এবং অপূর্ণ থাকিয়া যায়। শিক্ষাসমুচ্চয়ে[৮৩] বলা হইয়াছে —"যেমন কেহ ভৈষজ্যবৃক্ষের মূল লইয়া যায়, কেহ শাখা, কেহ পত্র, কেহ পুষ্প এবং কেহ ফল লইয়া যায়, কিন্তু ভৈষজ্যবৃক্ষ কোন প্রকার ভ্রূক্ষেপও করেনা (লোকে আমার কি লইয়া গেল বলিয়া), তদ্রূপ বোধিসত্ত্বও নিজকে ভৈষজ্যবৃক্ষ মনে করেন এবং সংকল্প করেন যে, যাহার যাহা প্রয়োজন তাহা

আমার নিকট হইতে লইয়া যাউক।" পালি দীঘনিকায়ের চক্কবত্তিসীহনাদ সুত্তে বলা হইয়াছে—"দরিদ্রের নিকট ধনাভাব হেতুই তাহাদের মধ্যে চৌর্য, হত্যা, মিথ্যাভাষণ, ব্যভিচার, অতিলোভ, কটুভাষণ, বৈমনস্য, মিথ্যাদৃষ্টি, গুরুজনের প্রতি অশ্রদ্ধাভাবাদি দুর্নীতি আসে।" এই সকল দুরাচার দূর করা শুধু কঠিন নয়, অসম্ভবও বটে। বোধিসত্ত্বের দান পারমিতার উদ্দেশ্যই হইল প্রার্থীর প্রার্থনা পূর্ণ করা, তাহার অভাব দূর করা যতটা সম্ভব। শান্তিদেব বলিয়াছেন—"সমস্ত প্রাণীর হিতের জন্য দানফল সহ সর্বস্ব ত্যাগাভিপ্রায়ে প্রদত্ত দানকেই দান-পারমিতা বলা হয়।"[৬৯] অতএব দানের পূর্ণতার জন্য ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করা নিতান্ত আবশ্যক। এইজন্যই বোধিসত্ত্বগণ আত্মভাবেরও পরিত্যাগ করেন এবং অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কুশলমূলেরও পরিত্যাগ করেন, যাহাতে সর্বপ্রাণীর মঙ্গলসিদ্ধি হয়। সুতরাং আত্মভাবের ত্যাগই নির্বাণলাভের প্রকৃষ্ট উপায়। যদি নির্বাণলাভের জন্য সমস্ত ত্যাগই করিতে হয়, তাহা হইলে সকল প্রাণীর হিতের জন্যই ত্যাগ করা উত্তম। এই ভাবনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া বোধিসত্ত্বগণ স্বীয় শরীর পর্যন্ত সমস্ত প্রাণীর হিতের জন্য দান করেন। যেমন পৃথিবী, অপ্, তেজ, বায়ু অখণ্ড প্রাণীর উপভোগ্য হয়, সেইরূপ বোধিসত্ত্বগণও সকল প্রাণীর আশ্রয়স্থল, যেই পর্যন্ত না তাহারা (প্রাণিগণ) সংসার-দুঃখ হইতে চিরতরে মুক্ত হয়।

সাংসারিক দুঃখের মূলই হইল সর্বপরিগ্রহ। আমার পুত্র, আমার ধন ইত্যাদি 'আমার আমার' করিয়াই অজ্ঞলোক দুঃখভোগ করিয়া থাকে। নিজেই যখন নিজের নহে, তখন পুত্রকন্যা ধনজন কি করিয়া নিজের হইবে?[৭০] অতএব আত্মভাবরহিত অপরিগ্রহ দ্বারাই সংসারদুঃখ হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। সেইজন্য, বোধিসত্ত্বগণ আত্মভাবের উৎসর্গ করিয়া অনাথ সত্ত্বগণের প্রতি করুণাবশতঃ তাহাদের দুঃখবিনাশের অভিপ্রায়ে স্বয়ং দুঃখভার গ্রহণ করতঃ বুদ্ধত্বলাভের জন্য বদ্ধপরিকর হন।

জাতক ও অবদানসাহিত্যে বোধিসত্ত্বের দানপারমিতার বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। বোধিসত্ত্বের এই দান-পারমিতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া মহারাজ হর্ষবর্ধন প্রতি পঞ্চম বর্ষে প্রয়াগে এক ধর্ম-সম্মেলন আহ্বান করিতেন এবং উক্ত সম্মেলনে শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দীন-দুঃখী সকলকে সর্বস্ব দান করিয়া দিতেন। তিব্বতের রাজা মুনি-বচেন্‌পো (খৃঃ ৭৮৫—৭৮৬)

তাঁহার মাত্র ১ বৎসর ৭ মাসের রাজত্বকালে তিনবার ধনরাশি প্রজাদিগের নিকট সমভাবে দান করিয়াছিলেন। শুনিতে অবশ্য মনে হইবে পাগলামি, কিন্তু ইহার পশ্চাতে যে বোধিসত্ত্বের দান-পারমিতার আদর্শ কাজ করিয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না।

২। শীল-পারমিতা—শীল পারমিতা হইতেছে কায় ও বাক্ কর্মের সম্পূর্ণ সংযম। শীল সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্বে এই গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি। বোধিসত্ত্ব সংসার-দুঃখ হইতে মুক্তি ও বুদ্ধত্ব লাভের সংকল্প করিয়া জন্মজন্মান্তরে শীল-পারমিতা পূর্ণ করিয়াছেন। তিনি প্রাণীহত্যা, চৌর্য, কাম-ব্যভিচার, অসত্যভাষণ, মাদক দ্রব্য সেবনাদি হইতে নিজেকে সংযত রাখিতেন। তিনি পিশুনবাক্ (চুক্‌লি), কটু-বাক্, সম্প্রলাপ, লোভ, দ্বেষ এবং মিথ্যাদৃষ্টি হইতে বিরত থাকিতেন। অবশ্য লোভ, দ্বেষ এবং মিথ্যাদৃষ্টি শীলের অন্তর্গত নহে। ইহাদের সম্বন্ধ মনের সঙ্গে।

জাতকনিদান হইতে জানা যায় যে, সুমেধ তাপস দান-পারমিতা পর্যবেক্ষণ করতঃ শীল-পারমিতা পূরণের সংকল্প করিয়াছিলেন। "চমরী যেমন জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়াও স্বীয় লাঙ্গুল রক্ষা করে, তদ্রূপ আমিও জীবনের প্রতি কোন মমতা না রাখিয়া শীল-পারমিতা পূর্ণ করিয়া বুদ্ধ হইব।" তাহার পর হইতে তিনি শীলবান জন্মে, চম্পেয়্য জন্মে, ভূরিদত্ত নাগরাজরূপে, ছদ্দন্ত হস্তীরূপে, জয়দ্দিস রাজপুত্ররূপে, অসীম শক্র কুমার ইত্যাদি জন্মে অসহ্য শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও শীল-পারমিতা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

৩। ক্ষান্তি-পারমিতা—বোধিসত্ত্ব ক্ষান্তি-পারমিতা অভ্যাসকালে অন্যদের অপরাধকে ক্ষমা করিয়া দিতেন। কোন অবস্থাতেই তিনি মনে বিকার উৎপাদন করিতেন না, অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্রও মনে বিদ্বেষভাব পোষণ করিতেন না। সমস্ত কষ্ট সহ্য করিতেন। ক্ষান্তি-পারমিতা কি করিয়া পূরণ করিতে হয় তাহার একটি প্রকৃষ্ট উপমা বুদ্ধ মজ্ঝিমনিকায়ের ককচূপমসুত্তে প্রদান করিয়াছেন: "হে ভিক্ষুগণ, চোর-ডাকাত যদি করাত দ্বারা (বা যে কোন অস্ত্র দ্বারা) তোমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও ছেদন করে, তথাপি তোমরা মনকে দূষিত করিবে না। তোমরা এইরূপ শিক্ষা করিবে: 'আমি আমার চিত্তকে বিকারযুক্ত হইতে দিব না। দুর্বাক্য ব্যবহার করিব না।

মৈত্রীভাবের দ্বারা সদা অন্যের হিতানুকম্পী হইয়া বাস করিব। কিছুতেই আমার চিত্তে দ্বেষভাব উৎপাদন করিব না। বিশ্বের সকলের প্রতি অপরিমেয় মৈত্রীভাব পোষণ করিব।' মাতা যেমন তাঁহার জীবনের বিনিময়েও একমাত্র পুত্রের জীবন রক্ষা করেন, সেইরূপ অপরিসীম মৈত্রী শত্রু-মিত্র সকলের প্রতি পোষণ করিবে।"

৪। বীর্য-পারমিতা—কুশলকর্মে উৎসাহিত হওয়াই বীর্য, ইহার বিপরীত হইতেছে আলস্য, কুৎসিত কর্মে আসক্তি, বিষাদ এবং আত্মাবজ্ঞা। সংসার-দুঃখ তীব্রভাবে অনুভূত না হইলে কুশলকর্মে প্রবৃত্তি হয় না, আবার সংসার-দুঃখে অনুদ্বেগ হেতু আলস্য উৎপন্ন হয়। বুদ্ধ বলিয়াছেন ঃ

"যং কিঞ্চি সিথিলং কম্মং সংকিলিট্‌ঠং চ যং বতং।
সংকস্সরং ব্রহ্মচরিয়ং ন তং হোতি মহপ্‌ফলং ॥

(ধম্মপদ ২২।৭)

অর্থাৎ শিথিল (উদ্যমহীন) কর্ম, কলুষিত ব্রত এবং অপবিত্র ব্রহ্মচর্যের ফল ভাল হয় না। বুদ্ধ আরও বলিয়াছেন ঃ

"কয়িরা চে কয়িরাথেনং দল্‌হমেনং পরক্কমে।
সিথিলো হি পরিব্বাজো ভিয্যো আকিরতে রজং ॥"

(ধম্মপদ ২২।৮)

যদি কুশল কর্ম করিতে হয়, তবে উহা দৃঢ় পরাক্রম সহকারেই করিবে। কারণ শিথিলভাবে অনুষ্ঠিত সন্ন্যাস অধিকতর রজঃই বিকিরণ করে।

"উট্‌ঠানকালম্হি অনুট্‌ঠহানো
যুবা বলী আলসিয়ং উপেতো।
সংসন্নসংকপ্‌পমনো কুসীতো
পঞ্‌ঞায় মগ্‌গং অলসো ন বিন্দতি।"

(ধম্মপদ ২০।৮)

—উদ্যমের সময় যে উদ্যমবিহীন, তরুণ ও শক্তিমান হইয়াও যে আলস্যযুক্ত, সংকল্পে অবসন্নচিত্ত, হীনবীর্য, নিরুৎসাহী; সেই ব্যক্তি প্রজ্ঞামার্গ লাভ করিতে পারে না।

বোধিচর্যাবতারে শান্তিদেব বীর্য-পারমিতা সম্বন্ধে সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন ঃ ক্ষমাশীল হইয়া বীর্যের আচরণ করা উচিত, কারণ বীর্যের উপরই বোধি নির্ভর করে। যেমন বায়ু বিনা গতি

হয় না, তদ্রূপ বীর্য বিনা পুণ্য হয় না। বীর্য কাহাকে বলে? বীর্য হইতেছে পুণ্যাচরণের জন্য উৎসাহ। মানুষ সংসার-দুঃখ সম্বন্ধে অচেতন থাকাতে সে নিদ্রা-আলস্য ও তন্দ্রায় জীবন নষ্ট করে। তাই বলা হইয়াছে— ক্লেশরূপী ধীবরের বশীভূত হইয়া জন্মরূপ জালে আবদ্ধ হইয়া তুমি মৃত্যুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছ, তথাপি তোমার ঘুমের ঘোর কাটিতেছে না? তোমার চক্ষুর সম্মুখে তোমার সঙ্গী সাথী, আত্মীয়-পরিজন মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, তথাপি তোমার চেতনা হইতেছে না! যমদূত তোমার দ্বারে উপস্থিত, তথাপি পান-ভোজন-শয়ন ও আনন্দ ফূর্তিতে মশগুল হইয়া আছ? মনুষ্য জন্মরূপী নৌকা লাভ করিয়াও তুমি দুঃখরূপ নদী পার হইবার চিন্তা করিতেছ না কেন? হে মূঢ়! নিদ্রার সময় নাই। কারণ এই নৌকা পুনরায় দুর্লভ।

দুঃখরূপ নদী সৃষ্টির মূলে চিত্ত (ক্লেশ)। সেই ক্লেশসমূহকে বীর্য সহকারে নির্মূল করিতে হইবে। শিক্ষিত শত্রুর বিরুদ্ধে তরবারি দ্বারা যুদ্ধ করার সময় যেমন আত্মরক্ষা এবং শত্রু ধ্বংসের জন্য দৃঢ়বীর্য সহকারে তরবারি চালনা করিতে হয়, তদ্রূপ চিত্তক্লেশের আঘাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে হইবে এবং ক্লেশসমূহকে ধ্বংস করিতে হইবে। যুদ্ধ করার সময় হস্তস্খলিত তরবারিকে যেমন ঝট্‌পট্ উঠাইয়া লইতে হয়, তদ্রূপ স্মৃতিরূপ তরবারিকে জাগ্রত রাখিয়া ক্লেশের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। রক্তের সহিত মিশিবার সঙ্গে সঙ্গে যেমন বিষ সমগ্র শরীরে ফলিত হয়, তদ্রূপ স্মৃতির অভাবের সুযোগ লইয়া ক্লেশরূপী শত্রু চিত্তের মধ্যে ফলিত হয়। অতএব বীর্য সহকারে স্মৃতিকে জাগ্রত রাখিতে হইবে। অসিধারী ব্যক্তিদের মধ্যে তৈলপাত্রবাহী ব্যক্তি যেমন তৎপর (সাবধান) থাকে, অর্থাৎ তৈল-পাত্র স্খলিত হইলে তরবারি আঘাতে তাহার মৃত্যু হইবে ইহা জানিয়া যেমন তাহাকে তৎপর থাকিতে হয়, তদ্রূপ ব্রতীকে তৎপর থাকিতে হইবে যাহাতে ক্লেশরূপ অসি দ্বারা তাহার শরীর ক্ষতবিক্ষত না হয়। কোলে হঠাৎ কোন বিষধর সর্প আসিয়া পড়িলে যেমন ঝট্‌পট্ উঠিয়া পড়িয়া সর্পকে ত্যাগ করিতে হয়, তদ্রূপ নিদ্রা-আলস্য দ্বারা আক্রান্ত হইলে ঝট্‌পট্ তাহার প্রতিকার করিতে হইবে। স্মৃতিভ্রষ্ট হইলে লোকে একটার পর একটা ভুল করিয়া অনুসোচনা করে। অতএব বীর্য সহকারে সর্বদা স্মৃতি জাগ্রত রাখিতে হইবে। কার্যারম্ভের পূর্বে যেমন কর্তাকে সজাগ থাকিতে হয়, তদ্রূপ অপ্র-

মাদের কথা স্মরণ রাখিয়া নিজেকে সব সময় সজাগ থাকিতে হইবে। বায়ুর গমনাগমনে যেমন তুলা বায়ুর বশীভূত হয় তদ্রূপ ব্রতীকে উৎসাহবশ (অর্থাৎ বীর্যবান্) হইতে হইবে, তাহা হইলেই ঋদ্ধি-সিদ্ধি লাভের সম্ভাবনা।

বোধিসত্ত্ব বুদ্ধত্বের সংকল্পকে সম্মুখে রাখিয়া জন্মজন্মান্তরে এই বীর্য-পারমিতাই পূরণ করিয়াছেন।

৫। ধ্যান-পারমিতা—বীর্যকে বৃদ্ধি করিয়া সমাধিতে মন আরোপ করিতে হইবে, অর্থাৎ চিত্তৈকাগ্রতার জন্য যত্নবান হইতে হইবে। কেন না বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তি বীর্যবান হইলেও ক্লেশ-কবলিত থাকে। এইজন্য বোধিসত্ত্ব চিত্তকে শান্ত ও একাগ্র করার জন্য জন্ম-জন্মান্তরে ধ্যান-পারমিতা পূর্ণ করিয়াছিলেন। ধ্যান শব্দের অর্থ হইতেছে সমাধি যাহার অর্থ হইতেছে চিত্তের একাগ্রতা অর্থাৎ একালম্বনে সমান তথা সম্যক্‌রূপে চিত্ত ও চৈতসিক ধর্মসমূহের কোন প্রকার বিক্ষেপ ব্যতীত স্থির হওয়া। সমাধিতে বিক্ষেপের ধ্বংস হয় এবং চিত্ত ও চৈতসিক ধর্মসমূহ বিপ্রকীর্ণ না হইয়া একালম্বনে পিণ্ডরূপে অবস্থিত হয়। জনসম্পর্ক বিবর্জন তথা কামাদি বিবর্জন দ্বারা চিত্তবিক্ষেপের উদ্ভব হয় না, অর্থাৎ নিরাসঙ্গ (=নিঃসঙ্গতা) হইলেই আলম্বনে চিত্ত প্রতিষ্ঠিত হয়। এইজন্য সংসার পরিত্যাগ করিয়া রাগদ্বেষমোহাদির বিক্ষেপের হেতুসমূহকে পরিত্যাগ করা উচিত। স্নেহের বশীভূত তথা লাভ-সৎকার দ্বারা প্রলুব্ধ হইয়া সংসার ত্যাগ করা যায় না। জ্ঞানীমাত্রেরই জানা উচিত, যিনি চিত্তের একাগ্রতার দ্বারা (ধ্যান=সমাধির দ্বারা) যথাভূত তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনিই চিত্তের ক্লেশাদির মূল উৎপাটন করিতে সমর্থ হন, এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রথমেই চিত্তৈকাগ্রতা উৎপাদনের চেষ্টা করিতে হইবে। যিনি সমাহিতচিত্ত এবং যাঁহার যথাভূত তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়াছে তাঁহার বাহ্য চেষ্টার বিবর্জন হয় এবং শান্ত হওয়ার কারণে তাঁহার চিত্ত চঞ্চল হয় না।

উপরিউক্ত সমাধি (=ধ্যান) অনেক প্রকার, কিন্তু এখানে কেবল অভিপ্রেত অর্থেরই উল্লেখ করা হইতেছে। আলোচ্য স্থলে লৌকিক সমাধিই অভিপ্রেত। কাম, রূপ ও অরূপ ভূমির কুশল চিত্তের একাগ্রতাকেই লৌকিক সমাধি বলা হয়। লোকোত্তর সমাধির ভাবনা প্রজ্ঞা-ভাবনাতেই সংগৃহীত। প্রজ্ঞা সুভাবিত হইলে লোকোত্তর সমাধির লাভ হয়। ইহা প্রজ্ঞারই বিষয়।

এই লৌকিক সমাধির মার্গকে বলা হয় "শমথ যান" এবং লোকোত্তর সমাধির মার্গকে বলা হয় "বিপশ্যনা যান।"[৭১]

৬। প্রজ্ঞা-পারমিতা—বোধিসত্ত্ব প্রজ্ঞা-পারমিতার অভ্যাস করিয়াছিলেন। শুরু শুরুতে প্রজ্ঞা বলিতে বুঝাইত বুদ্ধি-তীক্ষ্ণতা এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। জাতকের মধ্যে সত্তুভস্তজাতক (জাতক নং ৪০২) বোধিসত্ত্বের প্রজ্ঞা-পারমিতার একটি উদাহরণ। এখানে প্রজ্ঞা বলিতে বুঝাইয়াছে তীক্ষ্ণ প্রতিভাকে। উক্ত জাতকের সংক্ষিপ্তসার হইল ঃ এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ টাকার বিনিময়ে একটি তরুণী ভার্যা লাভ করিয়াছিলেন। সেই ভার্যার একজন প্রেমিক ছিল। ব্রাহ্মণ সর্বদা গৃহে অবস্থান করাতে সেই ভার্যা তাহার প্রেমিকের সহিত সুখে মিলিত হইতে পারিত না। তখন সে চিন্তা করিল—'ব্রাহ্মণকে গৃহের বাহিরে পাঠাইতে হইবে।' একদিন পত্নীর কথাতে ব্রাহ্মণ ভিক্ষায় বাহির হইল। তাহার পত্নী দিনের খাদ্য স্বরূপ কিছু সক্তু (=ছাতু) ব্রাহ্মণের ঝোলাতে দিয়াছিল। ব্রাহ্মণ ভিক্ষায় অনেক মুদ্রা লাভ করিল এবং ঐ মুদ্রা উক্ত ঝোলাতে রাখিল। ফিরিবার সময় ব্রাহ্মণ এক নদীতীরে উক্ত সক্তু আহার করিয়া জলপানের জন্য নদীতে অবতরণ করিল। ঐ ঝোলাটি নদীর তীরেই ছিল। ইত্যবসরে একটি কৃষ্ণসর্প উক্ত ঝোলাতে ঢুকিয়া পড়িল। ব্রাহ্মণ তাহা জানিত না। সে ঝোলার মুখ বাঁধিয়া লইয়া আবার চলিতে লাগিল। তাহার মনে খুব আনন্দ এইজন্য যে অনেক মুদ্রা দেখিয়া তাহার পত্নী খুশী হইবে। রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে ব্রাহ্মণ এক বৃক্ষদেবতার সাবধান বাণী শুনিল। বৃক্ষদেবতা বলিলেন—'যদি তুমি সন্ধ্যায় কোথাও অবস্থান কর, তোমার মৃত্যু হইবে।' আর যদি গৃহে ফিরিয়া যাও, তাহা হইলে তোমার পত্নীর মৃত্যু হইবে। ব্রাহ্মণ এই কথা শুনিয়া মহা দুশ্চিন্তায় পড়িল। পথিপার্শ্বে এক জায়গায় বোধিসত্ত্ব ধর্মদেশনা করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণ যাইয়া স্বয়ং ধর্মোপদেশ শুনিল কিন্তু তাহার দুশ্চিন্তা দূর হইল না। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন তাহার দুশ্চিন্তার কারণ কি? ব্রাহ্মণ সেই বৃক্ষদেবতার সাবধান বাণীর কথা বলিল। বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা জানিয়া লইলেন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে ব্রাহ্মণের সেই ঝোলাতে এমন কোন বস্তু আছে যদ্দ্বারা তাহার বা তাহার পত্নীর মৃত্যু হইতে পারে। নিশ্চয়ই কোন বিষধর সর্প সেই ঝোলায় ঢুকিয়াছে। ব্রাহ্মণ অজ্ঞাতসারে সেই ঝোলার মুখ বন্ধন করিয়া চলিয়াছে।

বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকে বলিলেন—'তুমি ঝোলার মুখ খোল।' ব্রাহ্মণ তাহা করিলে উক্ত কৃষ্ণসর্প ঝোলা হইতে বাহিরে আসিয়া ধরা পড়িল। ইহাতে ব্রাহ্মণের জীবন রক্ষা পাইল। বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকে আরও কিছু মুদ্রা দিয়া বলিলেন—'তুমি এই সমস্ত ধন লইয়া গৃহে যাইও না, তোমার ক্ষতি হইবে।' ব্রাহ্মণ একটি বৃক্ষের কোটরে ধন লুকাইয়া রাখিয়া গৃহে ফিরিল। কিন্তু ধনের কথা ভার্যার নিকট গোপন করিতে পারিল না। ভার্যা তাহার প্রেমিককে দিয়া সব ধন চুরি করাইল। ধন চুরি যাওয়াতে ব্রাহ্মণ আবার বোধিসত্ত্বের নিকট আসিয়া সব জানাইল। বোধিসত্ত্ব বুঝিতে পারিলেন, কে ধন চুরি করিয়াছে। তিনি ব্রাহ্মণকে দিয়া সেই যুবককে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। বোধিসত্ত্বের জেরায় পড়িয়া যুবক স্বীকার করিল যে সেই ধন চুরি করিয়াছে। বোধিসত্ত্বের প্রজ্ঞার প্রভাবে ব্রাহ্মণ ধন ফিরিয়া পাইল।—এই কাহিনীতে বোধিসত্ত্ব যে প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়াছেন তাহা এক প্রকার প্রতিভা বিশেষ। কিন্তু ঈদৃশ ব্যবহারিক প্রতিভা প্রজ্ঞার প্রকৃষ্ট উদাহরণ নহে। অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞা-পারমিতাতে প্রজ্ঞার দার্শনিক রূপের পরিচয় পাওয়া যায়ঃ—

সুভূতি—ভগবন্, প্রজ্ঞা পারমিতার লক্ষণ কি?

ভগবান্—প্রজ্ঞা পারমিতা হইতেছে অসংগলক্ষণা। এইজন্য প্রজ্ঞা পারমিতা হইতেছে শূন্য এবং তদ্ধেতু সর্ব ধর্ম শূন্য।

সুভূতি — যদি ভগবন্ সর্ব ধর্ম শূন্য হয়, তাহা হইলে সত্ত্বগণের সংক্লেশ (=চিত্তকলুষতা) এবং ব্যবদানের (=শুদ্ধির) কথা কেন বলা হয়?

ভগবান্—সুভূতি, তুমি কি মনে কর যে, সত্ত্বগণ অহংকার এবং মমকারে বিভ্রান্ত থাকে?

সুভূতি — হাঁ ভগবান, সত্ত্বগণ তাহাই।

ভগবান্— তুমি কি মনে কর অহংকার এবং মমকার শূন্য?

সুভূতি — হে ভগবন্ শূন্য, হে সুগত, শূন্য।

ভগবান্— তুমি কি মনে কর এই অহংকার-মমকারের জন্যই সত্ত্বগণ সংসারে বারবার জন্ম-মৃত্যুর কবলে কবলিত হয়।

সুভূতি — হাঁ ভগবন্ সত্ত্বগণ তাহাই।

ভগবান্— হে সুভূতি, সত্ত্বগণের যেমন অভিনিবেশ (=আগ্রহ) হয়, তেমনই সংক্লেশ হইয়া থাকে। অভিনিবেশ না হইলে অহংকার মমকার

হয় না। ব্যবদানের (=শুদ্ধির) ক্ষেত্রেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে।[৭২]

এখানে শূন্য শব্দের দ্বারা বিভ্রান্ত হইবার প্রয়োজন নাই। শূন্য শব্দের দ্বারা কোন কিছুর নাশ, ধ্বংস বা অভাব বুঝায় না। অষ্টসাহস্রিকাতে সাবধান করা হইয়াছে যে, কেহ কেহ প্রজ্ঞা পারমিতার ভুল ব্যাখ্যা দিয়া থাকে। তাহারা পঞ্চস্কন্ধের বিনাশকে ইহাদের অনিত্যতা বলিয়া থাকে। যাহারা প্রজ্ঞা পারমিতাকে এইভাবে বিচার করিবে তাহারাও ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে বুঝিতে হইবে।

আচার্য অসংগ পারমিতা সমূহের উত্তম ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাঁহার মহাযান সূত্রালংকারে।[৭৩] তাঁহার মতে পারমিতাসমূহের অভ্যাস (=চর্চা) নির্বিকল্প জ্ঞানের সহিত করিতে হইবে। নির্বিকল্প জ্ঞানের অভিপ্রায় ঐ জ্ঞানের সহিত যাহাতে বিকল্প একেবারেই নাই, সন্দেহ বুদ্ধি নাই। এই বুদ্ধি (=জ্ঞান) ধর্মনৈরাত্ম্য পর্য্যন্ত (সব্বে ধম্মা অনত্তা) পেঁীছিয়া যায়। প্রত্যেক পারমিতার এক বিরোধী পক্ষও থাকে, প্রত্যেক পারমিতার এক উদ্দেশ্য থাকে। বিপক্ষ-সমূহকে দূর করিয়া উক্ত উদ্দেশ্যগুলি পূরণ করিতে পারিলেই বোধিসত্ত্ব প্রাণিগণের কল্যাণ সাধন করিতে পারেন। শুধু প্রাণিগণের হিত কেন, নিজের হিতও করিতে পারেন। যদিও বোধিসত্ত্বের নিজের হিত বলিয়া কিছুই নাই। কিন্তু যিনি পরার্থকে আত্মার্থ বলিয়া মনে করেন তিনি যদি পরার্থই সাধন করিতে পারেন, তদ্ দ্বারা আত্মার্থই সাধিত হইল ইহা বুঝিতে হইবে। অসংগ যে পারমিতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

পারমিতা	তদ্দ্বারা প্রাপ্ত অভ্যুদয়	ইহার বিপক্ষ	ইহার উদ্দেশ্য
দান	ভোগসম্পত্তি	স্বার্থ	প্রাণিগণের ইচ্ছাপূর্তি
শীল	শরীর-সম্পত্তি	দুরাচার	কায়-বাক্ সংযম
ক্ষান্তি	বহুজন-প্রিয়তা, অনন্ত মৈত্রীভাবের অভ্যুদয়	ক্রোধ, দ্বেষ	অপরাধ-ক্ষমা
বীর্য	সর্বকর্মে সাফল্য	অকর্মণ্যতা	প্রাণিগণের হিতসাধন
ধ্যান	চিত্তশুদ্ধি	চাঞ্চল্য	মনঃ সংযম, শান্তি
প্রজ্ঞা	কার্যে অবিপর্যাস	দুষ্প্রজ্ঞা, মোহ, মূঢ়তা	সংশয়-নিবারণ

উক্ত ছয় পারমিতার প্রথম তিনটির দ্বারা বোধিসত্ত্ব ক্রমশঃ ত্যাগ, অহিংসা ও অক্রোধের দ্বারা পরার্থ সাধন করেন এবং বাকী তিনটি দ্বারা ক্রমশঃ উদ্যোগ, শান্তি ও মুক্তি দ্বারা আত্মার্থ সাধন করেন।

বোধিসত্ত্ব এই সকল পারমিতার অভ্যাসকালে **দান-পারমিতার** দ্বারা ভোগের প্রতি অনাসক্ত হন। **শীল-পারমিতার** দ্বারা কায়-বাক্ কর্মের সংযমের প্রতি উদ্যোগী হন। **ক্ষান্তি-পারমিতার** দ্বারা প্রাণী বা অপ্রাণী-প্রদত্ত দুঃখ-কষ্টের দ্বারা বিন্দুমাত্রও বিচলিত হন না। **বীর্য-পারমিতার** দ্বারা পুণ্যকর্ম সম্পাদনে তিনি কখনও ক্লান্ত হন না। **ধ্যান-পারমিতার** দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা ও স্থৈর্য্য লাভ করেন। তাহাতে তাঁহার শমথ বা শান্তি লাভ হয়। **প্রজ্ঞা-পারমিতার** অভ্যাসের দ্বারা তাঁহার বিপশ্যনা প্রাপ্তি হয় অর্থাৎ তিনি বুঝিতে পারেন যে সংসারে সমস্ত কিছুই অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম। ইহাই হইতেছে মহাযান ধর্ম, তাই মহাযান সূত্রালংকারে অসংগ বলিয়াছেন ঃ

"ভোগেষু চানভিরতিস্তীব্রা গুরুতা দ্বয়ে অখেদশ্চ।
যোগশ্চ নির্বিকল্পঃ সমস্তমিদমুত্তমং যানম্ ॥"[৭৪]

হীনযান বা থেরবাদীদের দশ পারমিতা ঃ

থেরবাদীদের ১০ পারমিতার মধ্যে ৫টির সঙ্গে মহাযানের ৫ পারমিতার সাদৃশ্য আছে, অর্থাৎ দান-পারমিতা, শীল-পারমিতা, ক্ষান্তি-পারমিতা, বীর্য-পারমিতা এবং প্রজ্ঞা পারমিতা। এইগুলি উপরে আলোচিত হইয়াছে, অতএব অবশিষ্ট ৫টি পারমিতা নিম্নে আলোচিত হইতেছে ঃ—

১। নেক্খম্ম-পারমী—(=নৈষ্ক্রম্য বা নৈষ্কাম্য পারমিতা) বোধিসত্ত্ব স্বাভাবিক ভাবেই নির্জনতার অভিলাষী, তাই তিনি নেক্খম্ম (সংসার ত্যাগ) পারমী পূর্ণ করিয়াছেন। অবশ্য এখানে সংসার-ত্যাগ বলিতে বুঝিতে হইবে ঋষি-প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতঃ সংসারের ভোগবিলাসের প্রতি অনাসক্ত থাকা।

সংসারের ভোগসম্পত্তির অসারতার কথা চিন্তা করিয়া বোধিসত্ত্ব স্বেচ্ছায় গৃহত্যাগ করেন এবং সন্ন্যাস-বেশ ধারণ করিয়া শুদ্ধ ব্রহ্মচর্য পালনে তৎপর হন। তিনি সর্ব কর্মফলে অনাসক্ত থাকিয়া কায়-বাক্ সংযম পালন করেন। তিনি কোন প্রকার ধন, যশ, প্রতিপত্তি ও পার্থিব লাভের প্রতি আসক্ত হন না। মখাদেব জাতকে (নং ৯) দেখা যায় বোধিসত্ত্ব তাঁহার মাথায় একটি-মাত্র পাকা চুল দেখিয়া সংসারের অনিত্যতার কথা চিন্তা করিয়া রাজ্যপাট ত্যাগ করিয়া বনবাসী হইয়াছিলেন।

২। সচ্চ-পারমী—(=সত্য পারমিতা)। বোধিসত্ত্ব জন্মজন্মান্তরে সত্য পারমিতা (সত্য প্রণিধান) পূর্ণ করিয়াছিলেন। তিনি কখনও তাঁহার বাক্য লঙ্ঘন করিতেন না। তিনি যাহা বলিতেন তাহা করিতেন এবং যাহা করিতেন তাহা বলিতেন। হারিত জাতকে (নং ৪৩১) দেখা যায় যে বোধিসত্ত্ব অন্যান্য শীল ভঙ্গ করিলেও অসত্যভাষণ করিতেন না। প্রাণপাত হইলেও মিথ্যাভাষণ করিতেন না।

হিরিজাতকে (নং ৩৬৩) বোধিসত্ত্ব উপদেশ দিতেছেন ঃ

"করিতে পারিবে যাহা কর তা' স্বীকার।
অস্বীকার কর যাহা অসাধ্য তোমার ॥
অঙ্গীকার করি যে না করে সম্পাদন।
মিথ্যাবাদী বলি তারে নিন্দে সাধুজন ॥"

মহাসুতসোম জাতকে (নং ৫৩৭) আছে যে সত্যবচন রক্ষার্থ বোধিসত্ত্ব তাঁহার নিজের জীবন বিসর্জনের জন্যও প্রস্তুত ছিলেন।

বট্টক জাতকে (নং ৩৫) আছে কিভাবে বোধিসত্ত্বের সত্যক্রিয়ার প্রভাবে দাবাগ্নিও নির্বাপিত হইয়াছিল।

৩। অধিট্‌ঠান-পারমী—(অধিষ্ঠান-পারমিতা—resolute determination)। এই অধিষ্ঠান পারমিতার বলে বোধিসত্ত্ব শত বাধা-বিপত্তির মধ্যেও সংকল্পচ্যুত হইতেন না। তাঁহার অন্তিম জন্মেও আমরা দেখি যে, বোধিসত্ত্ব গৌতম বুদ্ধত্বলাভের অধিষ্ঠান করিয়া সংসারের সমস্ত ভোগ-বিলাস ত্যাগ করিয়া কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের পথ বাছিয়া লইয়াছিলেন। ছয় বৎসর ধরিয়া তিনি অমানুষিক পরিশ্রম করিয়াছেন, শরীরকে কষ্ট দিয়াছেন, তথাপি সংকল্পচ্যুত হন নাই। শেষে তাঁহার পাঁচজন বন্ধুও (পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষু) তাঁহাকে ফেলিয়া চলিয়া গেলেন, তথাপি তিনি তাঁহার অধিষ্ঠান হইতে পশ্চাদ্‌গামী হন নাই। ইহাই বোধিসত্ত্বের অধিষ্ঠান পারমিতা।

৪। মেত্তা-পারমী—(মৈত্রী-পারমিতা)—সমস্ত প্রাণীর অপরিসীম সুখ-শান্তি কামনা করাই মৈত্রী। এই মৈত্রী পারমিতা পূরণের জন্য বোধিসত্ত্ব নিজের মুক্তিও বিসর্জন দিয়াছিলেন। যেহেতু তিনি বিশ্বমৈত্রীর আধার সেইজন্য তিনি কাহাকেও ভয় করিতেন না, তাঁহাকেও কেহ ভয় পাইতেন না। বনের পশু-পক্ষীরাও ছিল তাঁহার পরম বন্ধুস্থানীয়। তাঁহার উপস্থিতিতেই সকলে নিজ নিজ শত্রুতা ভুলিয়া যাইত। মৈত্রী আর ব্যক্তিগত

প্রেম ও জৈবিক ভালবাসা এক নহে। প্রেম হইতে ভয় ও শোক-দুঃখ উৎপন্ন হয়, কিন্তু মৈত্রী হইতে তাদৃশ কিছু উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। বোধিসত্ত্বের মৈত্রী কিরূপ হইবে তাহা উদাহরণ সহযোগে বলা হইয়াছে ঃ

"মাতা যথা নিযং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরক্খে।
এবম্পি সব্বভুতেসু মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং ॥"

—মাতা যেমন নিজের জীবনের বিনিময়েও একমাত্র সন্তানের জীবন রক্ষা করেন, তদ্রূপ অপরিসীম মৈত্রী সমস্ত প্রাণীর প্রতি পোষণ করিতে হইবে।

মহাধর্ম্মপাল জাতকে (নং ৩৮৫) আছে যে, বোধিসত্ত্ব তাঁহার নিষ্ঠুর পিতার প্রতি যিনি তাঁহার বধের আদেশ দিয়াছিলেন, তাঁহার ঘাতকের প্রতি এবং তাঁহার ক্রন্দনরতা মাতার প্রতি সমান মৈত্রীভাব পোষণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধ বলিতেছেন ঃ "আমি যখন পর্বতের গুহা-কন্দরে বাস করিতেছিলাম তখন আমার মৈত্রীর প্রভাবে হিংস্র সিংহ-ব্যাঘ্রাদিকেও আমার নিকট আনয়ন করিতে পারিতাম। অরণ্যে সিংহ-ব্যাঘ্র, চিতা-বন্য মহিষ, হরিণ, বন্য শূকর ইত্যাদির দ্বারা পরিবৃত হইয়া আমি অবস্থান করিতাম। তাহারাও আমাকে ভয় করিত না। আমিও তাহাদের ভয় করিতাম না। এইভাবে নির্ভয়ে আমি সর্বত্র বিচরণ করিতাম, আমার মৈত্রীবলই ছিল আমার একমাত্র শক্তি।" পালি জাতক এবং সংস্কৃত অবদানে বহু গল্প আছে যেখানে দেখা যায় কিভাবে বুদ্ধ তাঁহার মৈত্রী প্রদর্শন করিতেন সকলের প্রতি—জাতি-ধর্মনির্বিশেষে স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে, মনুষ্য-মনুষ্যেতর পশুপক্ষী নির্বিশেষে।

৫। উপেক্খা-পারমী—(উপেক্ষা-পারমিতা) উপেক্ষা (mental equanimity) হইল লোভ ও দ্বেষ বর্জিত নিরপেক্ষ দর্শন। ইহা মনের সাম্যাবস্থা। রাগ (আসক্তি) ইহার প্রত্যক্ষ শত্রু এবং নির্বোধ উপেক্ষা ইহার পরোক্ষ শত্রু। লোভ ও দ্বেষ উপেক্ষা দ্বারা পরিত্যক্ত হয়। নিরপেক্ষভাব ইহার মুখ্য লক্ষণ।

এখানে উপেক্ষা বলিতে কেবলমাত্র নিরপেক্ষ বেদনাকে বুঝায় না, ইহাতে প্রকৃত পুণ্য-বিদ্যমানতাও সূচিত করে। তত্রমধ্যস্থতা ইহার অনুকূল অর্থবহ শব্দ। উপেক্ষা বোধিলাভের অঙ্গরূপে চিহ্নিত হইয়াছে।

উপেক্ষা উত্তম-অধম, প্রিয়-অপ্রিয়, মনোজ্ঞ-অমনোজ্ঞ, সুখ-দুঃখ এবং এইরূপ সকল বিরুদ্ধ যুগলে বিদ্যমান থাকে।

বোধিসত্ত্ব তাঁহার বহু পূর্ব পূর্ব জন্মে এই উপেক্ষা-পারমিতা পূর্ণ করিয়াছেন। তিনি সুখে-দুঃখে, নিন্দা-প্রশংসায়, লাভ-ক্ষতিতে সর্বদা নিজের মনের সাম্যাবস্থা বজায় রাখিতেন। সিংহ যেমন কোন শব্দের দ্বারা প্রকম্পিত হয় না, তিনিও কাহারও নিন্দাসূচক বাক্যবাণে বিচলিত হইতেন না। বায়ু যেমন জালের ছিদ্রে লগ্ন হইয়া থাকে না, তিনিও তদ্রূপ এই পরিবর্ত্তনশীল জগতের মায়াময় ভোগ-সুখের প্রতি আসক্ত হইতেন না। পদ্ম যেমন ইহার উৎপত্তিস্থল কর্দমের দ্বারা কলুষিত হয় না, তিনিও তদ্রূপ জগতের কোন প্রকার প্রলোভনের দ্বারা প্রলুব্ধ না হইয়া সর্বদা শান্ত ও নিরুদ্বিগ্ন থাকিতেন। সমুদ্রতলের প্রশান্তিকে যেমন সমুদ্রের লক্ষ লক্ষ ঢেউ ভঙ্গ করিতে পারে না, তদ্রূপ তাঁহার চিত্তও শত বিপত্তির মধ্যেও অবিক্ষুব্ধ থাকিত। এইভাবেই বোধিসত্ত্ব উপেক্ষা পারমিতা পূর্ণ করিতেন। এই জন্মে বুদ্ধত্ব লাভ করিবার পরেও তাঁহাকে নানা প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, কত নিন্দা-অপযশের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, কতবার তাঁহার প্রাণ-সংশয়ের ঘটনা ঘটিয়াছে। কিন্তু তিনি উপেক্ষা-পারমিতার দ্বারা সমস্ত কিছু জয় করিয়াছিলেন।

বোধিসত্ত্বের দশভূমি :

মহাযান শাস্ত্রানুসারে বুদ্ধত্ব লাভ করিতে হইলে বোধিসত্ত্বকে ধ্যানের দশটি ভূমি অতিক্রম করিতে হয়, যেমন (প্র)মুদিতা, বিমলা, প্রভাকরী, অর্চিষ্মতী, (সু) দুর্জয়া, অভিমুখী, দূরংগমা, অচলা, সাধুমতী এবং ধর্মমেঘা।

১। (প্র) মুদিতা—প্রথম ভূমিতে প্রাণিহিতের সাধনাভূত বোধির সমীপবর্তী দেখিয়া বোধিসত্ত্বের হৃদয়ে তীব্র মোদ বা আনন্দ উৎপন্ন হয়। এইজন্য এই ভূমিকে বলা হয় (প্র) মুদিতা। এই ভূমির লক্ষণ পরম শূন্যতা। কেন না ধর্ম নৈরাত্ম্য ও পুদ্গলনৈরাত্ম্যের প্রতিষ্ঠা প্রথম ভূমিতেই হইয়া যায়।

২। বিমলা—দুঃশীলতার মনোভাবের 'মল' (=কলুষতা) এই দ্বিতীয় ভূমিতে দূরীভূত হয়, এইজন্য ইহাকে বিমলা বলা হইয়াছে। এই ভূমির লক্ষণ হইতেছে কর্মসমূহের অবিপ্রণাশব্যবস্থা অর্থাৎ বুঝিতে হইবে যে কর্ম নিজ নিজ ফল দান করে, ফল দান ব্যতিরেকে কর্ম নষ্ট হয়

না। কুশল কর্মের ফল ভাল এবং অকুশল কর্মের ফল মন্দ তাহা জানিতে হইবে।

৩। প্রভাকরী—সমাধি বলের দ্বারা এই ভূমিতে অপ্রমেয় ধর্মসমূহের অবভাস প্রাপ্ত হয়। তাই এই ভূমিকে বলা হইয়াছে প্রভাকরী। এই ভূমির লক্ষণ হইতেছে অত্যন্ত সুখের সহিত ধ্যান প্রাপ্তি। এই ভূমি লাভের পরে মৃত্যু হইলে যোগী কামধাতুতেই আবার উৎপন্ন হইবে।

৪। অর্চিষ্মতী—এই ভূমিতে ক্লেশাবরণ এবং জ্ঞেয়াবরণের দাহ হয়। ইহাদের দাহক বোধিপাক্ষিক ধর্ম এবং দাহকারক বলিয়াই 'অর্চি' বলা হয়। এই ভূমিতে অর্চি বা জ্যোতি উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাকে অর্চিষ্মতী বলা হয়। এই ভূমিতে লোকহিতের জন্য বোধিপাক্ষিক ধর্মসমূহের পরিণামনা (=সমর্পণ) হইয়া থাকে।

৫। (সু) দুর্জয়া—এই ভূমিতে সত্ত্বপরিপাক এবং স্বচিত্ত রক্ষা করিতে যাইয়া দুঃখকে জয় করা যায়। এইজন্য এই ভূমির নাম (সু) দুর্জয়া। এই ভূমিতে চারি আর্যসত্যের সাক্ষাৎকারহেতু ক্লেশ রহিত চিত্ত দ্বারা সত্ত্বসমূহের পরিপাচনা (অর্থাৎ প্রাণিসমূহের ধার্মিক ভাবের পুষ্ট করা) সম্ভব হয়।

৬। অভিমুখী—এই ভূমিতে প্রজ্ঞা-পারমিতার আশ্রয়ের কারণে বোধিসত্ত্ব সংসার এবং নির্বাণ উভয়ের অভিমুখী হইয়া থাকেন। এইজন্য এই ভূমির নাম অভিমুখী। এই ভূমিতে প্রতীত্যসমুৎপাদের সাক্ষাৎকার-হেতু ভবোপপত্তি (=উধর্ব লোকসমূহে উৎপত্তি) —বিষয়ক সংক্লেশ সমূহ হইতে বোধিসত্ত্বের অনুরক্ষণা (=রক্ষা) হইয়া থাকে।

৭। দূরংগমা—এই ভূমি একায়ন পথ দ্বারা সংশ্লিষ্ট, যাহা বহু দূরে অবস্থিত। এইজন্য ইহাকে দূরংগমা বলে। এই ভূমির লক্ষণ একায়ন-পথ (=অষ্টম বিহার) দ্বারা সংশ্লিষ্ট, অনিমিত্ত এবং ঐকান্তিক মার্গ।

৮। অচলা—এই ভূমিতে নিমিত্ত সংজ্ঞা এবং অনিমিত্ত মনোভাব সংজ্ঞার দ্বারা চাঞ্চল্য থাকে না, এই জন্য ইহাকে অচলা বলা হইয়াছে। ইহার লক্ষণ নিরভিসংস্কার (=বাসনাহীন) এবং অনিমিত্ত-বিহারী (বিষয়রূপী নিমিত্ত বিনা বিহারকারী) হওয়াতে বুদ্ধক্ষেত্রের পরিশুদ্ধি।

৯। সাধুমতী—ইহাতে প্রতিসংবিৎমতির (=বিশ্লেষণ করিয়া অনুভব-কারী বুদ্ধির) প্রাধান্য হয়। এই প্রাধান্যকেই 'সাধু' বলা হইয়াছে। এবং

ইহাতে এইরূপ হয় বলিয়া এই ভূমির নাম সাধুমতী। এই ভূমির লক্ষণ হইতেছে সত্ত্বপাক-পরিনিষ্পত্তি (প্রাণীদের বোধিবীজ পরিপুষ্ট করার মতি)।

১০। ধর্মমেঘা—যেমন মেঘ আকাশকে ব্যাপ্ত করে, তদ্রূপ দশম ভূমি সমাধি-ধারণী সমূহের দ্বারা ধর্মাকাশ ব্যাপ্ত করিয়া থাকে। এইজন্য ধর্ম-মেঘা বলা হইয়াছে। এই ভূমির লক্ষণ হইতেছে সমাধি-ধারণীসমূহের বিশুদ্ধতা অর্থাৎ বোধি-বিশুদ্ধতা।

মহাযানে বোধিসত্ত্বের আদর্শ :

বুদ্ধত্ব লাভের জন্য যত্নবান সত্ত্বকে বোধিসত্ত্ব বলা হয়। অনেক জন্মের সাধনার এবং পারমিতা পূর্তির অন্তিম পরিণাম স্বরূপ বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি সম্ভব হয়। শাক্যমুনি বুদ্ধ এক জন্মের সাধনায় বুদ্ধ হইতে পারেন নাই। তাঁহাকে অনেক জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া সাধনা করিতে হইয়াছে। কিন্তু মহাযান গ্রন্থসমূহে বুদ্ধত্ব লাভের জন্য এক বিশিষ্ট সাধনার নির্দেশ পাওয়া যায় যাহার নাম বোধিচর্যা। বোধিচর্যার আরম্ভ বোধিচিত্ত গ্রহণের দ্বারা হইয়া থাকে। পালিতে 'বোধিসত্ত' শব্দ অনেকবার আসিয়াছে—এখানে বোধিসত্ত্ব (=বোধিসত্ত্ব) শব্দের অর্থ বোধি বা দিব্যজ্ঞান লাভের জন্য প্রযত্নশীল সত্ত্ব। শাক্যমুনি বুদ্ধ পূর্ব পূর্ব জন্মে যখন বুদ্ধত্ব লাভের জন্য সাধনা করিতে-ছিলেন, তখন তাঁহাকে বোধিসত্ত্ব বলা হইত। বোধিসত্ত্বই অন্তিম জন্মে বুদ্ধ হন। কিন্তু মহাযানে বোধিসত্ত্বের স্বরূপের পরিবর্তন হইয়াছে। মহাযান মতে যে পর্যন্ত বিশ্বের একজন মাত্র প্রাণীও অমুক্ত থাকিবে সেই পর্যন্ত বোধিসত্ত্ব স্বীয় প্রযত্নলব্ধ নির্বাণকেও স্বীকার করিবেন না। নির্বাণ-লাভ তাঁহাদের মতে স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতা ও হীন আদর্শ। অন্যদের মুক্তির জন্য আত্মবিমুক্তি ত্যাগ করাই পরার্থতা, মহান্ আদর্শ—ইহাই মহাযান। তাঁহাদের মতে নির্বাণ মুক্তি শেষ কথা নহে, ইহার পরেও তথাগত-জ্ঞান দ্বারা সম্যক্ সম্বোধির অন্বেষণ করিতে হয়। এইরূপে মহাযানে অনুত্তর সম্যক্ সম্বোধিকে নির্বাণ হইতে পৃথক্ করা হইয়াছে এবং উহাকে এক উচ্চতর স্থিতি বলা হইয়াছে।

বোধিসত্ত্ব কল্পনার তাৎপর্য :

যখন্ মহাযানে সর্বপ্রথম বোধিসত্ত্বের কল্পনা অঙ্কুরিত হয়, তখন

'অবলোকিতেশ্বর'ই প্রথম দেখা দেন। তাঁহার পরই 'মঞ্জুশ্রী'র আবির্ভাব। অবলোকিতেশ্বর মহাকরুণার প্রতীক এবং মঞ্জুশ্রী প্রজ্ঞার অধিকারী। পরবর্তীকালে সামন্তভদ্র, বজ্রপাণি, বজ্রগর্ভ, জ্ঞানগর্ভ, ক্ষিতিগর্ভ, রত্নগর্ভ, আকাশগর্ভ, সূর্য-গর্ভ, মৈত্রেয় প্রভৃতি অনেক বোধিসত্ত্বের কল্পনা অঙ্কুরিত হয়। ইঁহাদের মধ্যেও আবার মহাকরুণার প্রতীকরূপে অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের স্থান সর্বোচ্চরূপে নিশ্চিত হয়।

অবশ্য এইখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, উক্ত বোধিসত্ত্বগণের কল্পনার মধ্যে কোন ঐতিহাসিক আধার নাই। শাক্যমুনি বুদ্ধের পূর্ব পূর্ব জীবনের জীবনচর্যার উপর ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল বোধিসত্ত্বের কল্পনা। এইভাবে ধরিয়া লইলে নিষ্কর্ষ এই দাঁড়ায় যে, শাক্যমুনি গৌতম বুদ্ধ যেই করুণাদৃষ্টিতে বিশ্বসংসার অবলোকন করিয়াছিলেন, তাহারই প্রতীকরূপে অবলোকিতেশ্বরের কল্পনা অংকুরিত হইয়াছিল। এইরূপে বুদ্ধের 'মঞ্জুঘোষ' মঞ্জুশ্রী বোধিসত্ত্বরূপে প্রতীকবদ্ধ হইয়াছে। এইভাবে অন্যান্য বোধিসত্ত্বেরাও বুদ্ধের বিভিন্ন জীবন ও ব্যক্তিত্বের গুণব্যূহের প্রতীকরূপে কল্পিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ বোধিসত্ত্বের এই কল্পনা শ্রৌত-পরম্পরাগত পৌরাণিক কল্পনা-সমূহকে আত্মসাৎ করতঃ তাহাদের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার দিকে চলিয়া গিয়াছে। অবলোকিতেশ্বরের উপরিউক্ত গুণ-ব্যূহতে ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। অবলোকিতেশ্বর যে শুধু মহাকরুণার মূর্ত প্রতীক ছিলেন তাহা নহে, তিনি সৃষ্টির স্রষ্টাও। কারণ্ডব্যূহ তথা অন্যান্য মহাযানগ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, অবলোকিতেশ্বরের চক্ষু হইতে চন্দ্র-সূর্য্য, ভ্রূমধ্য হইতে মহেশ্বর, বাহু হইতে ব্রহ্মাদি দেবগণ, হৃদয় হইতে নারায়ণ (=বিষ্ণু), দন্ত হইতে সরস্বতী, মুখ হইতে মরুৎ, পদ হইতে পৃথিবী এবং উদর হইতে বরুণের উৎপত্তি হইয়াছে। এইভাবে ক্রমে ক্রমে অবলোকিতেশ্বরকে সৃষ্টিকর্তার সর্বোচ্চ সিংহাসনে বসানো হইয়াছিল। তাঁহাদের কল্পনায় তিনি শুধুমাত্র সৃষ্টিকর্তা ছিলেন না, মুক্তিদাতাও ছিলেন। শান্তিদেব তাঁহার বোধিচর্যাবতারে বর্ণনা করিতেছেন ঃ

"অনাথানামহং নাথঃ সার্থবাহশ্চ যায়িনাং।
পারেপ্সূনাং নৌভূতঃ সেতুঃ সক্রম এব চ॥"

—আমি অনাথের নাথ, যাত্রীর সার্থবাহ, পারে গমনকারীর তরণী, সেতু এবং ভেলা হইব।

মহাযানীয় বোধিসত্ত্ব কল্পনার মূলস্রোত ঃ

পালি সাহিত্যের জাতক-নিদান গ্রন্থে আমরা মহাযানীয় বোধিসত্ত্বের আদর্শের মূল স্রোত খুঁজিয়া পাই। গৌতমবুদ্ধ সুমেধ তাপস অবস্থায় চিন্তা করিয়াছিলেন—আমি যদি চেষ্টা করি তাহা হইলে অদ্যই সর্বপ্রকার চিত্ত-মালিন্য নিঃশেষ করতঃ নির্বাণলাভ করিতে পারি। কিন্তু আমার মত বলবীর্য সম্পন্ন পুরুষের পক্ষে একাকী মুক্ত হওয়ার কি-ই বা সার্থকতা আছে! আমিও দীপঙ্কর দশবল-বুদ্ধের ন্যায় সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ করিয়া দেব-মানব সহ অসংখ্য প্রাণীকে মুক্ত করিব। তিনি বলিতেছেন—

> "কিং মে একেন তিণ্ণেন পুরিসেন থামদস্সিনা।
> সব্বঞ্ঞুতং পাপুণিত্বা সন্তরেস্সং সদেবকং॥"[৭৫]

কি উদাত্ত ভাবনা, বিশ্বপ্রাণীর সঙ্গে নিজকে একাকার করার কি বিহ্বলতা, পরার্থে আত্মার্থ বিলীন করিয়া দিবার কি অদম্য উদ্যোগ! ইহাই ত বোধি-সত্ত্বের আদর্শের চরমবিকাশ, পরম পরাকাষ্ঠা। অদ্যাপি বিশ্বের মহাযান অধ্যুষিত দেশসমূহে ইহার বিপুল প্রভাব লোকসেবার ধার্মিক অভিব্যক্তিরূপে বিদ্যমান। পরবর্তীকালে খৃষ্টধর্মের প্রচারকদের মধ্যে এই উদাত্ত ভাবনার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।

মহাযানের মহত্ত্ব ঃ

ভারতীয় ধর্মসাধনায় মহাযান-সাধনার নিজস্ব স্থান আছে এবং ইহা অদ্বিতীয়, কারণ ইহা অতুলনীয়। পরম্পরাক্রমে মহাযানের কিছু কিছু তথ্য আজ পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে, কিন্তু ইহার অনেক কিছু বিস্মৃত ও লুপ্ত হইয়াছে। ভারতীয় পরম্পরার ধর্মসাধনার মধ্যে কেবল মহাযান-সাধনাই আছে যাহা নিজের মুক্তিকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। 'কিং মে একেন তিণ্ণেন' অর্থাৎ আমার একাকী মুক্ত হওয়ার কি সার্থকতা আছে—বোধিসত্ত্বের এই বচন বারংবার প্রণিধানযোগ্য। যখন সমস্ত জগৎ দুঃখে আছে, তখন নিজের মুক্তি এবং নিজের সুখের জন্য লালায়িত হওয়া মহত্ত্বের লক্ষণ নহে, বরং স্বার্থ-পরতা। এই স্বার্থপরতা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া সর্বপ্রাণিহিতের মহান্ আদর্শের পথে চলাই বস্তুতপক্ষে মহাযান। অষ্টসাহস্রিকায় বলা হইয়াছে ঃ[৭৬] মহাযান কি…কিভাবে এই যানে চলা যায়?…বলা হইয়াছে যে, মহাযান হইতেছে অপ্রমেয়তার অধিবচন…পারমিতাসমূহের দ্বারা ঐ পথে চলা যায়…

আকাশবৎ অত্যন্ত মহান্ বলিয়া ইহাকে মহাযান বলা হইয়াছে। আকাশে অপ্রমেয় প্রাণীর অবকাশ থাকে। তদ্রূপ মহাযানে অপ্রমেয় সত্ত্বের অবকাশ আছে।[৭৭]

মহাযান সাধনাতেই দেখা যায় যে মহাকারুণিক বোধিসত্ত্ব অত্যন্ত বৎসল যিনি সর্বপ্রাণীর হিতের জন্য আত্মবিসর্জন দিতে ইচ্ছুক, প্রাণীহিত ব্যতীত তাঁহার নিজের বলিয়া আর কিছুই নাই। প্রাণীদের সেবাকেই মহাযান সাধক ভগবানের সেবা বলিয়া গণ্য করেন। ভগবানের আরাধনার জন্য তিনি মনে-প্রাণে লোকসেবক হইবার ব্রত গ্রহণ করেন। লোকে তাঁহার মাথায় পদাঘাত করুক, তাঁহাকে প্রহার করুক—যাহাই বা করুক না কেন তিনি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখিয়া নিষ্প্রতিক্রিয় থাকেন, কেননা ভগবানকে প্রসন্ন করাই সাধকের ধ্যেয় এবং তিনি মনে করেন যে, সেই কৃপালু ভগবান এই জগৎকে আত্মসাৎ করিয়াছেন, প্রাণীদের রূপে ভগবানই ত দর্শন দিয়া থাকেন, অতএব প্রাণীদের প্রতি সাধকের অনাদর বুদ্ধি কি করিয়া হইতে পারে? এই লোকসেবাকেই তিনি তথাগতের আরাধনা বলিয়া জানেন, এই লোকসেবাকেই তিনি স্বার্থসাধনা বলিয়া মানেন, এই লোকসেবাকেই তিনি লোকদুঃখ দূর করার উৎকৃষ্ট পন্থা বলিয়া জানেন। তাই তিনি এই ব্রত গ্রহণ করেন ঃ

> "আরাধনায় তথাগতানাং সর্বাত্মনা দাস্যমুপৈমি লোকে।
> কুর্বন্তি মে মূর্ধ্নি পদং জনৌঘা বিঘ্নন্তু বা তুষ্যতু লোকনাথঃ।।
> আত্মীকৃতং সর্বমিদং জগত্তৈঃ কৃপাত্মভির্নৈব হি সংশয়োঽস্তি।
> দৃশ্যন্ত এতে নমু সত্ত্বরূপাস্ত এব নাথাঃ কিমনাদরোঽত্র।।
> তথাগতারাধনমেতদেব স্বার্থস্য সংসাধনমেতদেব।
> লোকস্য দুঃখাপহমেতদেব তস্মান্ মমাস্তু ব্রতমেতদেব।।"
>
> (—বোধিচর্যাবতার, ৬/১২৫—১২৭)

—তথাগতগণের আরাধনার জন্য আমি কায়মনবাক্যে লোকসেবক হইব। লোকে আমার মস্তকে পদাঘাত করুক, আমাকে মারুক (কিছুই যায় আসে না)—লোকনাথ প্রসন্ন হউন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, সমস্ত জগৎ হইতেছে ঐ সকল দয়াবন্তগণের আত্মরূপ। প্রাণীদের রূপে তাঁহারা দৃশ্যমান্, তাহাদের প্রতি অনাদর কেন? ইহাই তথাগতের আরাধনা, ইহাই স্বার্থের সম্যক্ সাধনা। ইহার দ্বারাই লোক-দুঃখ দূর করা যায় অতএব, ইহাই আমার ব্রত হউক।

এইপ্রকার লোকসেবার ব্রত লইয়া বোধিমার্গের সাধক সর্বতোভাবে সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়া থাকেন, বিশেষ করিয়া যখন ধার্মিকতার পরম অভিমানী ব্যক্তিও কোন কোন ক্ষেত্রে অসহিষ্ণু হইয়া উঠেন। কোন কোন ক্ষেত্রে যেমন কেহ তাঁহার মতবাদকে নিন্দা করিল, তাঁহার গুরুকে নিন্দা করিল, তাঁহার উপাস্য দেবতাকে নিন্দা করিল—এই সকল ক্ষেত্রে পরম ধার্মিক ব্যক্তিও ক্ষমার কথা ভুলিয়া যাইয়া অসহিষ্ণু হইয়া যান। এমনও বলিতে শোনা যায় যে হরিনিন্দা শুনিতে অনিচ্ছুক হইলে শক্তি থাকে ত নিন্দুকের জিভ্ কাটিয়া লও। কিন্তু মহাযান সাধক এই সকল ক্ষেত্রে আরও অধিক সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়া থাকেন। লোকে ভগবানের প্রতিমা, স্তূপ নষ্ট করিতেছে, সদ্ধর্মের নিন্দা করিতেছে—তথাপি মহাযান-সাধক ব্যথিত হননা, কারণ তিনি মনে করেন যে ইহাতে বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্বগণের ব্যথা হয়না—

"প্রতিমাস্তূপসদ্ধর্মনাশকাক্রোশকেষু চ।
ন যুজ্যতে মম ক্রোধো বুদ্ধাদীনাং নহি ব্যথা ॥"

(—বোধিচর্যাবতার, ৬/৬৪)

শাক্যমুনি বুদ্ধ নিজের জীবনেও বহু সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছেন ঃ

এক সময় ভগবান পাঁচশত ভিক্ষুদের সঙ্ঘকে লইয়া রাজগৃহ হইতে নালন্দায় যাইতেছিলেন। তখন সুপ্রিয় পরিব্রাজকও শিষ্য ব্রহ্মদত্তকে লইয়া ঐ পথেই যাইতেছিলেন। সেই সময় সুপ্রিয় নানাভাবে বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের নিন্দা করিতেছিলেন। কিন্তু শিষ্য ব্রহ্মদত্ত নানা ভাবে বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের প্রশংসা করিতেছিলেন। রাত্রি সমাগত হইলে ভগবান ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ অম্বলট্ঠিকায় রাত্রিযাপন করিতে লাগিলেন। সুপ্রিয়ও শিষ্য ব্রহ্মদত্তকে লইয়া ঐখানেই রাত্রিবাস করিতে লাগিলেন। সেখানেও সুপ্রিয় নানাভাবে বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের নিন্দা করিতেছিলেন, কিন্তু শিষ্য ব্রহ্মদত্ত নানাভাবে বুদ্ধ, ধর্মও সঙ্ঘের প্রশংসা করিতেছিলেন।

সকাল হইলে ভিক্ষুসঙ্ঘ সুপ্রিয় এবং ব্রহ্মদত্তের বার্তালাপ প্রসঙ্গে আলোচনা করিতে লাগিলেন। ভগবান্ এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া বলিলেন—

"হে ভিক্ষুগণ, যদি কেহ আমার, আমার ধর্মের বা আমার সঙ্ঘের নিন্দা করে তোমরা অসন্তুষ্ট হইবে না, মনে কোন প্রকার বিদ্বেষ আনিবে না। এই-রূপ অবস্থায় যদি তোমরা কুপিত হও বা বিদ্বেষ আনয়ন কর, তাহাতে তোমাদেরই ক্ষতি হইবে।"

এইরূপ সহিষ্ণু থাকাই বোধিমার্গের সাধকের পরম সম্পত্তি। বোধিমার্গের সাধক যে আধ্যাত্মিক ভাবের দ্বারা জীবনের কথা চিন্তা করে তাহা আরও অপূর্ব। তাঁহার নিকট জগৎ নিঃসার, মায়াময়। জগৎ মায়াময় বলিয়া চিন্তা করিলেও তিনি এই কথা ভুলেন না যে, জগৎ প্রতীত্যসমুৎপন্ন। অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তু সকারণতা ও পরিবর্তনের নিয়মে আবদ্ধ। এইজন্য তিনি সর্বদা প্রাণিমাত্রেরই দুঃখ দূর করার জন্য উদ্যোগী হইয়া থাকেন। কারণ তিনি জানেন যে দুঃখ কারণসম্ভূত এবং ইহাকে দূর করার উপায়ও আছে। প্রাণিহিতের জন্য তিনি অদম্য উৎসাহ লইয়া প্রযত্ন করিতে থাকেন। মহাকরুণা ও মহামৈত্রী তাঁহার আধ্যাত্মিক সম্পত্তি। তিনি মনে করেন যে, তিনি কোন ঈশ্বর বা ব্রহ্মা বা মার বা কোন অমনুষ্যের দাস নহেন, তিনি প্রাণিমাত্রেরই দাস। মানুষ নিজেই নিজের প্রভু, নিজেই নিজের দুঃখ দূর করিতে পারে। দুঃখ দূর করার জন্য তাহাকে কোন ঈশ্বর বা মারের শরণ লইতে হয় না, কোন পর্বত, বন, আরাম, বৃক্ষ, চৈত্যের শরণ লইতে হয় না। অনেক মানুষ ভয়ভীত হইয়া ঐ সকল শরণ লইয়া থাকে, কিন্তু বোধিমার্গের পথিক জানেন যে, ঐ সকল শরণ যথার্থ শরণ নহে, কারণ তাহাতে বাস্তবিক কল্যাণ হয় না, তাহাতে সকল দুঃখ দূর হয় না—

> "বহুং বে সরণং যন্তি পব্বতানি বনানি চ।
> আরামরুক্‌খচেতিয়ানি মনুস্সা ভয়তজ্জিতা ॥
> নেতং খো সরণং খেমং নেতং সরণমুত্তমং।
> নেতং সরণমাগম্ম সব্বদুক্‌খা পমুচ্চতি ॥"

(ধম্মপদ, ১৪।১০-১১)

শূন্যবাদের তত্ত্বজ্ঞানই তাঁহার একমাত্র আশ্রয়, কেন না ইহা ব্যতীত মানুষ ঐ সকল মিথ্যাদৃষ্টি হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারে না, যে সকল মিথ্যাদৃষ্টি তাহার মনে বদ্ধমূল হইয়া আছে, এবং যাহা হইতে সহজে নিষ্কৃতি লাভ অসম্ভব। মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন সেই সকল মূঢ় ব্যক্তিদের দশা সেই চিত্রকরের সঙ্গে তুলনীয় যে কোন যক্ষ বা দৈত্যের ভয়ঙ্কর চিত্র অঙ্কিত করিয়া নিজেই তাহার ভয়ে ভীত হইয়া উঠে—

> "যথা চিত্রকরো রূপং যক্ষস্যাতিভয়ংকরম্।
> সমালিখ্য স্বয়ং ভীতঃ সংসারেঽপ্যবুধাস্তথা ॥"

শূন্যবাদের সাহায্যে সকল প্রকার বাদবিবাদকে ছিন্নভিন্ন করিয়া বোধি-

মার্গের সাধক সকারণতা ও পরিবর্তনের নিয়মের সাহায্যে মানুষকে সম্যক্ পথে আনয়নের চেষ্টা করেন। প্রাণীদের দুঃখিত দেখিয়া তাহাদের সুখী করার জন্য সাধন প্রস্তুত করেন। প্রাণিহিতের জন্য অপার করুণা ও অপার ত্যাগচিত্তের জীবন তিনি ধারণ করেন। ঈশ্বর-ব্রহ্মা-মারাদি বন্ধনমুক্ত বর্তমান যুগের ঈশ্বরবাদীদের দৃষ্টিতে 'নাস্তিক' মহাযানীর অদ্বিতীয় প্রাণিহিতসাধনার অধ্যাত্মবাদ বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। তাঁহার শূন্যতাতত্ত্ব অনেক সমাদর যোগ্য। তাঁহার ধর্মমত এইজন্যই প্রশংসনীয় যেহেতু তিনি বুদ্ধের সেই উপদেশ বিস্মৃত হন না যে, ধর্মরূপ ভেলা সংসার সাগর অতিক্রম করার জন্যই, তাহাকে মাথায় লইয়া চিরকাল বহনের জন্য নহে। অতএব সংসার-সাগর অতিক্রম করিয়া ধর্ম-ভেলাকেও বিসর্জন করিতে হয়, কারণ অধর্ম পূর্বেই বিনষ্ট হইয়াছে। অধর্মই যদি না রহিল, ধর্ম-ভেলার আর প্রয়োজন কোথায়? অতএব তাহাও ত্যাজ্য।

"কোলোপমং ধর্মপর্যায়মাজানদ্ভির্ধর্মা এব প্রাহাতব্যাঃ প্রাগেবাধর্মাঃ"

(বজ্রচ্ছেদিকা)

পাদটীকা

* বর্তমান গ্রন্থের সম্পাদক ডঃ সুকোমল চৌধুরী কর্তৃক অনূদিত 'বিজ্ঞপ্তি-মাত্রতাসিদ্ধি' গ্রন্থের পরিশিষ্টাংশ হইতে পুনর্মুদ্রিত হইল।

১। যথা হি অঙ্গসম্ভারা হোতি সদ্দো রথো ইতি।

এবং খন্ধেসু সন্তেসু হোতি সত্তো তি সম্মুতি।—যেমন ঈষা, অক্ষ, চক্র প্রভৃতি অঙ্গসমূহের সমন্বয়কে 'রথ' শব্দের দ্বারা অভিহিত করা হয়, সেইরূপ রূপ-বেদনাদি পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টিকে সত্ত্ব বা জীব বলিয়া অভিহিত করা হয়।

২। নির্বাণ এবং আকাশ অসংস্কৃত (unconstituted) বলিয়া ইহাদের প্রসঙ্গ এখানে আসিবে না।

৩। নির্বাণকেও স্কন্ধ বলা হয়। আকাশকেও আয়তন বলা হয়। তবে অসংস্কৃত (unconstituted) বলিয়া ইহারা উক্ত অনিত্যাদি-ধর্মযুক্ত নহে।

৪। পৃঃ ৮৫-১১৬ দ্রষ্টব্য।

৫। অন্ধ্র সাম্রাজ্যের পশ্চিম অংশে (মহারাষ্ট্রে) সম্মিতীয় শাখার পীঠস্থান ছিল।

৬। অন্ধ্র সাম্রাজ্যে ধান্যকটকের মহাচৈত্যে এই শাখার কেন্দ্রস্থল ছিল বলিয়া উহার ঐ নাম হইয়াছিল।

৭। বর্তমান মিলিন্দপঞ্হ ছয়টি পরিচ্ছেদযুক্ত। কিন্তু ভাষা ও বর্ণভঙ্গী দেখিয়া মনে হয় ইহার প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদই প্রাচীন এবং আসল। অবশিষ্ট-গুলি পরবর্তীকালে সংযোজিত হইয়াছে। চীনা ভাষায়ও ইহার প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদেরই অনুবাদ পাওয়া যায়।

৮। "আত্মা স্কন্ধা যদি ভবেদায়ব্যয়ভাগ্ ভবেৎ।
স্কন্ধেভ্যোঽন্যো যদি ভবেদ্ ভবেদস্কন্ধলক্ষণঃ।"
মাঃ বৃঃ. পৃঃ ৩৪০।

৯। দীঘনিকায়, ১ম, পৃঃ ২০২ ; মাঃ বৃঃ, পৃঃ ৩৪৫।

১০। B. Sangharaksita, A Survey of Buddhism, pp.330-331

১১। "অপ্রহীণমসম্প্রাপ্তমনুচ্ছিন্নমশাশ্বতম্।
অনিরুদ্ধমনুৎপন্নমেতন্নির্বাণমুচ্যতে ॥"—মাঃ বৃঃ, পৃঃ ৫২১।

১২। "আকাশেন কৃতো গ্রন্থিরাকাশেনৈব মোচিতঃ।"—মাঃ বৃঃ, পৃঃ ৫৪০।

১৩। মল্লিখিত প্রবন্ধ 'আচার্য নাগার্জুন' দ্রষ্টব্য, নালন্দা, ১৩৭৩, পৃঃ ৬৫-৭৭।

১৪। মল্লিখিত প্রবন্ধ 'আচার্য আর্যদেব' দ্রষ্টব্য, নালন্দা, ১৩৭৬, পৃঃ ১০৩-১০৭ ; ১৩৭৭, পৃঃ ২৮-৩২।

১৫। মল্লিখিত প্রবন্ধ 'আচার্য মৈত্রেয়নাথ' দ্রষ্টব্য, নালন্দা, ১৩৭৭, পৃঃ ৮৩-৮৯।

১৬। মল্লিখিত প্রবন্ধ 'আচার্য অসঙ্গ' দ্রষ্টব্য, নালন্দা, ১৩৭৮, পৃঃ ৫৭-৬১।

১৭। প্রমুদিতা, বিমলা, প্রভাকরী, অর্চিষ্মতী, সুদুর্জয়া, অভিমুখী, দূরঙ্গমা, অচলা, সাধুমতী এবং ধর্মমেঘা।

১৮। বিশদ বিবরণের জন্য এই গ্রন্থের পৃঃ ৩৪৬-৩৫৮ দ্রষ্টব্য।

১৯। এই গ্রন্থের ৩৫৭-৩৫৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২০। ৩৫০-৩৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২১। অবশ্য এই বিষয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। অর্থাৎ দিঙ্‌নাগ বসুবন্ধুর শিষ্য কিনা সন্দেহ আছে। তিব্বতী ইতিহাস হইতে জানা যায় যে দিঙ্‌নাগের জন্ম হয় কাঞ্চী বা কাঞ্চীভরমে। তিনি বাৎসীপুত্রীয় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের জনৈক ভিক্ষু নাগদত্তের নিকট ভিক্ষুধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। কিছুকাল গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিয়া পুদ্গল (আত্মা) সম্বন্ধে মতভেদ ঘটিলে তিনি মঠ পরিত্যাগ করিয়া উত্তরভারতে আসিয়া আচার্য বসুবন্ধুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

২২। "ইতি সুনিপুণবুদ্ধিলক্ষণং বক্তুকামঃ পদযুগলমপীদং নির্মমে নানবদ্যম্।
ভবতু মতিমহিম্নশ্চেষ্টিতং দৃষ্টমেতজ্জগদভিভবধীরং ধীমতো ধর্মকীর্তেঃ।"
—ন্যায়মঞ্জরী, পৃঃ ১০০।

২৩। “ত্রুব্যাবাধ ইব চায়ং ধর্মকীর্তেঃ পন্থা ইত্যবহিতেন ভাব্যমিহেতি।”
—খণ্ডনখণ্ডখাদ্য ১।

২৪। প্রমাণবার্ত্তিক, ৩।৩৩৮-৩৩৭।
২৫। ঐ ২।২৮৪-৫।
২৬। ঐ ৩।৫৩৬।
২৭। ঐ ২।২৮।
২৮। মাধ্যমিক কারিকা (=মা. কা.) ৮।১২-১৩।
২৯। ব্রহ্মসূত্র (=ব্র. সূ.) ২।২।৩৪।
৩০। পৃঃ ২১০।
৩১। ব্র. সূ., ২।২।২৬।
৩২। ন্যায়সূত্র, ১।২।৫০।
৩৩। মাধ্যমিক কারিকা বৃত্তি (=মা. কা. বৃ.), ভূমিকা।
৩৪। মা. কা., ৮।২-৫।
৩৫। ঐ, ১৩।৮।
৩৬। ঐ, ২৪।৩৭-৩৮।
৩৭। ঐ, ২২।১৬, ১৫।
৩৮। ঐ, ২৭।২২-২৪।
৩৯। ব্র. সূ., ২।২।৩২।
৪০। ন্যায়সূত্র, ১।১।২২।
৪১। মা, কা., ১৬।৯।
৪২। ঐ, ১৮।৭।
৪৩। ঐ, ১৮।৯-১১।
৪৪। চতুঃশতক, ৮।১৫।
৪৫। মা. কা., ১৮।৬।
৪৬। ঐ, ২৪।১১-১২।
৪৭। বোধিচর্যাবতার (=বো. চ.), ৯।৩৫।
৪৮। ঐ, ৯।৭৩।
৪৯। ধম্মপদ, ৫।৩।
৫০। বোধিচর্যাবতার পঞ্জিকা (৯।৭৮)তে উদ্ধৃত।
৫১। মা. কা., ২৪।২০-২৪ (বঙ্গানুবাদ)।
৫২। ঐ, ২৪।৩৯-৪০।
৫৩। বৈশেষিক সূত্র, ১।২।১—২।১।২৪।
৫৪। ঐ, ১।২।৭।
৫৫। ব্র. সূ., ২।২।২০-২১।

৫৬। ঐ, ২।২।২৮-৩২।

৫৭। ঐ, ২।২।১২।

৫৮। ঐ, ২।২।২।

৫৯। ত্রিংশিকা কারিকা, কারিকা নং ২, ৫, ৮, ১৩।

৬০। বিংশতিকা কারিকা, কারিকা নং ১।

৬১। ঐ, কারিকা নং ২।

৬২। ঐ, কারিকা নং ৪, ৬।

৬৩। ন্যায়সূত্র, ৪।২।২।

৬৪। গৌড়পাদকারিকা, ৪।২৫।

৬৫। (মুদ্রণে ভুলবশতঃ '৬৬' হইয়াছে)
বটকৃষ্ণ ঘোষ, বিজ্ঞানবাদের ক্রমবিকাশ,
পরিচয় (পত্রিকা), শ্রাবণ, ১৩৪৫।

৬৬। বো. চ, ৯।১৭-১৮

৬৭। ঐ, ৯।১৮-১৯।

৬৮। (মুদ্রণে ভুলবশতঃ '৮৬' হইয়াছে)।
পৃঃ ১১।

৬৯। বো. চ, ৫।১০।

৭০। ধম্মপদ, ৫।৩।

৭১। আমরা ইতিপূর্বে অর্থাৎ এই গ্রন্থের 'নির্বাণলাভের মার্গ' শীর্ষক অধ্যায়ে শমথযান ও বিপশ্যনা যান সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। অতএব এখানে তাহার পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই।

৭২। অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা, পৃঃ ৩৯১-৪০০।

৭৩। অধ্যায়, ১৬।৮-১৯।

৭৪। ঐ, ১৬।৫।

৭৫। জাতকনিদান, পৃঃ ১৩।

৭৬। অষ্টসাহস্রিকা প্র. পা., পৃঃ ২৩-২৪।